প্রকাশক ঃ
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া-১৩৭৪ বঙ্গাব্দ

প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ
প্রাণেশ মণ্ডল

মুদ্রাকর ঃ
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা—১
বাংলাদেশ

সূচীপত্র

প্রার্থনা

নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥

গুরু পিতা গুরুর্মাতা গুরুর্দ্দেবো গুরুগতি।
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌরুষ্টে ন কশ্চন॥

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমস্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্বদেবতাঃ॥

নাস্তি মাতৃসমং দৈবং নাস্তি পিতৃসম গুরুঃ।
তয়োঃ প্রত্যুপকারোহপিন কথঞ্চন বিদ্যতে

নাস্তি মাতৃসমাচ্ছায়া নাস্তি মাতৃসমা গতিঃ।
নাস্তি মাতৃসমং ত্রানং নাস্তি মাতৃ সমা প্রভা॥

অঞ্জলি

জীবনে যাঁহার উদারতা সরলতা ও অনাড়ম্বরপ্রিয়তা
স্বপল্লীবাসীগণের হৃদয়ে একটী অলৌকিক আদর্শ সৃষ্টি
করিয়া গিয়াছে,
মৃত্যুতে যাঁহার স্বজাতিবর্গ এক অপূরণীয় শাশ্বত অভাব
মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ও অনুযোগ করিয়া আসিতেছে, এবং
যাঁহার অভয়বাণী প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে
কার্য্যকরী হইয়া আমাকে
বিশাল সংসারের সাম্য ও বৈষম্যরাশির
মধ্য দিয়া মনুষ্যত্বের পথে লইয়া চলিয়াছে,
আমার সেই পরমারাধ্য স্বর্গীয় পিতৃদেব —
চারুচন্দ্র বসু মল্লিক মহাশয়ের

ও

যাঁহার স্নিগ্ধশীতল করুণার ছায়ায়
সর্ব্বজনে সর্ব্বদা-ই সমভাবে বিরাম লাভ করিয়াছে,
যাঁহার অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি আমাদের ভবনে
অবিমিশ্র শান্তির উৎস প্রবাহিত রাখিয়াছে, এবং
যাঁহার আশীর্ব্বাণী এই পৃথিবীর সুখদুঃখের
সঙ্গমস্থলে এক অপার্থিব আনন্দ সঞ্চার করিয়া আসিতেছে,
আমার সেই শুভানুধ্যায়ী স্বর্গতা জননী দেবী—
রাজকুমারী শ্রীমতী কৃষ্ণসঙ্গিনী বসু মহাশয়ার চরণ যুগলে
ভক্তি ও শ্রদ্ধার সামান্য নিদর্শন স্বরূপ
পুষ্পাঞ্জলি এই গ্রন্থখানি
সমর্পণ করিলাম—

ইতি—গ্রন্থকার।

ভুমিকা

জাতীয় জাগরণের এই আনন্দ কোলাহলে সকল জাতিই স্ব স্ব উন্নতিকল্পে যথাশক্তি চেষ্টা করিতেছে। নিজের দেশকে বড় করিতে হইলে, নিজের ভ্রাতা, ভগ্নী, আত্মীয় স্বজনকে প্রথমে বড় করা প্রয়োজন। প্রত্যেকের-ই ভাবা উচিৎ— কি আমরা ছিলাম এবং কি হইয়াছি কোথা হইতে আসিয়া কোথায় যাইতেছি! নিজের দেশের নিজের গ্রামের এবং নিজ পিতৃপুরুষগণের গৌরব কথা বলিতে ও শুনিতে মানুষমাত্রেই ভালবাসে। আমাদের পিতৃকুলের পূর্বপুরুষদিগের নাম কি ছিল; তাহারা কোন জাতি হইতে সমুদ্ভূত, কি কি কার্য করিয়াছেন ইত্যাদি সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হওয়া প্রত্যেক বংশধরের-ই উচিৎ। যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, যাঁহাদের প্রসাদে ধন, মান, যশঃ সুখ সম্পদ উপভোগ করিয়া আসিতেছি তাঁহাদের আদি বৃত্তান্ত না জানা অত্যন্ত অগৌরবের বিষয়।

আমাদের দেশে পুরাকালে ধারাবাহিক ইতিহাস রক্ষা করা প্রথা ছিল না। পুরাতন কাব্যে ও পুরাণে মধ্যে মধ্যে অনেক রাজবংশের বিবরণ তন্মধ্যে রাজাদিগের এবং প্রধান প্রধান প্রজাগণের অবস্থা এক এক স্থানে বিশদরূপে বর্ণিত দেখা যায়। সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের চেষ্টায় বহু প্রাচীন গ্রন্থাদি ও কীর্তিচিহ্ন আবিষ্কৃত হইতেছে; শিলালিপি তাম্রলিপি, মুদ্রা ও পুরাণাদি হইতে এদেশের বহু প্রাচীন বংশের ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে।

"ঘটকেরে কুল কহে ভাটে দেয় পরিচয়।"

পুরাকালে ঘটক এবং ভাটদিগের নিকট হইতে কুলের পরিচয় পাওয়া যাইত। কুলীনগণ এক সময়ে কুল মর্যাদা ও বংশ কীর্তি রক্ষা করা একটা প্রধান ধর্ম মনে করিতেন। এজন্য তাঁহারা স্ব স্ব সমাজের পরিবারের কুলপঞ্জিকা লিখিবার নিমিত্ত কুলাচার্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ঐ সকল কুলপঞ্জিকা বা কুলগ্রন্থ হইতে আমাদের পূর্বপুরুষগণের অনেক বিবরণ সংগ্রহ হইতেছে। কুলগ্রন্থে আমাদের পূর্বপুরুষগণের কীর্তিকাহিনী শ্রবণ করিলে, আমরা বুঝিতে পারি আমাদের পূর্বপুরুষগণ কত উন্নত ও শক্তিশালী ছিলেন এবং তাঁহাদের বংশগৌরবের কথা স্মরণ করিলে, আমাদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিবার ইচ্ছা বলবতী হইবে এবং ইহাতে জাতীয় চরিত্রের গঠন হইবে।

রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থে দেখা যায় যে বিবাহ ইত্যাদি সভায় কুলগাথা গান করিবার কথা প্রচলিত ছিল। বিশেষ বিশেষ সামাজিক যজ্ঞ ও উৎসব উপলক্ষে বহু কায়স্থ সমবেত হইতেন, কুলাচার্যগণ তথায় সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া কর্মকর্তার পূর্বপুরুষগণের কারিকা ও গাথাগান করিতেন এবং পরে সেই উৎসবে উপস্থিত বিশেষ বিশেষ কুলীনগণের কারিকা গান হইত। প্রাচীন কুলগ্রন্থকে সাধারণতঃ ঢাকুরী বলে। সভায় আহ্বান বা ডাক উপলক্ষে গীত হইত বলিয়া ঢাকুরী বা চাকুরী (অথবা ঢাক) বাদ্যের সহিত গীত হইত বলিয়া নামে ঢাকুরী) অভিহিত হইত। একটি চামর হস্তে গীত হইলে উহাকে চামরী' ও পাঁচজন গায়ক দ্বারা পাঁচটি চামর হস্তে গীত হইলে 'পঞ্চ চামরী' ছন্দ বলিত। এখনও অনেক পল্লীগ্রামে বিবাহ সভায় বরযাত্রী ও কন্যাযাত্রীগণ সমবেত হইলে বা দুইটি সমজাতীয় পক্ষ একত্র হইলে, পরস্পর পরস্পরের নিকট কুলের পরিচয় দিতে হয়।

আমাদের দেশে এখন অনেকেই স্বজাতীয় ইতিহাস পাঠে সবিশেষ আসক্তি ও অনুরাগ দেখাইতেছেন, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়। আমরা বাল্যকাল হইতে বিদ্যালয়ে বিজাতীয় রাজগণের বংশাবলী ধারাবাহিকরূপে কণ্ঠস্থ করিতে পরাঙ্মুখ হই না; কিন্তু নিজেদের পিতৃকুলের এবং মাতৃকুলের তথ্য বা পরিচয় কিছুই জানিবার চেষ্টা করি না। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিতেন—সংসারে মাতাপিতা জীবন্ত দেবতাস্বরূপ। মাতৃ-পিতৃ পূজা ত্যাগ করিয়া বা মাতাপিতার প্রতি বা তাঁহাদের নানা প্রকার দুঃখকষ্টের প্রতি উদাসীন হইয়া, দেবপূজায় ধর্মার্জন হয় না। আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইতে আমরা যদি আমাদের পিতৃপুরুষগণের গৌরবের বিষয় স্মরণ করিয়া সকলে এক বংশ-গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া থাকিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া ধন্য হইব।

অক্লান্তকর্মী প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় নানারূপ পুরাতন গ্রন্থাদি দেখিয়া বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতির বহু প্রাচীন ইতিবৃত্ত ও খ্যাতনামা বহু বংশের বংশাবলী ও ইতিহাস প্রকাশ করিয়া দেশের অশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সংগৃহীত অমূল্য উপাদান হইতে আমি আমাদের পূর্বপুরুষগণের বহু অমূল্য বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাঁহার প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এই বৃহৎ বসুমল্লিক বংশের প্রত্যেকের সম্পূর্ণ ইতিহাস ও বংশলতা সংকলন করা অতীব দুরূহ কার্য। আমি যথাসম্ভব প্রত্যেক বিষয় নির্ভুলভাবে সংগ্রহ করিতে বহু চেষ্টা করিয়াছি। সংগৃহীত উপাদানে বহু ভ্রম থাকিতে পারে। কোথাও কোন বিষয়ে ভ্রম থাকিলে, দয়া করিয়া তাহা আমাকে জানাইলে, বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব।

"পটলডাঙা ভবন"
১৮, রাধানাথ মল্লিক লেন,
শুভ শারদীয়া বাসর, ১৩৪৭

শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র বসুমল্লিক

গ্রন্থকার দেবেন্দ্রচন্দ্র বসু মল্লিক
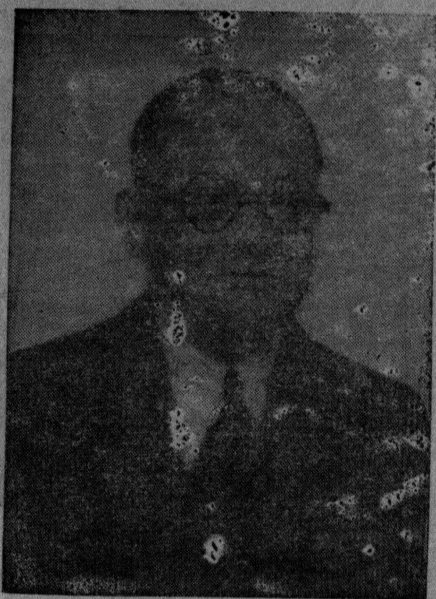
নীরদচন্দ্র বসুমল্লিক

হেমচন্দ্র বসুমল্লিক

নরেন্দ্রচন্দ্র বসুমল্লিক

রাজা সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক

প্রথম অধ্যায়

বসু বংশের উৎপত্তি

প্রবাদ আছে ব্রহ্মার কায়া হইতে চিত্রগুপ্তদেব জন্মগ্রহণ করেন এবং কায়া হইতে জন্মগ্রহণ বলিয়া কায়স্থ উপাধি অথচ ক্ষত্রিয় বলিয়া বিদিত হন। এই মহাত্মা শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেব কায়স্থ জাতির আদি পুরুষ।

পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডে কায়স্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে—

স্বষ্ট্যাদৌ সদসৎ কর্ম্মজ্ঞাপ্তয়ে প্রাণিণাং বিধিঃ।
ক্ষণং ধ্যানস্থিতস্তাস্য সর্ব্বকায়াদ্বিনির্গতঃ॥
দিব্যরূপঃ পুমান হস্তে মসীপাত্রঞ্চলেখনীম্।
চিত্রগুপ্ত ইতি খ্যাতো ধর্ম্মরাজসমীপতঃ॥
প্রাণিনাং সদসৎকর্ম্ম লেখায় স নিরূপিতঃ।
ব্রহ্মণাতীন্দ্রিয়জ্ঞানী দেবাগ্নের্যজ্ঞভুক্ সবৈ॥
ভোজনাচ্চ সদা তস্মাদাহুতির্দীয়তে দ্বিজৈঃ॥
ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো বর্ণ উচ্যতে।
নানা গোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যাঃ কাযস্থাভুবি সন্তিবৈ॥

অন্যত্র ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ বর্ণনা আছে—

ইত্যাকর্ণ্য ততো ব্রহ্মা পুরুষং স্বশরীজম্।
প্রহৃষ্য প্রত্যুবাচেদমানন্দিতমতিঃ পুনঃ॥
স্থিরচিত্তং সমাধায় ধ্যানস্থমতিসুন্দরম্।
মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূত স্তস্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকঃ॥
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাত ভুবি ভবিষ্যসি।
ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা॥
স্থিতি ভবতুর্তে বৎস মমাজ্ঞাং প্রাপ্যনিশ্চলাম্।
ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি॥

প্রজাঃ সৃজস্ব ভোঃ পুত্র ভুবি ভাবসমন্বিতঃ।
তস্মৈ দত্বা বরং ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়তঃ॥

ধর্মরাজ ধর্মাধর্ম বিচারকার্যে গোলমাল দেখিয়া এবং তজ্জন্য যাগযজ্ঞাদি ধর্মকর্ম করিতে সময়াভাবে একদা সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে বিনীতভাবে সেই দুঃখ-কাহিনী বিবৃত করিয়া ইহার সুব্যবস্থা করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা চিন্তিত হইয়া ধ্যানস্থ হইলে ব্রহ্মার সর্ব কায়া হইতে এক সুন্দর পুরুষ বাহির হইলেন। তিনি চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত হইয়া প্রাণিগণের সদসৎ কর্ম লিপিবদ্ধ করিবার জন্য ধর্ম-রাজের সভায় নিযুক্ত হইলেন। ব্রহ্মা দেবাগ্নিমধ্যে ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানী পুরুষকে যজ্ঞভাগ অর্পণ করিয়াছিলেন; সেই কারণে দ্বিজগণ ভোজনকালে এই মহাপুরুষকে আহুতি দিয়া থাকেন। ব্রহ্মার কায়া হইতে উৎপন্ন বলিয়া তিনি কায়স্থ জাতি নামে বিখ্যাত হইলেন। তাঁহার অন্য নাম ধর্মরাজ। তাঁহার বংশসম্ভূত কায়স্থগণ নানা গোত্রে বিভক্ত হইয়া পৃথিবীতে বাস করিতেছে।

গরুড়পুরাণের উত্তরখণ্ডের ১৯শ অধ্যায়ে আছে—

চিত্রগুপ্ত পুরং তত্র যোজনানাস্তু বিংশতিঃ।
কায়স্থাস্তত্র পশ্যন্তি পাপ পুণ্যানি সর্ব্বশঃ॥

বিংশতি যোজন বিস্তৃত চিত্রগুপ্তপুর, সেইখানে কায়স্থগণ সকলের পাপ পুণ্য বিচার করেন। (উত্তরখণ্ড—১৯।২)

কায়স্থ জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে কাশীরাম দাসের মহাভারতের আদিপর্বে দেখা যায়—

যমের বচনে সুচিন্তিত প্রজাপতি।
সেই কালে কায় হইতে হৈল উৎপত্তি॥
লেখনী দক্ষিণ করে তালপত্র বামে।
জাতিতে কায়স্থ হৈল চিত্রগুপ্ত নামে॥

ভবিষ্যপুরাণে ভীষ্মবাক্যে লিখিত আছে—

কায়স্থের লক্ষণ

ব্রহ্মবিৎসু পরাভক্তিঃ শণসূত্রস্য ধারণম্।
দানমধ্যয়নং ধ্যানং পরোপকারিতা তথা॥

যজনং শাস্ত্রতত্ত্বেন প্রজানাং পরিপালনম্।
রাজকর্ম্মক্ষমশৌচং কায়স্থলক্ষণং স্মৃতম্॥

স্কন্দপুরাণে প্রভাসখণ্ডে চিত্রগুপ্তদেবের জন্ম সম্বন্ধে যে বিবরণ আছে তাহাতে তাঁহাকে কায়স্থ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে আছে—

হে দেবী! পুরাকালে এই ভূমণ্ডলে সর্বভূতের প্রিয় ও হিতকর মিত্র নামে এক ধর্মাত্মা কায়স্থ ছিলেন। ঋতুকালে গমন করিয়া তিনি পরম তেজস্বী চিত্র নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন ও তাঁহার রূপগুণশালিনী একটি কন্যা হইয়াছিল। এই দুইটি পুত্র-কন্যা জন্মিবামাত্রই মিত্র পরলোক গমন করায় তাঁহার পত্নীও চিতাগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর অসহায় শিশু পুত্র-কন্যা দুইটি ঋষিগণ কর্তৃক মহারণ্যে প্রতিপালিত হইয়া বর্ধিত হইতে লাগিল। তাহারা শৈশব অবস্থায়ই ব্রত অবলম্বন করিয়া প্রভাস ক্ষেত্রে গমন করিল এবং তথায় গিয়া মহাদেব ও সূর্যের মূর্তি সংস্থাপিত করিয়া ধূপ মাল্য ও অনুলেপন দ্বারা তাঁহাদের পূজা করিয়া তপস্যা করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপ তপস্যা করার কিছুদিন পর ভগবান্ সূর্যদেব পরিতুষ্ট হইয়া চিত্রকে বলিলেন, হে সুব্রত! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি বর প্রার্থনা কর। চিত্র বলিল, হে ভগবান্ আপনি যদি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে এই বর প্রদান করুন যেন আমার সর্বকার্যে দক্ষতা ও স্পৃহা জন্মে। সূর্যদেব "তথাস্তু" বলিয়া তাঁহাকে বর প্রদান করিলেন। পরে চিত্র সর্বজ্ঞতা লাভ করিলেন। অনন্তর ধর্মরাজ চিত্রকে তাদৃশ ক্ষমতাপন্ন জানিতে পারিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে যদি এই মেধাবী আমার লেখক হয় তবে আমার সকল কার্যেই সিদ্ধি হইতে পারে। হে ভামিনি! ধর্মরাজ এইরূপ চিন্তা করিয়া একদা স্নানার্থ লবণ সমুদ্র-প্রবিষ্ট চিত্রকে অগ্নিতীর্থ হইতে স্বীয় অনুচরবর্গ দ্বারা নিজপুরে আনয়ন করিলেন। সেই চিত্রই সংসারে চিত্রলেখ বা চিত্রগুপ্ত নামে বিখ্যাত হন। (কায়স্থ সমাজ-তত্ত্ব—রাজেন্দ্র ঘোষ)।

শুক্রাচার্যের শুক্রনীতি ২য় অধ্যায়ে আছে—

গ্রামপো ব্রাহ্মণো যোজ্যো কায়স্থ লেখকস্তথা।
শুল্কগ্রাহীতু বৈশ্যাহি প্রতিহারশ্চ পাদজঃ॥

চিত্রগুপ্তদেবের নয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন যথা—শ্রীমদ্রা, নাগরা, গৌর, শ্রীবৎস, মাথুরা, অহিফনা, সৌরসেন, শৈবসেনা, ও অম্বষ্ঠা। উক্ত নয় পুত্রের

বংশে আটটি পুত্র আটটি দেশের শাসনকর্তা হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন যথা— চিত্রবীর্য জম্বুদ্বীপে, চিত্রাঙ্গদ প্লক্ষদ্বীপে, চিত্রসেন শাল্মলদ্বীপে, চিত্র কুশদ্বীপে, চিত্ররথ ক্রৌঞ্চদ্বীপে, চিত্রধ্বজ শাকদ্বীপে, সুচারু পুষ্করদ্বীপে এবং চরিত্র পাতালে রাজ্য স্থাপন করেন। চিত্রবীর্যের দুইটি পুত্র হয় বুদ্ধি ও বলাহক। বুদ্ধি শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেন এবং শর্মিষ্ঠার গর্ভে নয়টি পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বুদ্ধির জ্যেষ্ঠ পুত্র ধর্মজ্ঞ ভারতের রাজা হন। রাজা ধর্মজ্ঞ চন্দ্রবংশ সম্ভূত রাজা দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র রাজা ভরতের সচিব, কীর্তিমানের দুই কন্যা যতী ও সতীকে বিবাহ করেন এবং যতীর গর্ভে চারি পুত্র মতিমান, দাশরথী, অতিক্রান্ত ও গুহ্যক এবং সতীর গর্ভে সাত পুত্র দুর্বাক্য, দুর্বাসা, কুথু, শশাঙ্ক, পৌলব, সহস্রাক্ষ এবং দুর্দ্ধর্ষ জন্মগ্রহণ করেন। উক্ত পুত্রগণ বয়প্রাপ্ত হইয়া নৈমিষারণ্যে ঋষিগণের আশ্রমে বিদ্যাশিক্ষার জন্য গিয়া বাস করেন। মতিমন্ত সৌকালীন আশ্রমে, দাশরথী গৌতম আশ্রমে, অতিক্রান্ত বিশ্বামিত্র আশ্রমে, গুহ্যক কশ্যপ আশ্রমে, দুর্বাক্য দুর্বাসা আশ্রমে, কুথু ও শশাঙ্ক ভরদ্বাজ আশ্রমে, পৌলব বাসুকি আশ্রমে, সহস্রাক্ষ মুসাল আশ্রমে এবং দুর্দ্ধর্ষ কশ্যপ আশ্রমে গিয়া শিক্ষা লাভ করিতে থাকেন। যিনি যে ঋষির আশ্রমে গিয়াছিলেন তিনি সেই মুনির গোত্র পাইলেন এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক উপাধি নিজ নিজ জ্ঞানের সহিত লাভ করেন। মতিমন্ত যশের কারণ ঘোষ উপাধি, দাশরথী ধনরত্নের কারণ বসু উপাধি, অতিক্রান্ত মন্ত্রণাকুশল বলিয়া মিত্র উপাধি, গুহ্যক পর্বত গুহাতে বাস করার কারণ গুহ উপাধি, দুর্বাক্য দেবভক্ত বলিয়া দেব উপাধি, দুর্বাসা দাতা বলিয়া দত্ত উপাধি, কুথু করমিত্র বলিয়া কর উপাধি, শশাঙ্ক পালন প্রিয় বলিয়া পালিত উপাধি, পৌলব সেনাপতি বলিয়া সেন উপাধি, সহস্রাক্ষ সিংহপ্রতাপ জন্য সিংহ উপাধি, এবং দুর্দ্ধর্ষ সেবারত বলিয়া দাস উপাধি প্রাপ্ত হন। উক্ত মতিমন্ত, দাশরথী ইত্যাদি সকলে পুরাকালে উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বাস করিতেন এবং তাঁহাদের বংশের মতিমন্তের বংশে মকরন্দ ঘোষ, দাশরথীর বংশে দশরথ বসু, অতিক্রান্ত মিত্রের বংশে কালিদাস মিত্র, গুহ্যক গুহের বংশে দশরথ গুহ এবং দুর্বাসা দত্তের বংশে পুরুষোত্তম দত্ত গৌড়াধিপতি মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞে পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত বঙ্গদেশে প্রথমে আগমন করিয়া বঙ্গবাসী হন।

কথিত আছে, বসুবংশে, ভগবান ব্রহ্মার মানস পুত্র মহর্ষি অত্রির বংশাপত্যে মহাসত্ত্ব ওষধিনাথ আত্রেয়ের ষষ্ঠ উক্তর পুরুষে প্রতাপবান মহারাজাধিরাজ ভারত সম্রাট যযাতি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ছয় পুত্রের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ যদু এবং

সর্বকনিষ্ঠ পুরু। এই উভয় রাজবংশ ক্ষত্রিয় সমাজে বরণীয়। যদুবংশ হইতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণদেব জন্মগ্রহণ করেন। সম্রাট পুরুর বিংশোত্তর পুরুষে মহামহিমবর প্রবল প্রতাপশালী আজমীঢ় ভারত সিংহাসন অধিকার করেন। মহাবাহু আজমীঢ়ের রাজমহিষীর গর্ভজাত পুত্রের নবম পুরুষে পুণ্যশ্লোক বসু জন্মগ্রহণ করেন। প্রাতঃস্মরণীয় মহাবাহু কুরু ইহার অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহ, তন্নামে কুল প্রবর্তিত না হইয়া অধ্যাত্মপ্রাণে সিদ্ধকাম বসুর নামে কুল প্রবর্তিত হইয়াছিল। মহাভারতের আদিপর্বে কথিত আছে যে, স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র বসুকে স্বীয় পুষ্পক-বিমান উপহার দিয়া তৎসহ সখ্য স্থাপন পূর্বক হংসরূপ ধারণ করিয়া বসুকে প্রাণ-বিদ্যার উপদেশ দেন। এই বসুনৃপতি ইন্দ্রের উপদেশে যদু বংশধর কৌশিকের আত্মজ চেদিরাজার দেশে অরাজকতা উপস্থিত হওয়ায় শান্তিরক্ষার জন্য উক্ত চেদিরাজ্য অধিকার করেন এবং 'চৈদ্য বসু' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। জৈন হরিবংশ মতে "বিন্ধ্যা পৃষ্ঠে হভিচন্দ্রেণ চেদিরাষ্ট্রমধিষ্ঠিতম্"। বিশ্বকোষ মতে বিন্ধ্যাপৃষ্ঠে শুক্তিমতী নদীতীরে অগ্নিকোণে চেদি রাজধানী ছিল।

কাশীরাম দাসের মহাভারতের সভাপর্বে দেখা যায়—

প্রাগদেশ অধিপতি রাজা ভগদত্ত।
বিশ্বাবসু আদি সব বিদ্যাধর বহু॥
চিত্রসেন রাজা দেব চাচর ঈশ্বর।
বসুদেব সহ আসে যত যদুবীর॥

শ্রীভট্ট কবির মিশ্রকারিকা অতিপ্রাচীন গ্রন্থ। উক্ত গ্রন্থে বসুবংশের প্রথম পুরুষ দশরথ বসুকে "স চ চৈদ্য কুলাম্বুজঃ" চৈদ্য বসু বংশজাত বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

বিশ্বেশ্বরের কায়স্থ কুলদর্পণ পুস্তকে আমরা পাই—কথিত আছে দুষ্মন্ত-পত্নী শকুন্তলার গর্ভজাত মহারাজ ভরত অতি পুণ্যশীল নরপতি ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রীর জ্যোতি ও সতী নামক সর্বাঙ্গসুন্দরী সর্বগুণসম্পন্না দুই কন্যা ছিল। মহারাজ তাঁহাদিগকে ধর্মজ্ঞকে দান করিতে আদেশ করেন। এই ধর্মজ্ঞ মহাত্মা চিত্রগুপ্তের বংশধর মহারাজ চিত্রবীর্যের পুত্র বুদ্ধির পত্নী শর্মিষ্ঠার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। মন্ত্রী রাজাজ্ঞানুসারে ধর্মজ্ঞের সহিত কন্যাদ্বয়ের পরিণয় দেন। জ্যোতির গর্ভে মতিমন্ত দাশরথি ইত্যাদি সপ্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। ধর্মজ্ঞের সকল

পুত্র তৎকালীন নিয়মানুসারে নৈমিষ্যারণ্যে ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। উক্ত দাশরথি গৌতমমুনির সেবাশুশ্রূষা করিয়া গৌতম গোত্র প্রাপ্ত হন। উক্ত দাশরথির বংশে দশরথ বসু জন্মগ্রহণ করেন।

বসুধারা—চাতুর্বর্ণের আভ্যুদয়িক কার্যে উক্ত বসুবংশের সম্মান জন্য, অষ্টবসুর উপাসনার জন্য প্রাচীর গাত্রে বসুধারা এখনও প্রদত্ত হইয়া থাকে।

বাহাত্তর মৌলিক—

কথিত আছে চিত্রার্যের কনিষ্ঠ পুত্র বলাহকের পুত্র নিত্যানন্দ মগধ দেশে গিয়া বাহাত্তরটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং তাঁহার যে সন্ততিগণ হয় তাঁহারা বাহাত্তর মৌলিক বলিয়া অভিহিত হয় যথা—

হোড় স্বর হর বাণ সোম সুর পাই।
আইচ ধরুণী সাম ভঞ্জ বিন্দু ভুঁই।
চাকি বল লোধ চন্দ্র রুদ্র লুই শর্মা।
রাজ আদিত্য বিষ্ণু নাগ খিল পিল ধর্ম॥
ইন্দ্র গুপ্ত পাল ভদ্র রক্ষিত অঙ্কুর।
মন গণ্ড ওম নাথ রাহুত বন্ধুর॥
সাঁই হেস রাণা রামা গুত দাহা দানা।
খাম ক্ষোম ঘর ওঝা আশ আর সানা॥
অর্ণব বর্দ্ধন রঙ্গ গুঁই কীর্ত্তি ক্ষেমা।
শক্তি ভূত বিদ তেজ গণ বাস হেমা।
যশ কুন্ত নন্দী শীল ব্রহ্ম ধণু গুণ দাম॥

শ্রীবাস্তব

অনেক প্রাচীন গ্রন্থ শিলালিপি ইত্যাদি হইতে আমরা প্রমাণ পাই যে বসুবংশ শ্রাবস্তী নামক স্থানে বাস হেতু "শ্রীবাস্তব" কায়স্থ নামে অভিহিত হন। বঙ্গজ ঘটক কারিকা ও দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ কারিকার মতে শ্রীবাস্তব শাখা হইতে বসুবংশের উদ্ভব। শ্রীশ্রাবস্তীই বাস্ত বা শ্রীবাস্তব কায়স্থগণের আদি বাসস্থান। দ্বিজ ঘটকচূড়ামণি রচিত দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঘটক কারিকায় লিখিত

আছে যে 'শ্রীবাস্তব কুলে বসু বংশের উৎপত্তি।' উত্তর পশ্চিম প্রদেশের শ্রেষ্ঠ কায়স্থগণ শ্রীবাস্তব বংশ বলিয়া বিখ্যাত এবং চিত্রগুপ্ত বংশীয় শ্রীবাস্তব কায়স্থগণ সর্বোচ্চ সম্মান পাইয়া থাকেন।

এখন এই শ্রাবস্তী দেশ কোথায় তাহা লইয়া প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ গবেষণা করিতেছেন। রামায়ণে দেখা যায়, শ্রীরামচন্দ্রের মহাপ্রস্থানের পর, তাঁহার দুই পুত্র দুইটি রাজধানী স্থাপন করেন। কুশের রাজধানীর নাম কুশবতী, এবং লবের রাজধানীর নাম শ্রাবস্তী—যাহা অযোধ্যার উত্তর পশ্চিম প্রদেশে অবস্থিত। মৎস্যপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ ও কুর্মপুরাণে লিখিত আছে যে 'শ্রাবস্ত কর্তৃক গৌড়দেশে শ্রাবস্তী পুরী নির্মিত হইয়াছিল।' দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার পৃথিবীর ইতিহাসের ২য় খণ্ডে এই শ্রাবস্তীর অবস্থানের বিষয় বিশেষ আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন এই দেশ, গৌড় অযোধ্যা প্রদেশের কোন অংশবিশেষে অবস্থিত ছিল এবং বঙ্গদেশীয় গৌড় লইয়া প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে পাঁচটি গৌড় বিদ্যমান ছিল।

মহাভারতীয় চন্দ্রবংশীয় চেদীকুলোৎপন্ন পুরুবসুর বংশধরগণ শ্রাবস্তী বা শ্রীবাস্তব নামক নগরীতে রাজত্ব করিতেন। এই পুরুবসুর বংশধরগণ গৌতম গোত্রীয় ছিল। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে এই বসুবংশের আদি কুলস্থান পৌণ্ড্রবর্ধনের মধ্যে ছিল। এই পৌণ্ড্রবর্ধন হইতে চেদি কালাঞ্চল এমনকি সুদূর কাশ্মীর পর্যন্ত নানা স্থানে গিয়া বসুবংশ বাস্তব্য বা শ্রীবাস্তব আখ্যায় পরিচিত হন।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রবাবু তাঁহার দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ড পুস্তকে এ বিষয় অনেক গবেষণা করিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, শ্রাবস্তী বরেন্দ্র বা পৌণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত ছিল। বঙ্গদেশের উত্তর বিভাগকে তখন পৌণ্ড্রবর্ধন নামে অভিহিত করা হইত। বসুবংশ পৌণ্ড্রবর্ধন হইতে রাঢ়দেশে আসিয়া পরে বাস করেন।

নানা তাম্রশাসন, শিলালিপি ও প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে সন্ধান পাওয়া যাইতেছে যে চেদিরাজ সভার বহুপূর্ব কাল হইতে শ্রীবাস্তব কায়স্থগণ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন।

মহামতি নীলকণ্ঠ খিল হরিবংশে ২।৩৭।৩৪ শ্লোকের টীকায় "বসুযবো

বসুপতে বসুনাম্” (ঋ ১০।৪৭।১) এই শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন “বসুনাং বসুবংশানাং বসুগোত্রে ভবানাং বসুপতে মুখ্য স্বামিন ইতি।”

পারস্কর ও শাঙ্খায়নে “বসুনাম” অর্থ বসুগোত্র অথবা বসুবংশীয়দিগকে বলা হইয়াছে।

মহাভারতে বসুবংশকে পুরুবংশীয় বলা হয় -

স চেদি বিষয়ং রমং বসুঃ পৌরব নন্দনঃ।
ইন্দ্রোপদেশাজ্জ গ্রাহ রমণীয় মহীপতি ॥

(মহাভারত ১।৬৩।২)

কায়স্থ ক্ষত্রিয় না শূদ্র

অনেকের ধারণা যে কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয় নহে কারণ কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইলে উপনয়ন সংস্কার থাকিত, উপবীতধারী হইত এবং দ্বাদশ দিবস অশৌচ পালন করিত কিন্তু ইহা অত্যন্ত ভ্রমাত্মক ধারণা। কায়স্থ কখনও শূদ্র ছিল না বা হয় নাই। প্রাচীন পুরাণাদিতে এবং বহু প্রাচীন গ্রন্থাবলী, ভ্রমণ কাহিনী, কাব্য, নাটক, এবং নব আবিষ্কৃত প্রাচীন তাম্রশাসন শিলালিপি ইত্যাদি হইতে দেখা যাইতেছে যে কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। পদ্মপুরাণ, গরুড়পুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, গৌরতন্ত্র, মেরুতন্ত্র, দণ্ডতন্ত্র, বিজ্ঞানতন্ত্র, আচারনিয়মতন্ত্র, যমসংহিতা, নারদ সংহিতা, ঔশনস ধর্মশাস্ত্র, বিষ্ণুসংহিতা, মিতাক্ষরা, মনুসংহিতা, বৃহৎপরাশর, মেধাতিথি, কাত্যায়ন প্রভৃতি বহু প্রাচীন ধর্ম ও শাস্ত্রগ্রন্থে দেখা যায় যে কায়স্থকে ক্ষত্রিয় এবং লেখক জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছে। পদ্মপুরাণের পাতাল খণ্ডে ব্রহ্মবচনে—‘কায়স্থ দ্বিজাতি ক্ষত্রবর্ণ বেদ-শাস্ত্রাধিকারী এবং লেখক’ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

স্কন্দপুরাণে বর্ণনা আছে—

কায়স্থ এষ উৎপন্নঃ ক্ষত্রিণ্যাং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ।

ইহা হইতে প্রকৃষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে ক্ষত্রিয়ের গর্ভে ক্ষত্রিয়ার ঔরসে কায়স্থের জন্ম হয়। ব্যোমসংহিতায় লিখিত আছে যে কায়স্থের উপাধি বর্মা।

ব্রহ্মকায়াৎ সমুদ্ভূতঃ কায়স্থো বর্ম্মসংজ্ঞকঃ।
কলৌহি ক্ষত্রিয়স্তস্য জপযজ্ঞেষুরাজনম্॥

প্রাচীনকালে সকল দ্বিজাতির ন্যায় কায়স্থ জাতির উপনয়ন সংস্কার ছিল এবং প্রত্যেক কায়স্থই উপবীত ধারণ করিতেন। বঙ্গদেশের কতক কায়স্থ ভিন্ন ভারতবর্ষের সকল দেশের কায়স্থই এখনও উপবীতধারী এবং দ্বাদশ দিবস অশৌচ পালন করিয়া আসিতেছেন এবং সম্পূর্ণরূপে ক্ষত্রোচিত সংস্কারসম্পন্ন।

আদিশূরের যজ্ঞে আগত পঞ্চকায়স্থ উপবীতধারী ছিলেন এবং সেই সময়ে বঙ্গদেশের সকল কায়স্থই ক্ষত্রোচিত সংস্কারসম্পন্ন ছিলেন। পরে বিধর্মী মুসলমানগণের রাজত্বকালে অনেক কায়স্থ ক্ষত্রোচিত সংস্কার ত্যাগ করিয়াছিলেন। এক সময়ে বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ প্রভাব বৃদ্ধি হয়। সেই সময়ে বেদ-বিরোধী বৌদ্ধ তান্ত্রিকগণের প্রভাবে বঙ্গদেশের অনেক কায়স্থ বংশ বেদচর্চা ও বেদোক্ত বা কার্য পরিত্যাগের সহিত যজ্ঞসূত্রও পরিত্যাগ করেন। রামানন্দ মিশ্রের কুলদীপিকা গ্রন্থে লিখিত আছে যে 'কায়স্থোস্ত্যজয়েৎ সূত্রং বৌদ্ধেত বিপ্রহীনতঃ।' বঙ্গের কায়স্থগণ বৌদ্ধবিপ্লবে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাবে যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করেন। এইরূপ নানা কারণে বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণ উপনয়ন সংস্কার বিহীন হইয়া ধর্মশাস্ত্রানুসারে ব্রাত্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেইকারণে চিত্রগুপ্ত-সন্তান বঙ্গীয় কায়স্থগণকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় অভিহিত করেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য দশসংস্কার রহিত হইলে ব্রাত্য হয় কিন্তু জাতিচ্যুত হয় না। শাস্ত্রে ব্রাত্য জাতি চান্দ্রায়ণ ব্রতাদির দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনরায় পূর্ব পদ পায়।

৺দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার পৃথিবীর ইতিহাসের ২য় খণ্ড ৩২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"কায়স্থগণ যে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় তৎসম্বন্ধে বহুল প্রমাণ পরম্পরা দৃষ্ট হয়। 'কায়স্থ এব উৎপন্নঃ ক্ষত্রিণ্যা ক্ষত্রিয়াত্তত:'—স্কন্দ-পুরাণান্তর্গত এতদ্বচনে ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে কায়স্থের জন্ম হয় সপ্রমাণ হইয়াছে। এইরূপ মিশ্রবর্ণ নহে বর্ণশঙ্কর নহে অথচ উপাধি দেখিয়া সহজে বুঝিতে পারা যায় না এমন অনেক উচ্চ জাতির অস্তিত্ব আজিও অক্ষুণ্ণ আছে। যে সকল জাতির মধ্যে বিবাহের বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই অর্থাৎ সবর্ণের মধ্যেই বিবাহ চলিতেছে সেই সমুদয় জাতিকে বর্ণশঙ্কর বলা যাইতে পারে না।"

বঙ্গীয় কায়স্থগণ যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিয়াছিল বলিয়া যে তাহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইল এমন কোন শাস্ত্রসংগত কারণ নাই। ব্রাহ্মণ যজ্ঞসূত্র ধারণ না করিলে কি শূদ্র হয়? অনেকে বলেন কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইলে একমাস অশৌচ পালন না করিয়া দ্বাদশ দিবস অশৌচ পালন করিত কিন্তু একমাস অশৌচ পালন করিয়াই যে শূদ্র হইয়া গেল তাহার কোন প্রমাণ নাই।

মহাভারতের শান্তিপর্বে প্রকাশ পাণ্ডবগণ সুহৃদ্‌বর্গের মৃত্যুর পরে একমাস অশৌচ গ্রহণ করিয়াছিলেন যথা—

কৃতোদকাস্তে সুহৃদাঃ সর্ব্বেষাং পাণ্ডুনন্দনাঃ।
শৌচং নির্ব্বর্ত্তয়ামাসু মাসমাত্রং বহিঃপুরাৎ॥

—শান্তিপর্ব্ব ১।২।

চণ্ডালাদি অনেক নীচ শূদ্র জাতি দশ বা দ্বাদশ দিবশ অশৌচ পালন করে বলিয়া তাহারা উচ্চ বর্ণ বলিয়া গণ্য হয় না। সেইরূপ বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের মধ্যে যাঁহারা দ্বাদশ দিবস অশৌচ পালন না করিয়া একমাস অশৌচ পালন করিয়া থাকেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় জাতিচ্যুত হইয়া শূদ্র হইবেন এরূপ কোন বিধান শাস্ত্রে নাই।

কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়বর্ণো ন তু শূদ্রঃ কদাচন।

—ইতি বিজ্ঞানতন্ত্রম্।

শাস্ত্রে কায়স্থের বর্ণনা—

বিদ্যাবাংশ্চ শুচি ধীরো দাতা পরোপকারকঃ।
রাজধর্ম্মী দয়াশীলো কায়স্থ সপ্তলক্ষণং॥
মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ স্বরান্‌লব্ধলক্ষণ কলোদ্ভাতান্।
সর্ব্বান্ সপ্তবষ্টৌ বা প্রকুর্ব্বীত পরীক্ষিতান্॥
সপ্তৈতৎ গুণকৈ যুক্তাঃ কায়স্থানুমহাবলাঃ।
খ্যাতাশ্চ মৌলিকাস্মাৎ সর্ব্বধর্ম্মবিদাম্বরাঃ॥
কায়স্থৈ রাজসম্বন্ধাৎ প্রভবিষ্ণুভিঃ।

—শূলপাণিকৃত কবচ।

অর্থাৎ রাজ সম্বন্ধ জন্য কায়স্থগণ অত্যন্ত প্রভাবশালী। প্রায় ৩৫০ বৎসর

পূর্বে বারাণসীর সুপ্রসিদ্ধ ধর্মশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর ভট্ট ওরফে গাগাভট্ট তাঁহার 'কায়স্থ ধর্মপ্রদীপ' নামক গ্রন্থে কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন এবং মহামহোপাধ্যায় তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয় তাঁহার বাচস্পত্যাভিধান নামক সংস্কৃত অভিধানে কায়স্থ জাতির দ্বিজত্ব ও উপনয়ন গ্রহণের অনুকূলে শাস্ত্রীয বচন উদ্ধৃত করিয়া কায়স্থ জাতিকে ক্ষত্রিয় বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর যুগে কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিচিত ছিল। চৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যলীলায়—

"কেশব ছত্রীরে রাজা বার্ত্তা যে পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল॥"

এখানে কেশব বসুকে ছত্রী বা ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে।

বঙ্গদেশে কায়স্থের প্রভাব

আমরা বাঙ্গালাদেশের প্রাচীন সাহিত্য পুস্তক সমূহ পাঠ করিলেই দেখিতে পাই যে বহু প্রাচীনকাল হইতে সর্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে এই কায়স্থ জাতি। শিক্ষা সাহিত্য ধর্ম যশ অর্থবল প্রতিভা রাজকার্য সম্ভ্রম বা পদমর্যাদা ইত্যাদি কোন বিষয়েই অন্য কোন জাতি অদ্যাবধি কায়স্থ জাতির সমকক্ষ হইতে পারে নাই। কি হিন্দুযুগে, বৌদ্ধ যুগে, কি মুসলমান রাজত্বকালে বা কি ইংরাজ রাজত্বকালে সর্ব সময়ে রাজকার্যের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ পদসকল নিজ প্রতিভাবলে এই কায়স্থ জাতি পাইয়া আসিতেছে। প্রজাপালন করা এই কায়স্থ ক্ষত্রিয় জাতির ধর্ম—

'ক্ষত্রিয়ানাং হি সংস্কারোঽধ্যয়নং যজ্ঞকর্ম্ম যৎ।
তৎ করিষ্যতি কায়স্থঃ প্রজাপালন কর্ম্মনি॥
—স্কন্দপুরাণ, সহ্যাদ্রি খণ্ড ৬৬ অঃ।

ক্ষত্রিয়গণের যে রূপ সংস্কার অধ্যয়ন অধিকার এবং যজ্ঞকর্ম ও প্রজাপালন নির্দিষ্ট আছে কায়স্থ তাহাই করিবে।

এক সময়ে এই বঙ্গদেশে শাসন ও শিক্ষার ভার সম্পূর্ণ এই কায়স্থ জাতির উপর ন্যস্ত ছিল। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রবাবুর বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের রাজন্যকাণ্ডতে দেখা যায় যে সম্রাট অশোকের স্তম্ভলিপিতে ইহা ঘোষণা করা হইয়াছিল, 'যেমন কোন ব্যক্তি উপযুক্ত ধাত্রীর হস্তে শিশুকে ন্যস্ত করিয়া শান্তি বোধ করে এবং মনে মনে বলিয়া থাকে ধাত্রী আমার শিশুটীকে ভাল করিয়াই রাখিবে আমিও সেইরূপ জনপদ গঠনের মঙ্গল ও সুখের জন্য রাজুককে বা কায়স্থগণকে দিয়া কার্য করাইতেছি। আমি পুরস্কার ও দণ্ডবিধানে রাজুকগণকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছি। তাঁহারাই রাজকীয় কার্যে সমতা দেখাইবেন, দণ্ড বিধানেরও সমতা দেখাইবেন।'

রাজুক সম্বন্ধে Dr Buhlar লিখিয়াছেন—

That Asoka's Rajukas were better scholars than Karkuns of the British Government officers before the introduction of the European system of education.

—Epigraphia Indica, vol. 1, p. 17.

In note I to my German translation of Rock Edict II, I have pointed out that Professor Jacobi found the Jaina Prakrit representation of lajuka or rajuka (Girnar) in the Kalapasutra were rajju means writer, a clerk. I have added that lajuka i. e. Rajjuka was an old name of the writer caste which is later called (Dabir) Kayastha and that Asoka calls his great administrative officials simply the writers because they were chiefly taken from that caste.

—Epigraphia Indica, Vol. II, p. 254

গত ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের সেনসাস রিপোর্টে দেখা যায়—

Bengal is pre-eminently the land of Kayasthas. No other province in India can compare with Bengal as regards the nature and importance of the Kayastha community. In the 16 century Bengal was ruled by a number of semi-independent

and independent princes called Bhuiyas most of whom were Kayasthas.

—Census of India, Vol. V, part I, page 526.

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বার্ষিক সভায় ঘোষণা করিয়াছিলেন—

খৃষ্টীয় ৫০০ অব্দ পূর্ব হইতেই সমগ্র গৌড়বঙ্গের শাসন ভূভাগ কায়স্থ জাতির একচেটিয়া ছিল। কায়স্থের অনুমোদন ভিন্ন বিন্দুমাত্র জমি কাহারও দখল করিবার সুবিধা ছিল না।

সাড়ে তিনশত বৎসর পূর্বে ভারত সম্রাট বাদশাহ্ আকবরের সভায় আবুল ফজল সকল জনপদের প্রাচীন মালমসলা লইয়া তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ আইন-ই আকবরী গ্রন্থে বঙ্গের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহাতেই আমরা দেখিতে পাই—

The Subah of Bengal consists of 24 Sarkars and 787 Mahals. The revenue is 56 crores, 84 lakhs, 593, 19 dams = Rs. 14961482—15—7½ in money. The Zeminders are mostly Kayasthas. Their troops number 23330 cavalry, 801150 infantry, 1170 elephants, 4260 guns and 4400 boats.

—Ain-i-Akbari translated by Col. Jarrett,
Asiatic Society's Edition, Vol. II, p. 129.

বাঙ্গালা সুবা ২৪টি সরকার এবং ৭৮৭টি মহালে বিভক্ত ছিল। রাজস্ব ৫৬ কোটি ৮৪ লক্ষ, ৫৮৩, ১৯ দাম ছিল যাহা এখনকার মুদ্রায় ১৪৯৬১৪৮২৸৵৭॥ টাকা। জমিদারেরা প্রায়ই কায়স্থ এবং তাহাদের ২৩৩৩০ অশ্বারোহী, ৮০১১৫৮ পদাতিক ও ১১৭০ গজ, ৪২৬০ কামান এবং ৪৪০০ নৌকা ছিল।

Indian Antiquary 'ভারতীয় পুরাতত্ত্ব' নামক গ্রন্থমালা গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পঞ্চম খণ্ডে কটক জেলায় প্রাপ্ত কতিপয় তাম্রশাসনের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—

It is a noticeable fact 'Sandhi-Bigraha' or 'minister of war and peace and the secretary' were always Kayastha or men of the writer caste. This not only' occurs in Kataka plates but in grants or inscriptions found in Ceylon and Central India.

—Indian Antiquary, Vol. V. p. 57.

ইহা একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় যে হিন্দু রাজাদের শাসনকালে সন্ধি-বিগ্রহ বা যুদ্ধ ও সন্ধি বিষয়ক মন্ত্রী ও সেক্রেটারী বা সচিব সর্বদাই কায়স্থরাই হইতেন। কেবল কটকের তাম্রফলকসমূহে নহে সিংহল ও মধ্যভারতে প্রাপ্ত শিলাখণ্ডে ও শাসনপত্রাদিও এ বিষয় সাক্ষ্য দান করিতেছে।

ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে দেখা যায় যে কায়স্থগণ বিষয় ব্যবস্থায় অভিজ্ঞ বলিয়া 'মহত্তর দশগ্রামিকাদি' কার্যে নিযুক্ত হইতেন। পরবর্তীকালেও বহুতর কায়স্থ সন্তানের এই সমস্ত কার্যে নিয়োগের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখনকার Accountant General মুখ্যগণক, Finance Minister অর্থসচিব, Revenue Minister রাজস্ব-সচিব, Foreign Minister পররাষ্ট্র সচিব, সামরিক মন্ত্রী বা সান্ধিবিগ্রহিক যেরূপ। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের রাজদরবারে দুই-চারিজন কায়স্থকে দেখা যায় এবং বেশীর ভাগই উচ্চপদ ইংরাজগণ দখল করে, প্রাচীন ভারতে হিন্দু ও মুসলমান রাজদরবারে ঐ সকল উচ্চ রাজপদ কায়স্থগণই পাইয়া থাকিত এবং কায়স্থ জাতির মধ্যেই সংবদ্ধ ছিল। এই পটলডাঙ্গা বসুমল্লিক বংশের ১১ পর্যায় হইতে ১৭ পর্যায়ের মহীপতি বসু, ঈশান, বলভদ্র, গোপীনাথ বা পুরন্দর খাঁ, গোবিন্দ, কেশব, শ্রীকৃষ্ণ, চক্রপাণি, রঘুনাথ প্রভৃতি পরপর বহু মহাপুরুষ বাঙ্গলার নবাবের রাজদরবারে উচ্চ রাজমন্ত্রী প্রভৃতির পদ অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকেই তাঁহাদের অনেকের বিষয় উল্লেখ করা হইল।

কানুনগোর কার্যেও কায়স্থগণের একাধিপত্য ছিল। পাঠান শাসনকালে যে সমস্ত ভূমি সরকারের খাসে আসিত তাহার রাজস্ব আদায়ের নিমিত্ত চৌধুরী এবং ক্রোরী নামধেয় কর্মচারী নিয়োজিত হইতেন। কানুনগোগণ এই সকলের রাজস্ব আদায় এবং মহল শাসন করিত। কায়স্থগণ বহুকাল হইতে রাজকার্যে বিশেষ অভিজ্ঞ হওয়ায় উক্ত চৌধুরী বা ক্রোরীর কার্য প্রায় কায়স্থ লেখকগণই

প্রাপ্ত হইত। সেই সময় হইতেই কায়স্থগণ অধিকাংশ জমির জমিদার বা মালিক হইয়া পুরুষানুক্রমে ভোগ দখল করিয়া আসিতেছে।

বাঙ্গলার নবাব হোসেন সাহের রাজত্বকালে এই বসুবংশের গোপীনাথ বসু বা বসু পুরন্দর খাঁ সুলতানের প্রধান রাজস্ব-সচিব Finance Minister ও নৌ-সেনাপতি Naval Commander ছিলেন এবং রাঢ়ে রায়না নামক স্থানে দিল্লীশ্বরের আগমন উপলক্ষে মহাসমারোহ ব্যাপারে দক্ষিণ বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজপতি উক্ত পুরন্দর খাঁর তাঁবু পড়িয়াছিল। সেখানে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন জাতিই সেই কায়স্থ মন্ত্রীবরকে নমস্কার করিয়া অভিবাদন জ্ঞাপন করিয়াছেন।

সম্ভ্রান্ত কায়স্থগণ স্বধর্মপালক ও সদাচারসম্পন্ন ছিলেন। বিদ্যাশিক্ষায় তাঁহারা শ্রেষ্ঠ জাতি এবং সংস্কৃত সাহিত্য ও কবিতা চর্চায় যে কায়স্থ জাতি ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষা নিম্নে ছিল না তাহার প্রমাণ কাশীরাম দাসের মহাভারত ও এই বসু-বংশের কুলীনগ্রামবাসী মালাধর বসু বা গুণরাজ খান ও রায় রামানন্দ বসু প্রভৃতি। বাঙ্গলা সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করিলেই দেখা যায় সাহিত্য-সেবকগণের সংখ্যানুপাতে কায়স্থ সাহিত্যিকের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যতগুলি সাধারণের দান বা Public Endowments ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে তাহার টাকার অঙ্ক ধরিলে প্রায় চারি ভাগের তিন ভাগ টাকা শিক্ষাবিস্তারের জন্য কায়স্থ দাতাগণের দান। এই বসুবংশের ২৬শ পর্যায়ের শ্রীগোপাল বসুমল্লিক মহাশয় সংস্কৃত শিক্ষা বিস্তারের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রায় দুই লক্ষ টাকা এবং রাজা সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক মহাশয় যাদবপুর শিক্ষালয়ে এক লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। গত ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের সেনসাস রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে ১০০০ জন হিন্দুর মধ্যে মাত্র ২৫৬ জন শিক্ষিত কিন্তু প্রতি ১০০০ কায়স্থের মধ্যে ৫৭১ জন বা অর্ধেকের অধিক কায়স্থ লেখাপড়া জানে।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে লিখিয়াছেন—"কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারী।" চৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যলীলা অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই "বিশেষ কায়স্থ বুদ্ধে অন্তরে করে ডর।" ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী লিখিত কবিকঙ্কণ চণ্ডী কাব্য নানা রত্নের আকর। ইহাতে সে যুগের বাঙ্গালী

সমাজবিন্যাস এবং ধর্মকর্ম জীবনের অনেক কথাই পাওয়া যায়। এই পুস্তকের এক স্থানে দেখা যায়—

কায়স্থ আইল মহাজন।

প্রসন্ন সবার বাণী লেখাপড়া সবে জানি
ভব্য জন নগরের শোভা।
কুলে শীলে হীন দোষ কেহ মাহেশের ঘোষ
বসু মিত্র কুলের প্রধান।
তব গুণে হ'য়্যা বন্দী পাল পালিত নন্দি
সিংহ সেন দেব দত্ত দাস।
কর নাগ সোম চন্দ্র ভঞ্জ বিষ্ণু রাহা বিন্দ
একস্থানে করিব নিবাস।
বিচার করিয়া তুমি দিবে ভাল বাড়ী ভূমি
শুনি বীর হৃদয় উল্লাস।

সেই বৈষ্ণব যুগে সকল কায়স্থই লেখাপড়া জানিত। ইঁহারা মহাজন। ভব্য সমাজে ও নগরের শোভা স্বরূপ ছিল। ভাল বাটীতে বাস করিত এবং ভূ-সম্পত্তি ছিল। মাহেশের ঘোষ শীলে দোষহীন ছিল। বসু ও মিত্র কুলের প্রধান।

এই বঙ্গদেশে হিন্দু যুগে কায়স্থ জাতির বহু নৃপতি রাজা হইয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। সম্রাট আকবরের মন্ত্রী আবুল ফাজেল তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বঙ্গের ভোজ, শূর, পাল ও সেন এই চারটি রাজবংশকেই কায়স্থ রাজবংশ বলিয়া উক্ত করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালাদেশের ইতিহাসে অনেক রাজার বিষয় বর্ণিত আছে যেমন দনুজমর্দনদেব, বসন্ত রায়, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য, সীতারাম, মুকুন্দরাম, লক্ষ্মণমাণিক্য, রাজা গণেশ ও চন্দ্রদ্বীপের বসুবংশীয় রাজাগণ। ব্যোমসংহিতায় লিখিত "ব্রহ্মকায়াৎ সমুদ্ভুত কায়স্থো বর্ম্ম-সংজ্ঞকঃ। কলৌহি ক্ষত্রিয়স্তস্য জপযজ্ঞেষুরাজনম্।'—এই বচন হইতে বেশ প্রমাণ হইতেছে যে কায়স্থগণ এক সময়ে ভারতের রাজা হইয়াছিল।

অনেকের ধারণা যে রাজা আদিশূর মহারাজের সভায় বঙ্গদেশে প্রথম পাঁচজন কুলীন কায়স্থ আগমন করেন এবং তৎপূর্বে বঙ্গদেশে কায়স্থ বিরল

ছিল কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এখন যে সমস্ত তাম্রলিপি ও শিলালিপি এবং অন্যান্য প্রাচীন পুঁথি ও গ্রন্থাদি আবিষ্কৃত হইতেছে তাহা হইতে বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে রাজা আদিশূরের রাজত্বকালের বহু শতাব্দী পূর্ব হইতে এই বঙ্গদেশে বহু কায়স্থের বাস ছিল।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের গবর্ণমেণ্টের সেনসাস্ রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে সমগ্র ভারতবর্ষে কায়স্থ জনসংখ্যা মোট ২৯৪৭২২৬ জন। তন্মধ্যে অর্দ্ধেকের উপর ১৫,৫৮,৪৭৫ জন কায়স্থ এই বঙ্গদেশবাসী। ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে বহু শতাব্দী পূর্ব হইতে এই বঙ্গদেশে বহু কায়স্থ বাস করিত এবং বঙ্গদেশকে কায়স্থপ্রধান দেশ বলিয়া বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক পুস্তকে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ৺নগেন্দ্রবাবু প্রমাণ করিয়াছেন যে আড়াই হাজার বর্ষ পূর্বে এখানে সম্ভ্রান্ত বহু কায়স্থ বাস করিত এবং তাহারাই গৌড় কায়স্থ। ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে পরাক্রান্ত মহারাজ ললিতাদিত্য কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। মহামতি কহ্লন তাঁহার রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থে উক্ত ললিতাদিত্যের গৌড়দেশ বিজয় ও পরে উক্ত নৃপতির বিশ্বাসঘাতকতার জন্য গৌড়ীয়েরা উক্ত সময়ে শ্রীপরিহাসকেশবের মন্দির ধ্বংস করিয়া দিবার বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন।

মহারাজ আদিশূরের রাজত্বকালে গৌতম গোত্রীয় বসুবংশ, সৌকালীন গোত্রীয় ঘোষবংশ এবং বিশ্বামিত্র গোত্রীয় মিত্রবংশ কান্যকুব্জ প্রদেশ হইতে আসিয়াছিলেন ইহা সত্য কিন্তু এখন প্রাচীন ঐতিহাসিক নানারূপ পুরাণদি, শিলালিপি ও পুঁথি ইত্যাদি হইতে বহু প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে উক্ত গৌতম গোত্রীয় বসুবংশ, সৌকালন গোত্রীয় ঘোষবংশ এবং বিশ্বামিত্র গোত্রীয় মিত্রবংশ ভিন্ন অন্য গোত্রীয় অনেক বসু ঘোষ মিত্র ইত্যাদি বহু প্রাচীন কাল হইতে এই বঙ্গদেশে বসবাস করিয়া আসিতেছেন।

কায়স্থ জাতির গৌরব স্বামী বিবেকানন্দকে যখন মাদ্রাজে শূদ্র বলিয়া ব্রাহ্মণেরা উপহাস করেন তাহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—

"আমি সমাজ সংস্কারকগণের মুখপত্রে পড়িলাম যে তাঁহারা বলিতেছেন—যে আমি শূদ্র আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন শূদ্রের সন্ন্যাসী হইবার

কি অধিকার আছে? ইহাতে আমার উত্তর এই যদি তোমরা তোমাদের পুরাণ বিশ্বাস কর, তবে জানিও আমি সেই মহাপুরুষের বংশধর যাঁহার পদে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ 'যমায় ধর্ম্মরাজায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ'—মন্ত্র উচ্চারণ সহকারে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন; আর যাহার বংশধরগণ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। এই বাঙ্গালী সংস্কারগণ জানিয়া রাখুন আমার জাতি অন্যান্য নানা উপায়ে ভারতের সেবা ব্যতীত শতশত শতাব্দী ধরিয়া ভারতের অর্দ্ধাংশ শাসন করিয়াছিল। যদি আমার জাতিকে বাদ দেওয়া যায়; তবে ভারতের আধুনিক সভ্যতার আর কতটুকু অবশিষ্ট থাকে? কেবল বাঙ্গলা দেশেই আমার জাতি হইতে তাহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক সকলের অভ্যুদয় হইয়াছে। আমার জাতি হইতেই আজকালকার ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের অভ্যুদয় হইয়াছে।"

—'ভারতে বিবেকানন্দ'।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহারাজ আদিশূর

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গদেশে পালবংশীয় রাজাগণ বিশেষ প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়াছিল। সেনবংশীয় রাজাগণ পূর্ববঙ্গে এবং পালবংশীয় রাজাগণ পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে রাজত্ব করিতেন। পালবংশীয় শেষ রাজা ন্যায়পালকে বিতাড়ন করিয়া পূর্ববঙ্গের সেনবংশীয় রাজা বীরসেন সমগ্র বঙ্গরাজ্য অধিকার করেন। প্রত্নতত্ত্ববিশারদ পণ্ডিতগণের মতে বীরসেন এবং আদিশূর একই ব্যক্তি। জেনারেল কানিংহামের এবং জে সি মার্সম্যানের মতে বীরসেন সেনবংশীয় রাজাগণের পূর্বপুরুষ। অনেকে বলেন আদিশূর কোন ব্যক্তি-বিশেষের নাম নহে। শূরবংশের আদি বলিয়া ঐ বংশের প্রতিষ্ঠাতা "আদিশূর" আখ্যালাভ করেন।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রবাবুর মতে আদিশূর এবং জয়ন্ত এক ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে আদিশূরের রাজ্যাভিষেক এবং ৭১২ বা ৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে অধিশ্বরত্ব লাভ করেন।

প্রাচীন কুলজী এবং অনেক প্রত্নতত্ত্ববিশারদের মতে একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আদিশূর বা বীরসিংহ বঙ্গ সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। আদিশূরের নাম এবং রাজত্বকাল সম্বন্ধে বিশেষ মতান্তর দৃষ্ট হয়। তবে আদিশূর নামক এক বিশেষ পরাক্রান্ত নৃপতি যে বঙ্গদেশে বহুকাল রাজত্ব করেন সে বিষয় সকল ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ একমত।

কথিত আছে চিত্রগুপ্তের বংশে অম্বষ্ঠ নামক কায়স্থের উৎপত্তি হয় এবং ঐ বংশে রাজাধিরাজ আদিশূর জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি ভারতের পশ্চিমোত্তর প্রদেশস্থিত দরদ প্রদেশ হইতে গৌড়ে আসিয়া গৌড়াধিপতি হইয়া আসাম হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত গৌড়রাজ্য বিস্তার করেন।

সত্যধর্মপরায়ণ মহাত্মা আদিশূর সামান্য এক সামন্ত রাজা হইতে বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যা ও আসামের পরাক্রান্ত রাজা হইয়া ৩০ বৎসর (আইন-ই-

আকবরী মতে ৭৫ বৎসর) অপ্রতিহত প্রভাবে এই বিস্তৃত জনপদ সুশাসন করিয়াছিলেন। কহ্লন পণ্ডিতের রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থমতে আদিশূর বা জয়ন্তের কন্যা কল্যাণদেবীর সহিত কাশ্মীররাজ কায়স্থবংশীয় জয়াপীড়ের বিবাহ হয়।

চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতঃ কায়স্থোঽশ্বষ্টনামকঃ।
অভবত্তস্য বংশে চ আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ ॥
অগসন্তায়তাং বর্ষং দরদাৎ স রবিপ্রভঃ।
চণ্ডাসুরসমো যুদ্ধে প্রতাপে রাবণোপমঃ
চতুরঙ্গ বলোপেতঃ শ্রেষ্ঠ সর্ব্বধনুষ্মতাম্।
তন্মন্ত্রী বলভদ্রাখ্যো রবিদাসকুলোত্তমঃ ॥
রাজধানাকুলোদ্ভূতো বীরবাহুর্মহাবলঃ।
সেনাধিপোঽভবত্তস্য যোধো ভীমপরাক্রমঃ ॥
গ্রহমধ্যে যথা ভানুরাদিশূরস্তথা নৃণাম্।
ররাজ রাঢ়বারেন্দ্রস্যাধিপতোন তেজসা ॥
জিত্বা চ বৌদ্ধরাজানস্তথা গৌড়াধিপান্ বলাৎ।
তাম্রলিপ্তীং তথা চন্দ্রদ্বীপং শ্রীহট্টসংজ্ঞকং ॥
লৌহিত্যং কাচকঞ্চৈব সপ্তগ্রামং তথৈবচ।
হেড়ম্বং বঙ্গদেশঞ্চ তথা কোচকমের চ ॥
পুরীঞ্চ স্থাপয়ামাস মর্কতঃ সুমনোহরম্।
পালীকৃতং তথা গৌড়ং ভুবনেশ্বরসংজ্ঞকং।
রাজাপুরং তথা জ্ঞেয়ং কথ্যন্তে গ্রন্থকারকৈঃ ॥

—ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মিশ্রাকারিকা ॥

উক্ত ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মিশ্রকারিকায় "মহারাজ আদিশূর সম্বন্ধে সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে চিত্রগুপ্তদেবের বংশে কায়স্থ জাতির উৎপত্তি এবং এই কায়স্থবংশে মহারাজ আদিশূর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সূর্যতুল্য তেজস্বী যুদ্ধকালে চণ্ডাসুর সদৃশ; প্রতাপে রাবণের মত, চতুরঙ্গ বলসম্পন্ন ও ধনুর্দ্ধরগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। রবিদাস কুলশ্রেষ্ঠ বলভদ্র তাঁহার মন্ত্রী এবং রাজ ধানাকুলসম্ভূত মহাবলসম্পন্ন ভীমের ন্যায় প্রতাপশালী যোদ্ধা বীরবাহু তাঁহার সেনাপতি ছিলেন। তিনি বৌদ্ধরাজগণকে পরাজয় করিয়া রাঢ় ও বারেন্দ্র রাজ্য অধিকার করিয়া তাম্রলিপ্ত, চন্দ্রদ্বীপ, শ্রীহট্ট, লৌহিত্য, কীচক, সপ্তগ্রাম, হেড়ম্ব, বঙ্গ

ও কোচবিহার রাজ্য অধিকার করেন এবং সুমনোহর মর্কত, পালীকৃত, গৌড়, ভুবনেশ্বর ও রাজাপুর নামক পুরী স্থাপন করেন। তিনি নানা গ্রন্থাদিও লিখিয়াছিলেন।"

—শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু লিখিত—আদিশূর। কায়স্থ পত্রিকা ১৩০৯ ভাদ্র সংখ্যা।

শ্রীমদ্রাজাদিশূরোঽভবদ বালপতি ধর্ম্ম রাজোঽশাস্তা।
জল্লোকঃ সদ্বিচারৈর্বদতি সুরপতিঃ স যথাসীৎ তথাসীৎ।
প্রতাপাদিত্য তপ্তাখিল তিমিরচয় স্তত্ব বেত্তা মহাত্মা
জিত্বা বুদ্ধাশ্চকার স্বয়মপি নৃপতি গৌড়রাজ্যান্নিরস্তান

—ইতি দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকা।

উক্ত দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকা হইতে দেখা যাইতেছে আদিশূরের সময়ে গৌড়দেশ বৌদ্ধদিগের হস্তগত ছিল। তিনি বৌদ্ধগণকে পরাজিত করিয়া গৌড়দেশ হইতে বহিষ্কৃত করেন এবং নিজে গৌড়েশ্বর হন।

রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী নামক দুই শত বর্ষের প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে দেখা যায়—

ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তেনচ।
নাম্নাপি দেশভেদৈস্ত রাঢ় বারেন্দ্র সাতশতী॥

অন্যত্রে—

আদিশূরো ভূশূরশ্চ ক্ষিতিশূরোঽবণীশূরঃ।
ধরণী শূরকশ্চাপি ধরাহ শূরোনুশূরকঃ।
এতে সপ্তশূরাঃ প্রোক্তাঃ ক্রমশঃ সুতবর্ণিতা॥
বেদবাণাঙ্কশাকে তু নৃপোঽভূর্য্যাদিশূরকঃ।
বসুকর্ম্মাঙ্গকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ॥

—রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী।

উক্ত প্রাচীন পুথি হইতে দেখা যায় আদিশূর এবং জয়ন্ত এক ব্যক্তি এবং ৬৫৪ শাকে আদিশূরের রাজ্যলাভ এবং ৬৬৮ শাকে গৌড় ব্রাহ্মণদিগের সমাগম।

(শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ লিখিত "আদিশূর"—কলিকাতা সাহিত্য সভায় পঠিত।)

বসুবংশের বঙ্গে আগমন

আদিশূর নৃপতি বঙ্গদেশের সিংহাসনে যখন অধিষ্ঠিত হন তখন বৌদ্ধধর্ম বিপ্লবে বৈদিকধর্ম লুপ্তপ্রায়। আদিশূর পুনরায় বঙ্গদেশে বৈদিক ধর্ম স্থাপন ও যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য বেদজ্ঞ ও সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিশেষ আবশ্যক বোধ করেন।

মহারাজ আদিশূরের রাজত্বকালে উত্তর পশ্চিম ভারতে কনৌজ বা কান্যকুব্জ নামে একটি সুবৃহৎ বিশেষ ক্ষমতাশালী রাজ্য ছিল। উক্ত কনৌজ রাজ্যের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত এখনও নানা গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। উপস্থিত উক্ত কান্যকুব্জ রাজ্যের রাজধানী কনৌজ নামক একটি ক্ষুদ্র সহর যুক্তপ্রদেশের ফরক্কাবাদ জেলার মধ্যে অবস্থিত এবং তথায় বহু প্রাচীন সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

ঘটকচূড়ামণির কারিকাগ্রন্থে লিখিত আছে মহারাজ আদিশূর কান্যকুব্জাধিপতি মহারাজ যশোবন্তকে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ নির্বাহের জন্য পত্র লেখেন—

আদিশূরো মহারাজঃ পুত্রেষ্টি সমনুষ্ঠিতঃ।
তদর্থঃ প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজাদশঃ॥

—ঘটকচূড়ামণির কারিকা

কবি ভট্টশালীবাহনধৃত লিখিত গ্রন্থে আছে যে কান্যকুব্জপতি বীরসিংহ, আদিশূর মহারাজার রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত দশজন দ্বিজকে বঙ্গদেশে পাঠাইয়াছিলেন।

কান্যকুব্জাপতির্ধীরঃ পত্রার্থে বিধৃতঃ সুধীঃ
বিদ্যায় পণ্ডিতাঃ সর্ব্বে আদিত্যশ্চভিমন্ত্রিতঃ।
গৌড়েশ্বর মহারাজো রাজসূয়মনুষ্ঠিতঃ।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্ত দ্বিজাদশ।

পণ্ডিতপ্রবর ধ্রুবানন্দের কারিকা অতি প্রাচীন। তাহাতে লিখিত আছে—

যজ্ঞার্থে ব্রাহ্মণাঃ পঞ্চ তথা কায়স্থ পঞ্চকাঃ।
ভূপালেন সমানীতা দেশাৎ কোলঞ্চ সংজ্ঞকাৎ॥

উক্ত কারিকা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ কোলঞ্চ দেশ হইতে মহারাজ আদিশূরের সভায় উপস্থিত হইয়াছিল। উক্ত কোলঞ্চকে সকলে কান্যকুব্জ দেশ বলিয়া মনে করেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রবাবু তাঁহার রাজন্যকাণ্ডে (১৩১ পৃষ্ঠা) লিখিয়াছেন যে এই কোলঞ্চ, কোলাঞ্চল বা কোলগিরি জনপদ দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে অবস্থিত ছিল এবং ঐ স্থান কর্ণাটক প্রদেশের অংশ।

'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' নামক গ্রন্থে প্রকাশ—

আদিশূর কনৌজরাজ চন্দ্রকেতুর কন্যা চন্দ্রমুখীর পাণিগ্রহণ করেন। চন্দ্রমুখী চান্দ্রায়ণ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দেশীয় ব্রাহ্মণগণ বেদজ্ঞান বিমূঢ়তা নিবন্ধন রাজ্ঞীর অভিলাষানুরূপ যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে না পারায় তাঁহার অনুরোধে আদিশূর আপনার শ্বশুরকে পত্র লিখিয়া কনৌজ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।

মহারাজ আদিশূর কনৌজ হইতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণকে পুত্রেষ্টি বা অশ্বমেধ বা রাজসূয় যজ্ঞ, কিম্বা চান্দ্রায়ণ ব্রত বা কী উপলক্ষে বঙ্গদেশে আনাইয়াছিলেন সে বিষয় মতান্তর থাকিলেও তিনি যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ এবং পঞ্চ কায়স্থকে বঙ্গদেশে আনাইয়াছিলেন সে বিষয়ে সকল ঐতিহাসিকগণ একমত।

প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে প্রমাণ হইতেছে যে মহারাজ আদিশূর সভায় কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষ, ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ, বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দড়, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ ও সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভ এই পাঁচজন ব্রাহ্মণ এবং তাঁহাদের সহিত তাঁহাদের শিষ্য মহাত্মা দশরথ বসু, মকরন্দ ঘোষ, কালিদাস মিত্র, পুরুষোত্তম দত্ত এবং দশরথ গুহ পাঁচজন ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভব কায়স্থ আসিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণ	গোত্র	বয়স	শিষ্য	গোত্র	পূর্বনিবাস
দক্ষ	কাশ্যপ	৬০	দশরথ বসু	গৌতম	কোলঞ্চ
ভট্টনারায়ণ	শাণ্ডিল্য	৭০	মকরন্দ ঘোষ	সৌকালীন	অম্বুটর
বেদগর্ভ	সাবর্ণ	৫০	কালিদাস মিত্র	বিশ্বামিত্র	মন্ত্র
ছান্দড়	বাৎস্য	৩০	পুরুষোত্তম দত্ত	মৌদগল্য	তাড়ি
শ্রীহর্ষ	ভরদ্বাজ	৯০	বিরাট গুহ	কাশ্যপ	ঔড়ম্বর

ভট্টনারায়ণো দক্ষ ছান্দড় শ্রীহরিস্তথা
বেদগর্ভ সমাখ্যাতো পঞ্চৈতে বঙ্গবাহিনী।
এই পঞ্চ মুনি সঙ্গে দশরথ বসু বঙ্গে
চলিতে লাগিল শূরমণি ॥

—রামানন্দের বঙ্গজ কুল কারিকা।

অম্বষ্ঠ কুলজাত শ্রীখণ্ডবাসী শ্রীল গোবিন্দদাস তদীয় 'প্রেমবিলাস' নামক ১৫২২ শকে লিখিত বৈষ্ণব ইতিহাসের চতুর্বিংশতি বিলাসে গৌড়ে ব্রাহ্মণ কায়স্থের আগমন সংবাদে লিখিয়াছেন—

"পঞ্চ ঋষির সঙ্গে দিলা ভৃত্য পঞ্চজন।
পঞ্চ ঋষির রক্ষা সেবা করিবার কারণ।

* * * *

যোদ্ধবেশধারী পঞ্চ ভৃত্য হন ক্ষত্র।
ক্ষত্রিয় কায়স্থ এই ভৃত্য পঞ্চজন ॥
পঞ্চ ঋষির সঙ্গে গৌড়ে করিলেন গমন ॥"

অনেক প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে যে উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের যজ্ঞের হবি রক্ষণার্থ উক্ত দশরথ বসু ইত্যাদি পঞ্চ কায়স্থ যোদ্ধবেশে লোকজন লইয়া ব্রাহ্মণের শিষ্যরূপে তাঁহাদের সহিত কান্যকুব্জ হইতে গৌড়দেশে আগমন করিয়াছিলেন। দশরথ বসুর সঙ্গেতে সেনা অযুত আসিয়াছিল। মহারাজ আদিশূর তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণের সহিত বিশেষ সম্মান দেখাইয়া সসম্ভ্রমে আলিঙ্গন দিয়া অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

রামানন্দের বঙ্গজ কারিকায় বর্ণিত আছে—

জোড় হস্তে নৃপতি নানাবিধ স্তব স্তুতি নিবেদন করিও পাত্র।
চলিল হরিষ মনে বসাইলা সিংহাসনে নৃপতি ধরিলা দুই পাত্র ॥
পঞ্চ কায়স্থ আনে বসাইলা সিংহাসনে তবে দত্ত দেয় পরিচয়।
শুন পরিচয় বঙ্গে আসিয়াছি মুনি সঙ্গে আমি কাহার নফর নয় ॥
গুহ দিলা পরিচয় শুন রাজা মহাশয় আমি হই রাজার তনয়।
ঘোষ বসু মিত্র বলে শুন রাজা যজ্ঞস্থলে আমাদেরো তিনের পরিচয়

অবধান কর রায় দিব মোরা পরিচয় আমরা হই পঞ্চ মুনির দাস।
দত্ত বলে শুন তত্ত্ব আমি নহি কাহার ভৃত্য আমি হই
এক গ্রামে বাস।

ঘোষ বসু মিত্র তিনজন নিজ নিজ ব্রাহ্মণ গুরুর সহিত আদিশূর রাজসভায় আসিয়া নিজ নিজ ব্রাহ্মণ গুরুর সম্মুখে নিজেদের ব্রাহ্মণের দাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। উক্ত কায়স্থগণ নিজেদের ব্রাহ্মণের দাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে কায়স্থ জাতিকে দাস বা শূদ্র বলিয়া ধারণা করেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় নিজেকে ব্রাহ্মণের দাস বলিয়া পরিচয় দিলে শূদ্র হয় এমন কোন বিধান নাই। স্বয়ং ভগবান ব্রাহ্মণের পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। উক্ত বসু, ঘোষ এবং মিত্র মহাশয় যে ব্রাহ্মণের দাস বলিয়াছিলেন তাহা ভক্তি-সঞ্জাত বিনয়মূলক। অনেক রাজকীয় পত্রাদিতে আমাদের "your most obedient servant" লিখিত হয়।। ইহাতে কি আমরা দাস বা চাকর হইয়া যাই? কায়স্থ জাতি এই বঙ্গদেশে বহু প্রাচীন কাল হইতে দাসত্ব না করিয়া রাজত্ব করিয়া গিয়াছে। সুদূর কনৌজদেশ এবং কন্যাকুব্জ রাজসভা হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত উক্ত পঞ্চ কায়স্থ মাত্র মহারাজ আদিশূর সভায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসেন নাই। তাঁহাদের সহিত আরো শত শত লোকজন আসিয়াছিল। মহারাজ আদিশূরের রাজবাটিতে ব্রাহ্মণগণ বলদ বাহনে উপস্থিত হন। ঘোষ, বসু ও মিত্র অশ্বে, দত্ত গজে এবং গুহ নরযানে আসিয়াছিলেন।

"গোযানেনাগতা বিপ্রা অশ্বে ঘোষাদিকাস্ত্রয়ঃ।
গজে দত্ত কুলশ্রেষ্ঠা নরযানে গুহ সুধী।"
—ইতি কুলাচার্য কারিকা।

দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ কারিকা হইতে জানা যায় যে কায়স্থগণ অশ্ব হস্তী প্রভৃতি যানে অসি কবচ ধনু প্রভৃতি ধারণ করিয়া ক্ষত্রিয় বেশে মহারাজ আদিশূরের সভায় উপস্থিত হন।

কর্ণাট-রাজ্ঞী গ্রন্থে আমরা পাই সংবৎ আরম্ভের ২৩৪ বৎসর পূর্বে আশ্বিন মাসে কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদ্‌ তিথি বুধবার অমৃতযোগে অশ্বিনী নক্ষত্রে আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় আনিবার জন্য পত্র লেখেন যে "তিনি (বীরসিংহ)

বেদশাস্ত্রজ্ঞ, বেদাচারসম্পন্ন, ব্রহ্মনিষ্ঠ বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ ও পঞ্চজন কায়স্থ যজ্ঞ নির্ব্বাহার্থ পাঠাইয়া দিবেন।" (কায়স্থপুরাণ পৃ ১০৩) উঁহারা ৯৯৪ শকে (১০৭২ খ্রীষ্টাব্দে) আশ্বিন মাসে পূর্ণিমায় শুক্রবারে গৌড়রাজ সভায় আগমন করেন।

"নয়শত চৌরানই শক পরিমাণে।
আইলেন দ্বিজগণ রাজ সন্নিধানে॥
পঞ্চ কায়স্থ সঙ্গে আরোহণ গোযানে।
সম্মান পূর্ব্বক ভূপ রাখিলা সর্ব্বজনে।"
—দ্বিজ বাচস্পতি মিশ্রের বঙ্গজকুলজী সার সংগ্রহ।

চৌরানই শকে নবশত লেখে গৌড়দেশে আগমন।
সভায় বিচার নবগুণ যার কুলীন করিল স্থাপন॥
—দক্ষিণরাঢ়ীয় ঢাকুরী।

রাজা প্রেমনারায়ণের সভাপণ্ডিত ধ্রুবানন্দ তদীয় কায়স্থ কারিকায় লিখিয়াছেন—

"ঘোষ বসু গুহ মিত্র দত্তশ্চ আদিকুলীনাঃ।
নবগুণৈস্তু সংযুক্তাঃ রাজবংশসমুদ্ভুতাঃ।
একোনবিংশতি গৌড়ানগন।
সপ্তগুণৈস্তু সংযুক্তা রাজণ্যাঃ সৎকুলোদ্ভবাঃ॥

উক্ত কারিকা হইতে প্রমাণ হইতেছে ঘোষ বসু মিত্র গুহ ও দত্ত আদি কুলীন, কুলীনের নয়টি গুণই তাঁহাদের ছিল, রাজবংশে জন্ম এবং সৎকুলে উৎপত্তি।

শ্রীদেবীর কৃত "পঞ্চ বিপ্রোপোখ্যানং" গ্রন্থে লিখিত আছে যে "ব্রাহ্মণেরা যবনের বেশভূষায় পরিবৃত হইয়া উপস্থিত হওয়ায় আদিশূর তাঁহাদিগকে প্রথমে অভ্যর্থনা করেন নাই। তখন ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বাদ পুষ্প দূর্ব্বা আলানে ন্যস্ত করিয়া প্রস্থান করেন। কিছু কালের মধ্যে ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ করা পুষ্প দূর্ব্বার বলে আলানের শুষ্ক কাষ্ঠ মুঞ্জরিত ও কুসুমিত হইয়া উঠে।" তদ্দর্শনে আদিশূর পুনরায় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণকে মহাসম্মানের সহিত সভায় আনাইয়া যজ্ঞ সম্পাদন করেন ও পরে ভূম্যাদি দান করিয়া বঙ্গদেশে তাঁহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন।

মহারাজ আদিশূর উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ এবং পঞ্চ কায়স্থকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া সম্মানপুরঃসর উপযুক্ত আসন প্রদান করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ স্ব স্ব নাম ও গোত্র ও বংশের পরিচয় দিতে লাগিলেন।

অগ্রে ভট্টনারায়ণ বলিলেন 'আমি শাণ্ডিল্য গোত্রীয় এবং বেদ শাস্ত্র পুরাণ ধনুর্বিদ্যাদিতে পারগ। আমার সহিত মকরন্দ ঘোষ আসিয়াছেন। ইনি শ্রেষ্ঠ দাতা, প্রচুর গুণশালী।" রাজা ঘোষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। ঘোষ বলিলেন, "নারায়ণের বক্ষে ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন আছে, তজ্জন্য আমি ব্রাহ্মণের দাস।" রাজা মকরন্দ ঘোষকে কুলমর্যাদা প্রদান করেন।

দক্ষ ঠাকুর বলিলেন "আমি কাশ্যপ গোত্রীয়—বেদ শাস্ত্র ধনুর্বিদ্যায় আমি পারদর্শী। আমার সহিত দশরথ বসু আসিয়াছেন। ইনি সর্বকার্যকুশল; দানশীলতায় কর্ণের সহিত তুলনীয়। রাজা বসুর প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করায় বসু বলিলেন "আমি ব্রাহ্মণের দাস।" রাজা দশরথ বসুকে কুলীনত্ব দিলেন।

শ্রীহর্ষ বলিলেন, "আমি ভরদ্বাজ গোত্রীয় এবং ঐরূপ সর্বাংশে পারগ। আমার সহিত কালিদাস মিত্র আসিয়াছেন। ইনিও ঐরূপ গুণান্বিত।"। রাজা মিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। মিত্র বলিলেন "আমি জন্মে জন্মে বিপ্রদিগের দাস। ইহারও কুলীনত্ব লাভ হইলে। দত্ত বিনয়হীনতার জন্য নিষ্কুল হইলেন। গুহ গর্বোক্তি করিয়াছিল বলিয়া তদ্বংশের লোক রাঢ়ে কুলমর্যাদা না পাইয়া বঙ্গজে কুলীন হইলেন।

প্রাচীন কুলগ্রন্থাদিতে উক্ত দশরথ বসু ইত্যাদি পঞ্চ কায়স্থের বিষয় যেরূপ বর্ণনা পাই তাহার কতকগুলি এখানে উদ্ধৃত করিতেছি :—

ঘটকচূড়ামণির কায়স্থ কারিকার (১০০৮ সনে লিখিত) কায়স্থ পঞ্চজনকে ব্রাহ্মণের শিষ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন—

আদিশূর করিলেন কামেষ্টি আরম্ভণ।
নিমন্ত্রিয়া আনিলেন ঋষি পঞ্চন॥
সভাতে বসিল তবে মুনি পঞ্চজন।
পাত্র মিত্র সভাসদ্ সহিত রাজন্।
পঞ্চ কায়স্থ আছে নৃপতি সদন।

সসম্ভ্রমে নরপতি দিলা আলিঙ্গন।
জিজ্ঞাসিল নরপতি মুনিদের স্থানে।
এত শুনি কহে তবে পঞ্চ তপোধনে॥
এই পঞ্চ জন হয় কায়স্থ কুমার।
জিজ্ঞাসহ ইহাদের কি কহে উত্তর।
দশরথ মকরন্দ কালিদাস কয়।
শিষ্য অনুগত মোরা শুন মহাশয়।
দক্ষ দ্বিজ আদি করি মুনি পঞ্চজন॥
ইহাদের দাস হৈনু শুন সর্ব্বজন।
পুরুষোত্তম দত্ত কহে করপুটে।
তোমা দরশনে আইলাম মুনি সঙ্গে বটে॥
দত্ত কহে ভৃত্য নহি শুন মহীপাল।
একগ্রামে বসতি আছয়ে বহুকাল॥
কায়স্থ কুলেতে জন্ম শুন নরপতি।
রাঢ়দেশ দেখিবারে আইলাম সংহতি॥

*　　　*　　　*

আর যত কায়স্থ আইলেন পরে।
পত্র দিয়া মুনিগণ আনিল সভারে॥
পশ্চিম হইতে আইল গৌড়দেশ পার।
সপ্তগ্রামে মিলিল মৌলিক আসি যত॥

—দ্বিজ ঘটকচূড়ামণির কারিকা।

ঘটককেশরীর দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থকুল কারিকায় দেখা যায়—

শুনি আপনার পরিচয় দেন তারে।
কালিদাস মকরন্দ দশরথ পরে॥
জাতিতে কায়স্থ হই মুনিদের দাস।
জাতিতে কায়স্থ হই মুনিদের দাস।
দ্বিজ সঙ্গে আসিয়াছি তীর্থ অভিলাষ॥

*　　　*　　　*

ঘোষ বসু মিত্র দত্ত এই চারিজন।
দ্বিজাজ্ঞায় সপ্তগ্রামে রহিল তখন॥

আরপর ছয় জন মৌলিক আনাইল।
সম্মান করিয়া স্থান সভাকার দিল।
ইহাদের পরিজন পরে আনাইল।
বৃত্তি দিয়া নিজ দেশে সভারে থুইল॥

দ্বিজ বাচস্পতির বঙ্গজ কায়স্থ কারিকায় আমরা পাই—

"মকরন্দ মহাকৃতি ঘোষ বংশশিরোমণিঃ।
দশরথো মহাশূরো বসু কুলস্য দীপকঃ॥

*　　　*　　　*

একোনবিংশতিশ্চৈতে কান্যকুব্জাৎ সমাগতাঃ।
স্থাপয়ামাস তান্ সর্ব্বান্ আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।

মাধব বসুর আধুনিক দক্ষিণ রাঢ়ীয় কারিকায় দেখা যায়—

গৌড়দেশবাসী রাজা অভিলাষী, আদিশূর নৃপরায়॥
যেন তুল্য ব্রহ্মা সৃষ্টিকৃতি কর্ম্মা আদিশূর মহাশয়॥
কোলাঞ্চর দেশ শুন সবিশেষ হৃদয় হইল খেদ।
সেই দ্বিজ আনি শুন নৃপমণি পুরাণ পড়াবে বেদ॥

*　　　*　　　*

যে হয় প্রধান সর্ব্বত্র সমান তুমি মুখ্য কুলরাজ।
দক্ষ পাণি চাইয়া যুগপাণি হইয়া জিজ্ঞাসিতে বাসি লাজ॥
দ্বিজবর কয় শুন সদাশয় বীরনাথ বসু সুত।
দশরথ নাম কুল অনুপম সঙ্গেতে সেনা অযুত॥
বসু কহে বাণী শুন নৃপমণি দ্বিজদাসে আদি চিহ্ন।
রাজা বলে বট তুমি নহে খাট কুলে শীলে অগ্রগণ্য॥

উক্ত মাধব বসুর কারিকারিকায় দেখা যায়—

দশরথ জ্যেষ্ঠ দয়াবন্ত শ্রেষ্ঠ শুচিরথ সর্বশেষে।
রাজা আজ্ঞা পাইয়া ইষ্ট স্মরণ লইয়া চলিলেন গৌড়দেশে॥

*　　　*　　　*

বীরনাথ বসু হৈল দুই শিশু দশরথ সিন্ধুনাথে।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রবাবুর ১৩৪০ সনের প্রকাশিত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ডে উক্ত কুলগ্রন্থ সকল তিনি বিশেষভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার লিখিত পূর্বেকার সকল লেখনীতেই উক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ এবং দশরথ বসু ইত্যাদি পঞ্চ কায়স্থের কান্যকুব্জ দেশ হইতে গৌড়ে মহারাজ আদিশূরের রাজসভায় আগমন বিষয় সমর্থন করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ১৩৪০ সনে প্রকাশিত তাঁহার বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ডে তাঁহার মত পরিবর্তন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার নব-আবিষ্কৃত কয়খানি পুঁথি হইতে দেখাইয়াছেন যে প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব হইতেই ঘোষ, বসু, মিত্র, দত্ত প্রভৃতি পদবিযুক্ত ব্যক্তিগণ গৌড়দেশে বাস করিত। বসু বংশ শ্রীবাস্তব শাখা হইতে উদ্ভব এবং শ্রাবস্তীই বাস্তব্য বা শ্রীবাস্তব কায়স্থের আদি বাসস্থান। ঐ শ্রাবস্তী বরেন্দ্র বা পৌণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্গত ছিল। সুতরাং বসুবংশের আদিকুলস্থান পৌণ্ড্রবর্ধনে ছিল। ৯৯৪ শকাব্দে দেবগ্রাম প্রতিবদ্ধ বিক্রমপুরে মহারাজ বিজয়সেন গৌড়াধিপরূপে এবং ব্রহ্মপুত্র জলকল্লোল বলয়িত বিক্রমপুরে মহারাজ সামলবর্মা বঙ্গাধিপরূপে অভিষিক্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের অভিষেককালে উভয় বিক্রমপুরেই বহু সজ্জনের কুভাগমন হইয়াছিল। এই সময়ে উত্তর রাঢ় হইতে বহু শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ রাজসভায় আহূত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে সৌকালীন সোমঘোষ বংশীয় মকরন্দ ঘোষ, বিশ্বামিত্র সুদর্শন মিত্র বংশধর কালিদাস মিত্র, মৌদ্গল্য পুরুষোত্তম দত্ত এবং গৌড় হইতে দশরথ বসু আসিয়া রাজা বিজয়সেনের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

রাজন্যকাণ্ডেও নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছিলেন—(পৃ ৩১৭) "কোন কোন কুলগ্রন্থে 'চৈদ্যকুলকমলের সূর্য' বলিয়া দশরথ বসুর পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় যে চেদিরাজ্যেই তাঁহার পূর্বপুরুষের প্রতিষ্ঠালাভ হইয়াছিল বলিয়া দশরথ 'চৈদ্যকুলাম্বুজভানু' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। চেদিরাজ সভায় বহু পূর্বকাল হইতেই শ্রীবাস্তব কায়স্থগণ উচ্চপদে অধিষ্ঠীত ও সম্মানিত ছিলেন, নানা তাম্রশাসন ও শিলালিপি হইতে তাহার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এদিকে কোন কোন প্রাচীন কুলগ্রন্থে বসুবংশ শ্রীবাস্তব্যকুলজাত বলিয়াও আখ্যাত হইয়াছেন। ৯৯৪ শকে দশরথ বসু যদি বিজয়সেনের সভায় আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার উর্দ্ধতন ৯ম পুরুষ অনন্তানন্দকে আমরা খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর বা ১ম আদিশূরের সমসাময়িক ব্যক্তি বলিয়া মনে করিতে পারি। তাই আদিশূরের সময় বসুবংশের বীজীপুরুষের গৌড়াগমন প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু

বরেন্দ্র ও উত্তররাঢ় পালবংশের আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে বসুবংশও সম্ভবতঃ দক্ষিণ রাঢ়ে চলিয়া আসেন এই হেতু উত্তর রাঢ়ীয় বা বারেন্দ্র সমাজের সহিত বসুবংশের কোন সম্বন্ধ ঘটে নাই।"

মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, তিনি উক্ত পঞ্চ কায়স্থকে বসবাস করিবার জন্য এক একটি গ্রাম প্রদান করেন।

'ঘোষ বসু দত্ত মিত্র এই চারিজন।
দ্বিজাজ্ঞায় সপ্তগ্রামে রহিল তখন॥

—ঘটক নন্দরাম মিত্রের সংগৃহীত কারিকা।

পরে বঙ্গেশ্বর কর্তৃক গ্রামের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া নিজ নিজ গ্রামে গিয়া সংসার প্রতিষ্ঠা করিয়া বংশানুক্রমে বাস করিতে লাগিল। ঐ সকল স্থান বঙ্গদেশের নানাস্থানে অদ্যপি বসুগ্রাম, বাসুরা, বোসপাড়া, ঘোষগ্রাম, মিত্রগ্রাম ইত্যাদি নামেই পরিচিত হইয়া রহিয়াছে।

বঙ্গজ সমাজের কুলগ্রন্থ হইতে দেখা যায় যে মহারাজ আদিশূরের রাজত্ব-কালে কান্যকুব্জ হইতে দশরথ বসু আদি পঞ্চ কায়স্থ ব্যতীত দেবদত্ত নাগ, চন্দ্রচূড় দাস, জলধর সেন, চক্রধর পালিত প্রমুখ ২২ জন কায়স্থ বঙ্গে আগমন করেন এবং আদিশূর এই ২৭ জনকেই ২৭ খানা গ্রাম দান করেন।

"স্থাপয়ামাস তান্ সর্ব্বান্ আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ॥
সপ্তবিংশতি নামানি গ্রামানি সমৃদ্ধানি চ।
বাসার্থং প্রদদৌ তেভ্য আদিশূরো নৃপোত্তমঃ॥

—দ্বিজ বাচস্পতির কারিকা।

আচার্য চূড়ামণির সংস্কৃতকারিকায় দশরথ বসুর পূর্বপুরুষগণের বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে—

"বসুপূর্ব্বে সমাখ্যাত অনন্তানন্দ-সজ্ঞকং।
তৎপুত্রো বিজয়ী নাম তস্য পুত্রো মহার্ণবঃ॥
গুণাকরস্তৎপুত্রস্তৎপুত্রো জয়ধনস্তথা।
যশোধনো মহাবীর্য্যঃ গৌতমস্তস্য বৈ সুতঃ॥
তৎসুতো রাবণঃ॥

সূর্য্যবংশে সমুৎপন্না মোহিনী নাম্নী কন্যকা।
রাবণেন পরিণীতা সূর্য্যসোমগুণৌ সমৌ॥
সুতৌ শম্ভুদশরথৌ পরমো দশরথাত্মজঃ।
লক্ষ্মণপূষণৌ গুণান্বিত মহাত্মনৌ॥

—আচার্য চূড়ামণির কারিকা।

বসুবংশের প্রসিদ্ধ বীজীপুরুষ অনন্তানন্দ, তৎপুত্র বিজয়ী, তৎপুত্র মহার্ণব, তৎপুত্র গুণাকর, তৎপুত্র জয়ধন, তৎপুত্র যশোধন, তৎপুত্র গৌতম, তৎপুত্র রাবণ। এই রাবণের সহিত সূর্যবংশীয় মোহিনী নাম্নী এক কন্যার বিবাহ। হয়। তাঁহাদের পুত্র হইতেছেন দশরথ ও শম্ভু। দশরথের পুত্র পরম। পরমের গুণান্বিত মহাত্মন দুই পুত্র জন্মে, তাঁহাদের উভয়ের নাম লক্ষ্মণ ও পূষণ। উক্ত দশরথ বসু পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন।

—দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ড, পৃ ৬৭।

কাশীনাথের দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঢাকুরীতে আমরা পাই—

বীরনাথ সুত বসু
দশরথ নাম দক্ষিণ রাঢ়ে ধাম
গৌতম গোত্রেতে ই।

তৃতীয় অধ্যায়

দশরথ বসু

বসুধাধিপোচক্রবর্ত্তিনো বসু তুল্যাঃ বসুবংশসম্ভবাঃ।
বসুধাবিদিতা গুণার্ণবৈনিয়তঃ তেজস্বিনো ভবন্তি যে॥
দশরথো বিদিতো জগতীতলে দশরথঃ প্রথিতঃ প্রথমে কুলে।
দশদিশাং জয়িনাং যশসাজয়ী বিজয়তে বিভবৈঃ কুলসাগরে।
স চ চৈদ্যকুলাম্বুজ সূর্য্যসমোঃ গৌতমগোত্রজঃ
শ্রীদক্ষ শিষ্যো মহাত্মা।
সুধীরো ধাম্মিকোমতি নির্ম্মলশ্চ মহাতান্ত্রিকো বীরগণা-
গ্রগণ্যাভিমানী॥
শ্রীভট্টকবির মিশ্র কারিকা।

অর্থাৎ বসুন্ধরায় রাজচক্রবর্তী বসুতুল্য বসুবংশ সম্ভব, যাহার গুণসাগর জগতে বিদিত, সবদা যিনি জয়ী। ইনি বসুবংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া দশরথ নামে জগতে বিখ্যাত। দশদিক জয় করিয়া ইনি নিজকুলের গৌরবে যশস্বী হইয়াছেন। ইনি গৌতম গোত্রজ মহাত্মা শ্রীদক্ষের শিষ্য চেদীকুলার্ণবের চন্দ্র স্বরূপ, সুধীর ধার্মিক নির্মল মহাতান্ত্রিক ও বীরাগ্রগণ্য।

ধ্রুবানন্দ মিশ্রের বঙ্গজ কারিকায় লিখিত আছে—

দশরথ প্রধানশ্চ কায়স্থানাং চূড়ামণিঃ।
আদিশূর সমানীতো যথাগঙ্গা ভাগীরথৈঃ॥
তস্যাপি বংশসংজাতো পরমকৃষ্ণকো বসু।
নবগুণৈশ্ব সংযুক্তৌ কুলিনো তৌ কুলেশ্বরো॥
স্থিতঃকৃষ্ণবসুঃ রাঢ়ে পরমোবঙ্গদেশকে।
তয়োশ্চ কুল মাহাত্ম্যং নৈবশক্লোমিবর্ণিতুং।
দ্বোপুত্রৌ পরমাজ্জাতৌ খ্যাতৌ লক্ষ্মণপুষণৌ॥

"৺বল্লাল চরিতম্" পুস্তকে পাই—

কাশ্যপগোত্রে সংজাতো দক্ষনামা মহামতিঃ।
তস্যদাসো গৌতমস্য গোত্রে দশরথো বসুঃ॥

কাশ্যপেচৈব গোত্রে চ দক্ষনামা মহামতিঃ।
তস্য দাসো গৌতমস্য গোত্রে দশরথো বসুঃ॥
—দেবীবর-রচিত কুলপঞ্জিকা।

কায়স্থ সংহিতায় লিখিত আছে—

বসোঃপরিচয়ঃ
(লঘুত্রিপদী)

এই ক্ষিতিপতি অতি মহামতি
অষ্টবসু তুল্য জানি।
সেই বসু বংশ ভূমে অবতংশ
মহাতেজা মহামানী॥
শৌর্য্য বীর্য্য অতি যুদ্ধে মহারথি
দশদিক করে জয়।
রাজাপ্রজা মেলি দশরথ বলি
সেই হেতু নাম কয়॥

শব্দকল্পদ্রুমোক্ত দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঘটক কারিকা ও চন্দ্রদ্বীপপতি প্রেমনারায়ণের সভায় রচিত গৌড়বংশাবলী বা বঙ্গজ কায়স্থকারিকায় এবং অন্যান্য অনেক প্রাচীন কুলগ্রন্থে দশরথ বসুকে "স চ চৈত্যকুলাম্বুজঃ সূর্য্যসমো বসুবংশ সম্ভব" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

৺শশিভূষণ নন্দী বর্মা মহাশয়ের প্রণীত "কায়স্থ-পুরাণ" গ্রন্থে কনৌজ হইতে পঞ্চ কায়স্থের বংশ নির্ণয় অধ্যায়ে তিনি লিখিয়াছেন—

"বসুর পরিচয়ে লিখিত আছে, তিনি রাজচক্রবর্ত্তী, বসুদেবতুল্য বসুর বংশ হইতে উদ্ভূত। এক্ষণে দেখা আবশ্যক, কোন বর্ণের মধ্যে ঐরূপ প্রতাপশালী বসু নামক রাজা ছিলেন। শূদ্র অথবা বৈশ্যবর্ণে বসু নামে কেহ কখনও চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন না। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগে ও কলির প্রথমেও সর্ববর্ণ স্ব স্ব

জাতি নির্দ্দিষ্ট ক্রিয়া ব্যতীত অন্য জাতির জন্য নির্দ্ধারিত ক্রিয়া করিতে সক্ষম ছিলেন না। চক্রবর্তিত্ব ও রাজ্যশাসন ক্ষত্রিয়গণেরই নির্দ্ধারিত ছিল। বসু বংশের বর্ণনায় লিখিত আছে এ বংশ দশদিগ্‌বিজয়ীদিগেরও জয়কর্ত্তা। সুতরাং নিঃসন্দেহরূপে প্রতীত হয় ঐ বসু নামে কোন ক্ষত্রিয় চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন। তাঁহার বংশই (ক্ষত্রিয়) কায়স্থ কুলীন বসু হইতেছেন।"

বেদব্যাস বিরচিত পঞ্চম বেদ মহাভারত যাহা স্বর্গীয় মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, ঐ মহাভারতে লিখিত আছে, "মনু হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি মানব জাতি উৎপন্ন হয়; এই নিমিত্ত তাহারা মানব বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে। বৈবস্বত মনুর ইক্ষাকু প্রভৃতি ৯ পুত্র ও ইলা নামে কন্যা হয়। সোমের পুত্র বুধের সহিত ইলার বিবাহ হয়। ইলার পুত্র পুরূরবা। পুরূরবার ঔরসে উর্ব্বশীর গর্ভে আয়ু, ধীমান, অমাবশু, দৃঢ়ায়ু, বলায়ু, এবং শতায়ু এই ছয় পুত্র জন্মে। আয়ুর নহুষ প্রভৃতি চার পুত্র হয়। ধীমান সত্যপরাক্রম নহুষ রাজা ধর্ম্মানুসারে এই পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন। নহুষ পিতৃলোক, দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব, উরগ, রাক্ষস, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই সকলকে সমভাবে প্রতিপালন করিতেন। তিনি দস্যুদল এরূপ দমন করিয়াছিলেন যে তাঁহারা ঋষিদিগকে কর দিত ও পৃষ্ঠে বহন করিত। তিনি স্বকীয় তেজঃ ও তপোবলে দেবতাদিগকে পরাভব করিয়া ঋষিগণকে ইন্দ্রত্ব ভোগ করাইতেন। তিনি যতী যযাতি সংযাতি আয়তি অয়তি ও ধ্রুব নামে ছয়টি পুত্র উৎপাদন করেন। যতী যোগবলে মুনি হইয়া চরমকালে পরব্রহ্মে লীন হন। যযাতি বিক্রম প্রভাবে সম্রাট হইয়া এই সসাগরা পৃথিবী শাসন, বহুবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান ও একান্ত ভক্তির সহিত পিতৃ ও দেবগণকে অর্চ্চনা করিতেন। যযাতির ঔরসে এবং তাহার বনিতা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে দ্রহ্য, অনু ও পুরু নামে তিন পুত্র জন্মে; তন্মধ্যে যযাতির অভিশাপে পুরু ব্যতীত তাঁহার সমস্ত পুত্র সিংহাসনে বঞ্চিত হন, পুরুই পৃথিবীর সম্রাট হইলেন। ঐ পুরুবংশে দুষ্মন্ত প্রভৃতি অনেক রাজা জন্মগ্রহণ করেন।

পুরুবংশে উপরিচরনামা এক রাজা ছিলেন। তাহার অপর নাম বসু। তিনি সর্বদা মৃগয়ায় আসক্ত থাকিতেন। মহারাজ বসু ইন্দ্রের উপদেশক্রমে রমণীয় চেদীরাজ্য অধিকার করেন। পরে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক আশ্রমে প্রবেশ করিয়া অতি কঠোর তপস্যা করিলেন। একদা ইন্দ্রাদি দেবগণ তদীয় আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ভাবিলেন ইনি যেরূপ তপস্যা করিতেছেন ইহাতে বোধ হয় ইন্দ্রত্ব

গ্রহণ করিবেন ; এই ভাবিয়া শান্ত বাক্য দ্বারা তাঁহাকে তপস্যা হইতে নিবৃত্ত করিলেন। দেবতারা কহিলেন, মহারাজ ! যাহাতে পৃথিবী মধ্যে ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণ না হয়, তাহাই তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। তুমি ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছ বলিয়া লোক সকল স্বধর্ম্মে ব্যবস্থিত আছে। ইন্দ্র কহিলেন, হে নরনাথ ! তুমি অবহিত ও নিয়মশালী হইয়া সতত ধর্ম্ম অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেই নিত্য ও পবিত্র লোক পাইবে। তুমি ভূলোকে থাকিয়াও আমার প্রিয় সখা হইলে। তোমাকে এক সদুপদেশ দিতেছি শ্রবণ কর। এই ভূমণ্ডলের মধ্যে যে প্রদেশ অতি রমণীয় পবিত্র ও উর্ব্বরা ক্ষেত্র বিশিষ্ট এবং পশ্বাদির আবাস ও বিচিত্র ধনধান্য সম্পন্ন তুমি সেই দেব-মাতৃক প্রদেশে অবস্থিতি কর।

হে চেদিরাজ ! চেদিদেশ প্রভূত ধনরত্নাদি বিশিষ্ট ভূমি তথায় গিয়া বাস কর। ঐ জনপদের অধিবাসীরা ধর্ম্মপরায়ণ ও সাধু। অধিক কি বলিব ; তাহারা পরিহাসক্রমেও কদাচ মিথ্যা ব্যবহার করে না। পুত্রেরা পিতার হিতকার্য্যে তৎপর হইয়া একান্নে বাস করে। তত্রত্য লোকেরা দুর্ব্বল বলীবর্দ্দ-দিগকে কার্য্যে নিয়োগ করে না। তথায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণ সতত সাবধান হইয়া স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া থাকেন। হে মানপ্রদ, ত্রিলোকে যে সকল ঘটনা হইবে, আমার প্রসাদে তোমার কিছুই অবিদিত থাকিবে না, মনুষ্যের মধ্যে কেবল তুমিই মদ্দত্ত এই দিব্য স্ফটিক নির্ম্মিত আকাশগামী বিমানে আরোহণ করিয়া বিগ্রহবান্ দেবতার ন্যায় গগনমার্গে সঞ্চরণ করিতে পারিবে। আর তোমাকে এই বৈজয়ন্তী নাম্নী অম্লান-পঙ্কজা মালা অর্পণ করি, এই মালা সংগ্রামকালে তোমাকে রক্ষা করিবে ও ইহার প্রভাবে তুমি অক্ষত শরীরে রণস্থল হইতে প্রত্যাগত হইতে পারিবে। এই সুবিখ্যাত ইন্দ্রমালা তোমার একমাত্র অসাধারণ চিহ্নস্বরূপ হইবে।

এইরূপে বসুরাজা অভিহিত হইয়াছিলেন। ফলতঃ যে নর ভূমি ও রত্নাদি প্রদান করিয়া ইন্দ্রোৎসব করিয়া থাকেন তিনি পূজিত হয়েন। চেদীশ্বর বসু বরদান ও শক্রোৎসবের উপদেশ কথনদ্বারা ইন্দ্র কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া এই পৃথিবী ধর্ম্মতঃ পালন করিতেন। এবং সুরপতির সন্তোষার্থে মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রোৎসব করিতেন।

মহারাজ বসুর মহাবল পরাক্রান্ত পাঁচ পুত্র ছিল। তিনি তাঁহাদিগকে পৃথক পৃথক রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। তাঁহার এক পুত্রের নাম বৃহদ্রথ।

ইনি মগধ দেশে মহারথ বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। অপর পুত্রের নাম প্রত্যগ্রহ। আর একটির নাম কুশাম্ব, কেহ কেহ ইহার নাম মণিবাহন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অন্য পুত্রের নাম মাবেল্ল। অপরের নাম যদু। ......সেই ইন্দ্রতুল্য পঞ্চ ভূপতির পৃথক পৃথক বংশাবলী হইয়াছিল। যখন সেই বসুরাজা ইন্দ্রের প্রসাদলব্ধ স্ফটিক নির্ম্মিত রথে আরোহণ করিয়া পৃথিবীর উপরিভাগ আকাশপথে সঞ্চরণ করিতেন, তৎকালে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা সকল আসিয়া তাঁহার আরাধনা করিতেন। তিনি উপরি ভ্রমণ করিতেন। এই নিমিত্ত উপরিচর নামে প্রখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানীর নিকটে শুক্তিমতী নামে এক নদী ছিল।" ইত্যাদি।

ক্ষত্রিয় (কায়স্থ) কুলীন বসুর পরিচয়ে বসুবংশ যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে—"চক্রবর্ত্তী রাজা বসুদেব তুল্য বসুর বংশোদ্ভব দশরথ বসু দশদিগ্‌বিজয়ীদিগেরও জয়কর্ত্তা এই বিষয়টি পুরুবংশীয় উপরের লিখিত বসুরাজার বিবরণের সহিত একত্রিত করিয়া বিবেচনা করিলে এবং অন্য কোন জাতিতে এরূপ প্রতাপশালী বসু নামক রাজা অথবা ঐ নামে চক্রবর্ত্তী রাজা না থাকা—এই সকল বিষয়ের প্রতি নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে নিঃসন্দেহ রূপে ইহা প্রতীতি হয় যে, ব্রহ্মকায়স্থ কুলীন বসু ও পুরুবংশীয় চেদীশ্বর বসুরাজার কুলোদ্ভব। দশরথ বসুরাজার প্রথম কুলোদ্ভব বলিয়া লিখিত হইয়াছে ; এতদ্‌বশতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে তিনি বৃহদ্রথের বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকিবেন।"

—শ্রীগিরিশচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার সম্পাদিত কায়স্থ পুরাণ ২য় সংস্করণ পৃষ্ঠা ১২১।

দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের সর্বপ্রধান কুলীন গৌতম গোত্রীয় বসু বংশীয়গণ। তাঁহাদের আকর্ষণে পড়িয়া ঘোষবংশ ও মিত্রবংশ দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে মিলিত হইয়াছিলেন এবং বিশেষ সম্মানলাভ করেন।

পটলডাঙ্গার বসুমল্লিক বংশের বীজপুরুষ এই মহাত্মা দশরথ বসু। তাঁহার সময় হইতে এই বংশের ধারাবাহিকভাবে পর পর বংশধর সকলের নাম পাওয়া যায়।

বঙ্গজ কুলদীপিকা ও বংশাবলীতে আমরা পাই—

গৌতমগোত্রে সর্ব্বাদৌ দশরথবসুসুতৌ
পরমবসুকৃষ্ণবসুকৌ।
পরমবসুসুতৌ লক্ষ্মণবসুপূষণবসুকৌ বঙ্গেখ্যাতৌ।
কৃষ্ণ বসু দক্ষিণ রাঢ়ে খ্যাত তস্য সুতো ভববসুঃ।

তৎসুতো হংসবসুস্তৎসুতাঃ শুক্তিমুক্তিঅলঙ্কারবসুকাঃ।
অলঙ্কারবসোঃ সুতোমধু বসুস্তৎসুতো গুণাকরবসুঃ।
তৎসুতাবস্তোদয়ৌ।

ইতি বঙ্গজ কুলদীপিকা ও বংশাবলি।
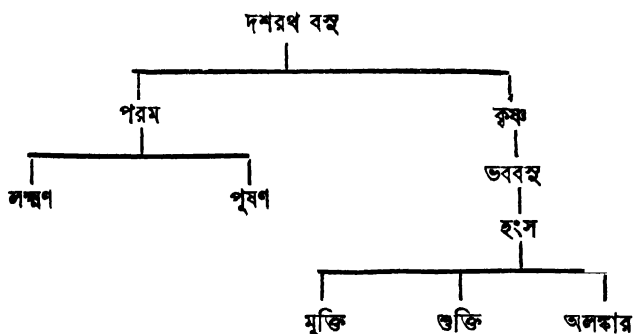
উক্ত বঙ্গজ কারিকায় আমরা পাই পুরুবংশীয় চক্রবর্তী বসু বংশোদ্ভব গৌতম-গোত্রীয় যে দশরথ বসু মহারাজ আদিশূর জয়ন্তের সভায় উপস্থিত হইয়া কুলীনত্ব সম্মান পান তাঁহার দুই পুত্র পরম বসু ও কৃষ্ণ বসু।

পরম বসু বঙ্গ বিভাগে বাসস্থান হেতু বঙ্গজ হন এবং তাঁহার দুই পুত্র লক্ষ্মণ ও পূষণ।

কৃষ্ণ বসু দক্ষিণ রাঢ়ে গিয়া বাস করেন এবং দক্ষিণ রাঢ়ীয় হন। কৃষ্ণ বসুর এক পুত্র ভববসু বা ভবনাথ বসু এবং ভববসুর একমাত্র পুত্র হংস। হংসের তিন পুত্র শুক্তি মুক্তি ও অলঙ্কার। দক্ষিণ রাঢ়ীয় গৌতমগোত্রীয় বসুগণ এই শুক্তি ও মুক্তি বংশজাত। শুক্তি বাগাণ্ডায় বাসস্থান স্থাপন করেন। মুক্তি মাহীনগরে গিয়া বাসস্থান স্থাপন করেন। অলঙ্কার বঙ্গগত হইয়া বঙ্গজ হন।

স্যার রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের শব্দকল্পদ্রুমঃ গ্রন্থে কুলীন শব্দের মধ্যে আমরা পাই—

"অথ দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকুলীনাঃ—তত্রাদিশূর রাজেন কান্যকুব্জ দেশাদানীতৈ ব্রাহ্মণপঞ্চকৈঃ সহ ঘোষ বসু মিত্র দত্ত গুহাঃ পঞ্চাগতা আদি কুলীনাঃ যথা—সৌকালীন গোত্রে মকরন্দ ঘোষঃ। ১। গৌতমে দশরথ বসুঃ। ২। বিশ্বামিত্রে কালিদাস মিত্রঃ। ৩। কাশ্যপগোত্রে দশরথ গুহঃ স্বাহঙ্কারাদ্বমানিতো বঙ্গে গতঃ। ৪। ভরদ্বাজগোত্রে পুরুষোত্তমদত্তঃ বিনয়হীনতো নিষ্কুলঃ। ৫। অথ

বঙ্গজকুলীনাঃ—বসু বংশে চ মুখ্যৌ দ্বৌ নাম্না লক্ষণপূষণৌ। এতেষামাদি পুরুষ নির্ণয়ো—যথা—গৌতমগোত্রে সর্ব্বাদৌ দশরথ বসুসুতৌ কৃষ্ণ বসু পরম বসুকৌ কৃষ্ণ বসু দক্ষিণ রাঢ়ে খ্যাতস্তস্য সুতঃ ভববসুঃ তৎসুতঃ হংসবসুঃ তৎসুতাঃ শুক্তি মুক্তালঙ্কার বসুকাঃ। অলঙ্কার বসুঃ রাঢ়াৎ বঙ্গে গতঃ তস্য বঙ্গে কুলহানি জাতা তস্য সুতঃ মধুবসুঃ তৎসুতঃ গুণাকর বসুঃ তৎসুতা অনন্তাদয়ঃ দশরথ সুতঃ পরম বসুস্তৎসুতৌ লক্ষণবসু পূষণবসুকৌ বঙ্গে খ্যাতৌ।"

দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলজী মতে—
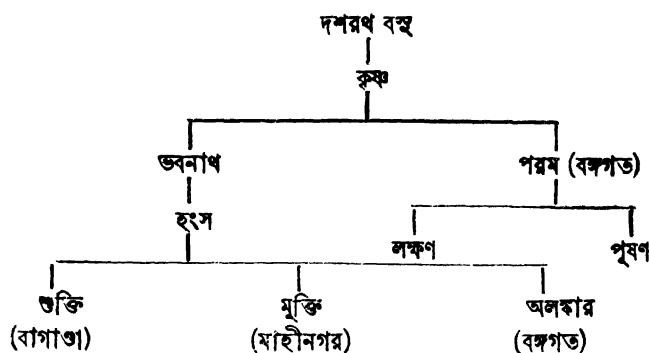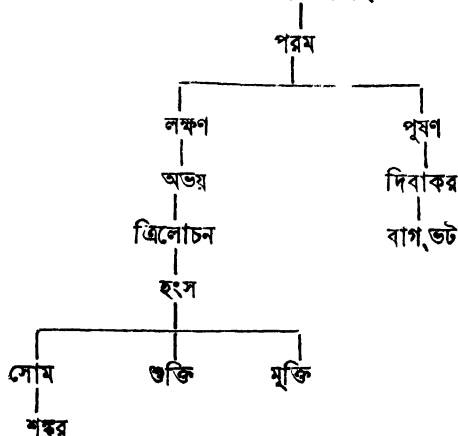
—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ড, পৃ ৮৯।

দর্জিপাড়া নিবাসী শ্রীগণেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের ভ্রাতুস্পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে রচিত কন্যাপক্ষের বসুবংশের কুলগাথা :—

চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাত, দাশরথী নামে খ্যাত
ছিলেন গৌতম শিষ্য-বর,
সেবিয়া গুরুর পদ, লভিলা সে গুণাস্পদ,
গুরু গোত্র সহিত প্রবর ॥
সেই বংশে পুণ্যব্রত, জন্মিলেন দশরথ,
বসু পূর্ণ হেতু বসু নাম।
কি কহিব তার গুণ শাস্ত্রে শস্ত্রে সুনিপুণ,
দক্ষ শিষ্য যশ কীর্ত্তিধাম ॥
আদিশূর নৃপবর রাঢ় বঙ্গ গৌড়েশ্বর,
যজ্ঞে যবে করি' নিমন্ত্রণ।
পঞ্চ ঋষি আনাইলা সেই সঙ্গে এসেছিলা,
কণোজী কায়স্থ পঞ্চজন ॥
ঘোষ বসু মিত্র আর, গুহ দত্ত গুণাধার,
গৌড়দেশে হইলা আগত।
তাঁহাদেরি অন্যতম ছিলা, রথী শূরোত্তম,
শুদ্ধমতি বসু দশরথ ॥
পরিচয় পেয়ে অতি হরষিত নরপতি,
কহিলেন, "হইলাম ধন্য।
ঘোষ বসু আর মিত্র নব গুণ সুপবিত্র
হইলা কুলীন বলি' গণ্য ॥"
দশরথ সুতদ্বয়, কৃষ্ণ ও পরম হয়,
পরম করিলা বঙ্গে বাস।
কৃষ্ণ বসু রহে রাঢ়ে ক্রমে তার বংশ বাড়ে,
পুত্র ভবনাথ সুপ্রকাশ ॥
ভবনাথ হৈতে হংস, বসুবংশে অবতংশ
সুপ্রশংস হংস-পুত্রত্রয়।
শুক্তি, মুক্তি, অলঙ্কার, সবে কুলে অলঙ্কার
অলঙ্কার কৈলা বঙ্গাশ্রয় ॥

ভূপতি বল্লাল সেন যবে কুল বাঁধিলেন,
ব্রাহ্মণ-কায়স্থগণ মাঝে।
শুক্তি-মুক্তি গুণাস্পদ প্রকৃত মুখ্যের পদ,
সেই কালে পাইলা সমাজে॥
বাগাণ্ডায় রহে শুক্তি মহীনগরেতে মুক্তি
বসুবংশে দুই কুল-স্থান।
মুক্তি পুত্র দামোদর প্রকৃত কুলীনবর,
পুত্র তাঁর অনন্ত ধীমান॥
হইলা অনন্ত সুত গুণাকর গুণ-যুত,
গুণ হৈতে মাধব জন্মিল।
তাঁহার তনয় নব মহাকুল-সমুদ্ভব,
সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ লক্ষণ হইল॥
লক্ষণ-তনয় দশ ভুবন ভরিয়া যশ
প্রথমে প্রকৃত মহীপতি।

যজ্ঞ হেতু আদিশূর গৌড়ের ঈশ্বর।
কান্যকুব্জ হৈতে আনে পঞ্চ ঋষিবর॥
শ্রীহর্ষ ছান্দড় দক্ষ ভট্টনারায়ণ।
বেদগর্ভ নামে পঞ্চ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ॥
কায়স্থ ক্ষত্রিয় পঞ্চ তাঁহাদের সনে।
আইলা কনোজ হ'তে যজ্ঞের রক্ষণে॥
ঘোষ কুলাম্বুজ ভানু মকরন্দ ধীর।
মুক্তাতালি কৃতাম্বর বেষ্টিত শরীর
ভট্টনারায়ণ শিষ্য সদা শুদ্ধাচার॥
সৌকালীন গোত্রে জাত মহিমা অপার॥
দশরথ বসু কৃতী রথীর প্রধান।
বসুধা অধিপ বসু তুল্য কীর্ত্তিমান।
দক্ষ-শিষ্য বিখ্যাত গৌতম গোত্রে জাত।
'বসুপূর্ণ' হেতু যিনি বসু নামে খ্যাত।
মিত্র-কুলসিন্ধু-পূর্ণ-ইন্দু কালিদাস।
যাঁর শুভ যশোজ্যোতিঃ জগতে প্রকাশ।

পরিচয় পেয়ে রাজা পরিতুষ্ট মন।
সমাদরে সবাকারে করিলা গ্রহণ।
ঘোষ বসু মিত্রে হেরি নব গুণধর
দিলেন কুলীন পদ গৌড় নৃপবর।
ব্রাহ্মণ কায়স্থে নৃপ করিয়া সম্মান।
গঙ্গাতীরে বৃত্তি ভূমি দিলা বাসস্থান।
সপ্তগ্রামে কায়স্থেরা করিল বসতি।
ক্রমে বাড়ে তাঁহাদের সন্তান সন্ততি।

চতুর্থ অধ্যায়

মুক্তি বসু ও রাজা বল্লালসেন

মহারাজ আদিশূরের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র সুমন্ত সেন বা সামন্ত সেন গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুমন্ত সেনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র হেমন্ত সেন, এবং হেমন্ত সেনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বিজয় সেন রাজা হন। বিজয় সেনের স্বর্গারোহণের পর ১০৯১ শকাব্দে বা ১১৬১ খৃষ্টাব্দে বিজয় সেনের পুত্র বল্লালসেন রাজা হন।

রাজা বল্লালসেন মহাপরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন এবং পাল বংশের রাজাদিগের অল্পপ্রভাব যাহা ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া তিনি বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা ও আসাম প্রদেশ জয় করিয়া একচ্ছত্র অধিপতি হন। বল্লাল-সেনের 'অদ্ভুত সাগর' গ্রন্থে লিখিত আছে—

"ভুজ বসু দশ ১০৮২ মিতে শাকে শ্রীমদ্বল্লালসেন রাজাদৌ ষষ্ঠৈকা বর্ষে মুনি বিনিহিতো বিশাখায়াং,"

—এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত গবর্ণমেণ্ট সংগৃহীত অদ্ভুত সাগর, ৫২।১ পৃষ্ঠা।

ভুজ বসু দশমিতে ১০৮২ শাকে (১২৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে) শ্রীমান বল্লাল সেনের রাজ্যাদিতে বিশাখা নক্ষত্রে সপ্তর্ষি ৬১ বর্ষ অবস্থিত ছিল। বল্লালসেন যে কায়স্থ ছিলেন সে বিষয় আমরা প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বহু প্রমাণ পাই।

অথ বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দনঃ।
কুরুতেঽতি প্রযত্নে কুলশাস্ত্রনিরূপণম্।

—বঙ্গজ কারিকা।

কায়স্থপুত্র বল্লাল যা করে তা হয়।
উত্তমকে ছোট করি নীচকে বাড়ায়॥

—বারেন্দ্র কায়স্থগণের ঢাকুর।

সুপ্রসিদ্ধ আইন-ই-আকবরীতে বল্লালসেনকে কায়স্থ বলিয়া গিয়াছিলেন।

রাজা বল্লালসেন তাঁহার রাজত্বে শান্তিস্থাপন করিয়া সমাজ শাসনে মনোনিবেশ করেন। তিনি প্রত্যেক জাতিকে সামাজিক শাসনে পৃথক পৃথক মান্য দিয়া সমাজবদ্ধ করিতে যত্নবান হন। জাতীয় সমাজ বিন্যাসের উপাদানে সংঘশক্তির সৃষ্টি করা ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। এই সময়ে বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের বংশ এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে তাহাদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ করিয়া সমাজে বিপ্লব দূরীভূত করিয়া সমাজে সুশৃঙ্খলা আনিয়া বৈদিক হিন্দু ধর্মকে যথাযথ রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সংঘশক্তি সৃষ্টি করিয়া রাজা বল্লালসেন প্রত্যেক শ্রেণীকে যথাযোগ্য মান্য দেন এবং ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা স্থাপন করেন।

মহারাজ বল্লালসেন মিথিলা দেশ জয় করিয়া আসিয়া তাঁহার রাজত্ব পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন।

রাঢ়, বারেন্দ্র, বাগড়ী, বঙ্গ ও মিথিলা। ভাগীরথীর পশ্চিম ও গঙ্গার দক্ষিণ ভাগস্থিত ভূভাগ অর্থাৎ বর্তমান জেলা হুগলী, বর্ধমান, তমলুক প্রভৃতি স্থান, মেদিনীপুরের কিয়দংশ, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি নদীয়ার কিয়দংশ, খিদিরপুর, চেতলা, বোড়াল, বাঁশদ্রোণী, সুন্দরবনের কিয়দংশ, জয়নগর, ডায়মণ্ডহারবার ও মেটীয়াবুরুজ প্রভৃতি স্থান যাহা ২৪ পরগণার সামিল ঐ অংশ ও মানকর এবং সাঁওতাল পরগণা অবধি বৈদ্যনাথের সমীপ পর্যন্ত গঙ্গার আদিস্রোতের পশ্চিমবর্তী সমস্ত স্থানই রাঢ়। জেলা ঢাকা ফরিদপুর বাখরগঞ্জ ও জেলা নদীয়ার কিয়দংশ এবং যশোহর—বঙ্গ। পদ্মা ও ভাগীরথীর মধ্যস্থিত ভূভাগ অর্থাৎ এখনকার জেলা নদীয়া, ২৪ পরগণা ও সুন্দরবনের কিয়দংশ প্রভৃতি স্থানই বাগাড়ী। পদ্মানদীর উত্তর করতোয়া মহানন্দার মধ্যবর্তী ভূভাগ বারেন্দ্র। রাজসাহী জেলা প্রভৃতি স্থান বারেন্দ্র ভূমির অন্তঃপাতী। মহানন্দার পশ্চিম অর্থাৎ ত্রিহুত জেলা প্রভৃতি ভূভাগ মিথিলা সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়। (কায়স্থ পুরাণ, পৃ ১৮৯)।

বল্লালসেনের কুলবিধি—

রাজা বল্লালসেন বাসস্থানানুসারে কায়স্থগণকে চারি শ্রেণীতে বিভাগ করেন—উত্তর রাঢ়ীয়, দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বঙ্গজ এবং বারেন্দ্র। প্রত্যেক কুলের ব্যক্তিগণকে আটটি করিয়া সমাজ ভুক্ত করেন এবং তন্মধ্যে প্রত্যেকের দুইটি

কুলীন ও ছয়টি বংশজ সৃষ্টি করেন। প্রত্যেক কুলের দুইজনকে শ্রেষ্ঠ কুলসম্পন্ন দেখিয়া মুখ্য কুলীন আখ্যা দিয়া শ্রেষ্ঠ পদ দেন। বসুবংশীয়দিগের মধ্যে ৫ম পর্যায়ভুক্ত শুক্তিকে বাগাণ্ডা সমাজে এবং মুক্তিকে মাহীনগর সমাজে, ঘোষ বংশীয়দিগের ৬ পর্যায়ে প্রভাকরকে আকনা সমাজে ও নিশাপতিকে বালী সমাজে এবং মিত্র বংশীয়দিগের মধ্যে ৯ পর্যায়ের ধুঁইকে বড়িষা সমাজে ও গুঁইকে টেকা সমাজে মুখ্য কুলীন আখ্যা দিয়া সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন দেন। মুখ্য কুলীন কুলীনের শ্রেষ্ঠ এবং কুলরাজ নামে অভিহিত হন এবং তাঁহারা যে নিয়ম প্রচার করেন, সমাজ তাহা গ্রহণ করিয়া থাকে।

বসুঃ ঘোষঃ গুহঃ মিত্রঃ দত্তঃ নাগশ্চ নাথকঃ।
দাসঃ সেনঃ করঃ দামঃ পালিতঃ রুদ্রঃ পালকঃ।
রাহাঃ ভদ্রঃ ধরঃ নন্দী দেবঃ কুণ্ডশ্চ সোমকঃ।
সিংহঃ রক্ষিতোহঙ্কুরশ্চৈব বিষ্ণু আঢ্যশ্চ নন্দকঃ।
এতে সপ্তবিংশতীজাঃ বল্লালেন প্রতিষ্ঠিতাঃ॥

—ঘটকরাজের বঙ্গজ-কুলপঞ্জী।

কায়স্থগণের মধ্যে বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র, দত্ত, নাগ, নাথ, দাস, সেন, কর, দাম, পালিত, চন্দ্র, পাল, রাহা. ভদ্র, ধর, নন্দী, দেব, কুণ্ড, সোম, সিংহ, রক্ষিত, আঙ্কুর, বিষ্ণু, আঢ্য ও নন্দ এই ২৭ ঘর মহারাজ বল্লালসেনের সভায় প্রতিষ্ঠালাভ করে। তাহার সভায় ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণ ঐরূপ কুলমর্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্বে মুসলমানরাজাগণ এবং এখন ইংরাজ রাজত্বে রাজপ্রতিনিধি যেমন দরবার করিয়া খেতাব উপাধি দিয়া থাকেন, মহারাজ বল্লালসেনও সেইরূপ রাজসভায় মান্যগন্য ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া কুলাচারী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণকে কুলমর্যাদা ও কুলস্থান দিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রদত্ত কুলমর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য কতগুলি কুলবিধি প্রণয়ন করিয়া কুলীন সমাজকে রক্ষার জন্য আইন করিয়া দিলেন।

যে ব্যক্তি কুলের মধ্যে বিদ্যা ও বুদ্ধিতে, আচার ও ব্যবহারে, বিনয় ও শিষ্টাচারে, প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তিতে, প্রভাব ও প্রতিভায়, ধার্মিকতায় ও ক্রিয়া-কলাপে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে, সেই মুখ্য কুলীন আখ্যা পায়—

আচারঃ বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্‌।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং ॥
সপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দানগ্রহণমুত্তমম্‌।
কন্যাভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিষ্ঠা বা পরস্পরং ॥
কুলীনস্য সুতাং লব্ধা কুলীনায় সুতাংদদৌ।
পর্য্যায় ক্রমতশ্চৈব স এব কুলদীপকঃ ॥
আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগং তথৈবচ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রে চ কুলকর্ম্ম চতুর্ব্বিধঃ ॥
আদানেন প্রদানেন কুলকর্ম্ম চ সাধয়েৎ
কন্যাভাবে কুশত্যাগং প্রতিজ্ঞাং বা পরস্পরং ॥
বিবাহঃ দানগ্রহণৈঃ কুলীনাঃ শ্রেষ্ঠতাং লভেৎ।

ইতি আচার্য্যচূড়ামণির বঙ্গজ কায়স্থ কারিকা।

বল্লালসেনের কুলকে অনেকে কন্যাগত কুল বলে। তিনি কায়স্থদিগের কৌলিন্য পদ্ধতির মেলবদ্ধ করিয়া যে সকল নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে—

সপর্যায় ও সমঘরে কন্যাদান ও কন্যাগ্রহণ করা পরস্পর প্রতিজ্ঞা করিবেন ; যদি কন্যার অভাব হয় তবে কুলত্যাগ করা কর্তব্য। পর্যায়ক্রমে যিনি কুলীনের কন্যাগ্রহণ ও কুলীনকে কন্যাদান করেন, তিনি কুলদীপক। কুলকর্ম চারি প্রকার—যথা আদান, প্রদান, কুলত্যাগ ও ঘটকের সম্মুখে প্রতিজ্ঞা। বিপর্যয়ে বিবাহ করিলে কুল থাকে না। যাহার যে পর্যায় ঠিক সেই পর্যায়ে কন্যাদান বা কন্যার বিবাহ দিয়া এবং স্বপর্যায়ে কুলীন কন্যা গ্রহণ করিয়া পুত্রের বিবাহ দিয়া যে কুলকর্ম করে তাহাকে কুলদীপক বলে এবং এইভাবে সকল পুত্রকন্যার পর্যায় মিল করিয়া বিবাহ কুলীনের ঘরে দিলে কুলরক্ষা হয়। কুলীনের কন্যার বিবাহ কুলীন পুত্রের সহিত দিতে হইত। এই কারণে বল্লালসেনের কুলপ্রথাকে কন্যাগত কুল বলিত। কুলীনের বংশে জন্মগ্রহণ করিলেই 'কুলজ' বা পুত্রকন্যা কুলীন হইত এবং যে কুলকর্ম করিত না, বা কুলহীনের গৃহে জন্মাইত সে বংশজ হইত। সেই সময়ে সমাজে সুশৃঙ্খল আনয়ন করিবার জন্য মহারাজ বল্লালসেন যে সকল কুলকর্ম রক্ষার জন্য কুলপ্রথা প্রবর্তন করেন তাহা সকল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থই গ্রহণ করে এবং তিনি

কুলবিধাতা নামে প্রসিদ্ধ হন। রাজা বল্লালসেনের প্রবর্তিত কুলপ্রথাকে এখনও বল্লালী কুলপ্রথা বলিয়া থাকে। কিন্তু মহারাজ বল্লালসেনের প্রবর্তিত কুলপ্রথার বহু নিয়ম বসুবংশের ১৩ পর্যায়ের মহারাজ গোপীনাথ বসু বা পুরন্দর খাঁ সংস্কার ও পরিবর্তন করিয়া গিয়াছেন। এখন বল্লালসেনের কন্যাগত প্রথা উঠিয়া গিয়া পুরন্দর খাঁর প্রবর্তিত পুত্রগত কুলপ্রথা হইয়াছে। কুলাচার্যগণ মহারাজ বল্লালসেনকে প্রথম কুলবিধাতা এবং পুরন্দর খাঁকে দ্বিতীয় কুলবিধাতা বলিয়া থাকেন। মহারাজ বল্লালসেনের অন্যান্য কুলপ্রথা গোপীনাথ বসুর জীবনীর মধ্যে সমালোচনা করিব।

মহারাজ বল্লালসেন সুদর্শন মিত্রের বংশোদ্ভব বটেশ্বর মিত্রের কন্যা লক্ষণার পাণিগ্রহণ করেন। (উত্তর রাঢ়ীয় কারিকা, রাজন্যকাণ্ড, পৃ ৩৩৬।)

দক্ষিণ রাঢ়ীয় নারায়ণ দত্ত মহারাজ বল্লালসেনের মন্ত্রী ছিলেন। (কায়স্থ পত্রিকা—১৩০৯ ফাল্গুন।)

ঘটক নন্দরাম মিত্রের দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলকারিকায় বল্লালসেনের কুলবিধি:—

শুন সবে বলি তবে কুলের যেমন ধর্ম্ম।
প্রকৃত সহজ মুখ্য কুল কমলের জন্ম॥
হংস সুত মুক্তি বসু ঘোষে নিশাপতি।
মৃত্যুঞ্জয় সুত গুই কুলে মহাকৃতি॥
এ তিন সৃজিলা মুখ্য নৃপতি বল্লালে।
বাণ রস অঙ্গ পর্য্যায় দিল সেই কালে॥
তিনেতে বাড়িল তিন ছয় প্রকৃত গণ্য।
তবে একে একে তিন সমাজ বিভিন্ন॥
আকনা প্রভাকর বালি নিশাপতি নাম।
শুক্তি বসু বাগাণ্ডা মুক্তি মাহীনগর গ্রাম॥
ধুই মিত্র বড়িশা টেকায় মিত্র গেলা গুই।
তিন কুলে ছয় সমাজ প্রকৃত মুখ্য এই॥
কোমলের জন্ম কেহ জানে বা না জানে।
কেহ কেহ কথা কয় অসার সন্ধানে॥
প্রজাপতি সুত বাড় মুখ্য ঘোষ হংস।
জ্যেষ্ঠ পুত্র কোমল হইল তার অংশ॥

কনিষ্ঠ মধ্যাংশ জ্যেষ্ঠ কুলে হীনবল।
তে কারণে রাজ আজ্ঞা মুখ্য সে কোমল॥
আদান প্রদান নাই জন্ম মুখ্য কুলে।
কোমল-মুখ্য থুইলা নাম নৃপতি বল্লালে॥
প্রকৃত চিহ্ন সহজ ভিন্ন সমানে প্রভব।
তখনি কোমলের জন্ম পর্য্যায় ছিল নব॥
সহজের জন্ম হইল দশের পর্য্যায়।
ধুই-সুত মকরন্দ মিত্র মহাশয়।
দুই অঙ্গে প্রকৃত যার শোভা আছে কুল।
কুল গর্ব্ব সহজ সমান এক সমতুল॥
প্রকৃত সহজ জন্মে সহজে সহজ।
কোমলে কোমল বাড়ে অনুজে অনুজ।
মুখ্যের ত্রিবিধ হইল শুন তার বোল।
প্রকৃত সহজ অবশেষ সে কোমল॥
সহজ মুখ্যের কুল যেন নদ নদী।
হ্রাস বৃদ্ধি কোমলে নাই যাবৎ দিনাবধি।
কুলের প্রবন্ধ এখন কর অবধান।
কনিষ্ঠ ছভায়া মধ্যাংশ তেওজ বিধান॥
ইহার অনুজ যত শুন সংখ্যা ইহ।
পঞ্চম অবধি পুত্র মধ্যাংশ দ্বিতীয়॥
যে যাহাকে কুল করে সেই অংশে তার কুল।
কুলীন সভায় বাড়া ভাগ্য সকল মূল॥
কনিষ্ঠ ছভায়া গণি ছভায়া কনিষ্ঠ।
পিতৃকুলে চিহ্ন নহে গণি মধ্যশ্রেষ্ঠ॥
বাড় মুখ্য কুলে তৃতীয় পুত্র আদি।
মুখ্য পুত্র শেষ আর পঞ্চম অবধি॥
একঘরে জন্মে নাম আর ঘরে লয়।
মধ্যাংশ দ্বিতীয় হয়ে বর্গে উঠে রয়।
আর আর কুল যত শুন তার কথা।

কনিষ্ঠ দ্বিতীয় পুত্র আদি করি যথা ॥
নয় প্রকার কুল এই কহিলাম সার।
বুঝহ কুল যত গেলে অংশের বিচার ॥
কনিষ্ঠ ছ'ভায়া কুল মুখ্য কনিষ্ঠ হয়।
মধ্যাংশ দ্বিতীয় কুল স্থিরতর রয় ॥
কনিষ্ঠ দ্বিতীয় কুল শুন একভাব।
তেওজ হইলে পুত্র তেওজ হয় এই লাভ ॥
দ্বিতীয় মধ্যাংশ দ্বিতীয় তেওজ কুল।
মাঝখান উন সংখ্যা এই তার মূল ॥
কনিষ্ঠ দ্বিতীয় পুত্র বাড়ে তেওজ জানি।
তৃতীয় পুত্রের দ্বিতীয় পুত্র ছ'ভায়া যে গণি ॥
কনিষ্ঠ ছ'ভায়া কুলের দ্বিতীয় তনয়।
মুখ্য কনিষ্ঠ হয় জানিবা নিশ্চয় ॥
কেহবা হয় বাড় তেওজ ছ'ভায়া অনুজ।
তেওজ দ্বিতীয় পুত্রস্য জন্ম হয় তেওজ ॥
মুখ্য পুত্র বাড়ে আর তেওজ তাহার।
বাল্য যুবা বৃদ্ধভাব হয় সবাকার ॥

অথ নবকুলস্য অংশঃ।

মুখ্য আদি তেওজ দোওজ নবকুল।
অংশ বিচার সাঙ্গ হইল সূক্ষ্ম আর স্থূল ॥
প্রকৃত সহজে আসি কুলেতে বিচার।
সহজ কোমল আর্ত্তি এই ব্যবহার ॥
কোমল মুখ্য আর্ত্তি হয় আর সর্ব্বকুলে।
সূক্ষ্ম বিবেচনা ইহা নাহি বলি স্থলে ॥
পরে পরে আর্ত্তি জেন কুলীন সকলে।
সর্ব্বকুলে কর্ম আছে সর্ব্বত্রতে বলে ॥
যোগ ক্রিয়া অংশ প্রতি সার বলবান্।
যোগে কুল থাকে মাত্র করি অনুমান ॥
পুর্ব্বমত যোগ ছিল ইদানিন্তু আর।
সমুখ পশ্চাৎ যোগ নূতন বিচার ॥

সপর্য্যাতে প্রমাণিকে দিলে দোষ হয়।
সাম্য পশ্চাৎ কুলীনের ঘটকেতে কয়।
সপর্য্যাতে কুল গ্রহণ কাটি সংজ্ঞা সার।
বিপর্য্যাতে দান দিলে পৌত্রীতে বিচার।
বিপর্য্যায়ে কুল হইলে নাহি থাকে কুল।
এ কর্ম্মেতে দোষ অতি নাশ হয় মূল।
পিতা মাতা আর ভ্রাতা যে কন্যাবিহীনা।
রন্তকন্যা নাম তার কুলে অতি ক্ষীণা।
এমন কন্যা গ্রহণেতে কুলীন সদোষ।
থাকে সেই কুল হানি হয়্যা অসন্তোষ।
পিতা হয়্যা ত্যাজ্যপুত্রে পিণ্ডদান করে।
পিণ্ডদোষে কুল নাশে সেই কুলপরে।
তাহার সুতাকে কেহ করিলে গ্রহণ।
পিণ্ডদোষে কুলনাশ পুস্তক লিখন॥
স্বজনাদোষ যাতে ঘটে শুন বিবরণ।
পিতৃপক্ষ সপ্তমীতে গ্রহণ করণ॥
মাতৃপক্ষ পঞ্চমী সুতা গ্রহণ বাখানি।
স্বজনায় শাস্ত্র উক্ত দোষ তার জানি॥
কুলীন কুলীনে যদি আন্বরস করে।
সপর্য্যায় কুলহানি অংশের ভিতরে॥
ক্ষেম্য দোষ কুলীনের দুই মত ঘটে।
দোষাশ্রিত কর্ম্ম হলে ক্ষেম্য দোষ রটে।
মধ্যাংশ দ্বিতীয় বাড়ে শুন সভাসদ্।
কনিষ্ঠ মধ্যাংশ তেওজ হয় বিধিমত।
প্রকৃত মুখ্যের কুলে নাহি হ্রাস বৃদ্ধি।
নিদাঘ বরষা শীতে যেন মহোদধি॥

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের দক্ষিণ রাঢ়ীয়
কায়স্থ কাণ্ড, পৃ ৭৭।

বসুবংশের আদিপুরুষ দশরথ বসু হইতে পঞ্চম পর্যায়ে মুক্তি এবং শুক্তি বসু মহারাজ বল্লালসেন কর্তৃক রাজসভায় কুলমর্যাদা প্রাপ্ত হইয়া শুক্তি বসু

বাগাণ্ডা এবং মুক্তি বসু মাহীনগর সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমাজপতি হন এবং স্বীয় প্রতিভাবলে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন।

অথ বসুবংশস্যাষ্ট সমাজঃ।

বাগাণ্ডা মাহীনগর সমাজ প্রধান।
প্রকৃতাদি মুখ্যকুলে কর্ম্ম সহমান॥
মাহীনগর বাগাণ্ডাতে সর্ব্বকাল আছে।
বৈষ্ণবের ক্ষয় কোথা বিষ্ণু আগে পাছে॥
চিত্রপুর দীর্ঘ অঙ্গ শাল মুলি আর।
নিমারকা পঞ্চমূলী গোহরি গ্রাম সার॥
এই সকল সমাজেতে সর্ব্ব মৌলিকান্ত।
কুলত্যাগী হয়্যা ভাবে আছে অতি শান্ত॥

দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলপ্রদীপ।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রবাবু ইদিলপুরের লক্ষ্মীকান্ত শর্মা ঘটকের তালপাতার পুথি হইতে পাইয়াছেন যে, "কায়স্থানাং বাসস্থানং হরিকোণৌ বটগোণৌ বর্দ্ধমানঃ মধুস্তথা। কর্ণ কঙ্কৌচ রাঢ়ায়াং কায়স্থানাং স্থানাষ্টকাঃ॥ কোণাৎ বসু বটাৎ ঘোষো বর্দ্ধমানাৎ মিত্রস্তথা। কঙ্কগ্রামে সমানীতো বল্লালেন প্রতিষ্ঠিতঃ।" অর্থাৎ মহারাজ বল্লালসেন কোন নামক গ্রাম হইতে বসুকে, বটগ্রাম হইতে ঘোষকে এবং বর্দ্ধমান হইতে মিত্রকে আনাইয়া কঙ্কগ্রামে কৌলীন্য মর্যাদা দেন।

পঞ্চানন কুলাচার্যের দক্ষিণ রাঢ়ীয় কারিকায় লিখিত আছে—

বল্লালসেন মহারাজ জন্মিলা পৃথিবী মাঝ
তপস্যা করিয়া শত শত।
জাতিভেদ বিচার করি অংশ বংশ শুদ্ধ ধরি
নবগুণে কুলীন স্থাপিত॥
ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভাব সেবায়েত দিব্য লাভ
এই দুই জাতির প্রধান।
ঘোষ বসু মিত্র তিন ব্রাহ্মণ সেবায়ে লীন
বল্লাল ভূপতি বিদ্যমান॥
বিষ্ণু অংশ ব্রাহ্মণ তস্য শিষ্য তিনজন
নবগুণ যুক্ত দেখ এই।

আরাধিয়া মহাবিদ্যা মহাকৃতি মহাসাধ্যা
ভূদেব ভাবনা পরে নাই ॥
পরিত্রাণ নির্ম্মল বংশ তাহে কুললক্ষ্মী অংশ
বিপ্রপদে দৃঢ় দেখি মন।
আচার বিনয় আদি নবগুণ দেখি যদি
জানিলে যে পরম কারণ ॥
দ্বিজ গুরু অতিথি সেবা সত্য পূজা সত্যতপা
ভক্তিভাবে সেবয়ে যে জন।
ঈশ্বরের আজ্ঞা পালে বেদবাক্য পথে চলে
পায় পূজা পূজনীয় কুলীন ॥
কৈল মুখ্য কুলরাজ দক্ষিণ-রাঢ়ের মাঝ
চন্দনে তুষিল তিনজনে।
সপ্তঘর মৌলিক সিদ্ধি ছিল রাজার মুৎসুদ্দি
তিনেতে চিহ্নিত কৈলা দানে ॥
বল্লালে পূজিত হ'য়ে ঘোষ বসু মিত্র লয়ে
গৌড়দেশে ছিল সর্ব্বজন।
রাজার হইল অপবাদ ডোমকন্যা পরিষাদ
গৌড় ছাড়ি করিলা গমন ॥
পূর্ব্ব আর পশ্চিম যত বঙ্গজ বারেন্দ্র খ্যাত।
উত্তর দেশেতে উত্তররাঢ়ী।
দক্ষিণ গঙ্গার কুল দক্ষিণ-রাঢ়ের মূল
জাহ্নবী সমাজে কৈল বাড়ী ॥
তিন কুলে ছয় ভাই রহিল গিয়া ঠাই ঠাই।
চিহ্নিত সমাজে কুলশ্রেষ্ঠ।
প্রভাকর নিশাপতি আকনা বালীতে স্থিতি
প্রচার করিল পর্য্যায় ষষ্ট ॥
শুক্তি মুক্তি সহোদর বাগাণ্ডা মাহিনগর
বাণ পর্য্যায় বসুজা আলয়।
মিত্রবংশে শুন লেখা বড়িশা সমাজে টেকা
তখনেতে পর্য্যা ছিল নয় ॥

মাহীনগর

বাঙ্গলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশস্থ গঙ্গানদীর পূর্ব পশ্চিম ধারে অবস্থিত স্থানকে রাঢ়দেশ বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই রাঢ়দেশে মহারাজ আদিশূরের রাজত্বকালে বহু পূর্ব হইতে বহু কায়স্থ বংশের বাস ছিল এবং গৌড় প্রদেশের একটি জনসমৃদ্ধশালী অংশ ও অনেক প্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল। উক্ত রাঢ়-দেশের দক্ষিণ অংশে ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে সেই সময়ে মহীনগর নামে একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। রাজা বল্লালসেন কর্তৃক বিশেষ পদমর্যাদা ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়া মুক্তি বসু সেই সময়ে কায়স্থ সমাজের মধ্যে একজন সমাজ-পতি এবং প্রধান মুখ্য কুলীন পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মাহীনগর নামক স্থানে আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন এবং মাহীনগর সমাজ নামে একটি বিশেষ জাতীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সেই সময়ে সমাজপতি দেশের প্রধান নেতা এবং প্রতিপত্তিশালী শাসনকর্তারূপে সম্মানিত হইতেন। প্রজাবর্গ এবং গ্রাম-বাসীদিগের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসংবাদ সংঘটিত হইলে তাঁহারা সমাজপতির কাছে গিয়া নালিশ করিতেন এবং সমাজপতিই মধ্যস্থ হইয়া নিরপেক্ষভাবে তাহার মীমাংসা ও বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিতেন। এই সমাজপতিগণ হিন্দু রাজার আদেশ মত প্রাদেশিক গবর্ণরের মত বিচারক ও শাসনকর্তা হইতেন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহারা নিজ প্রতিভা ও প্রতিপত্তি বলে জমিদার হইয়া প্রভূত ধনসম্পদশালী হইতেন।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত ইষ্ট-বেঙ্গল রেলওয়ের ডায়মণ্ডহারবার রেল লাইনের মল্লিকপুর ষ্টেশনের নিকটেই উক্ত মাহীনগর গ্রাম এখনও বর্তমান আছে। মুক্তি বসু উক্ত মাহীনগর নামক স্থানের জমিদার ও শাসনকর্তারূপে থাকিয়া বহু উদ্যান ও অট্টালিকাদি প্রস্তুত করিয়া গৌড়ের এবং অন্যান্য স্থানের অনেক কায়স্থকে আনাইয়া বসবাস স্থাপন করান এবং ক্রমে ক্রমে মাহীনগর দক্ষিণ বঙ্গের একটি বহুজনাকীর্ণ সমৃদ্ধিশালী নগর হইয়া উঠে। মুক্তি বসুর স্বর্গারোহণের পর তাঁহার বংশধরগণ বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তির সহিত উক্ত মাহীনগরে বাস করেন এবং এখনও উক্ত মুক্তি বসুর বংশের বংশধরগণ 'মাহী-নগরের বসু' বলিয়া বিখ্যাত এবং গৌরবান্বিত হইয়া আসিতেছেন।

কবিকঙ্কণের চণ্ডী গ্রন্থে লিখিত আছে যে ধনপতি সওদাগরের নৌকা এই মাহীনগরের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা বহিয়া মগরা অভিমুখে গিয়াছিল। কবিকঙ্কণ

মুকুন্দরাম বালীঘাটা (বর্তমান বেলেঘাটা) ও কালীঘাটের পর মাহীনগর ও তৎপরে যথাক্রমে নাচনগাছা বৈষ্ণবঘাট বারাসত ও ছত্রভোগের নামোল্লেখ করিয়াছেন—

ডাহিনে ছাড়িয়া যায় হিজুলীর পথ।
রাজহংস জিনিয়া লইল পারাবত ॥
কালীঘাটে গিয়া ডিঙ্গা দিল দরশন।
তীরের প্রয়ান যেন চলে তরিবর।
তাহার মেলানী বহে মাই নগর ॥
নাচাগাছা বৈষ্ণবঘাটা বামদিকে থুইয়া।
দক্ষিণেতে বারাসত গ্রাম এড়াইয়া ॥
ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধুবালা।
ছত্রভোগ উত্তরিলা অবসান বেলা ॥

যে সুন্দরবন এখন ব্যাঘ্র, গণ্ডার ও কুম্ভীরের আবাসভূমি হইয়াছে, তাহা এককালে শস্যশালী জনপূর্ণ ভূমি ও বহু সমৃদ্ধিশালী গ্রামে পরিপূর্ণ ছিল। ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে ভিনিসীয় বণিক কোণ্টি সাহেব গঙ্গার মোহনার নিকটস্থ জমি সকল নগর ও উপবনে পরিপূর্ণ দেখিয়া গিয়াছেন। সুন্দরবন অংশের ভিতর এবং ২৪ পরগণার অনেক স্থানেই বহু মন্দির ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। এখনও ২৪ পরগণার দক্ষিণ অংশে জয়নগর, মজিলপুর, বারুইপুর, মল্লিকপুর, ইত্যাদি বহু প্রাচীন গ্রাম বর্তমান রহিয়াছে এবং প্রাচীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বংশধরগণ বসবাস করিতেছে।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রবাবু কায়স্থ পত্রিকায় 'পুরন্দর খাঁ ও মাহীনগর সমাজ' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—

"মাহীনগরে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের তিনবার একজাই হওয়ায় এক সময়ে সামাজিকগণের নিকট মাহীনগর তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। দুইশত বর্ষ পূর্ব্বেও এই স্থানের পার্শ্ব দিয়া প্রবল-তরঙ্গা গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন। কবি কৃষ্ণরামের "রায়মঙ্গল" গ্রন্থে সেই সময়ের কথা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

সাধুঘাটা পাছে করি, সূর্য্যপুর বহে তরি,
চাপাইলা বারুইপুরে আসি।
বিশেষ মহিমা বুঝি বিশালাক্ষ্মী দেবী পূজি,
বহে তার সাধু গুণরাশি ॥

মালঞ্চ রহিল দূর, বহিয়া কল্যাণপুর
কল্যাণ-মাধব প্রণমিল।
বাহিলেক যত গ্রাম কি কাজ করিয়া নাম
বড়দহ ঘাটে উত্তরিল॥"

(রায়মঙ্গল। ৪৯।)

গঙ্গার স্রোত রুদ্ধ হইবার পর, এই স্থানে মহামারীরূপে জ্বর রোগ আসিয়া দেখা দেয়, তাঁহাতে বসুবংশীয় অনেকেই স্ব স্ব বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ স্থানে আসিয়া বাস করেন। শ্রেষ্ঠ কুলীন কায়স্থগণ স্বস্থান ত্যাগ করিয়া গেলেও তাঁহাদের গুরু-পুরোহিত স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ স্ব স্ব শাসন বা ব্রহ্মত্র ত্যাগ করিয়া অপর স্থানে গিয়া বাস সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই। মাহীনগরের উপকণ্ঠ কোদালিয়া ও তৎনিকটস্থ চিংড়িপোতা, রাজপুর, হরিনাভি, লাঙ্গলবেড়ে প্রভৃতি স্থানে বিদ্যাবাচস্পতি প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত বংশধরগণের স্মৃতি আজও উজ্জ্বল রহিয়াছে। ঐ সকল স্থানে শত শত খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল পণ্ডিতগণের সমাগমে দাক্ষিণাত্য বৈদিক সমাজে 'কোদালিয়া' কাশীপুরী সদৃশ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে এইরূপ একটি শ্লোক শুনা যায়—

কোদালিয়া পুরী কাশী গোঘাটা মণিকর্ণিকা।
তর্কপঞ্চাননো ব্যাসো রামনারায়ণঃ স্বয়ং॥

বলিতে কি, যে বিদ্যাবাচস্পতির বংশে রামনারায়ণ তর্কপঞ্চানন জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশেই সোম-প্রকাশ সম্পাদক দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ জন্মলাভ করিয়াছিলেন।

মুক্তি বসুর বংশধর

মুক্তি বসুর একমাত্র পুত্র দামোদর (৬ষ্ঠ পর্যায়)। দামোদরের একমাত্র পুত্র অনন্ত (৭ম পর্যায়)। অনন্তের দুই পুত্র—গুণাকর ও বিনায়ক (৮ম পর্যায়)। দামোদর, অনন্ত এবং গুণাকর তিনজনই মাহীনগর সমাজে প্রধান মুখ্য কুলীনের পদ প্রাপ্ত হইয়া সমাজপতি হিসাবে থাকিয়া পিতৃপুরুষ মহাত্মা মুক্তি বসুর পদানুসরণ করিয়া নিজ নিজ বংশগৌরব রক্ষা করিয়া যান। অনন্তের কনিষ্ঠ পুত্র কোমল মুখ্য হন এবং মাহীনগর হইতে চিত্রপুর নামক স্থানে গিয়া বাস করেন।

গুণাকরের দুই পুত্র মাধব এবং সাধব। ৯ম পর্যায় মাধব প্রধান মুখ্য এবং সাধব কোমল মুখ্য কুলীনের পদ পান।

মাধবের সাত পুত্র, যথা—১০ম পর্যায় ১। লক্ষ্মণ প্রধান মুখ্য ২। বাড়ি কোমল মুখ্য চক্রপাণি ৩। উদয় ৪। নৌ ৫। ধৌ ৬। শ্রীপতি ৭। তেয়জ অচ্যুতানন্দ।

জ্যেষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মণ প্রধান মুখ্য কুলীন হইয়া মাহীনগরে সমাজপতির পদ প্রাপ্ত হন।

লক্ষ্মণের দশ পুত্র হয়—১১ পর্যায়ে—

১। মহীপতি (প্রধান মুখ্য)
২। দিবাকর (কুলহানি হয়)
৩। পঞ্চানন—(বাড়ি সহজ মুখ্য)
৪। নারায়ণ—(বাড়ি সহজ মুখ্য)
৫। বিজয় (কোমল মুখ্য)
৬। শ্রীধর (বা শ্রীবর, তেয়জ)
৭। হরি (বাড়ি তেয়জ)
৮। লম্বোদর
৯। গর্ভেশ্বর
১০। মৃত্যুঞ্জয়

পঞ্চম অধ্যায়

মহীপতি বসু বা সুবুদ্ধি খাঁ

মহারাজ বল্লালসেনের স্বর্গারোহণের পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র মহাবীর ও ধার্মিক লক্ষ্মণসেন গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বহুবৎসর বঙ্গরাজ্য সুশাসন করেন। তাঁহার ৮০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গলাদেশে সমাজ ও রাষ্ট্রবিপ্লবের বিশেষ সূচনা হয়। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের দেশ সকল মুসলমানগণ কর্তৃক অধিকৃত হয় এবং হিন্দু রাজাগণ বিতাড়িত হন। সম্রাট মহম্মদ ঘোরী ১১৯১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর হিন্দু রাজ পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করিয়া দিল্লী সিংহাসন অধিকার করিয়া ভারতবর্ষে প্রথম মুসলমান রাজত্ব স্থাপন করেন। মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশের শেষ রাজা মহারাজ লক্ষ্মণসেনের রাজধানী নবদ্বীপ দখল করেন এবং পরে গৌড়দেশ দখল করিয়া বঙ্গদেশে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। গৌড়ই মুসলমানগণের বঙ্গদেশের রাজধানী হয় এবং পাঠানগণ গৌড় সিংহাসনে বসিয়া বঙ্গদেশ শাসন করিতে থাকেন।

যে সময় বঙ্গের মুসলমান রাজবংশ ইলাইস সাহীর বংশ ধ্বংস করিয়া আবিসিনীয় বংশের খোজা ও হাবসী নামধেয় দুইজন রাজা বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময় দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গে দশরথ বসুর বংশধর একাদশ পর্যায়ের সুপ্রসিদ্ধ মহীপতি বসু একজন বিশেষ ধনবান ক্ষমতাশালী বড় জমিদার ছিলেন।

১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দিন হুসেন সাহ খোজা ও হাবসীর ক্ষমতা ধ্বংস করিয়া বঙ্গের অধীশ্বর হন। উক্ত আলাউদ্দীন হুসেন শাহ প্রথম জীবনে একজন দরিদ্র লোক ছিলেন এবং পশ্চিম প্রদেশ হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া উক্ত মহীপতি বসুর অধীনে চাকরী করিতেন। ক্রমে নিজ প্রতিভাবলে আবিসিনীয় বংশের গৌড়েশ্বরের সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হন। অল্পদিনের মধ্যেই হুসেন সাহ বঙ্গের হিন্দু এবং মুসলমানগণের সাহায্যে বঙ্গের নবাব খোজা ও হাবসীকে বধ করিয়া বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। হুসেন সাহ হিন্দুদিগকে বিশেষ

ভালবাসিতেন এবং সম্রাট আকবর সাহ'র ন্যায় বুদ্ধিমান নবাব ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের নবাব হইয়া পুরাতন প্রভু মহীপতি বসুকে ভুলেন নাই। গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করিয়া তিনি মহীপতি বসুর প্রখর বুদ্ধি ও কার্যকুশলতার বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার রাজধানীতে আহ্বান করিয়া রাজস্ব এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের উচ্চ মন্ত্রীপদ প্রদান করেন এবং সুবুদ্ধি খাঁ উপাধি এবং প্রভূত জায়গীর দান করেন। হুসেন সাহ ভাগীরথীর তীরে রাজমহলে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন এবং বহু হিন্দুকে রাজ্যশাসনের উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়া নিজ সিংহাসন সুদৃঢ় করেন।

আলাউদ্দীন হুসেন সাহ হিন্দুদিগকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ও পরামর্শদাতা ছিলেন এই সুপ্রসিদ্ধ মহীপতি বসু বা সুবুদ্ধি খান্ ; যাহার সাহায্যে হুসেন সাহার সৌভাগ্য বিশেষভাবে বর্ধিত হয়। হুসেন সাহ বিদ্বান ব্যক্তির সম্মান করিতেন এবং প্রজার সুবিধার জন্য অনেক রাস্তা ও পান্থশালা নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সুশাসনে হিন্দু ও মুসলমান সকলেই সন্তুষ্ট ছিল এবং দেশের যথেষ্ট ধনবৃদ্ধি হইয়াছিল। কথিত আছে, তাঁহার আমলে গৌড়ের লোকেরা সোনার পাত্রে আহার করিত। তিনি একজন বিদ্বান ও ধার্মিক লোক ছিলেন এবং সকল ধর্মের প্রতি তাঁহার সমান সমাদর ছিল। তিনি বঙ্গভাষার উৎসাহদাতা ছিলেন এবং তাঁহার রাজত্বকালে বহু মূল্যবান গ্রন্থাদি রচিত হয়। বঙ্গভাষা এবং বাঙ্গালী তাঁহার নিকট বিশেষ ঋণী। তাঁহার রাজত্বকালে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণ এবং বহুসংখ্যক বৈষ্ণব গ্রন্থে হুসেন সাহ নবাবের যশ ও কীর্তি বর্ণিত হইয়াছে।

মুসলমান আমলে যাঁহারা রাজস্ব ও উচ্চ সচিবের কার্যে নিযুক্ত হইতেন তাঁহারা নিজ সমাজে রাজবৎ সম্মানিত হইতেন। মহীপতি বসু প্রকৃত মুখ্য কুলীন ও সমাজপতি ছিলেন এবং তাহার উপর নবাব দরবারে মন্ত্রীপদ থাকায় এবং সুবুদ্ধি খান উপাধিলাভের সহিত সমাজে তিনি প্রকৃত রাজা বলিয়া সম্মানিত ও পূজিত হইয়াছিলেন। বর্তমান মাহীনগরের প্রায় একক্রোশ দক্ষিণে বারুইপুর গ্রামের উত্তরে 'সুবুদ্ধিপুর' নামক একটি প্রাচীন স্থান সুবুদ্ধি খাঁর নাম আজও জাগাইয়া রাখিয়াছে। এই সুবুদ্ধিপুরই তাঁহার নামানুসারে বাদসাহ দত্ত জায়গীর এবং সুবুদ্ধি খাঁ মাহীনগর হইতে মধ্যে মধ্যে তথায় গিয়া বাস করিতেন।

'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' নামক গ্রন্থের ১৭৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে যখন গৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপে লীলাখেলা করেন তখন সুবুদ্ধি খাঁ গৌড় বাদসার অধীনে নবদ্বীপের কর্মচারী ছিলেন।

মহীপতি বসু যে ইতিহাস প্রসিদ্ধ সুবুদ্ধি খাঁ ছিলেন সে বিষয় আমরা বহু প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে প্রমাণ পাইতেছি। বৈষ্ণব গ্রন্থে, কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনাতে, চরিতামৃতে, এবং পুরাতন ও আধুনিক অনেক পুস্তকেই আমরা এ বিষয়ে ঐক্য দেখিতে পাই।

কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্র মহাশয় তাঁহার 'পুরন্দর খাঁ' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, "ঈশানের পিতা অর্থাৎ পুরন্দরের পিতামহ মহীপতি "সুবুদ্ধি খাঁ" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে খোজা এবং হাবসীকে দমন করিয়া যে আলাউদ্দিন হোসেন সা বঙ্গদেশের রাজ্যাসন অধিকার করেন তিনি বাল্য জীবনে সুবুদ্ধি খাঁর ভৃত্য ছিলেন। ইহাতেই বোধ হয় মহীপতি নবাব সরকারে প্রথম প্রতিপত্তি লাভ করেন।" (পুরন্দর খাঁ, পৃ ৯)।

Hussen had been in early life the servant of a Kayastha officer of the state named Subudhi Khan. He entertained great respect for the Hindus, two of whom Rup and Sanatan had high offices under him.

—Haraprasad Sastri's 'History of India.'

"পিশাচ প্রকৃতি মজাফরের প্রধান মন্ত্রী সৈয়দ হুসেন সাহ মুসলমান ও হিন্দুজমিদারগণের সহিত মিলিত হইয়া ১৪৯৭ অব্দে মজাফরের কলুষময় জীবনের অবসান করতঃ বঙ্গ সিংহাসন অধিকার করেন। হুসেন সাহ নবদ্বীপের নষ্ট-মন্দির ও ভগ্নদেউল প্রভৃতির পুনঃ সংস্কার করিবার অনুমতি প্রদান করেন। এই হুসেন সাহ পূর্ব্বে সুবুদ্ধি খাঁ নামক এক ধনাঢ্য কায়স্থের বাটীতে ভৃত্যের কার্য্য করিতেন। কোন সময় সুবুদ্ধি খাঁ তাঁহাকে পুষ্করিণী খনন কার্য্যের পরিদর্শক নিযুক্ত করেন কিন্তু হুসেন সাহ তাঁহার প্রভুর নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে সবিশেষ মনোযোগী না হওয়ায় সুবুদ্ধি বেত্রাঘাতে তাঁহাকে জর্জ্জরিত করেন। হুসেন নীরবে বেত্রাঘাত সহ্য করেন এবং পূর্ববৎ প্রভুর কার্য্য করিতে থাকেন, এ কারণ সুবুদ্ধির অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হইয়া উঠেন। সুবুদ্ধির চেষ্টায় হুসেন রাজ সরকারে

প্রথমে একটী সামান্য কর্ম্মে নিযুক্ত হন। উত্তরকালে স্বীয় সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভাবে রাজসিংহাসন পর্য্যন্ত লাভ করেন।"

—নদীয়া কাহিনী, শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত 'মধ্যযুগে বাঙ্গলা' নামক গ্রন্থের মধ্যে দেখা যায়—

"কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন—

পূর্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিলা গৌড় অধিকারী।
সৈয়দ হোসেন করে তাহার চাকরী॥
দীঘি খোদাইতে তাঁরে মনসীর করিল।
ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল॥
পাছে যবে হোসেন সা গৌড়ে রাজা হইলা।
সুবুদ্ধি রায়েরে তাঁহে বহু বাড়াইলা॥
তাঁর স্ত্রী তাঁর অঙ্গে দেখে মারণের চিহ্নে।
সুবুদ্ধি রায়েরে মারিতে কহে রাজা স্থানে॥
রাজা কহে আমার পোষ্টা রায় হয় পিতা।
তাহারে মারিব আমি ভাল নহে কথা॥
স্ত্রী কহে জাতি লহ প্রাণে না মারিবে।
রাজা কহে জাতি লৈলে ইহোঁ নাহি জীবে॥
স্ত্রী মারিতে চাহে রাজা সঙ্কটে পড়িলা।
করোনার পাণি তাঁর মুখে দেয়াইলা॥
তবে তো সুবুদ্ধি রায় সেই ছিদ্র পাঞা।
বারাণসী আইল সব বিষয় ছাড়িয়া॥"

চরিতামৃত, মধ্য খণ্ড। কবি এখানে যাহা বর্ণনা দিয়াছেন তাহা কবির কল্পনা বলিয়া মনে হয়। হোসেন সাহার মত সুবিজ্ঞ নরপতি যে বিনাদোষে স্ত্রীর কথায় 'পোষ্টা পিতার' তুল্য মাননীয় ব্যক্তিকে এরূপ লাঞ্ছনা করিবেন ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। অন্য কোন গ্রন্থে বা কাহিনীতেই সুবুদ্ধি খাঁর উপর যবন দোষের কোন স্পর্শের নিদর্শন এযাবৎ পাওয়া যায় নাই। অধিকন্তু এই মহীপতি বসুর পৌত্র মহাত্মা পুরন্দর খাঁ বা গোপীনাথ বসু মহাশয় পরে হোসেন সাহর প্রধান উজিরের পদপ্রাপ্ত হন। প্রিয় উজিরের পিতামহের

উপর এইরূপ আচরণ সম্ভবপর নয়। দুই একটি প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায় ঐ সময় সুবুদ্ধি রায় বলিয়া আর একটি প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। কিন্তু এ ঘটনার বিষয় সঠিক বলা অসম্ভব।

মহীপতি বসু বা সুবুদ্ধি খাঁর দশ পুত্র হয়—

১ম পুত্র —সুরেশ্বর	প্রধান মুখ্য কুলীন
২য় পুত্র—গঙ্গাধর	কুলহীন
৩য় পুত্র—বিষ্ণু	বাড়ি সহজ মুখ্য
৪র্থ পুত্র—শ্রীমন্ত বা ঈশান খাঁ	"
৫ম পুত্র —দাশরথী বা দাসো	"
৬ষ্ঠ পুত্র —সর্বেশ্বর	বাড়ি কনিষ্ঠ কুলীন
৭ম পুত্র—বিশ্বেশ্বর বা বিঘ্নেশ্বর	বাড়ি তেয়জ
৮ম পুত্র—গদাধর	"
৯ম পুত্র—ভাগীরথ বা শ্রীপতি	"
১০ম পুত্র—পরমেশ্বর বা রামেশ্বর	"

মহীপতি বসুর দশ পুত্রের মধ্যে চতুর্থ পুত্র শ্রীমন্ত বসু বিদ্যা বুদ্ধি এবং বিচক্ষণ-তায় সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়া পিতৃমর্যাদা প্রাপ্ত হন। গৌড়েশ্বর মুসলমান নবাব দরবারে পিতার পর মন্ত্রীপদ প্রাপ্ত হন এবং রাজ দরবার হইতে ঈশান খাঁ উপাধি এবং জায়গীর লাভ করেন। তিনি কুলমর্যাদা সম্যক পালন করিয়া সমাজে উচ্চ আসন লাভ করিয়া সমাজপতি এবং গোষ্ঠীপতি হন।

স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের একখানি গ্রন্থে (৮ই বৈশাখ ১২৬১) গোষ্ঠীপতি কারিকা নামক পরিচ্ছেদে লিখিত আছে—

> দ্বাদশ পর্য্যায়ে দানে আদি গোষ্ঠীপতি।
> সুবুদ্ধি খান সুত শ্রীমন্ত রায় কৃতী॥

'শব্দকল্পদ্রুম' গ্রন্থে আমরা পাই—

অথ কায়স্থ গোষ্ঠীপতি গণনা—আদৌ দ্বাদশ পর্য্যায়ে সমভবদ্দানেন গোষ্ঠীপতিঃ সংকীর্ত্তিশ্চ সুবুদ্ধি খান তনয়ঃ শ্রীমন্ত রায়ঃ কৃতী॥

শ্রীমন্ত আন্দুলের সিংহ বংশের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

শ্রীমন্ত রায় বিশেষ দাতা এবং দয়াবান লোক ছিলেন। বঙ্গদেশে কায়স্থদিগের মধ্যে তিনি প্রথম সকল কুলীন এবং মৌলিকগণকে একযাই করিয়া প্রথম গোষ্ঠীপতি বা সমাজপতি হন। তাঁহার মহৎ নাম এখনও আমরা অনেক প্রাচীন কুলগ্রন্থে প্রাপ্ত হই।

শ্রীমন্ত বসু বা ঈশান খাঁর তিন পুত্র হয় গোবিন্দ গোপীনাথ এবং বল্লভ।

জ্যেষ্ঠ গোবিন্দ পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসাবে সহজ মুখ্য কুলীন হন এবং গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে গন্ধর্ব খান উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি নবাব বাহাদুরের নিকট হইতে যে জায়গীর প্রাপ্ত হন তাহা এখনও মাহীনগরের দেড় মাইল পূর্বদিকে গোবিন্দপুর নামক গ্রাম বর্তমান থাকিয়া তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। তিনি ১৩ পর্যায় সর্বানন্দ ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করিয়া কুলকার্য করেন এবং নিজ বংশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

শ্রীমন্ত বসুর দ্বিতীয় পুত্র মহারাজ গোপীনাথ বসু বা পুরন্দর খাঁ। তাঁহার অমূল্য জীবনীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পর অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করিলাম।

শ্রীমন্ত বসুর কনিষ্ঠ পুত্র বল্লভ। অনেক প্রাচীন কুলগ্রন্থে বল্লভকে বলভদ্র বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছে। বল্লভ ১৩ পর্যায়ে বাড়ি সহজ মুখ্য কুলীন হন। বল্লভ রাজদরবারে উচ্চ রাজকর্মচারীর কার্য করিতেন এবং সুন্দরবর খাঁ উপাধি লাভ করেন।

বল্লভ বসু বা সুন্দরবর খাঁ সম্বন্ধে ঘটক সার্বভৌম ৺নন্দরাম মিত্র কৃত দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলপরিচয়ে আছে—

প্রকৃত্যার্থে সুন্দরবর খাঁ সহজে হৈল ডাক।
লক্ষ্মীপতি মিত্র পার্শ্বে কমল হৈল পাক॥

সুন্দরবর খাঁর কন্যার সহিত ছোট কুবের সুত ১৩শ পর্যায় ভুক্ত কোমল মুখ্য কুলীন লক্ষ্মীপতি মিত্রের পরিণয় হয়। এই লক্ষ্মীপতি মিত্রেরই বংশধর ২৪ পরগণার অন্তর্গত সুঁড়া গ্রামের বিখ্যাত মিত্র বংশের রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

মুসলমান বাদসাগণ উচ্চ রাজকর্মচারীদিগকে এবং বড বড় জমিদার ও গুণী ও মানী মহাপুরুষগণকে এখনকার ইংরাজ রাজত্বকালের ন্যায় উপাধি বা খেতাব দিয়া সম্মানিত করিতেন। উক্ত উপাধিদানের সহিত মুসলমান নবাবগণ

'জায়গীর' বা জমি দিতেন যাহার জন্য কোন খাজনা দিতে হইত না। উক্ত জায়গীরদার বা জমিদারগণের উপর তাঁহাদের জায়গীর বা জমিদারির মধ্যে আভ্যন্তরিক সকল প্রকার শাসনকার্যের ভার থাকিত। জায়গীরদারগণকে সৈন্য রাখিতে হইত এবং যুদ্ধবিগ্রহাদি উপস্থিত হইলে নবাব সরকারকে সাহায্য করিতে হইত। খাঁ উপাধি এখনকার ব্রিটিশ সম্রাটের প্রদত্ত 'রাজা' মহারাজা' ও 'স্যার' উপাধির মত ছিল। ব্রিটিশ রাজ কোন খেতাবের সহিত কোন জায়গীর দেন না কিন্তু মুসলমান সম্রাট ও নবাবগণ উপাধি বা খেতাবের সহিত জায়গীর দিতেন।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ৺নগেন্দ্রবাবু 'পুরন্দর খাঁ ও মাহীনগর সমাজ' নামক একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—

"মহীপতির চতুর্থ পুত্র ঈশান খাঁ বিদ্যা বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি গৌড়ের দরবারে পিতৃপদ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র গোবিন্দ গোপীনাথ ও বল্লভ। গৌড়ের সুলতানের নিকট গোবিন্দ গন্ধর্ব্ব খাঁ, গোপীনাথ পুরন্দর খাঁ, এবং বল্লভ সুন্দরবর খাঁ উপাধি লাভ করেন। মুসলমান আমলে উচ্চ উপাধি দানের সহিত কিছু কিছু জায়গীর দেওয়া হইত। গোবিন্দ বসু যে জায়গীর পান তাহা মাহীনগরের পূর্ব্বে গোবিন্দপুর নামে পরিচিত। পুরন্দর খাঁর জায়গীর 'পুরন্দরপুর' মাহীনগর হইতে দুই মাইল পশ্চিম উত্তর কোণে অবস্থিত। বল্লভ বা বুড়া মল্লিকের জায়গীর অধুনা ই, বি, রেলওয়ের দক্ষিণ শাখায় অবস্থিত প্রসিদ্ধ মল্লিকপুর ষ্টেশন।"

—কায়স্থ পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫, পৃ ৪৩।

উক্ত প্রবন্ধে নগেন্দ্রবাবু বল্লভ বসুকে "বুড়া মল্লিক" নামে অভিহিত করিতেছেন এবং "মল্লিকপুর" উক্ত বল্লভ বসুর জায়গীরের নামে হইয়াছে বলিতেছেন কিন্তু বল্লভ বসুর মল্লিক উপাধি প্রাপ্তির বিষয় অন্য কোথায়ও পাওয়া যায় নাই। অনেক প্রাচীন কুলগ্রন্থ হইতে আমরা দেখিতে পাই দশরথ বসু হইতে ২১শ পর্যায়ের বংশধর রামবল্লভ বসুই নবাব দরবার হইতে মল্লিক উপাধি পান এবং তিনিই বুড়া মল্লিক নামে খ্যাত ছিলেন। রামবল্লভ মল্লিকের সকল বংশধর এখনও মল্লিক উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন।

বাচস্পতির দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলসর্বস্বে পুরন্দরের নবকুলপ্রথার বিবরণ মধ্যে লিখিত আছে—

প্রকৃত সাম্যে সুন্দরবর খাঁ যত করিলা ডাক।
লক্ষ্মীপতি মিত্র স্পর্শে হইল কোমল মুখ্যের পাক॥
আছিল দেবরাজ ঘোষ ত্রিবিধ কুলমেলি।
বুড়া মল্লিক করিয়া সর্ব্বশেষে খাইলা গালি॥
প্রকৃত কুলে গণপতি ঘোষ আদি বাখানি।
শ্রীমান বসু পরাশর মিত্র সহজাগ্র গণি॥

ষষ্ঠ অধ্যায়

মহারাজ গোপীনাথ বসু

গৌড়াধিপতি পুরন্দর খাঁ নবরঙ্গী

বঙ্গের কায়স্থ কুলতিলক ধর্মপ্রাণ ও সমাজ সংস্কারক সুবিখ্যাত মহারাজ গোপীনাথ বসু একজন অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী মহাপুরুষ ছিলেন। গোপীনাথ দশরথ বসু হইতে ১২ পর্যায়ের শ্রীমন্ত বসু বা ঈশান খাঁর দ্বিতীয় পুত্র।

বাল্যকাল হইতেই গোপীনাথ মেধাবী ও তেজস্বী বালক ছিলেন। এবং বিজ্ঞ পণ্ডিতগণের নিকট হইতে সংস্কৃত সাহিত্য এবং হিন্দু ধর্মগ্রন্থাদি ভালভাবেই অধ্যয়ন করেন এবং মৌলবীর নিকট হইতে পারস্য ও আরবী ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। অধ্যবসায়শীল বালক গোপীনাথ অল্প বয়স হইতে হিন্দু ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করিয়া এবং সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় বিশেষরূপে শিক্ষিত হওয়ায় ভাগ্যলক্ষ্মী প্রখরবুদ্ধিসম্পন্ন গোপীনাথকে ভবিষ্যৎ জীবনে সর্ববিষয়ে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার পিতা ও পিতামহ প্রভৃতি অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি এবং বঙ্গেশ্বরের রাজদরবারে মন্ত্রীর পদে থাকায় গোপীনাথের প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্বাধীন নরপতিদিগের ন্যায় ছিল।

গোপীনাথ বসুর আবির্ভাবকালের বৎসর ঠিক করিয়া এখনও আবিষ্কৃত করা যায় নাই। তবে তিনি যে খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে মনে হয় যে ১৪৫০ হইতে ১৫২০ খৃষ্টাব্দ তাঁহার অভ্যুদয়ের সময়। ১৪০২ শকে বা ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি কুলীনগণকে একজাই বা সমীকরণ করিয়া গোষ্ঠীপতি হন এবং ৮৯২ হিজরী সনে বা ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান জেলায় রায়না নামক স্থানে গিয়া দরবার করেন। পুরন্দর খাঁ এবং তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা কবি মালাধর বসু বা গুণরাজ খাঁ এক সময়ে বর্তমান ছিলেন। উক্ত মালাধর বসু ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' গ্রন্থ রচনা করেন। গৌড়েশ্বর নবাব হুসেন সাহের

রাজদরবারে গোপীনাথ প্রধানমন্ত্রীর কার্য করিতেন এবং মহাপ্রভু চৈতন্যদেবও গোপীনাথের বর্তমানকালে লীলাখেলা করেন। তাঁহার সময়ে দেবীবর ঘটক এবং যোগেশ্বর পণ্ডিত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের মেলবদ্ধ করেন। যাহা হউক গোপীনাথের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ ও বৎসর নির্ণয় করিবার কোন সঠিক উপায় না থাকিলেও খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ যে তাঁহার আবির্ভাবের সময় তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে এবং তিনি যে দীর্ঘজীবী ছিলেন তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সমগ্র ভারতবর্ষে এক নূতন যুগের সৃষ্টি হয়। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব সেই সময় বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিয়া এবং তাঁহার ভক্তগণ সুমধুর প্রেমভক্তিময় কৃষ্ণলীলার নানারূপ রচনা প্রকাশ করিয়া সমগ্র বঙ্গদেশে আনন্দধারা প্রবাহ করান এবং চৈতন্যদেবের সহাধ্যায়ী স্মার্তযুগমণি রঘুনন্দন নূতন শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ করেন। গৌড়েশ্বর হুসেন সাহ মুসলমান ধর্মবলম্বী হইলেও হিন্দুগণকে বিশেষ ভালবাসিতেন এবং তাঁহার সাহায্যে সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনাদির নানারূপ গবেষণা হয় এবং সেই সময় অনেক অমূল্য গ্রন্থাদি প্রকাশ হয়। সেই সময় ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে গুরু নানক ইরাবতী নদীতীরে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বধর্ম প্রচার করেন। এই সময় গোপীনাথ বসুর বংশের দশরথ বসু হইতে ১৫ পর্য্যায় রাজা পরমানন্দ বসু চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইয়া নিজ বাহুবলে সমগ্র পুর্ববঙ্গের অধিপতি হইয়াছিলেন।

গোপীনাথের জন্মস্থান এবং কর্মক্ষেত্র লইয়া মতভেদ দেখা যায়। কায়স্থ কুল রক্ষিণী সভা হইতে প্রকাশিত কায়স্থ কারিকায় দেখা যায়—"বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপাল ও চণ্ডীতলা থানার অধীনস্থ সেয়াখালা গ্রাম পুরন্দরের জন্মভূমি ও আবাসভূমি ছিল। তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে অনেকেই সেয়াখালা গ্রাম ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে বসতি করিয়া আছেন। কিন্তু এখনও সেখানে কেহ কেহ বাস করিতেছেন এবং তথায় তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন আছে।"

স্বর্গীয় মহাত্মা সারদাচরণ মিত্র মহাশয় তাঁহার 'পুরন্দর খাঁ' নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—"এই সময়ে পুরন্দর খাঁ হোসেন সাহের একজন প্রধান মন্ত্রী এবং রূপ ও সনাতন প্রধান কর্মচারী ছিলেন। পুরন্দর দক্ষিণ রাঢ়ীয় বংশোদ্ভব ও মাহীনগর সমাজের বসুবংশের সমুজ্জ্বল রত্ন। বর্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত চণ্ডীতলা থানার অধীন কৌশিকী নদী সনাথ সেয়াখালা গ্রাম পুরন্দরের

জন্মস্থান। এক্ষণে কৌশিকীর অস্তিত্বের চিহ্নমাত্র আছে। কালস্রোতে কৌশিকীর স্রোত বিপুল হওয়ায় এক্ষণে উহার গর্ত অস্বাস্থ্যের কারণ হইয়াছে।

"জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত সদর ডিভিসানের মধ্যে মাহীনগর নামে একটী গ্রাম আছে; সম্ভবতঃ "মাহীনগর সমাজ" নাম করণের কারণ ঐ গ্রাম। উহা ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে ছিল কিন্তু এক্ষণে "বসুর গঙ্গা", "ঘোষের গঙ্গা" প্রভৃতি পুষ্করিণী সমূহ ভাগীরথীর স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। ভাগীরথীর অন্য চিহ্ন নাই। যে নদীপথ দ্বারা কবিকঙ্কণ চণ্ডীর শ্রীমন্ত সওদাগর পোতে গমন করিয়া মগরায় মহা ঝড় ও বৃষ্টিতে পড়িয়াছিলেন এবং অবশেষে সমুদ্র পথ দ্বারা সিংহলে গিয়াছিলেন, সে নদীর এক্ষণে চিহ্নমাত্র নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান ভাগীরথী কালীঘাট উত্তীর্ণ হইয়া অনতিদূরে টালির নালায় বিলুপ্ত হইয়াছে। সরস্বতী ও রূপনারায়ণের খাঁড়ী এক্ষণে ভাগীরথীর পরিদৃশ্যমান মুখ এবং তাহা ইংরাজ বাহাদুর কর্ত্তৃক হুগলী নামে অভিহিত হইয়াছে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা ভাগীরথীর মুখ নহে। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে খিদিরপুর হইতে সাঁখলাল পর্যন্ত নদীর চিহ্ন মাত্র ছিল না। ভাগীরথীর সহিত সরস্বতীর যোগ প্রথমতঃ একটি খাল কাটিয়া সম্পাদিত হয়। জল প্রবাহে ঐ খাল ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে 'কাটিগঙ্গা' হইয়াছে। 'কাটিগঙ্গা' এক্ষণে হুগলীর একাংশ। কথিত আছে যে মাহীনগরে পুরন্দরের বাস ছিল। তথায় এখনও তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন বর্ত্তমান আছে। কিন্তু কোন সময়ে কি জন্য তিনি কিম্বা তাঁহার কোন পূর্ব্বপুরুষ মাহীনগর ত্যাগ করেন এবং সেয়াখালায় বাস করেন তাহা নির্দ্দেশ করা যায় না।"

—পুরন্দর খাঁ, পৃ ৮।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ৺নগেন্দ্রবাবুর মতে মাহীনগরই পুরন্দর খাঁ মহাশয়ের জন্মস্থান ও কর্মস্থান—

"জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুর থানার মধ্যে মল্লিকপুর রেল-ষ্টেসনের অনতিদূরে মাহীনগর গ্রাম অবস্থিত। এই মাহীনগরে পুরন্দর খাঁর প্রতিষ্ঠিত একশত বিঘা একটী পুষ্করিণী আছে, উহা 'খাঁ পুকুর' নামে পরিচিত। পুষ্করিণী খননার্থ সহস্র সহস্র খনক যে স্থানে কোদাল রাখিত, আজিও সেই স্থান কোদালিয়া গ্রামে পর্য্যবসিত। মাহীনগরের যে অংশে পুরন্দর খাঁর বাস ছিল তাহাই তাঁহার আত্মীয় কুটুম্বে পরিবৃত পুরন্দরপুর নামে প্রখ্যাত হয়, সেইরূপে

তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোবিন্দ গন্ধর্ব্ব খাঁর নামানুসারে মাহীনগরের অদূরে গোবিন্দপুর এবং কনিষ্ঠ সুন্দরবর খাঁ মল্লিকের নামে মল্লিকপুর গ্রাম সৃষ্ট হইয়াছে। ঐ গ্রামগুলি আজিও বর্ত্তমান থাকিয়া পূর্ব্ব সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। গঙ্গাতীরবর্ত্তী মাহীনগরে পুরন্দর খাঁ যে ভ্রাতৃগণ সহ বাস করিতেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।"

—দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ড, পৃ ১০১।

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতিরত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—

"হোসেন শাহার সময়ে বাঙ্গালী হিন্দুই সকল কার্য্যে ছিলেন। হুগলী জেলার দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ গোপীনাথ বসু উজির ছিলেন—তাঁহার উপাধি ছিল পুরন্দর খাঁ। সেয়াখালায় তাঁহার নিবাস ছিল। এখনও পুরন্দর গড়ের ধ্বংসাবশেষ আছে। ঐ পুরন্দর খাঁর দুই ভাই গোবিন্দ ও প্রাণবল্লভও উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের যথাক্রমে উপাধি ছিল "গন্ধর্ব্ব খাঁ ও সুন্দরবর খাঁ।" মালদহের মাধাইপুরের ব্রাহ্মণ বংশীয় দুই ভ্রাতা রূপ ও সনাতন রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। হোসেন সাহের সেনাপতির নাম গৌর মল্লিক।

—পুরাতন কথা, বঙ্গবাণী, পৌষ ১৩৪১।

"সেযাখালা একটী প্রাচীন গ্রাম কৌশিকী নদী তীরে অবস্থিত। এখন এই নদীর চিহ্ন মাত্র নাই। পূর্ব্বে এখানে অনেক ধনবান লোক ছিলেন। দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ পুরন্দর খাঁর বাস। বাঙ্গলার নবাব হোসেন সাহা সেয়াখালা নিবাসী দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ গোপীনাথ বসুকে উজির করেন এবং তাহাকে পুরন্দর খাঁ উপাধি দেন। ইহার দুই ভ্রাতা গোবিন্দ ও প্রাণবল্লভ ঐ নবাবের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং তাহাদিগকে যথাক্রমে 'গন্ধর্ব্ব খাঁ এবং সুন্দরবর খাঁ' উপাধি দেন। সেয়াখালায় সেন এবং পুরন্দর খাঁর গড়ের ভগ্নাংশ আছে।

"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে রামচন্দ্র খানের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবকে ছত্রভোগ হইতে নৌকা যোগে বঙ্গ-সীমানা অতিক্রম করিয়া উড়িষ্যা-সীমানা দেখাইয়াছেন। ঐ রামচন্দ্রের গ্রাম ভদ্রকালীতে। ইনি সেয়াখালার পুরন্দর খাঁর (গোপীনাথ বসুর) গৃহে বিবাহ করেন।"

—হুগলী জেলার ইতিহাস, মাসিক বসুমতী, চৈত্র ১৩৪৩।

আকনা সমাজের পুঁথিতে (পৃ ৬) দৃষ্ট হয়—"কো মু যুধিষ্ঠির ঘোষ বাড়ি সমু পুরন্দর খা বসু আগছে ইনি কিন্তু কুল সৃষ্টি কর্ত্তা সাং সেয়াখালা বন্দীপুর স মু ঈশান খাঁর ২য় সুত।" ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে পুরন্দর খাঁ তাঁহার এক কন্যার বিবাহ হুগলী জেলাস্থ সেয়াখালা বন্দীপুর হইতে দিয়াছিলেন।

যাহা হউক প্রাচীন গ্রন্থাদি আলোচনা করিলে মনে হয় মাহীনগরই পুরন্দর খাঁর জন্মস্থান ও কর্মক্ষেত্র ছিল। এবং হুগলী জেলার মধ্যে সেয়াখালা গ্রামে তাঁহার একটি বড় জমিদারী ছিল এবং তিনি নিজ জমিদারী পর্যবেক্ষণ এবং রাজকার্য উপলক্ষে সেয়াখালা নামক স্থানে মধ্যে মধ্যে আসিয়া বসবাস করিতেন। উক্ত সেয়াখালা গ্রামের অদূরে অনেক গ্রামে তাঁহার অনেক বংশধর এখনও বসবাস করিতেছেন। এই পটলডাঙ্গা বসুমল্লিক বংশ, পুরন্দর খাঁর বংশধর ২৪ পর্যায়ের রামকুমার বসুমল্লিক মহাশয় হুগলী জেলাস্থ সেয়াখালা গ্রামের অদূরবর্ত্তী কাঠাগোড় নামক গ্রামে বাস করিতেন এবং তথা হইতে প্রথমে কলিকাতা আসিয়া বসবাস করেন। সেয়াখালার অতি সন্নিকটে "পুরন্দর খাঁর" নামে একটী প্রাচীন গড়ের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান থাকিয়া সেই মহাপুরুষের স্মৃতিরক্ষা করিতেছে।

গোপীনাথ বসু মাহীনগরে অনেক বড় বড় অট্টালিকা, বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় এবং বহু ফলপুষ্পাদি বিভূষিত উদ্যান প্রস্তুত করান এবং মাহীনগরের পার্শ্ববর্ত্তী মালঞ্চ নামক গ্রামে যে একটি সুন্দর উদ্যান ও নাটমন্দির প্রস্তুত করেন তাহার উল্লেখও অনেক প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। পণ্ডিতবর সার্বভৌম মহাশয় তাঁহার রচিত কুলগ্রন্থে মাহীনগরের শোভা দেখিয়া তাহাকে 'অমরাপুরী' বলিয়াছিলেন।

"গঙ্গাতীরে দক্ষিণ রাঢ়ী কুলীন সারি সারি।
বিধাতা-নির্ম্মিত যেন অমরা-নগরী।"

এখন কালস্রোতে সেই অমরা-নগরী গুল্মলতাসমাকীর্ণ একটি ক্ষুদ্রগ্রামে পরিণত হইয়াছে।

গোপীনাথ অত্যন্ত মেধাবী, উদারচেতা, দূরদর্শী ও বিচক্ষণ মহাপুরুষ ছিলেন এবং তাঁহার রাজনীতি জ্ঞান এবং অধ্যবসায় অসীম ছিল। তৎকালীন বাঙ্গলার সুলতান গৌড়েশ্বর গোপীনাথের অশেষ গুণগরিমায় ও বুদ্ধি বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বা সচিবের পদ দেন। গোপীনাথ সেই সময়ে একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতি-বিশারদ এবং পরাক্রমশালী যোদ্ধা ছিলেন।

তিনি প্রথমে রাজদরবারে প্রধান রাজস্ব-সচিব Finance Minister ও নৌ-সেনাপতি Naval Commander পদে নিযুক্ত হন, পরে সর্বপ্রধান মন্ত্রীর পদ পান।

গোপীনাথ সুলতানের নিকট হইতে প্রভূত জায়গীর এবং পুরন্দর খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। উক্ত সুলতান প্রদত্ত খেতাব পুরন্দর খাঁ প্রাপ্ত হইবার পর হইতে গোপীনাথ বসু "পুরন্দর খাঁ" নামেই প্রথিত যশস্বী হইয়া এই নামেই দেশবিখ্যাত হন। এমনকি প্রাচীন কুলগ্রন্থাদি গোপীনাথকে পুরন্দর খাঁ নামেই অভিহিত করিয়া গিয়াছে।

বঙ্গরাজ্য অধিকার করিবার পরে বঙ্গেশ্বর সুলতানগণ বঙ্গবাসী হইয়াই বাস করিতেন এবং রাজকার্যাদির সকল বিভাগেই মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুরা অধিকতর পারদর্শিতা দেখাইয়া থাকায় তাহারাই উচ্চ রাজকার্যে অধিক নিযুক্ত হইত। মহামতি সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন সাহ সমস্ত বাঙ্গলাদেশ হিন্দুদের সাহায্যে জয় করিয়া সুশাসনের প্রতিষ্ঠা করেন এবং দীর্ঘজীবী হইয়া বঙ্গে রাজত্ব করেন।

সুলতানের প্রধান সচিবত্বে পুরন্দরের নিজের এবং আত্মীয় কুটুম্বদিগের ঐশ্বর্য ও গৌরব অশেষ বৃদ্ধি হয় এবং রাজস্ব ও নৌ-বিভাগ পুরন্দরের করায়ত্ত থাকায় পুরন্দর বঙ্গদেশের সর্বময় কর্তা হইয়াছিলেন। গোপীনাথের পিতামহ মহীপতি বা সুবুদ্ধি খাঁ এবং পিতা ঈশান খাঁর সময় হইতে রাজদরবারে পুরুষানুক্রমে মন্ত্রিত্ব করায় তাঁহার বংশের প্রভাব প্রতিপত্তি ও সমাজে মানসম্ভ্রম অতুলনীয় হয় এবং তিনি সর্ববিষয়ে গুণান্বিত থাকায় সকল বঙ্গবাসীর বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হন। মুসলমান নবাবেরা জমিদার ও জায়গীরদারদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া এবং যুদ্ধকালে সৈন্য ও অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। আভ্যন্তরিক সকল শাসনকার্যের ভার জমিদারগণের উপর থাকিত। তাঁহাদিগকে আত্মরক্ষণোপযোগী সৈন্য সামন্ত রাখিতে হইত এবং প্রজাগণের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ ভঞ্জনার্থ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের কার্য করিবার জন্য বিচারালয়ের সুব্যবস্থা করিতে হইত। তখনকার রাজা মহারাজা বা জমিদারগণ এখানকার ন্যায় জমির খাজনা সংগ্রহ করিয়া ও লাটের খাজনা দিয়াই কেবলমাত্র নামে রাজা বা জমিদার ছিলেন না। জমিদারই প্রকৃত তাহার জমিদারীর ভূস্বামী স্বরূপ সর্বেসর্বা হইয়া থাকিত। পরস্পর সন্ধিবিগ্রহ করিতেন এবং সময় সময় সুলতানের বিরুদ্ধে

সৈন্য সামন্ত লইয়া যুদ্ধ করিয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেন। 'বারভূঞার' ইতিহাসে এখনও ইহার প্রমাণ দিতেছে।

প্রবাদ আছে গোপীনাথ প্রথম জীবনে বঙ্গেশ্বরের অধীনে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন এবং পরে নিজ বীরত্বে নবাবকে মুগ্ধ করিয়া নবাব সরকারের সৈন্যগণের একজন কমেণ্ডার (Commandar) হন এবং সেই সময়ে পুরন্দর নামক স্থানে বঙ্গেশ্বরের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হন এবং উক্ত যুদ্ধজয়ের ফলে পুরন্দর খাঁ উপাধি গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। বীরভূম জেলায় 'পুরন্দরপুর' নামক স্থান এই বীরের নাম এখনও সাক্ষ্য দিতেছে এবং উক্ত যুদ্ধে জয়ী হইবার পর হইতে পুরন্দর খাঁর সৌভাগ্য ও যশ অতুলনীয় হয়।

প্রাচীন কুলগ্রন্থাদিতে গোপীনাথ বসুকে 'মহারাজ চক্রবর্তী' 'নৃপতি' ও 'গৌড়াধিকারী' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ঘটক নন্দরাম মিত্রের দক্ষিণ রাঢ়ীয় কারিকায় তাঁহাকে 'মহারাজ চক্রবর্তী', রজনীকর ঘটকের দক্ষিণ রাঢ়ীয় ইতিহাসে 'গৌড়াধিকারী' এইরূপ বর্ণনা আছে। 'গৌড়ের ইতিহাস', 'কায়স্থ জাতীয় কুল পঞ্জিকা' ইত্যাদি গ্রন্থে তাঁহাকে নানারূপ সম্মানে বর্ণিত করা হইয়াছে।

১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে দুই রাজপুত সর্দার সুরসিং এবং রুদ্রসিং নবাব সরকার হইতে দলপতি ও গজপতি উপাধি এবং বর্ধমান জিলায় রায়না নামক স্থানে জায়গীর প্রাপ্ত হন। বঙ্গেশ্বরের প্রধান মন্ত্রী পুরন্দর খাঁ উভয়কে উপাধি এবং জায়গীর দিবার জন্য উক্ত রায়না নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া একটি বৃহৎ দরবার করিয়া রাজ প্রতিনিধির স্বরূপ উপাধি এবং জায়গীর দান করেন। এখন ভারত সম্রাট যেরূপ তাঁহার প্রতিনিধি ভাইসরয়কে দিয়া দরবারে উপাধি প্রদান করেন, ঠিক সেইরূপ মুসলমান আমলের নবাব সরকারের প্রথা অনুসারেই দরবার হইয়া থাকে। প্রায় তিনশত বর্ষ পূর্বে মালাধর ঘটক মহাশয় 'রায়নার দত্ত বংশ' সম্বন্ধে যে কারিকা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাতে সকল বঙ্গবাসীর নিকট পুরন্দর খাঁর অসাধারণ সম্মান ও প্রভাব সম্বন্ধে আমরা সুন্দর বিবরণ পাই—

"৮৯২ সনে মুলুক দেখিতে।
বাঙ্গলার বাদশা আইল দিল্লী হইতে॥
নবাব আইল সঙ্গে লয়ে সেনাগণ।
হস্তী ঘোড়া পদাতিক না যায় গণন॥

বোঁ বোঁ দামামা বাজে উটের উপর ডঙ্কা।
সমবেতে সুরসেন নাহি করে শঙ্কা ॥
সুরসিংহ রুদ্রসিংহ আইল যেন যমদূত।
দলপতি গজপতি ছত্রি রাজপুত ॥
সুরসিংহ রুদ্রসিংহ দলের সর্দ্দার।
বাদশা খেয়াতি দুই দিলেক উহার ॥
পূর্ব্বনাম লুপ্ত হইল কার্য্য অনুক্রমে।
দলপতি গজপতি সর্ব্বলোকে জানে।
নানা দেশে ফিরি ঘুরি আইলা রায়নাতে।
পুরন্দর খাঁ বসু আইলা বঙ্গদেশ হইতে ॥
মর্য্যাদা সাগর তুল্য সভে সবিনয়।
লেখাপড়ার কর্ত্তা হন ঈশান তনয় ॥
আর যত কায়স্থ আছে যে মুহুরী।
লেখাপড়া করে সবে বসু-আজ্ঞাকারী ॥
রায়নায় আসি সভে হইল উপস্থিত।
দিব্যস্থান দেখিয়া তবে মনে পাইলা প্রীতি ॥
বার দিয়া পুরন্দর বৈঠকে বসিল।
দুর্ব্বাফুল দিয়া ব্রাহ্মণে আশীষ কৈল ॥
ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র আসি করে নমস্কার।
মর্য্যাদা দেখিয়া ভাবে সুরসিংহ কোঁয়ার ॥
পুরন্দর খাঁ বসু যেন প্রলয় চন্দন।
যাহার পরশ হৈল কায়স্থের শোভন ॥
দুই ভাই দেখিলেন তাহার সম্মান।
দেখিয়া শুনিয়া তার উল্লসিত প্রাণ ॥
তাহা শুনি দুই ভাই বাঙ্গালা ভিতরে।
কায়স্থ হইব বলি কহিলা তাঁহারে ॥
যত টাকা লাগে দিব এইখানে।
কৃপা করি কায়স্থ করহ সর্ব্বজনে ॥
টাকার লোভে কুলীন সায় দিল তারে।
মৌলিক দিলেন সায় পুরন্দর অনুসারে ॥

ঘোষ বসু মিত্র আর মৌলিক যত।
ব্রাহ্মণ দিলেন সায় হ'য়া হরষিত॥
সমাজ ভাবিয়া না পান কোন স্থান।
ষোল সমাজ মৌলিকের স্থানেতে প্রধান॥
রায়নায় দত্ত হৈলে বলে সর্ব্বজন।
আজি হতে হৈলেন জাতি শ্রীকরণ॥
এই মতে হৈলেন রায়নার দত্ত।
ঘটক মালাধর করিল বিরচিত॥"

উক্ত রচনা হইতে দেখা যাইতেছে সেই সময়ের দিল্লীর বাদশা বহলোল লোদী বঙ্গদেশে বঙ্গেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন এবং সেই সঙ্গে দত্তবংশের পূর্বপুরুষ দুইজন রাজপুত সর্দার পশ্চিম হইতে আসিয়া বঙ্গেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হন এবং তাঁহারা দুই ভাই বঙ্গে কায়স্থের প্রভাব দেখিয়া কায়স্থ হইয়া বঙ্গদেশবাসী হন। এই বসুবংশের পুরন্দর খাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তি এত অসীম ছিল যে তাঁহার সমাজের জাতিগণের মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ করিবার ও অন্য জাতিকে সমাজে স্থান দিবার ক্ষমতা ছিল। উক্ত রাজপুত ভ্রাতৃদ্বয় ক্ষত্রিয় ছিল এবং কায়স্থও ক্ষত্রিয় থাকায় তাহারা সহজেই কায়স্থ সমাজে স্থান পাইয়া থাকিবে।

পুরন্দর খাঁ কেবল কায়স্থ সমাজের সমাজপতি ছিলেন না, তাঁহার গুণ-গরিমায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকল জাতিরই তিনি সম্মান ও ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ৺নগেন্দ্র বসু 'দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজ' পুস্তকে লিখিয়াছেন—

'সৈয়দ হোসেন আলাউদ্দীন হোসেন শাহ উপাধি গ্রহণ করিয়া গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। সামান্য ক্রীতদাস বা খোজাবংশে তাঁহার জন্ম নয়। যেমন মক্কার সরিফ রূপ উচ্চবংশে জন্ম তিনি তদনুরূপ বরাবর বংশ-মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সুশাসনে গৌড়বঙ্গে নূতন যুগ আনিয়াছিল। মহাত্মা পুরন্দর খাঁ বরাবর উচ্চপদে থাকিয়া মুসলমান সুলতান-গণের অধঃপতন লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে সুলতান হোসেনের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ কার্য্য করিতেন। এমন কি তিনি এ সময়ে প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে সর্ব্বেসর্ব্বা

হইয়া পড়িয়াছিলেন। গৌড় ও রাঢ়ের নানা স্থানে তাঁহার রাজস্ব আদায়ের সুবিধার জন্য গড় বা শাসনকেন্দ্র নির্মাণ হইয়াছিল। সে সময়ে মাহীনগরের পার্শ্ব দিয়া বেগবতী স্রোতস্বতী গঙ্গা প্রবাহিত হইত। মাহীনগর হইতে গৌড় পর্য্যন্ত পুরন্দর খাঁর নৌবাহিনী সর্বদা প্রস্তুত থাকিত। মাহীনগরে হস্তীশালা, অশ্বশালা ও সৈন্য সামন্ত বিরাজ করিত। তাঁহারই পুষ্পোদ্যান 'মালঞ্চ' নামে প্রথিত রহিয়াছে। সুলতান হোসেন শাহের সময় পুরন্দর খুব বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। পুত্রগণের উপর রাজকীয় ভার অর্পণ করিয়া নিজে কতকটা সামাজিক কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রই মুসলমান রাজ দরবারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কেশব খাঁ সুলতান হোসেন শাহের ছত্রনাজির পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে কেশব ছত্রী নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন।

গোপীনাথ সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যে তিনি একজন প্রথিতযশা সাহিত্যিক হইয়াছিলেন। তিনি একজন সুলেখক এবং সাহিত্য অনুরাগী হইয়া অনেক পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করেন। তাঁহার রচিত অনেক পুস্তক ও পদাবলী এখনও প্রচলিত আছে। বঙ্গেশ্বর নবাব বাহাদুর হোসেন শাহ পুরন্দর খাঁর রচনায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে যশরাজ খান উপাধি দেন। পুরন্দরের স্বরচিত "শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল" কাব্যে লিখিত আছে—

"নৃপতি হুসন জগত ভূষণ সোহ ও রসরাজ।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর ভনে যশরাজ খান ॥

পুরন্দর বহু যত্নে ও ব্যয়ে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থগণের ত্রয়োদশ পুরুষের পর্যায় ও বংশাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করান। তিনি বহু সংস্কৃত সাহিত্য ব্যবসায়ীদিগকে অর্থ দান দ্বারা সাহায্য করিতেন। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় শ্রীমৎ মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জনৈক পূর্বপুরুষ তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি অনেক বিদ্বান ব্রাহ্মণকে বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে আনাইয়া মাহীনগরের সন্নিকটে ভূমি দান করিয়া বসবাস করান।

পুরন্দরের সময়ে বঙ্গদেশে সাহিত্যের এক বন্যা আসে। সেই সময়ে অনেক কবি ও বড় বড় সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয় এবং বৈষ্ণব কবিগণ নানারূপ অমূল্য গ্রন্থাবলী রচনা করেন। পুরন্দরের জ্ঞাতি-ভ্রাতা মালাধর বসু তাঁহার অমূল্য কাব্যগ্রন্থ সকল সেই সময় প্রকাশ করেন এবং গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে "গুণরাজ খাঁ" উপাধি প্রাপ্ত হন।

রায় বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "বঙ্গভাষা এবং সাহিত্য" নামক পুস্তকের গৌড়ীয় যুগ নামক অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—

"কুলীন গ্রামের বসু বংশ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। গ্রামখানি দুর্গ সংরক্ষিত ছিল। এই পথের যাত্রীগণ বসু মহাশয়দিগের নিকট হইতে 'ডুরি' প্রাপ্ত না হইলে জগন্নাথ তীর্থে যাইতে পারিত না। মালাধর বসু এবং হুসেন সাহের মন্ত্রী গোপীনাথ বসু (উপাধি পুরন্দর খাঁ) এক সময়ের লোক। মালাধর বসু গোপীনাথ বসুর জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন। পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী' নামক পুস্তকের একটি পদ দৃষ্টে কেহ কেহ অনুমান করেন, গোপীনাথ বসু 'শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল' নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। ভনিতার অংশটী এইরূপ—

শ্রীযুক্ত হুসেন জগতভূষণ সোহ এ রসজান।
পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ পুরন্দর ভনে যশরাজ খান॥

প্রাচীন তাম্রফলক ইত্যাদিতে ভোগ শব্দ সচিব অর্থে ব্যবহৃত হয় কিন্তু তাহা হইলেও পুরন্দর এবং যশরাজ খান যে এক ব্যক্তি তাহা প্রমাণিত হইতেছে না; অপিচ পঞ্চ গৌড়েশ্বর ভোগ ইন্দ্র তুল্য এরূপ অর্থ করিলে 'পুরন্দর' শব্দকে আর মনুষ্য বিশেষের সংজ্ঞারূপে গণ্য না করিলেও চলে। যাহা হউক সামান্য একটা পদের সন্দেহাত্মক ভনিতার উপর নির্ভর করিয়া আমরা এ বিষয়ে কোন মত প্রকাশ করিতে পারিলাম না। মালাধর বসু আদিশূর আনীত দশরথ বসু বংশীয়। বংশাবলী নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। দশরথ বসু বংশীয় শ্রীকৃষ্ণ বসু (বল্লাল সেনের সম-সাময়িক) ২। ভবনাথ ৩। হংস ৪। মুক্তি ৫। দামোদর ৬। অনন্ত ৭। গুণাকর ৮। শ্রীপতি ৯। যজ্ঞেশ্বর ১০। ভগীরথ ১১। মালাধর বসু (গুণরাজ খাঁ)।

মালাধর বসুর উর্দ্ধতন ৫ম পুরুষ গুণাকরের জ্যেষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মণ হইতে পুরন্দর খাঁ অধস্তন পঞ্চম স্থানীয়। বসু পরিবার বৈষ্ণব ধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন। মালাধর বসুর পৌত্র বসু রামানন্দের নাম বৈষ্ণব সমাজে সুপরিচিত।

মালাধর বসু আদি বসু হইতে অধস্তন ১৪শ পুরুষ; ইহার পিতার নাম ভগীরথ বসু ও মাতা ইন্দুমতী দাসী।

মালাধর বসু গৌড়েশ্বর সামসুদ্দিন ইউসফ সাহ হইতে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সে কালের উপাধিগুলি কিছু অদ্ভুত রকমের ছিল। "পুরন্দর খাঁ", "গুণরাজ খাঁ" এই সমস্ত রাজ দত্ত খেতাব।

আমরা একখানি প্রাচীন কৃত্তিবাসী রামায়ণে কৃত্তিবাসকে "কবিত্ব-ভূষণ" উপাধি বিশিষ্ট দেখিয়াছি। এই "কবিত্ব-ভূষণ" রাজ-দত্ত উপাধি অথবা পুথি লেখকের প্রশংসাপত্র স্থির করিতে পারিলাম না; যাহা হউক 'গুণরাজ' উপাধি সেই সময় দেশে প্রচলিত ছিল, আমরা ষষ্ঠীবর কবিকেও গুণরাজ উপাধি যুক্ত পাইয়াছি।

১৩৯৫ শকে (১৪৭৩ খৃঃ) মালাধর বসু ভাগবতের বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হন; ও সাত বৎসরে দশম ও একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ সমাধা করেন। এই অনুবাদ গ্রন্থের নাম "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়"; কোন কোন প্রাচীন হস্ত লিখিত পুথিতে "গোবিন্দ বিজয়" নাম দৃষ্ট হয়।

মুসলমান সম্রাটই কুলীন গ্রামবাসী মালধর বসুকে ভাগবতের অনুবাদ রচনায় নিযুক্ত করেন, এবং উক্ত কবি ভাগবতের দশম ও একাদশ অধ্যায় সুচারুরূপে অনুবাদ করিলে তাহাকে "গুণরাজ খাঁ" উপাধি প্রদান করেন। সম্রাট হুসেন সাহের প্রশংসা সূচক অনেক কবিতা বাঙ্গলা প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের কাব্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। চৈতন্য-চরিতামৃতে উল্লেখ আছে ইনি চৈতন্যের একজন ভক্ত হইয়াছিলেন।

"সনাতন হুসেন সাহ নৃপতি তিলক"—বিজয় গুপ্ত। মালাধর বসু লিখিয়াছেন—"কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে বাস। স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস ॥"

ইনি আর এক খানি গ্রন্থ লেখেন—"লক্ষ্মী-চরিত্র।" বসু রামানন্দ কুলীন গ্রামের প্রসিদ্ধ মালাধর বসুর পৌত্র। ইনি দ্বারকা নগরী হইতে নীলাচল পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর সঙ্গে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। কথিত আছে মহাপ্রভু ইহাকে মিত্র সম্বোধন করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ রায় রামানন্দ উড়িষ্যার প্রতাপরুদ্রের একজন উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী ছিলেন। ইনি বিখ্যাত "জগন্নাথ-বল্লভ" নাটক রচনা করেন। চৈতন্যদেব ইহার দর্শনেচ্ছায় নিজে বিদ্যা নগরে গিয়াছিলেন। ইনি রসিক ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব সমাজে প্রসিদ্ধ। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দের মাঘ মাসে রায় রামানন্দের তিরোধান হয়।"

—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, গৌড়ীয় যুগ, পৃ ১৫৫।

৺কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত "মধ্যযুগে বাঙ্গলা" নামক গ্রন্থে পুরন্দর খাঁ সম্বন্ধে দেখা যায়—

"হোসেন সা সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবিগণের সমগ্র উক্তি তাঁহার সাধুতাই প্রমাণ

করিতেছে। সে কালের খ্যাতনামা অনেক হিন্দুকেই হোসেন সার অধীনে প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মে নিযুক্ত দেখিতে পাই। রাজকার্য্যে বাঙ্গালী-হিন্দুর পারদর্শিতা সম্ভবতঃ ইতঃ পূর্ব্বেই পাঠান রাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু হোসেন সার পূর্ব্বে গৌড়ের রাজসরকারে উচ্চতর বিস্তর রাজকার্য্যে হিন্দুর নিয়োগের বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। খ্যাতনামা দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ গোপীনাথ বসু হোসেন সার উজির ছিলেন। ইনি পুরন্দর খাঁ উপাধি লাভ করেন। বর্ত্তমান হুগলী জেলার সেয়াখালা গ্রাম পুরন্দর খাঁর জন্মস্থান; অদ্যাপি তথায় পুরন্দর গড় বিদ্যমান আছে। পুরন্দর খাঁর পিতামহও গৌড় সরকারে চাকুরী করিয়া সুবুদ্ধি খাঁ উপাধি পাইয়াছিলেন। পুরন্দর খাঁ দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের সংস্কার সাধন করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় গোবিন্দ ও প্রাণবল্লভ যথাক্রমে গন্ধর্ব্ব খাঁ ও সুন্দরবর খাঁ নামে প্রথিত হইয়া উচ্চতর রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব কথিত কেশব ছত্রী বাদশার বিশ্বস্ত হিন্দুর শরীররক্ষী সেনাদলের অধিনায়ক। কুলীন গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ কবি 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচয়িতা মালাধর বসু হোসেন সার নিকট গুণরাজ খাঁ উপাধি পাইয়াছিলেন। ইনিও উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।"

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ 'ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"সম্রাট হোসেন সাহ গৌড়ের ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি গৌড়ের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। ইঁহার রাজত্ব কালে বঙ্গ গৌড় নানা ঐশ্বর্য্য সম্ভারে পরিপূর্ণ ছিল। তিনি শেষ কালে পরম বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি যে শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করিতেন একথা শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য ভাগবতে লিখিত আছে। রূপ, সনাতন, পুরন্দর খাঁ প্রভৃতি সম্রাট হোসেন সাহের রাজ সভায় উপস্থিত থাকিতেন এবং মুসলমানগণের সহিত সপ্রণয় ভাবে হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। বঙ্গ সাহিত্যের তিনি পরম অনুরাগী এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণ, পরাগলী মহাভারত, ছুটিখার মহাভারতাংশ এবং নানা পদাবলীতে সম্রাট হোসেন সাহের কীর্ত্তি কথা ভূয়োভূয় বর্ণিত হইয়াছে।"

—ভারতবর্ষ, চৈত্র ১৩৪০।

কুলীনগ্রাম—মাহীনগরের মধ্যবর্তী গ্রামসমূহে বসুবংশের আকর্ষণে বহু কুলীন আসিয়া বাস করায় কুলীনগণের পরপর চারিবার একজাই বা সমীকরণ হওয়ায় উক্ত স্থান কুলীনগ্রাম নামে সুপ্রসিদ্ধ হয় এবং এখনও মাহীনগরের সন্নিকটবর্তী একটি গ্রাম কুলীনগ্রাম নামে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। বর্ধমান জেলাস্থ কুলীনগ্রাম গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। শ্রীশ্রীভগবান শ্রীমৎ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব হইতে ইহার কীর্তি বিশ্রুত আছে। এই পূত তীর্থে শ্রীশ্রীযবন হরিদাস বহুকাল সাধনা করিয়াছিলেন। ভগবৎ পার্ষদ শ্রীশ্রী বসু রামানন্দ মহাশয়ের শ্রীপাট, আদিনিবাস ও জন্মস্থান এই কুলীনগ্রামে। বাংলার আদি কাব্য প্রণেতাগণের মধ্যে অন্যতম মালাধর বসু ওরফে গুণরাজ খাঁ এই গ্রামেই বাস করিতেন এবং তথায় শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ও শ্রীলক্ষ্মী বিজয় নামক দুইখানি কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পরে তাঁহার পৌত্র রামানন্দ বসু যিনি বৈষ্ণব সমাজে বসু রামানন্দ নামে খ্যাত শ্রীমান মহাপ্রভুর একজন ভক্ত ও পার্ষদ ছিলেন। উক্ত বসু মহাশয়গণের প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহ শ্রীশ্রীমদনগোপাল দেব, শ্রীশ্রীগোপীশ্বর মহাদেব, শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব, শ্রীশ্রীরঘুনাথ ও হনুমানজী শ্রীশ্রীশিবানী দেবী ও শ্রীশ্রীযবন হরিদাস স্থাপিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের মন্দিরগুলি ধ্বংস অবস্থায় এখনও বিদ্যমান আছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাণীতে লিখিত আছে—

কুলীন গ্রামের ভাগ্য কহনে না যায়।
শূকর চরায় ডোম সেই কৃষ্ণ গুণ গায়।
কুলীন গ্রামের যে হয় কুক্কুর সেই মোর প্রিয়
অন্যজন বহুদূর।

অদ্যাবধি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আদেশ অনুসারে ৺পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসবে কুলীনগ্রাম হইতে পট্টডোরী প্রেরিত হয়। পুনঃযাত্রার সময়ে গুণ্ডিচা মন্দির হইতে পাণ্ড বিজয়ের কালে জগন্নাথের একটি পট্টডোরী ছিঁড়িয়া যায় তখন শ্রীগৌরাঙ্গ—

কুলীন গ্রামী রামানন্দ সত্য-রাজ খান্।
তারে আজ্ঞা দিলা প্রভু করিয়া সম্মান ॥
এই পট্টডোরীর তুমি হও যশমান।
প্রতিবর্ষে আনিবে ডোরী করিয়া নির্ম্মাণ ॥

এত বলি দিলা তারে ছিড়া পট্টডোরী।
ইহা দেখি করিবে ডোরী অতি দৃঢ় করি ॥
এই পট্টডোরীতে হয় শেষ অধিষ্ঠান।
দশমূর্ত্তি ধরি যিহোঁ সে যে ভগবান ॥
ভাগ্যবান সত্যরাজ বসু রামানন্দ।
সেবা আজ্ঞা পাইয়া হৈল পরম আনন্দ ॥

—মধ্যলীলা, ১৪শ অঃ।

মহাপ্রভুর আদেশে পট্টডোরী যোগাইবার ভার পাইয়া কুলীনগ্রামবাসী বসুবংশ ধন্য ও বাঙ্গালী গৌরবান্বিত।

বসুবংশের আদিপুরুষ দশরথ বসুর অনেক বংশধরের নামের সহিত 'রায়' উপাধি দেখা যায়। যেমন মহীপতি বসুর চতুর্থ পুত্র শ্রীমন্ত বা ঈশান খাঁকে অনেক প্রাচীন গ্রন্থে শ্রীমন্ত রায়, মালাধর বসুর পৌত্র উক্ত রামানন্দ বসুকে রায় রামানন্দ এবং চন্দ্রদ্বীপাধিপতি পরমানন্দ বসুকে পরমানন্দ রায় বলিয়া অনেক প্রাচীন গ্রন্থে অভিহিত করা হইয়াছে।

অনেক প্রাচীন গ্রন্থে গোপীনাথ বসুর 'মল্লিক' উপাধি ছিল বলিয়া উল্লেখ দেখা যায় এবং প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ৺নগেন্দ্রবাবু বলেন গোপীনাথ বসু মুসলমান দরবারে 'মল্লিক পুরন্দর খান' উপাধিলাভ করেন।

উক্ত রামানন্দ বসু মহাশয় বিরচিত দুইখানি গান—

বেলি অবসান কালে একা গিয়াছিলাম জলে
জলের ভিতরে শ্যামরায়,
ফুলের চূড়াটি মাথে মোহন মুরলী হাতে
পুন শ্যাম জলেতে লুকায়।
পুন জলে ঢেউ দিতে বিম্ব উঠে আচম্বিতে
বিম্বের মাঝারে শ্যামরায়।
চূড়ার টালনি বামে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীম ঠামে
জাতিকুল মজাইলাম তায়।
পুন জলে ঢেউ দিতে কোথাও না দেখি কেউ
জলে স্থির হইলে দেখি কানু।

ধরি ধরি মনে করি ধরিবারে নাহি পারি
অনুরাগে জলে ডুবেছিনু।
কর বাড়াইয়া যাই শ্যামের লাগাল নাহি পাই
কাঁদিতে কাঁদিতে আইলাম ঘরে।
হায় আমি অভাগিনী না পাইলাম শ্যামগুণমণি
সেই দুঃখে হৃদয় বিদরে।
বসু রামানন্দের বাণী শুন শুন ঠাকুরাণী
অকারণে জলে ডুবেছিলে।
বুঝিতে নারিলে মায়া জলে ছিল অঙ্গ ছায়া
শ্যাম ছিল কদম্বের মূলে।

—রামানন্দ বসু

প্রাণনাথ কি আজু হইল।
কেমনে যাইব ঘরে নিশি পোহাইল।
মৃগমদ চন্দন বেশ গেল দূর।
নয়ানের কাজল গেল সিঁথার সিন্দুর।
যতনে পরাহ মোর নিজ আভরণ।
সঙ্গে লইয়া চল মোরে বঙ্কিম লোচন।
তোমার পীত বাস আমারে দাও পরি।
উভ করি বান্ধ চূড়া আউল্যায়া কবরী।
তোমার গলের বনমালা দাও মোর গলে।
'মোর প্রিয় সখা' কৈয় সুধাইলে গোকুলে।
বসু রামানন্দ ভনে—এমন পীরিতি।
ব্যাঘ্র হরিণে যেন তোমার বসতি।

—রামানন্দ বসু

পুরন্দরের সমাজ সংস্কার

গোপীনাথ বসু গৌড়েশ্বরের প্রধানমন্ত্রীর পদ পাইয়া যে গৌরবলাভ করিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা তিনি সমাজ সংস্কার করিয়া অধিক সুপ্রসিদ্ধ

হইয়াছিলেন। তিনি কেবলমাত্র সচিবের পদে থাকিয়া রাজ্যশাসনের সুব্যবস্থা করিয়া গেলে তাঁহার নাম এত স্মরণীয় হইয়া থাকিত না। তিনি সমাজশাসনের নানারূপ নিয়মাবলী প্রবর্তন করিয়াই বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় হইয়া রাজচক্রবর্তী ও মহাপুরুষ নামে দেশবিখ্যাত হইয়া গিয়াছেন। যে সময় পুরন্দর খাঁ সম্মানের সমুচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত, সেই সময়ে তিনি দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে কুলীন ও মৌলিকগণের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষার ও আত্মীয়তা বিস্তারের জন্য বল্লালী কঠিন কুলবিধি পরিবর্তন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। মহাত্মা পুরন্দর বঙ্গদেশীয় ঘটক কারিকা গ্রন্থাদি হইতে সকল কুলবিধি সম্যক জ্ঞাত হইয়া এবং শ্রেষ্ঠ ঘটকদিগকে নিজ সভায় আমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া বল্লালসেনের কুলবিধির দোষ-গুণ সকল বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিলেন। ১৪০২ শকে বা ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে দেবীবর ঘটক রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ সমাজের সংস্কার করিয়া মেল প্রচার করেন এবং পুরন্দর রাজদরবারে থাকিয়াও ব্রাহ্মণ সমাজের গতি ও সংস্কার বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মহারাজ বল্লালসেন কুলবিধি প্রবর্তিত করিয়া সমাজ সংস্কার করেন। বল্লালসেনের পর প্রায় সাড়ে তিনশত বর্ষ পরে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পুরন্দরের আবির্ভাব হয়। ইতিমধ্যে মুসলমান বিধর্মী নবাবগণ সমগ্র বঙ্গদেশ জয় করিয়া মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপন করেন এবং বিধর্মীর শাসনে রাজনৈতিক এবং সামাজিক বহু প্রকার পরিবর্তন হয় এবং বিধর্মীর শাসনে হিন্দু সমাজে বহু পরিবর্তন ও বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায় ধর্মপ্রাণ হিন্দুগণ বিব্রত হইয়া উঠে।

পুরন্দর খাঁ দেখিলেন যে মহারাজ বল্লালসেনের প্রবর্তিত বল্লালী প্রথায় সমাজকে অতীব সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বিভাগ করিয়া রাখিয়াছে এবং এই প্রথায় সমাজশক্তি লোপ হইবে এবং সমাজ ধ্বংসের দিকে চলিবে। সেই সময়ে বল্লালী নিয়মসমূহের কঠোরতা সত্ত্বেও সচরাচর কৌলীন্য' প্রথার নিয়ম ভঙ্গ হইতেছে এবং বল্লালী নিয়মের কঠোরতা ভঙ্গ করিয়া না দিলে পশ্চিম বাঙ্গলায় অনেক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে এবং সামাজিক উন্নতির স্রোত প্রতিরুদ্ধ হইবে। কঠিন বল্লালী কুলবিধিতে এবং মুসলমান রাষ্ট্রবিপ্লবে অনেক কুলীন ও মৌলিকের বংশ নষ্ট ও বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে।

একজাই :—পুরন্দর খাঁ কুলজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ কুলীন এবং মৌলিকগণের সহিত

পরামর্শ করিয়া একজাই করিতে প্রস্তুত হইলেন। সমাজের শ্রেষ্ঠ কুলীন ও মৌলিকদিগকে একটি সভায় একত্রিত করিয়া সম্মান করার নাম একজাই বা সমীকরণ। যাঁহারা এইরূপভাবে সমাজের কুলীন ও মৌলিকদিগকে একত্র করিয়া কুলীনকন্যা গ্রহণ করিতেন তাঁহারা গোষ্ঠীপতি বা সমাজপতি হইতেন। নবগুণসম্পন্ন ও সদ্বংশজাত কুলকর্মা ও কুলীন পোষক সমাজের নেতাই পূর্ব্বে গোষ্ঠীপতি হইতে পারিতেন। পুরন্দর খাঁ ঐ পদ মৌলিকান্ত করিয়া মৌলিকদিগের সম্মান বৃদ্ধি করেন। সমীকরণ বা একজাই সভায় সকল বড় বড় কুলীনগণকে পর্যায় অনুসারে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইত এবং সকল প্রধান প্রধান ঘটক বা কুলাচার্যগণ সভায় যাহার যেরূপ মর্যাদা সেই অনুসারে আসন ঠিক করিয়া দিতেন। সকল কুলীন ও ঘটককে যথাযথ মর্যাদা অনুসারে বিদায় রাহাখরচ এবং খোরাকি দিতে হইত। এক একটি সমীকরণ করিবার খরচ লক্ষাধিক টাকা হইত।

গোষ্ঠীপতি—

দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলাচার্য কারিকায় দেখা যায়—

"কায়স্থ গোষ্ঠীপতি লক্ষণং যথা—নীতিজ্ঞ কুলকর্মটঃ স্থিতিমতাং মান্যোঽপি ধর্মান্বিতঃ কার্য্যাকার্য্য বিলোকনৈঃ কুলভৃতাং সম্মানদানোদ্যতঃ। পোষ্টা যঃ কুলসংবিদাং কুলসুধীঃ সন্মৌলিকানাং তথা সদ্বংশপ্রভবং ক্ষিতৌ সুবিদিতো দাতা স গোষ্ঠীপতিঃ। অথ কায়স্থ গোষ্ঠীপতি আদৌ দ্বাদশ পর্যায়ে সমভবদ্দানেন গোষ্ঠীপতিঃ সংকীর্ত্তিশ্চ সুবুদ্ধি খান তনয়ঃ শ্রীমন্তরায়ঃ কৃতী॥ ১॥ সংজাতস্তদনন্তরং দানান্তরং গুণা ধারাগণো চ পর্য্যায়কে স্বেচ্ছাতোহি পুরন্দরঃ কুলভবঃ খানঃ সদা দানতঃ ॥ ২॥ পর্য্যায়েচ চতুর্দ্দশে সমভবৎ পৌরন্দরঃ কেশবঃ খানঃ সন্তান দানতোহি বিল সংকীর্ত্তি ধরামণ্ডলে॥ ৩॥ নানা বিত্ত বিসর্জনেন জনিত প্রোৎফুল্লকীর্ত্তি ক্ষিতাবাসীৎ পঞ্চদেশ তদাত্মজক্ষ্ণী শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাস খান্॥ ৪॥

গোষ্ঠীপতি বর্ণনং॥

গোষ্ঠীপতি হয় কিসে শুন দিয়া মন।
নরকুল সহ ক্রিয়া করে যেই জন॥
কর্ম্ম দ্বারা সকল কুলীন ভোক্তা করে।
যশে যশোন্বিত সেই পৃথিবী ভিতরে॥

অন্নদানে ঘটক কুলীন করে বাধ্য।
সগোত্রের মধ্যে সেই হয়ত আরাধ্য॥
গোত্রবর্গে প্রতিপালন সদা যেই করে।
তার নাম গোষ্ঠীপতি বিচার তৎপরে॥
সদাচারী সবিনয়ী আর বিদ্যাবান্।
কুলেতে প্রতিষ্ঠা সদা তীর্থেতে প্রয়াণ॥
কুলকর্ম্ম ইষ্ট নিষ্ঠ জাতিবৃত্তি রত।
দাতা হবে তপস্যায় নিত্য শুদ্ধ মত॥
এই নব গুণে হয় শুদ্ধ সে কুলীন।
গোষ্ঠীপতি এই রীতি জানিবে প্রবীণ॥
মৌলিকের সহ কর্ম্ম মেলকাঠি হয়।
গ্রহণ গুণদানে হানি গোষ্ঠীপতি ক্ষয়॥

—বাচস্পতির দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুল সর্ব্বস্ব।

রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের একজাই গ্রন্থের (৮ই বৈশাখ ১২৬১) গোষ্ঠীপতি কারিকা নামক পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে—

যে রূপেতে গোষ্ঠীপতি হয় পূর্ব্বাপর।
মেলকাঠি পরিপাটি কহি সুবিস্তর॥
দ্বাদশ পর্য্যায়ে দানে আদি গোষ্ঠীপতি।
সুবুদ্ধি খান সুত শ্রীমন্ত রায় কৃতী॥
ত্রয়োদশ গোষ্ঠীপতি পুরন্দর খান।
শ্রীমন্ত রায়ের কন্যা করিয়া আদান॥
চতুর্দ্দশে গোষ্ঠীপতি পুরন্দর সুত।
কেশব খাঁন কীর্ত্তিমান দানমান যুত॥
কানুনগো খ্যাতি স্থিতি মেদিনীপুরেতে।
ঘোষবংশ অবতংশ বিখ্যাত লোকেতে॥
শ্রীমন্ত নামেতে পুত্র রামচন্দ্র খাঁর।
কেশব হইল গোষ্ঠীপতি কন্যা এনে তার॥

মহারাজ বল্লালসেন প্রথম সমীকরণ বা একজাই করেন। বল্লালসেনের পর পুরন্দর খাঁর পিতা শ্রীমন্ত বা ঈশান খাঁ দ্বাদশ পর্যায়ে একজাই বা সমীকরণ

করেন। তৎপর ১৩ পর্যায়ে তাঁহার দানশীল যশস্বী পুত্র মহারাজ গোপীনাথ বসু একজাই বা সমীকরণ করিয়া গোষ্ঠীপতি হন এবং এই সভায় তিনি নানারূপ কুলবিধি প্রচার করেন। ১৪ পর্যায়ে পিতার উপদেশ অনুসারে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কেশব বসু একজাই বা সমীকরণ করিয়া গোষ্ঠীপতি হন। ১৫ পর্যায়ে কেশব বসুর পুত্র শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাস খান একজাই ও সমীকরণ করিয়া গোষ্ঠীপতি হন। সমগ্র সমাজের উপর একচ্ছত্র প্রতিপত্তি না থাকিলে কেহই গোষ্ঠীপতি হইতে পারে না। দশরথ বসু হইতে ১২ পর্যায়ে শ্রীমন্ত বসু হইতে ১৫ পর্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাস খান পর্যন্ত পরপর চারি পুরুষে গোষ্ঠীপতি হইয়া সমগ্র সমাজে এই বংশের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অতুলনীয় হয়। তাঁহারা বঙ্গেশ্বরের দরবারে উজীরের পদে থাকিয়া এবং সমাজপতি হইয়া সেই সময়ে এই বংশের ক্ষমতা ও যশের প্রভাব সর্বোচ্চ শিখরে উঠে। তাঁহারা সকলেই অতুল ঐশ্বর্যশালী ছিলেন। এবং সর্ববিষয়ে তাহাদের প্রভাব ও অর্থ সামর্থ্য অব্যাহত ছিল।

পুরন্দর খাঁন গোষ্ঠীপতি হইয়া কতকগুলি বিধান করিয়া যান। তাঁহার বিধান অনুসারে যিনি গোষ্ঠীপতি হইবেন তাঁহাকে একজাই বা সমীকরণ করিতে হইবে এবং গোষ্ঠীপতি বংশের কন্যাকে গ্রহণ করিয়া কুলধর্ম সম্যকভাবে পালন করিয়া যাইতে হইবে। কুলহীন হইলে গোষ্ঠীপতি হইতে পারিবে না। নবগুণ-সম্পন্ন মৌলিকও কুলীন গোষ্ঠীপতির বংশের কন্যা আনিয়া গোষ্ঠীপতি হইতে পারিবেন।

এই সময়ে ভাগালক্ষ্মী দশঘরার পাল বংশের দয়ারাম পালের উপর কৃপাদৃষ্টি করেন এবং বাঙ্গলার মোগল শাসনকর্তার অধীনে উচ্চ রাজপদে থাকিয়া কায়স্থ-সন্তান দয়ারাম পালের প্রভূত ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা হয় এবং তিনি বহু কুলীনকে আশ্রয় দিয়া ১৬ পর্যায়ের একজাই বা সমীকরণ করিয়া গোষ্ঠীপতি হন। মহাত্মা গোপীনাথ দে, দত্ত, কর, পালিত ভিন্ন ষোলঘর সাধ্য মৌলিককে বিশেষ কৌলীন্য মর্যাদা প্রদান করেন—পাল, নাগ, অর্ণব, সোম, রুদ্র, আদিত্য, আইচ, ভদ্র, হোড়, তেয়, ব্রহ্ম, বিষ্ণু, নন্দী, রক্ষিত ও চন্দ্র। মহাত্মা পুরন্দর খাঁর বিধি অনুসারে পাল বংশের দয়ারাম পাল গোষ্ঠীপতির কন্যাকে গ্রহণ করিয়া গোষ্ঠীপতি হইলেন। ১৭ পর্যায়ে দয়ারাম পালের পুত্র রামভদ্র পাল একজাই বা সমীকরণ করিয়া গোষ্ঠীপতি হন। ১৮ পর্যায়ে ভেয়ে কিঙ্কর সেন একজাই করিয়া গোষ্ঠী-পতি হন। ১৯ পর্যায়ে সিংহ বংশের গোপীকান্ত সিংহ চৌধুরী সমীকরণ

করিয়া গোষ্ঠীপতি হন। ২০ পর্যায় ও ২১ পর্যায়ের একজাই (একজাই কারিক মতে) কুলাচার্যগণ একত্র হইয়া করেন। ২২ পর্যায়ে শোভাবাজার রাজবংশের মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ২৪শে মাঘ ১৭০৩ শকে (১৭৮১ খৃষ্টাব্দে) একজাই করিয়া গোষ্ঠীপতি হইলেন। ২৩ পর্যায়ে মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের পুত্র রাজা রাজকৃষ্ণ দেব ১৪ই শ্রাবণ ১২১৯ সনে একজাই করিয়া যান। ২৪ পর্যায়ে একজাই তিনজন ধনবান কায়স্থ সন্তান আহ্বান করিয়া সমীকরণ করেন। ১২ই মাঘ ১৭৬৬ শকে (ইং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে) শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণের বংশধর রাজা শিবকৃষ্ণ দেব এবং রাজা রাধাকান্ত দেব একজাই করেন এবং ১৭ই মাঘ ১৭৬৬ শকে সিমলা নিবাসী রামদুলাল সরকারের দুই পুত্র আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু) এবং প্রমথনাথ দেব (লাটুবাবু) একজাই করেন। ৮ই বৈশাখ ১৭৭৬ শকে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর পুনরায় তৃতীয় বার ২৪ পর্যায়ের একজাই করেন। ২৫ পর্যায়ে ২৬শে মাঘ ১২৮৬ সালে প্রমথনাথ দেবের পুত্র অনাথনাথ দেব মহাশয় একজাই করেন। ২৫ পর্যায়ের পর আর কোন একজাই হয় নাই।

"পুরন্দর বসুনৈষাং ত্রয়োদশপর্য্যায়াবধি শ্রেণী।
পর্য্যায় বন্ধভ্রমকৃত কুলোদ্ধারেণ কৃতে।"

ইতি দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলদীপিকা।

সমীকরণ বা একজাই সভায় সমগ্র মুখ্যাদি নব শ্রেণীর কুলীন এবং সিদ্ধ মৌলিকগণ একত্র হইয়া প্রকাশ্য সভায় আহ্বানকারীকে মাল্যচন্দনে ভূষিত ও গোষ্ঠীপতি পদে সম্মানিত করিত এবং সমবেত সভ্যগণ সকলেই অঙ্গীকার করিত যে সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে একজাইকারী গোষ্ঠীপতিকে সর্বাগ্রে মাল্য-চন্দন দিবে।

"পুরন্দর সম মালা পাইবে গলেতে।"

সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে মাল্যদানকে এখনও "পুরন্দরের মালা" বলিয়া কথিত হয় এবং কুলবিধাতা বলিয়া এখনও তাঁহার উদ্দেশে প্রথম মালা দেওয়া হয়।

এই একজাই বা সমীকরণ সভায় যে সকল কুলীন নিমন্ত্রিত হইয়া মর্যাদা পাইতেন তাঁহারা সমাজে বিশেষ সম্মানিত হইতেন এবং সমীকুলীন বলিয়া অভিহিত হইতেন।

মহারাজ পুরন্দর খাঁ মাহীনগরের দক্ষিণে কুলীনগ্রামে দক্ষিণ রাঢ়ের সমস্ত কুলীন সমাজ ও শ্রেষ্ঠ মৌলিক সমাজকে আহ্বান করিয়া এক সুবৃহৎ সম্মেলনের অনুষ্ঠান করিলেন। কথিত আছে এই সম্মেলনে লক্ষাধিক লোক সমাগত হইয়াছিল এবং সম্মেলনের পূর্বেই আহুত ভদ্রলোকগণের ব্যবহার্য বিশুদ্ধ জল সরবরাহের জন্য গোপীনাথ বসু লোক লাগাইয়া অল্পদিনের মধ্যে এক প্রকাণ্ড দীঘি খনন করান। বহুসংখ্যক খননকারকগণ যেখানে তাহাদিগের কোদাল ধুইয়া জড় করিয়া রাখিত, সেই স্থান এক্ষণে মাহীনগরের উত্তর উপকণ্ঠে "কোদালিয়া" নামে বিখ্যাত এবং এই একমাইলব্যাপী জলকীর্তি পুরন্দর খাঁনের নামানুসারে এখনও "খাঁ পুকুর" বলিয়া পরিচিত হইয়া রহিয়াছে। স্থানীয় কায়স্থগণের মধ্যে রায় বাহাদুর জানকীনাথ বসু (রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্রের পিতা) ও ডাক্তার কার্তিকচন্দ্র বসু মহাশয় উক্ত কোদালিয়ার বসু বংশ বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ।

এই সুপ্রসিদ্ধ একজাই এবং সমীকরণ সভায় গোপীনাথ বসুকে সকলে কুলীন সমাজের শ্রেষ্ঠ আসন দিয়া সমাজপতি ও গোষ্ঠীপতি বলিয়া বরণ করেন এবং তাঁহাকে কুলবিধাতা বলিয়া মানিয়া লন। এই সভা হইতে তিনি নূতন কুলবিধি সকল প্রচার করেন যাহা অদ্যাবধি সকল কায়স্থ সন্তানই যথাযথ প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। কঠিন বল্লালী প্রথার তিনি উচ্ছেদ করেন এবং নূতন বিধান করিয়া সমাজের সংস্কার করেন।

পুরন্দর খান রাজার জাতি কায়স্থগণের সমাজকে রাজস্থানীয়রূপে বিবেচনা করিয়া দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে রাজবিধিই প্রয়োগ করিলেন। বল্লালী কুলপ্রথায় কুল কন্যাগত ছিল। সকল কন্যাকেই কুলীনের সহিত বিবাহ দিতে হইত। পুরন্দর খান এই প্রথা উঠাইয়া দিয়া কুল জ্যেষ্ঠ পুত্রগত করান। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র যেমন পিতার রাজ্যাধিকার ও সমস্ত পিতৃসম্মানের উত্তরাধিকারীসূত্রে পিতৃপদ প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পুরন্দরের প্রবর্তিত কুল নিয়মানুসারে কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র কুলকার্যের অধিকারী হইলেন। কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ স্বপর্যায়ের যথাযথ কুলীনের কন্যার সহিত দিতে হইবে, অন্যথা কুল নষ্ট হইবে; সেই সময় হইতে বল্লালী বিধির সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইল।

বল্লালী বিধিতে কুলীনে কুলীনে সম্বন্ধ স্থাপিত হইত এবং কুলীনগণ মৌলিক-গণকে হীনভাবে দেখিত এবং কোন কুলীন মৌলিকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিত না; এমনকি একত্রে বসিয়া আহারাদিও করিত না। দূরদর্শী এবং

রাজনীতি-কুশল পুরন্দর খাঁ দেখিলেন কায়স্থ সমাজের মধ্যে এই বিভাগ সমাজকে অতীব সঙ্কীর্ণভাবে বিভাগ করিয়া রাখিয়াছে এবং জাতীয় উন্নতির বিশেষ অন্তরায় হইতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে পুরন্দর খাঁ ষোলঘর মৌলিককে সাধ্য মৌলিক করেন এবং তাহাদের সহিত কুলীনগণের সম্বন্ধ স্থাপনের অনুমতি দেন। বল্লালী নিয়মে কুলীনকন্যা মৌলিককে গ্রহণ করিতে পারিত না ; সুতরাং কুলীন ও মৌলিকে পরস্পর আত্মীয়তা স্থাপনের পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায় ছিল এবং মৌলিকগণ কুলীন সমাজ হইতে বিশেষ তফাৎ হইয়া পড়িতেছিল। পুরন্দর খাঁ কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ভিন্ন অন্যান্য পুত্রের এবং সকল কন্যার বিবাহ কুলীন বা মৌলিক যে কোন ঘরে দিবার অনুমতি দিলেন। পুরন্দর কুলবিধিতে মৌলিকের সহিত কুলীনের সম্বন্ধ স্থাপনের প্রথা প্রচলিত হওয়ায়, মৌলিকের নিকট কুলীনের সম্মান শতগুণ বর্ধিত হইল এবং মৌলিকগণ নিজ নিজ সম্মানবৃদ্ধি ও কুলোজ্জ্বল হইবে ভাবিয়া একমাত্র কুলীনের ঘরে আদান-প্রদান করিতে লাগিলেন। পূর্বে মৌলিকে মৌলিকে বিবাহ সর্বদা প্রচলিত ছিল কিন্তু গোপীনাথ বসু মহাশয় তাঁহার কুলবিধি প্রবর্তন করার পর হইতে মৌলিকগণ অনেকেই কুলীনের সহিত আদান-প্রদান করিয়া নিজ বংশ উজ্জ্বল করিবার বাসনায় কুলীন ভিন্ন মৌলিকে মৌলিকে আদান-প্রদান ক্রমশঃ বন্ধ করেন। বাংলাদেশের বেশীর ভাগ কায়স্থই মৌলিক এবং তাঁহারা সকলেই এই পুরন্দর প্রথা সাদরে গ্রহণ করেন।

"মৌলিকের সহ কর্ম্ম মেলকাঠি হয়।"

পুরন্দর খাঁ মৌলিকগণের সম্মানবৃদ্ধির জন্য তাঁহাদিগকেও গোষ্ঠীপতি ও সমাজপতি হইবার অনুমতি দেন এবং কোন মৌলিক গোষ্ঠীপতির কন্যা গ্রহণ করিয়া গোষ্ঠীপতি হইলে তাহাকে "মেলকাঠি" বলা হয়। এইরূপ গোষ্ঠীপতির কন্যা গ্রহণ করিতে পারিলে বহু সম্মানের কার্য হয় এবং মেলকাঠি প্রথম বংশ হইতে দ্বিতীয় বংশে পর্যাপ্ত হয়।

মহারাজ গোপীনাথ বসুর প্রবর্তিত কুলবিধি সকল প্রাচীন কুলাচার্যগণ নানা কুলপঞ্জিকা, কুলকারিকা ইত্যাদিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সে সকল কুলবিধি সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে।

প্রাচীন কুলশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ তাঁহাদের কারিকা, ঢাকুর ইত্যাদি পুঁথিতে যেরূপ লিখিয়া গিয়াছেন এবং বিশ্বেশ্বরের 'কায়স্থ কুলদর্পণ,' বিচারপতি

সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের লিখিত 'পুরন্দর খাঁ', প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রবাবুর 'দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ড,' শ্রীনগেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের 'কুল প্রথা', কায়স্থ-পুরাণ' ইত্যাদি পুস্তক হইতে যে সকল বিবরণ দেখিয়াছি তাহার কতক অংশ লিপিবদ্ধ করিলাম।

ঘটক নন্দরাম মিত্রের দক্ষিণ রাঢ়ীয়-কারিকায় দেখা যায় :—

পূর্ব্ব আর পশ্চিমে যত বঙ্গজ বারেন্দ্র খ্যাত উত্তর দেশেতে
উত্তর রাঢ়ী।

দক্ষিণে গঙ্গার কুল, দক্ষিণ রাঢ়ীর মূল, জাহ্নবী সম্মুখে
কৈলা বাড়ী ॥

তিনকুলে ছয় ভাই ; রহিল গিয়া ঠাঁই ঠাঁই চিহ্নিত সমাজ
কৈল সৃষ্ট।

কত কাল একরূপে বংশ বৃদ্ধি সমভাবে সমাজে সমানে করে
কুল ॥

নাহি ছিল ছোট বড় কুলকার্য্য ছিল দড় পর্য্যাবন্ধ নাহি
ছিল স্থুল।

তের পর্য্যায় 'পুরন্দর', জন্মিলা ঈশান ধর বসু বংশ কুলের
বিধাতা ॥

মহারাজ চক্রবর্ত্তী ভুবন ভরিয়া কীর্ত্তি আরম্ভিল কুলের
ব্যবস্থা।

জ্যেষ্ঠের জ্যেষ্ঠতা ধরি ক্রমাগত লেখা করি ছয় সমাজ ছয়
প্রকৃত ভিন্ন ॥

ইহার অনুজানুজ কনিষ্ঠ মধ্যাংশ তেওজ ছভায়া কনিষ্ঠ
শুভচিহ্ন ॥

দ্বিতীয় পুত্র মুখ্য হয়, পঞ্চম কনিষ্ঠ রয় ষষ্ঠম সপ্তম মধ্যাংশ।
অষ্টম নবম তেওজ কুল, সেই যে সভার মূল সেই যে বিচার
কুলে অংশ ॥

সার্বভৌম ঘটকের ঢাকুরে লিখিত আছে—

সুতরাং বসুজার কুল কোমলের কাজ।
কুলকর্ত্তা ক্রমে হইল সহজে বিরাজ ॥

নবরূপে জন্মিলেন আপনি পদ্মাসন।
নতুবা গন্ধর্ব্বকুলে রাখে কোন জন॥
স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আইলেন পুরন্দর।
সভা করিবার তরে আনাইল কুলবর॥
গঙ্গাতীরে দক্ষিণ রাঢ়ী কুলীন সারি সারি।
বিধাতা নির্ম্মিত যেন অমর নগরী॥
কুলেতে ধার্ম্মিক ছিল যুধিষ্ঠির রাজা।
সভা মধ্যে তার তরে করিলেক পূজা॥
মন্ত্রণা কারণ হেতু শিবের আগমন।
পরাশর মুনিবরে করিলে বরণ॥
সেইখানে পরাশর আইলেন শীঘ্রগতি।
ঈশান আইলা তবে তাহার সংহতি॥
দেবরাজ আইলেন সেই সভা দেখিবারে।
গন্ধমাল্য হাতে করি মালাধর ফিরে।
সহজ সুন্দর অতি দেখিতে সুছাঁদ।
মালাধর আইল যেন পূর্ণিমার চাঁদ॥
তাহা দেখি পরাশর কৈল অভ্যর্থন।
পরাশর মালাধর ক্রমে সে জোগান॥
সার্ব্বভৌম-ঢাকুরী এই কর অবধান।
সেই বন্দে করেন কুল পুরন্দর খান॥
তিন কন্যা প্রামাণিকে দিয়ে যত চিত্র।
মদন ঘোষ গদাধর আর কুবের মিত্র॥

পুরন্দর খান অস্য কুলং :—

ঈশান তনয় জাত বাড় মুখ্য গোপীনাথ,
পুরন্দর যাহার আখ্যান।
করিলে কুলের সৃষ্টি পূর্ব্বে যে বল্লাল দৃষ্টি
পর্য্যায়বন্ধ কুলের বিধান॥
সহজ আপন কাজ দানাবংশে পাইলে লাজ
বিপর্য্যায় ঘোষ গদাধরে।

পুনঃ সত্য যুধিষ্ঠিরে পিতা পুত্র একঘরে
যোগে শিব গেলা দেশান্তরে।
কোমলে হইল বর্ত্ত নাই যত সহজার্ত্ত
চিত্তে চিন্তিত পরে এই।
ভ্রমোদ্বায়ে কুল রক্ষে পুনঃ পরাশরে সক্ষে
হেরম্ব তনয় সহজ সেই॥
আদানেতে মালাধর ঘোষ মুখ্য সহজ বর
সহজ বলি কুলে হইল বাড়।
সার্ব্বভৌম বলেন শুন কুলকর্ত্তা তেক্রিজান
সহজাত্তি এ কারণে পাক।

ঘটক বিশারদের ১৩শ পর্যায়ের সংস্কৃত সমীকরণ কারিকায় লিখিত আছে—

১৩শ পর্য্যায়ে মুখ্যানাং সমীকরণং অথ সহজঃ।
শ্রীমন্তঃস্বশুভে পরাশর ইতি শ্রীলগ্রোকণ্ঠঃ কৃতী
শ্রীমালাধর ঘোষকে বিজয়তে গন্ধর্ব্বখাগে মহান্
খ্যাতো গোষ্ঠীপতিঃ পুরন্দরবসুধার্তৈব ভূমণ্ডলে
বিখ্যাতাঃ সহজাঃ কুলে কৃতিবরা মান্যাশ্চ সৎকীর্ত্তয়ঃ॥

দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলকারিকায় পুরন্দর খাঁয়ের কুলপ্রথা সম্বন্ধে লিখিত আছে---

বসুবংশে পুরন্দর ঈশান-নন্দন।
আজ্ঞাসূত্রে ভাবাভাব অংশ নিরূপণ॥
তিনগোত্র নয়কুল ছয় সমাজ।
ক্রমেতে কহিব যত কুলীনের কাজ॥
ঘোষ নিশাপতি বালি আকনায় প্রভাকর।
মুক্তি বসু বাগাণ্ডায় মুক্তি মাহীনগর॥
ধুই মিত্র বড়িশা গুই এর সমাজ টেকা।
তিনকুল ছয় সমাজ ক্রমে নয় লেখা॥
নৃপাদেশ তিনে হয় তুল্য কুলে ধাম।
পরেতে প্রবন্ধ রূপে সবার বিশ্রাম॥

কুল বিবরণের সবে কর অবগতি।
মুখ্য কনিষ্ঠ ছ ভায়া মধ্যাংশ শুদ্ধমতি ॥
তেওজ অবধি দিলাম প্রমাণের জায়।
দ্বিপুত্র জনার তত্ত্ব কহিব উপায় ॥
মুখ্যের তনয় মধ্য-দ্বিপুত্র গণন।
কনিষ্ঠ-দ্বিপুত্র আর ছ ভায়ার নন্দন ॥
তেওজ দ্বিতীয় পুত্র শেষ কুল জানি।
কয় প্রকার কুল এই রাঢ়েতে বাখানি ॥
ত্রিবিধ প্রকারে করি মুখ্য পরিচয়।
প্রকৃত সহজ শেষ কোমল উদয় ॥
তিন পুরুষে বাড়ি কনিষ্ঠ দেই যদি পায়।
নিত্য বাড়ে পুনঃ বৃদ্ধি নিন্দা অতিশয় ॥
তবে কুল মধ্যাংশ ত্রিবিধ বলিলাম।
তৃতীয় মধ্যশ্রেষ্ঠ আর বারভায়াতে বিশ্রাম ॥
কনিষ্ঠের দ্বিতীয় পুত্র বাড়ি তেওজ হয়।
তৃতীয়ের দ্বিতীয় পুত্র কথায় তেওজ কয় ॥

অথ মুখ্যস্য কার্য্যং

প্রথমতঃ মুখ্য-কুল কর অবধান।
সমান জনে দান দিয়া অধিক সম্মান ॥
কনিষ্ঠ দোছেই কন্যা তেছেই ছ ভায়া।
চৌছেই মধ্যে পাঁচ ছেই তেওজ তনয়া ॥
প্রথম গ্রহণ সমকুল শৌর্য্য কাজ।
দ্বিতীয়ে কনিষ্ঠ সুতা উভয়ের মাঝ ॥
তৃতীয়ে মধ্যাংশ সুতা চতুর্থে তেওজে।
দানেতে ছভায়া কেন গ্রহণে না ভজে ॥
তাহার সিদ্ধান্ত করি শুন কুলধীর।
বস্তুতঃ ছভায়া কুল দানেতে সুস্থির ॥
মুখ্য হইতে হয় যেই কুলের প্রকাশ।
তাহাতে করিলে গ্রহণ মনের উল্লাস ॥

দানে পাঁচ কুলে চারি নব রঙ্গ প্রতুল।
পুরন্দর কৃত সৃষ্টি মহিমা অতুল॥
জন্মের বৃত্তান্ত এই হৈল সমাপন।
অতঃপর বাড়িকুলে দেহ সভে মন॥
প্রকৃত দ্বিতীয় পুত্র সহজ সন্ততি।
কার্য্যাক্রমে বলে তার উচ্চ নীচ গতি॥
এক সঙ্গে কোমলাশ্রয় করে যেই জন।
হয়ত কোমল ভাব না যায় খণ্ডন॥
কোমল মুখ্যের কথা শুন দিয়া মন।
রাজার আজ্ঞাতে কোমল হইল কত জন॥
পূর্ব্বপক্ষ করিবেন বিপক্ষ ঘটক।
কেমনে হইবে পুরন্দর পরিপক্ক॥
সুতরাং বসুজার কুল কমলের কাজ।
কুলকর্ত্তা ক্রমে হইল সহজে বিরাজ॥
নবরূপে জন্মিলা আপনি পদ্মাসন।
নতুবা গন্ধর্ব্ব কুলে রাখে কোন জন॥
বাড়ের লক্ষণ তবে করিল নিরূপণ।
জন্মের পশ্চাৎ দুই জন না যায় খণ্ডন॥
মতান্তরে মুখ্য সুতের বৃদ্ধির লক্ষণ।
চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ কনিষ্ঠ দুই পান॥
মধ্যাংশ পদেতে দুইজনের বিহার।
তিনজন তেওজ কুলেতে ব্যবহার॥

দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুল	দান গ্রহণে শুদ্ধ মূল
উঠাপড়া কাজে হয়	তিন পুরুষ পর্য্যন্ত যায়
কুল জ্যেষ্ঠ পুত্রগত	জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ সম্মানিত
পরে দুই বাড়ি শিষ্ট	তার পাছে ছো কনিষ্ঠ
ছ ভায়া মধ্যাংশ তেওজ	এ সব কুলে দ্বিতীয়জ
এই রূপে নব ভাগ	নবরঙ্গ অনুরাগ
ত্রৈ পুরুষ নিরাবিল	ত্রি পুরুষে গরমিল

আগের হলে বংশ নাশ　　পরের হয় সপ্রকাশ
কুলীনে মৌলিকে কাজ　　ইহাতে নাহিক লাজ
আগছেই গরজেই　　ইহাতে গণনা নেই
কনিষ্ঠ মুখ্যত্ব পায়　　ছ ভায়া কনিষ্ঠে যায়
এইরূপে উঠাপড়া　　জানিও কুলের ধারা
দান গ্রহণ প্রতিসারণ　　উচিত কুলে সমীকরণ
কুলীন কুলজ্ঞ কাছে　　দানাদান প্রতিজ্ঞাপাছে
তবে জানি কুলোজ্জ্বল　　সভামধ্যে বলাবল

—দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলকারিকা।

পুরন্দর খাঁর প্রবর্তিত নিয়মানুসারে কুল নয় প্রকার, তাহার মধ্যে পাঁচটি মুখ্য। যথা—মুখ্য, কনিষ্ঠ, ছভায়া, মধ্যাংশ ও তেওজ এবং শাখা চারিটি যথা—কনিষ্ঠ দ্বিতীয় পুত্র, ছভায়া দ্বিতীয় পুত্র, মধ্যাংশের দ্বিতীয় পুত্র এবং তেওজের দ্বিতীয় পুত্র। মুখ্য কুলীনের প্রথম পুত্র জন্ম দ্বারাই মুখ্যত্ব প্রাপ্ত হয় এবং জন্মমুখ্য ও মুখ্যকুলীন হন। ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট কুল, ইহাও তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—প্রকৃত, সহজ ও কোমল। আদি পুরুষ হইতে জ্যেষ্ঠানুক্রমে জ্যেষ্ঠপুত্র প্রকৃত মুখ্য হয়। প্রকৃত মুখ্যের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র কোমল মুখ্য হয়। কুলীনের দ্বিতীয় পুত্র জন্ম কনিষ্ঠ, তৃতীয় জন্ম মধ্যাংশ, চতুর্থ জন্ম তেয়জ এবং পঞ্চমাদি পুত্রেরা মধ্যাংশের ২য় পো বলিয়া কথিত হয়।

দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুল দান গ্রহণে শুদ্ধ মূল। কুলীনের কুলরক্ষা করিতে হইলে তাহার প্রধান কার্য হইতেছে উপযুক্ত ঘরে পুত্রের বিবাহ দেওয়া এবং উপযুক্ত ঘর হইতে কন্যা গ্রহণ করা। কুলীন পুরন্দর খাঁর কুলবিধি মতে কন্যার বিবাহ কুলীন বা সাধ্য মৌলিকের সহিত দিতে পারেন কিন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ শ্রেষ্ঠ স্বপর্যায়ের মুখ্য কুলীনের কন্যার সহিত দিতে হইবে। মুখ্য ভিন্ন অন্য কুলে বা বিপর্যায়ে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিলে কুলভঙ্গ হয়।

দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলবিধি যাহা পুরন্দর খাঁ প্রবর্তিত করিয়াছিলেন তাহা ব্রাহ্মণগণের কুলবিধি হইতে পৃথক নহে। কায়স্থগণ দ্বিজাতি সম্ভূত এবং দ্বিজাতিগণের কুলবিধি অনুসারে সকল সামাজিক কার্যাদি এখনও হইয়া থাকে।

সভাই সমান ছিল ছোট বড় নাহি জ্ঞান।
ছোট বড় করি গেল রবির সন্তান॥

দেবীবর হইতে হইল ছোট বড় জ্ঞান।
তাহার বৃত্তান্ত কহি শুন সাবধান॥
কায়স্থ ব্রাহ্মণ করিলা কুলের বন্ধন।
কন্যাগত হৈল বিপ্র কুলের গঠন॥
পুরন্দর খান বসু কুলের শ্রেষ্ঠতা।
সমাজ পর্য্যায় বাধিলেন হইয়া বিধাতা॥

—ঘটক চূড়ামণির দক্ষিণ রাঢ়ীয় কারিকা।

কুলীনের জ্যেষ্ঠপুত্র কুলক্রিয়া করিয়া প্রথম দারপরিগ্রহণের পর, পুনরায় মৌলিকের কন্যাকে গ্রহণ করার নাম আভ্যরস। সেই সময়ে কুলীন সমাজে আভ্যরসকারী কুলীনের মৌলিক শ্বশুরের বংশ সমাজে বিশেষ আদৃত হইত। এবং এই কারণে কুলীন কুমারগণ প্রথম বিবাহের পর পুনরায় বহু মৌলিকের কন্যাকে বিবাহ করিত এবং মৌলিকগণ কুলীন পুত্রকে কন্যাদান করিয়া নিজ নিজ বংশের গৌরববৃদ্ধি করিত।

দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থগণ পুরন্দর খান প্রবর্তিত কুলপদ্ধতি গ্রহণ করায় তাহাকে "পুরন্দরী থাক" কহে।

পুরন্দর খান "নবরঙ্গ" কুলের সৃষ্টি করেন। যে কুলীন প্রথম পুত্রের বিবাহ জন্মমুখ্যে, দ্বিতীয় পুত্রের বিবাহ কনিষ্ঠ কুলে, তৃতীয় পুত্রের বিবাহ মধ্যাংশ কুলে এব, চতুর্থ পুত্রের বিবাহ তেয়জ কুলে এবং আগছেই বা প্রথমা কন্যার বিবাহ মুখ্য কুলে, দোছেই বা দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ কনিষ্ঠ কুলে, তেছেই (বা গরছেই) বা তৃতীয়া কন্যার বিবাহ ছ ভায়া কুলে, চৌছেই বা চতুর্থী কন্যার বিবাহ মধ্যাংশ কুলে এবং পঁচছেই অথবা পঞ্চমী কন্যার বিবাহ তেয়জ কুলে দিয়া থাকিতে পারিলে নিজ কুলকে নবরঙ্গ কুল করেন অথবা কিয়দংশ কৃতকার্য হন তাঁহার কুলগৌরব সর্বোচ্চ হয় এবং সমাজে অশেষ মর্যাদা পান।

"ডাক পাক খাতক বন্দি, তিন নিয়ে কুলের সন্ধি" অর্থাৎ দান বা কন্যার বিবাহ, গ্রহণ বা পুত্রের বিবাহ, কুলের পরিপাক্ এবং খাতক বন্দি বা বিবাহিতে পরস্পর সম্বন্ধ এই তিন কার্যে কুলীনের কুলরক্ষা এবং কুলীনত্ব পরিপুষ্ট হয়। কুলে কোন দোষ হইলে, প্রকৃত মুখ্য কুলীনের সংস্পর্শে কুলের দোষ খণ্ডন হয়। "বিবাহঃ দান গ্রহণৈঃ কুলীনাঃ শ্রেষ্ঠতাং লভেৎ।"

মহারাজ গোপীনাথ বসু মহারাজ বল্লালসেনের ন্যায় প্রধানতঃ কতকগুলি

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ ও কয়েকজন কায়স্থকে "কুলাচার্য্য" পদে নিযুক্ত করিয়া কুলপঞ্জিকা সকল সযত্নে লিপিবদ্ধ করিয়া রক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং তাঁহারই যত্নে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের কুলীন এবং বড় বড় সাধ্য মৌলিক বংশের অংশ, বংশ, পর্য্যায়াদি এবং দান ও গ্রহণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। পাঁচশত বৎসর পূর্বে পুরন্দর খান যে সম্মেলন করিয়া কুলবিধি সকল প্রবর্তন করিয়াছেন এযাবৎ সেই সকল বিধি কায়স্থসমাজে সম্যকভাবে প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে এবং প্রাচীন বহু কুলগ্রন্থাদিতে সেই সকল কুলপ্রথা সবিস্তৃত-ভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। উক্ত প্রাচীন কুলপঞ্জিকাদি হইতে এখনও আমরা সকল কুলীন বংশের বংশধরদিগের নাম এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের দান ও গ্রহণ বিষয়ে বিবরণ প্রাপ্ত হই। মহাপুরুষ পুরন্দর খাঁ কুলাচার্যদিগের দ্বারা দক্ষিণ বাংলায় প্রত্যেক কুলীন বংশের অংশ, বংশ, দান, গ্রহণ ইত্যাদির ইতিহাস লিখিয়া রাখার যে সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন সেরূপ অমূল্য সুন্দর প্রথা পৃথিবীর অন্য কোন জাতির মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ।

সকল প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদিগের লেখনীতে আমরা দেখিতে পাই যে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পুরন্দর খাঁ বল্লালী নিয়ম অতিক্রম করিয়া কৌলীন্য সম্বন্ধে নূতন কুলবিধি সকল সংস্থাপন করিয়া বঙ্গের দ্বিতীয় কুলবিধাতা নামে অভিহিত হইয়াছেন এবং অনেক গ্রন্থে তাঁহাকে "দ্বিতীয় বল্লাল" বলিয়া থাকে। গোপীনাথ বসু বঙ্গের সিংহাসনে বসেন নাই বা বল্লালসেনের ন্যায় প্রবল প্রতাপশালী নৃপতি ছিলেন না কিন্তু প্রাচীন কুলগ্রন্থাদিতে তাঁহাকে মহারাজ, 'গৌড়' অধিকারী, রাজচক্রবর্তী, বিধাতা ইত্যাদি বলিয়া অভিহিত করিয়া তাঁহার প্রতাপ ও প্রতি-পত্তি স্বাধীন অধীশ্বরের ন্যায় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এই কুলবিধাতা গোপীনাথ বসু বা পুরন্দর খাঁ বঙ্গদেশের স্বাধীন রাজা হোসেন সাহের প্রধান উজিরের পদে থাকিয়া কায়স্থ জাতির সামাজিক আচার-ব্যবহারে ক্ষত্রিয় রাজোচিত নিয়মাবলী প্রচলিত করাইয়া অক্ষয়কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। কুলীনের অগ্রজন্মা পুত্র রাজাদিগের Primogeniture ও ইউরোপের Feudal নিয়মের সদৃশ সর্বোচ্চ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কুলীন এবং পিতার মৃত্যুর পর পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। চির-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ সমূহে জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন, দ্বিতীয় কুমার, তৃতীয় ঠাকুর প্রভৃতি উপাধিতে অভিহিত হন। পুরন্দর খান রাজবংশের নিয়মাবলী অবলম্বন করিয়া রাজার জাতির কায়স্থ সন্তানগণের মধ্যে মুখ্য, কনিষ্ঠ

মধ্যাংশ, তেওজ প্রভৃতি পদের সৃষ্টি করেন। এই কুলবিধি প্রায় গত পাঁচশত বৎসর হইতে দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের মধ্যে অক্ষুণ্ণভাবে চলিয়া আসিতেছে এবং সমাজের কোন ক্ষতির কারণ হয় নাই। কুলীনগণ পূর্বে সমাজে সামন্তরাজ স্বরূপ ছিলেন বলিতে পারা যায়। পুরন্দর খাঁর সুচিরকালস্থায়ী কীর্তিস্তম্ভ অদ্যাপি দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থগণের হৃদয়ে নিহিত রহিয়াছে যাহা অল্পকালস্থায়ী ইষ্টক বা প্রস্তরনির্মিত নহে। এখনও সভাস্থলে অগ্রে "পুরন্দরে মালা" অন্তরস্থ কীর্তিস্তম্ভে নিবেশিত হইয়া চিহ্নস্বরূপ পৃথক মালা রাখা হইয়া থাকে।

মহারাজ গোপীনাথ বসু প্রসন্ন মিত্রের কন্যাকে বিবাহ করেন।

স্যার রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের একজাই গ্রন্থে লিখিত আছে যে পুরন্দর খান শ্রীমন্ত রায়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়া গোষ্ঠীপতি হন।

পুরন্দর খাঁর পাঁচ পুত্র কেশব, নীলাম্বর, শ্রীনিবাস, নরহরি, হরিহর এবং একাদশটি কন্যা হয়। কুলীনের প্রধান কর্ম উপযুক্ত বংশে পুত্রকন্যার বিবাহ দিয়া, দান এবং গ্রহণের দ্বারা নিজ বংশের মর্যাদা বৃদ্ধি করা। কুলবিধাতা গোপীনাথ তাঁহার পুত্রকন্যাগণের বিবাহ যথাযোগ্য বরে দিয়া নিজ কুলকে নবরঙ্গ কুল করেন এবং নবরঙ্গী নামে কুলীনশ্রেষ্ঠ ও সমাজপতি হন।

তাঁহার পাঁচ পুত্র এবং একাদশ কন্যার বিবাহ প্রাচীন কুলকারিকা হইতে যেরূপ পাওয়া যায় তাহা বর্ণনা করিলাম।

ঘটক বিশারদের সংস্কৃত সমীকরণ কারিকায় পুরন্দর খানের কুলের বিবরণ এইরূপ পাই—

১৩ পর্য্যায়ে বাড়ি সহজ মুখ্য পুরন্দর খানস্তকুলং

আসীৎ শ্রীলপুরন্দরঃ ক্ষিতিতলে ভূদেব সেবারতো
যশ্চক্রে কুলশৃঙ্খলাং গুণাযুতাং লোকৈবনিন্দ্যাং মুদা।
আদৌ ঘোষযুধিষ্ঠিরং বিতরণাৎ সংপ্রাপ্য শ্রীমন্তকং
তৎপশ্চাৎ শিবঘোষকং কৃতিবরং মুখ্যক্মোহং গতঃ॥
লব্ধা সোপি পরাশরাৎ সহজতাং শ্রেণীঞ্চ চক্রে
ততস্তস্মাদে ঘোষভিণ্ডী পরাশরং কৃতিবরং ঈশান ঘোষং মুদা
দেবেশং ক্রমশং প্রদানবিধিনা লেভে চ মালাধরং
ভাগাৎ সোপি গুণাকরং সহজকং জগ্রাহ মালাধরং॥

পশ্চাৎ ঘোষ পরাশরদ্বয় মহো লব্ধা চ মালাধরং
লোভ্যার্থং শুশুভে সুচারু মহিমা গৌড়াধিকারী যতঃ
ত্যক্ত্বা কোমলতাং ততঃ সহজতা জগ্রাহভাগ্যেন বা
চক্রেহসৌ নবরঙ্গতাং কৃতিবরো মান্যোহি গোষ্ঠীপতিঃ ॥

১৩প বাসসু পুরন্দর খান্

গৌড়দেশে অধিপতি পাত্র ছিল মহামতি
পুরন্দর খান মহাশয় ।
লোকে বলে ধন্য ধন্য কুলে শীলে অতিমান্য
রাজকর্ম্মে অতি সদাশয় ॥
প্রথম কুলের সৃষ্টি পরাপর নাহি দৃষ্টি
পুরস্কার করিলা বিস্তর ।
দানাংশেতে যুধিষ্ঠির রূপে গুণে অতিধীর
শ্রীমান মিত্র কুলবর ॥
তার পাছু শত্রুঘ্ন ঘোষ তাহাতে না পাইল্যা তোষ
কোমল কুলেতে অভিমান ।
সহজ কুলেতে স্থিতি করিলা যে মহামতি
পরাশর মিত্রের মিলন ।
ছেইর পত্তন দেখি ভিণ্ডী পরাশর সুখী
ঈশান করিলা দরশন ॥
দানাংশে অতীব লাজ দেখি আইলা দেবরাজ
তাহার পাছু ঘোষ মালাধর ।
দানাংশে হইল সায় গ্রহণের নতিজায়
সহজ কুলেতে মনোহর ॥
গোবিন্দ পদারবিন্দ মধুপানে মহানন্দ
গ্রহণেতে ঘোষ মালাধর ।
আদান প্রদানে ধন্য সহজেতে হইলা মান্য
দ্বিতীয়তে ঘোষ পরাশর ॥
মধ্যাংশ কুলের সার ঘোষ কুলে অবতার
পরাশরে তৃতীয় গ্রহণ ।

তেওজ কুলে মালাধর সেও বটে সুন্দর
ভাগ্যক্রমে হইল মিলন ॥
নবরঙ্গ গুণ বড় মুখ্য কুলে হয় দড
ভাগ্যক্রমে খান্ মহাশয় ।
কেশরী বলেন জান পুরন্দর পুণ্যমান
অদষ্ট সহজ সদাশয় ॥

তিন কন্যা প্রামাণিকে দিয়া যথোচিত ।
মদন ঘোষ গদাধর ঘোষ আর কুবের মিত্র ॥
শ্রীমান মিত্রে কন্যা দিয়া কুলে মহাদোষ ।
পুনঃ সাম্য পরাশর মিত্র যোগে শিব ঘোষ ॥
ছেই মিল করিয়া দোছেই কন্যা ভিঙী পরাশর ।
তেছেই ঈশান ঘোষ কুলেতে কুর্পর ॥
চৌছেই দেবরাজ মিত্র গতি করে রক্ষা ।
পাছছেই মালাধর ঘোষে পিতৃকুল দেখা ॥
ছছেই কন্যা গ্রহণ করে ঘোষ বর্দ্ধমান ।
নিবাস মিত্র শ্রীনাথ ঘোষ জঘন্য কন্যা দান ॥
দান যেন ডাল পল্লব গ্রহণ কুল মূল ।
মুখ্য মালাধর পাইয়া বাড়ায় সহজ কুল ॥
ভিঙী পরাশর পাইয়া দোজো আটুনি ।
তৃতীয় গ্রহণ পরাশর অন্য অন্য শুনি ॥
চৌঠ গ্রহণ সনাতন সকল গ্রহণ পুরে ।
নবরঙ্গ গঠিত কুল বসু পুরন্দরে ॥

কায়স্থ কারিকায় লিখিত আছে—গ্রহণ—
১৩ পর্য্যায়ে সহজ মুখ্য ঈশানের ২য় সুত
বাড়ি সহজ মুখ্য গোপীনাথ পুরন্দর খাঁর

গ্রহণ—

প্রথম পুত্র—সহজ মুখ্য কেশব খাঁর
—বা স মু মালাধর ঘোষ—আছে,-গু-স মু কাকুৎস্থ-সুত ।
দ্বিতীয় পুত্র—বাড়ি কোমল মুখ্য নীলাম্বর খাঁ
—বা, বা ভিঙী পরাশর ঘোষ আদান প্রদান ।

তৃতীয় পুত্র—বাড়ি কোমল শ্রীনিবাস খাঁ—
আ, ম বঙ্ক পরাশর ঘোষ কো মু গদাধর সুত।
চতুর্থ পুত্র—বাড়ি কোমল নরহরি খাঁ—
আ তে মালাধর ঘোষ তে মথুর সুত
নবরঙ্গ কুলহেতু মহতি গুণ।

দান

প্রথম কন্যা। আ কো মু যুধিষ্ঠির ঘোষে কো মু
গদাধর সুত।
২য় কন্যা। ব ম শ্রীমান মিত্রে ম ভাগীরথী সুত।
৩য় কন্যা। বা কো মু শিব ঘোষ—কো মু
কৃষ্ণ ঘোষ সুত।
১ম মে। ব স মু পরাশর মিত্রে—আছে, গু—স মু
হেরম্ব সুত।
চছে। বা বা ক ভিণ্ডী পরাশর ঘোষে,-গু-স মু
কাকুৎস্থ ঘোষের ২য় সুত।
তে ছে। আ, ছ, ঈশান ঘোষে-গু- বা ক সদানন্দ সুত।
চ ছে। ব ম দেবরাজ মিত্রে,-গু-ম পরমেশ্বর মিত্র হাজরা সুত।
প ছে। ব, তে মালাধর মিত্রে,-গু-তে শঙ্কর মিত্রের বংশ।
গ ছে। বা ম২ কন্দমান ঘোষে—কো মু কৃষ্ণ ঘোষ ৫ম সুত।
গ ছে। আ, ম২ লক্ষ্মীনাথ ঘোষ।
গ ছে। টে, ছ২ নিবাস মিত্রে—ছ সুরেশ্বর ২য় সুত।

পুরন্দর খানের দান এবং গ্রহণ সম্বন্ধে সার্বভৌম নন্দরাম মিত্রের কারিকায় যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহার সহিত কায়স্থ কারিকায় লিখিত বিবরণের সহিত সকলগুলির মিল হয় না। কায়স্থ কারিকায় লিখিত দান ও গ্রহণ শুদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

একখানি প্রাচীন পুস্তকে লিখিত আছে যে পুরন্দর খাঁর প্রথমা কন্যার বিবাহ আকনার প্রকৃত মুখ্য শূলপাণি ঘোষের দ্বিতীয় পুত্র মদন ঘোষের সহিত দেন। দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ সুদর্শন ঘোষ সর্বাধিকারীর পৌত্র আকনার কোমল মুখ্য গদাধর ঘোষের সহিত দেন। তৃতীয়া কন্যার বড়িশার প্রকৃত মুখ্য কুবের মিত্রের

সহিত এবং চতুর্থ কন্যার শ্রীমান মিত্রের সহিত বিবাহ দেন। একরাত্রে একলগ্নে তাঁহার দুই কন্যার বিবাহ পরাশর মিত্র এবং শিবঘোষের সহিত দেন।

গোপীনাথ বসু মহাশয়ের পাঁচ পুত্রই বিদ্বান ও যশস্বী ছিলেন এবং রাজদরবারে উচ্চ রাজপদ এবং খেতাব প্রাপ্ত হন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র কেশব বসুর সহজ মুখ্য কাকুৎস্থ ঘোষের পুত্র মালাধর ঘোষের কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া কুলকর্ম করেন। ছত্রনাজির কেশব বসু একজন মহাপুরুষ এবং পিতার ন্যায় সবগুণাধার ছিলেন। তাঁহার বিষয় পর অধ্যায়ে সবিশেষ বর্ণনা করিব।

দ্বিতীয় পুত্র নীলাম্বর নবাব দরবার হইতে নীলাম্বর খান উপাধি প্রাপ্ত হন। বাড়ি কোমল মুখ্য পরাশর ঘোষের কন্যার সহিত বিবাহ হয় এবং এক ভগ্নীর বিবাহও উক্ত পরাশর ঘোষের পুত্রের সহিত হয়।

"বসুঃ সোপি নীলাম্বরঃ খান বর্য্যঃ প্রস্থানন্নিম্বরেজে ভূমাং দেবরাজ"।

তৃতীয় পুত্র শ্রীনিবাস বসুর বিবাহ গদাধর ঘোষের পুত্র পরাশর ঘোষের কন্যার সহিত হয়।

ঘটক বিশারদের সংস্কৃত সমীকরণ কারিকায় শ্রীনিবাসকে বসু মল্লিক বলিয়া উল্লেখ করিতে দেখা যায়।

> পুরন্দর খান সুত ২৪প বা ক শ্রীনিবাস বসোঃ
> খ্যাত শ্রীলনিবাস মাল্লক বসু ধর্ন্যো ধরামণ্ডলে
> দানাৎ শ্রীল কলাধরো গুণযুতো সংবদ্ধমানো বভৌ।

চতুর্থ পুত্র নরহরি বাড়ি কোমল মুখ্য নবাব দরবারে উচ্চ রাজপদে থাকিয়া নরহরি খাঁ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

> নরহরি বসুরেষ জ্ঞানবান্ শঙ্করেহসৌ
> বিতরতি খলু দানং বদ্ধমানতিহৃষ্টঃ।

পঞ্চম পুত্র হরিহর বসু বিশেষ গুণবান ও সদাশয় লোক ছিলেন। সংস্কৃত কারিকায় হরিহরকেও মল্লিক উপাধি ভূষিত দেখা যায়।

> পুরন্দর সুত ১৪প বা ক মল্লিক হরিহরশ্চ—
> হরিহর বসুরেষ জ্ঞানবান্ শুদ্ধবেশো
> বিতরণমথ চক্রে ঘোষ গৌরীবরোহপি।

চন্দ্রদ্বীপপতি পরমানন্দ বসু

প্রাচীন ঐতিহাসিক নানারূপ গ্রন্থাদি হইতে প্রমাণ হইয়াছে যে মহারাজ পুরন্দর খান যখন দক্ষিণ বঙ্গে নানারূপ সমাজ সংস্কারে রত থাকিয়া বসুবংশের যশ ও প্রতিভার কিরণে চতুর্দিক আলোকিত করিয়াছিলেন, সেই সময় তাঁহারই জ্ঞাতি পরমানন্দ বসু পূর্ববঙ্গে একটি হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া বলশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

"বসুবংশ ছত্রধারী, চন্দ্রদ্বীপের অধিকারী।"

মহারাজ বল্লালসেনের স্বর্গারোহণের পর তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন বঙ্গসিংহাসনে বসেন। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ-ই-বখতিয়ার বিপুল দলবলে আসিয়া তাঁহার রাজধানী নদীয়া দখল করিয়া মুসলমান রাজত্ব স্থাপন করেন। লক্ষ্মণসেন পূর্ববঙ্গে সপরিবারে পলায়ন করিয়া এবং পূর্ববঙ্গে গিয়া চন্দ্রদ্বীপে রাজধানী স্থাপন করিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। ১৩০০ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের পৌত্র মহারাজ দনৌজমাধব চন্দ্রদ্বীপের একচ্ছত্র অধিপতি ও মহাপরাক্রমশালী রাজা হন। ঘটকচূড়ামণির বঙ্গজ কারিকায় লিখিত আছে যে, লক্ষ্মণসেনের সমীকরণের সময় উপস্থিত সমীকুলীন গৌতম গোত্রীয় বসু-বংশের পুরবসুর তৃতীয়া কন্যার সহিত দনৌজমাধবের বিবাহ হয়। মহারাজ দনৌজমাধব বঙ্গজ সমাজে সমাজপতি হইয়া একজাই সভা করিয়া কুলীন ব্রাহ্মণগণের সমীকরণ করান। উক্ত সেনকুলতিলক মহারাজ দনৌজমাধবের পঞ্চম পুরুষ অধস্তন জয়দেব কোন পুত্রসন্তান না রাখিয়া কালগ্রাসে পতিত হন। উক্ত জয়দেবের স্বর্গারোহণের পর, কুলীনপ্রবর বলভদ্র বসুর পুত্র পরমানন্দ বসু দৌহিত্র হিসাবে মাতামহের চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মহাপরাক্রমশালী রাজা হইয়া পূর্ববঙ্গের একচ্ছত্র আধিপত্যলাভের জন্য দূর-দেশবাসী বৈদেশিক রাজাদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া চন্দ্রদ্বীপরাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পরমানন্দ বসু গৌতম গোত্রীয় আদিপুরুষ দশরথ বসু হইতে ১৫ পর্যায়ের মুখ্য কুলীন ছিলেন।

বাকলা, চন্দ্রদ্বীপ, বিক্রমপুর, ইদিলপুর ইত্যাদি পূর্ববঙ্গের স্থানসমূহ চন্দ্রদ্বীপ অধিপতির রাজ্যমধ্যে অধিকারভুক্ত হয়। পরমানন্দ বসু রায় সকল বঙ্গজ কায়স্থগণকে সম্মিলিত করিয়া একজাই বা সমীকরণ করেন। এবং দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থগণের মধ্যে পুরন্দর খান যেরূপ কুলবিধি সকল প্রণয়ন করেন, বঙ্গজ কায়স্থগণের সমাজ শাসনের জন্য মহারাজ পরমানন্দ বসু সেইরূপ কুলবিধি

সকল গঠন করান। গুহবংশকে বঙ্গজ সমাজে কুলীন পদ দেওয়া হয়। বঙ্গজ কুলীন গুহবংশজ মহারাজ প্রতাপাদিত্য যশোহরে রাজধানী স্থাপন করিয়া নিজ বাহুবলে মুসলমান সম্রাটের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ স্বাধীন করিয়াছিলেন। যশোহরাধিপতি রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ পুত্র মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা বিন্দুবাসিনীর সহিত চন্দ্রদ্বীপাধিপতি রাজা রামচন্দ্র বসুর শুভবিবাহ দেন।

—

সপ্তম অধ্যায়

ছত্রনাজির কেশব বসু খান

মহাত্মা গোপীনাথ বসুর স্বর্গারোহণের পর তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কেশব বঙ্গ সমাজে কায়স্থগণের মধ্যে সমাজপতি এবং রাজদরবারে পিতৃপদ প্রাপ্ত হন।

কেশব ১৪ পর্যায়ের প্রধান মুখ্য কুলীন ছিলেন এবং বাল্যকাল হইতে পিতার সহিত থাকিয়া সকল কুলবিধি ও কুলশাস্ত্র সম্যক জ্ঞাত হন। তিনি বাল্যকাল হইতে মেধাবী এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সাহসী বীর ছিলেন। সংস্কৃত ও পারস্য ভাষা সম্যক শিক্ষা করিয়া বিশেষ সাহিত্যানুরাগী হন। তাঁহার লিখিত পুস্তক ও কাব্য বিষয় এখনও প্রাচীন পুস্তকে উল্লেখ পাওয়া যায়। বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গৌড়েশ্বরের রাজদরবারে তিনি যশস্বী পিতার সহিত রাজকার্য শিক্ষা করেন এবং রাজদরবারের কার্যে নিযুক্ত হন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি অতুল ঐশ্বর্যের অভিভাবক হইয়াও নিজ কুলগৌরব এবং বংশমর্যাদা ভুলেন নাই। কেশব খান গৌড়ের নবাবের শরীররক্ষক এবং রাজকোষ রক্ষণাবেক্ষণের মন্ত্রী ছিলেন। পরে প্রধানমন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন এবং তাঁহার চারি ভ্রাতা নীলাম্বর, শ্রীনিবাস, নরহরি এবং হরিহর সকলেই রাজদরবারে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া নবাব সরকার হইতে উপাধি প্রাপ্ত হন।

বঙ্গাধিপতি হোসেন শাহ কেশব বসুর কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "ছত্রনাজির কেশব খাঁ" উপাধিতে বিভূষিত করিয়া বহু মূল্যবান জায়গীর উপহার দেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে এই বসুমল্লিক বংশের অনেক বংশধর রাজদরবারে বড় বড় উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া সসম্মানে বংশগৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। দশরথ বসু হইতে একাদশ পর্যায়ে মহীপতি বসু বা সুবুদ্ধি খাঁ, তৎপুত্র শ্রীমন্ত বা ঈশান খাঁ, তৎপুত্র গোপীনাথ বা পুরন্দর খান পর পর পাঁচ পুরুষে বঙ্গেশ্বরের রাজদরবারে সসম্মানে উচ্চ রাজমন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইয়া অশেষ ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন। পুরন্দর খাঁ নবাব দরবারে Financial Minister অর্থসচিব ও নৌ সেনাপতি Naval Commander ছিলেন। কেশব খাঁ বঙ্গেশ্বরের

শরীররক্ষক, সেনাদলের সেনাপতি এবং পরে রাজস্ব সচিব পদ পাইয়াছিলেন। এইরূপ বংশপরম্পরায় উচ্চ রাজপদে থাকিয়া মন্ত্রীত্ব করিয়া যাইবার ইতিহাস অন্য কোন প্রাচীন বংশে বড় দেখা যায় না। পুরন্দর খাঁ এবং কেশব খাঁ এবং তাঁহার অন্যান্য জ্ঞাতিগণ বিশেষ যোদ্ধা ও বলশালী ছিলেন। মহীপতি বসু হইতে তাঁহার প্রপৌত্র কেশব খাঁ রাজনৈতিক এবং সমাজনৈতিক সকল কর্মেই বুদ্ধি-বিবেচনা শক্তির প্রখরতা ও সর্ব বিদ্যার পারদর্শিতায় সেই সময়ে বঙ্গদেশে যে প্রাধান্য দেখাইয়া গিয়াছেন সেরূপ প্রাধান্য অতি অল্প বংশেই দেখা গিয়াছে। বঙ্গের ইতিহাসই ইহার প্রমাণ।

জমিদার :—এই যুগে বঙ্গদেশে কায়স্থগণের প্রভাব প্রতিপত্তি ও বুদ্ধি সর্ব জাতির মধ্যে মস্তক উন্নত করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রাচ্যতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের লেখনী, তাম্রশাসন, শিলালিপি, কুল-পঞ্জিকা, পুথি ইত্যাদি নানাবিধ ঐতিহাসিক প্রাচীন উপাদান হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে এই বঙ্গদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে কায়স্থগণ সর্ব-বিষয়ে যেরূপ প্রভুত্ব করিয়া আসিতেছেন সেরূপ কোন সম্প্রদায়কেই করিতে দেখা যায় না। প্রায় সকল জমিদারই এই কায়স্থরাই হইয়া আসিতেছেন। পূর্বেই লিখিয়াছি মুসলমান সম্রাটগণ রাজধানীতে থাকিয়া বড় বড় জমিদারদিগের নিকট হইতে মাত্র রাজস্ব আদায় করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। জমিদারগণই প্রকৃত দেশের শাসনকর্তা ছিলেন। নবাব সরকার হইতে দেশের আভ্যন্তরিক কোনরূপ শাসনে হস্তক্ষেপ করেন নাই। জমিদারই আভ্যন্তরিক সকলরূপ শাসনকার্য চালাইতেন। জমিদারগণের সেনা, গড়, কেল্লা, কামান ইত্যাদি সকলরূপ যুদ্ধের উপকরণ রাখিবার ক্ষমতা ছিল এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী সকলরূপ বিচারালয় রাখিতে হইত। মুসলমান রাজত্বকালে জমিদার ও বড় বড় জায়গীরদারগণ করদ রাজাদিগের মত ছিলেন। জমিদারগণ নবাব সরকারে বৎসর বৎসর রাজস্ব প্রেরণ করিলেই নবাব সরকার সন্তুষ্ট থাকিত। অনেক সময় এই জমিদারগণের মধ্যে কেহ কেহ বলশালী হইয়া স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেন।

আকবর সাহের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে "বারভূঁইয়া" নামক পরাক্রান্ত জমিদারগণ নিজেরা স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং মহাপরাক্রমশালী দিল্লীশ্বরের ফৌজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য, ভূষণার লক্ষ্মণমাণিক্য, বিক্রমপুরের কেদার রায় ইত্যাদি পরাক্রান্ত জমিদারদিগের নাম এখনও বাঙ্গলার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে সাক্ষ্য দিতেছে।

মহারাজ পুরন্দর খান এবং ছত্রনাজির কেশব খাঁর সময় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেবের বঙ্গদেশে আবির্ভাব হয় এবং পিতাপুত্র উভয়েই মহাপ্রভুর বিশেষ ভক্ত হইয়া উঠেন। কেশব খান মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার একজন প্রধান বিশ্বস্ত শিষ্য হন। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী-লেখকদের মধ্যে কবি কর্ণপুর সর্বপ্রধান। তৎকৃত চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকের নবম অঙ্কে লিখিত আছে—

"কেশব বসু নাম্না তদমাত্যেন কথিতম্ শূরত্রাণ শ্রীচৈতন্য নামকোঽপি মহা-পুরুষঃ পুরুষোত্তমান্মথরাং প্রযাতি, তদ্দিদৃক্ষয়া অমী লোকাঃ সঞ্চরন্তি।"

মহাপ্রভু হরিনাম করিতে করিতে মথুরার পথে তদানীন্তন গৌড়ের রাজধানী রামকেলীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহাপ্রভুর চতুর্দিকে অগণিত লোক। গৌড়ের মুসলমান শাসনকর্তা হুসেন সাহ লোকসমাগম দেখিয়া বিচলিত হইলেন এবং অমাত্য "কেশব বসুকে" তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কেশব বসু বলিলেন "শূরত্রাণ, শ্রীচৈতন্য নামক কোন মহাপুরুষ পুরুষোত্তম হইতে মথুরায় যাইতেছেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য এই সকল লোক সঞ্চরণ করিতেছে।"

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর চৈতন্য ভাগবতে এই ঘটনা সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন—

ঐছে চলি আইলা প্রভু রামকেলী গ্রাম।
গৌড়ের নিকট অতি অনুপাম॥
তাঁহা নৃত্য করে প্রভু প্রেমে অচেতন।
কোটি কোটি লোক আইল দেখিতে চরণ॥
গৌড়েশ্বর যবন রাজা প্রভাব শুনিঞা।
কহিতে লাগিল কিছু বিস্ময় হইয়া॥
বিনা দানে এত লোক যায় পাছে হয়।
সেইত গোসাঞি ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
কাজি যবন কেহো ঞিহার না কর হিংসন।
আপন ইচ্ছায় বলুন যাহা উহার মন॥
কেশব ছত্রীরে রাজা বার্ত্তা যে পুছিল।
প্রভুর মহিমা ছত্রী উড়াইয়া দিল॥
ভিখারী সন্ন্যাসী করে তীর্থ পর্য্যটন।
তারে দেখিবারে আইসে দুই চারিজন॥
যবনে তোমার ঠাই করয়ে লাগনি।
তার হিংসায় লাভ নাহি হয় মাত্র হানি॥

রাজারে প্রবোধি ছত্রী ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া।
চলিবার তরে প্রভুরে পাঠাইল কহিয়া॥
দবীর খানেরে রাজা পুছিল নিভৃতে।
গোসাঞিের মহিমা তিঁহ লাগিল কহিতে॥
যে তোমারে রাজ্য দিল তোমার গোসাঞা।
তোমার ভাগ্যে তোমার দেশে জন্মিল আসিঞা॥
তোমার মঙ্গল বাঞ্ছে বাক্য সিদ্ধ হয়।
ইহার আশীর্ব্বাদে তোমার সর্ব্বত্রেতে জয়॥
মোরে কেন পুছ তুমি পুছ আপন মন।
তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু অংশ মম॥
তোমার চিতে চৈতন্যের কিছু হয় জ্ঞান।
তোমার চিত্তে যেই লয়ে সেইত প্রমাণ॥
রাজা কহে শুন মোর চিত্ত এই লয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর ইহোঁ নাহিক সংশয়॥
এত কহি রাজা গেল নিজ অভ্যন্তর।
দবীর খান আইলা তবে আপনার ঘর॥
ঘরে আসি দুই ভাই যুকতি করিয়া
প্রভু দেখিবারে চলে বেশ লুকাইয়া।
অর্দ্ধরাত্রে দুই ভাই আইলা প্রভুর স্থানে।

—চৈতন্য ভাগবত, মধ্যখণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ।

বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের চৈতন্য ভাগবতে কেশব খান সম্বন্ধে আমরা আরো বর্ণনা পাই—

কেশব খানেরে রাজা ডাকিয়া আনিয়া।
জিজ্ঞাসয়ে রাজা বড় বিস্মিত হইয়া।
কহত কেশব খান কি মত তোমার।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য বলি নাম বলে যার॥

—চৈতন্য ভাগবত, অন্ত্যখণ্ড।

প্রভুর মহিমা কেশব খাঁ গৌড়ের অধিপতিকে বুঝাইয়া দিলে হোসেন সাহ কেশব খাঁকে বলিয়াছিলেন—

সর্ব্বলোক লই সুখে করুন কীর্ত্তন।
কি বিরলে থাকুন যে লয় তার মন॥
কাজী বা কোটাল বা তাঁহাকে কোনজনে।
কিছু বলিলেই তার লইমু জীবনে॥

—অন্ত্যখণ্ড, চতুর্থ অধ্যায়, পৃ ৪২৩।

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের বিরচিত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-বংশবিস্তারে মধ্যলীলায় উত্তর দেশ ভ্রমণ নামক অষ্টম স্তবকে বর্ণিত আছে—

রামকেলী হইতে কেশব ছত্রীর নন্দন।
সে আইল প্রভুকে করিতে নিমন্ত্রণ॥
হস্তি রথ অশ্ব দোলা অনেক আইল।
দূরে রাখি পদব্রজে প্রভুপাশে আইল॥
এক বিপ্র সঙ্গে মাত্র গ্রাম্য লোক যত।
প্রভু কহে ইহা কোন ভাগ্যবান হয়॥
আইস আইস করি সব বৈষ্ণব কহয়॥
প্রভুকে জানায় ইহা রাজার উজীর।
কেশব ছত্রীর পুত্র পণ্ডিত গম্ভীর॥
নিকটে আইস বস বলি প্রভু আজ্ঞা কৈলা।
ভীত হইয়া দুর্ল্লভ ছত্রী নিকটে আইলা॥
প্রভুর সৌন্দর্য্য দেখি হইলা বিস্মৃতি।
পূর্ব্বে যেন দেখেছিল গৌরাঙ্গ মূরতি॥

শ্রীল নরহরি দাস কৃত 'ভক্তি রত্নাকর' একখানি প্রসিদ্ধ প্রাচীন বৈষ্ণব ইতিহাস। তাহাতে লিখিত আছে—

গণ সহ সনাতন রূপে কৃপা করি।
রামকেলী হইতে যাত্রা কৈল গৌর হরি॥
"কেশব ছত্রিন" আদি যত বিজ্ঞগণ।
হইল কৃতার্থ পাই প্রভুর দর্শন॥

কেশব খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাস খান বাল্যকাল হইতে ধর্মভাবাপন্ন থাকিয়া মহাপ্রভুর বিশেষ ভক্ত হন এবং তাঁহার নামও শ্রীকৃষ্ণ রাখা হয়। প্রাচীন গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণকে দুর্লভ নামেও অভিহিত করা হইয়াছে। উপরি লিখিত প্রাচীন পদাবলীতে কেশব বসুকে 'কেশব ছত্রী' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে.

'ছত্রি' ক্ষত্রিয় শব্দের অপভ্রংশ ও জাতিগত উপাধি। উপরি লিখিত প্রাচীন কবিগণ অনেকেই ব্রাহ্মণ হইয়াও কেশব বসুকে ছত্রি বা ক্ষত্রিয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে কায়স্থগণ শূদ্র নহে, চিরকাল ক্ষত্রিয়। রঘুনন্দন পণ্ডিতের সময়েও যে বাঙ্গালা দেশের কায়স্থ জাতিকে সকলে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিত তদ্বিষয়ে ইহা অকাট্য প্রমাণ।

কেশব খান মহাশয়ের মন্ত্রীত্বকালে রাজদরবারে রূপ ও সনাতন দুই ভাই মন্ত্রীত্ব কার্য করিতেন এবং রাজদরবার হইতে রূপ দবীর খাঁ এবং সনাতন শাকর মল্লিক উপাধি প্রাপ্ত হন। এই দুই ভাই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের বিশেষ ভক্ত ও শিষ্য হন।

রামকেলী :—বসু বংশের কেহ কেহ রাজপদ এবং উপাধি প্রাপ্তির সহিত 'রামকেলী' নামক স্থানে জমিদারী করেন এবং তথায় গিয়া বাস করিতেন। কেশব খান যে উক্ত রামকেলী নামক স্থানে গিয়া বাস করিয়াছিলেন তাঁহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। উক্ত রামকেলী সম্বন্ধে শ্রীবৃন্দাবন ঠাকুর তাঁহার বিরচিত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-বংশবিস্তারের মধ্যলীলায় লিখিয়া গিয়াছেন :—

মহানন্দো ধারে এক মালদহ গ্রাম।
বহুভাগ্যবন্ত লোক তাহাতে বৈসয়॥

মালদহ জেলার মালদহ সহর হইতে ৮ মাইল দূরে এবং প্রাচীন গৌড়ের অনতিদূরে রামকেলী গ্রাম এখনও বর্তমান আছে। এই রামকেলীতে শ্রীচৈতন্য-দেব পদধূলি দিয়াছিলেন এবং তথায় এখনও অনেক প্রাচীন কীর্তি বর্তমান আছে। ইহা রূপ-সনাতনের পৈত্রিক গ্রাম এবং শ্রীরূপ গোস্বামীর রূপসাগর দীঘি, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, তমাল ও কেলীকদম্ব তলে শ্রীগৌরাঙ্গের চরণচিহ্ন এখনও দেখা যায়। রূপ-সনাতন এখানে মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। মদনমোহন এখানে গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছেন বলিয়া ইহা গুপ্ত বৃন্দাবন নামে পরিচিত। রামকেলীর অদূরে প্রাচীন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ রহিয়াছে। রামকেলীকে এখন অনেকে শ্রীপাট রামকেলী বলে এবং প্রতিবৎসর আষাঢ় মাসে ঐস্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের তথায় গমনের স্মৃতি উৎসব হইয়া থাকে এবং বৈষ্ণব ভক্ত ও মোহন্তগণ সমবেত হইয়া কীর্তনাদি করেন।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার মহাশয় ১৩৩৪ সনের ফাল্গুন মাসের 'কায়স্থ পত্রিকায়' সুবুদ্ধি রায় নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—

"কুলগ্রন্থে দশরথ বসুর অধস্তন ১৩শ পর্য্যায়ে পুরন্দর খানস্য কুল লিখিত

হইয়াছে। তদীয় পুত্র কেশব খাঁ ১৪শ পর্য্যায় লিখিত আছে কেশবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ বসু বিশ্বাস খান। সম্ভবতঃ ইহা দুর্ল্লভ ছত্রীর নামান্তর থাকে। শ্রীকৃষ্ণের পুত্রদ্বয় আর্য্য ১৬শ পর্য্যায় অনন্ত রায়। তৎপুত্র ১৭শ পর্য্যায় বসু ও চাঁদ মল্লিক এবং সুন্দরবর খাঁ লিখিত হইয়াছে। ১৭শ পর্য্যায়ের পর হইতে খাঁ, রায়, "মল্লিক" উপাধি বংশে কাহারও নূতন হওয়া দৃষ্ট হয় না। এই সময় গৌড় হইতে ঢাকায় রাজধানী হয়। তজ্জন্যই নবাব-সরকারে বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে বহু দূরদেশে কেহ যান নাই ইহাই মনে হয়। যাহা হউক, পুরন্দরের বংশ বিত্তাদিভব সম্পন্ন হইয়া কিছুকাল রামকেলিতে বাস করিয়া রাজ দরবারের কার্য্য করিতেন।"

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে হোসেন সাহ নরপতির শাসনকালে পণ্ডিত বিজয় গুপ্ত 'পদ্মপুরাণ' নামক কাব্য রচনা করেন। তাহার একস্থানে আছে—

খুসি হৈয়া মহারাজ দিলা পুষ্পমালা।
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া॥
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাঠের পাছড়া॥

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রবাবু তাঁহার দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ডে লিখিয়াছেন—

"পুরন্দর খাঁয়ের উপদেশ মত তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কেশব বসু ১৪শ পর্য্যায়ের একজাই করিয়া সমগ্র দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থসমাজের গোষ্ঠীপতি হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি মহাপ্রভু চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে কেশব বসু "কেশব ছত্রী" নামে পরিচিত। তিনি সুলতান হোসেন সাহের "ছত্রনাজির" বা সুলতানের গার্হস্থ্য সকল বিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। রাজপ্রাসাদে বা দরবারে ছত্র ও আশাসোটা ব্যবহারে অধিকার থাকায় সর্ব্বসাধারণে তাঁহাকে কেশব ছত্রী বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। তিনি মহাপ্রভুর একজন অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। সুলতান তাঁহার পরামর্শে মহাপ্রভুর রামকেলী গমন কালে কেহ যাহাতে বাধা না দেয় তাহার ব্যবস্থা করেন। কেশব বসুর একযাই সভায় যে সকল কুলীন উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে ১৪শ পর্য্যায়ে ৫জন প্রকৃত মধ্যে গণপতি ঘোষ, ৬জন সহজ মধ্যে বিনোদ বসু খান ও ৮জন কোমল মুখ্য মধ্যে গোপাল ঘোষ অগ্রগণ্য ছিলেন।

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি মহারাজ পুরন্দর খাঁর যত্নে ও উৎসাহে কুলাচার্য্যগণ সকল কুলীন বংশের অংশ ও বংশ লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করেন। পুরন্দর খান, তৎপুত্র কেশব খান এবং তৎপুত্র শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাস খান পর পর একজাই বা

সমীকরণ করিয়া গোষ্ঠীপতি হন এবং ঐ সকল সমীকরণ বা একজাই সভায় যে সকল কুলীন উপস্থিত হইতেন তাহাদের সমীকুলীন বলিত এবং সমাজে তাঁহারা উচ্চাসন পাইতেন এবং তাঁহাদের মর্য্যাদা বৃদ্ধি হইত। প্রত্যেক একজাই বা সমীকরণ সভায় যে যে কুলীন উপস্থিত ছিলেন কুলাচার্য্যগণ তাঁহাদের অংশ ও বংশের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।"

নগেন্দ্রবাবু তাঁহার বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ডে উক্ত গোষ্ঠীপতি বংশের ইতিহাস এবং একজাই সভার সম্পূর্ণ বিবরণ ও কবি কুলজ্ঞগণের কারিকা সকল প্রকাশ করিয়া কুলীনগণের অশেষ উপকার করিয়াছেন এবং তাঁহার উক্ত গ্রন্থে এই বসুবংশের বংশলতা, আদান-প্রদান, প্রভৃতির ইতিহাস ও সংস্কৃতি ও বসুবংশের গৌরব যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে তাঁহার পরিশ্রমের ঋণ পরিশোধ করা আমাদের সাধ্যাতীত। তাঁহার উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কারিকা সকল বহুপ্রাচীন এবং বহু গুণী কবির রচনা। উক্ত অমূল্য প্রাচীন পুস্তক কুলপঞ্জিকা, ও কুলকারিকা বা ঢাকুরগুলি হইতে বসুবংশের ইতিহাস তিনি যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা সকল বংশধরেরই সম্যক জ্ঞাত হইবার কৌতূহল থাকা উচিত।

ঘটকবিশারদের সংস্কৃত সমীকরণ কারিকায় লিখিত আছে—

পুরন্দর খানস্য সুত ১৪প স মু কেশব খানস্য কুল।

খানঃ কেশব সংজ্ঞকঃ ক্ষিতিতলে দানেন হীনো মহানাদানাদ নিরুদ্ধ মিত্র তনয়াং সংপ্রাপ্য তুষ্টিং যযৌ। যঃ পশ্চাৎ কিল বংশমিত্র তনয়াব্দাদায় মুখ্যাগ্রণী ঘোষে ভাস্কর সংজ্ঞকে বিজয়তে গোরীশমিত্রে গ্রহাৎ॥

সার্বভৌম ঢাকুরীতে দেখা যায়—

অনিরুদ্ধ পাইয়া কেশব খানের উত্থান।
আর পাছে কংসারি মিত্র বড় অপমান॥
তৎপশ্চাৎ ভাস্কর ঘোষ কুলে বড় দাপ।
চৌঠ গ্রহণ দৈত্যারি ঘোষ ঘুচায় কুলের তাপ॥
সার্ব্বভৌম ঢাকুরী এই কুলে হইল ডাক।
বাপে কৈল ছেই পত্তন পুত্রে কৈল পাক॥
সনাতন মিত্রে প্রথম কন্যা প্রামাণিকে দান।
অনিরুদ্ধ মিত্রে গ্রহণ কুলে গুণ পান॥

প্রকৃত মুখ্যের সাম্য পাইয়া ঈশান তুল্য গণি।
বলাৎকারে কংসারি মিত্র দোজ গ্রহণ জানি ॥
তৃতীয় গ্রহণ ছভায়া কুল ঘোষ ভাস্কর।
চৌঠ গ্রহণ গোরীমিত্র দুহে অকুপর।
ইহার পর আর কার্য্য সাম্য নহে দেখি।
ভরত ঘোষ নারায়ণ ঘোষ দুই পৌত্রী লিখি ॥
ঘটক শেখর বলেন ইহার কুলে হইল ডাক
বাপেতে করিল কুল পুত্রদ্বারে পাক।

কায়স্থ কারিকায় কেশব খানের দানের বিষয় উল্লেখ নাই, কেবল চারিটি গ্রহণের বিষয় উল্লেখ আছে।

ব প্র মু অনিরুদ্ধ মিত্র আছ গু, প্র মু নৃসিংহ সুত।
২য় গ্র ব কো মু কংশোরি মিত্র পথে—কো মু লক্ষ্মীপতির ২য় সুত।
৩য় গ্র। বাছ ভাস্কর ঘোষ-ক ভিওি পরাশর সুত।
৪র্থ গ্র। ব তে কছি গৌরীনাথ মিত্র-তে শুক্লাম্বর সুত।

ছত্রনাজির কেশব বসু খানের চারি পুত্র
প্রথম—সহজ মুখ্য শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাস খাঁ
দ্বিতীয়—বাড়ি সহজ মুখ্য চক্রপাণি ছত্রনাজির
তৃতীয় পুত্র—বাড়ি কোমল মুখ্য কামদেব বিশ্বাস খাঁ
চতুর্থ পুত্র—বাড়ি কোমল রতিনাথ ছোট ঠাকুর।

কেশব খাঁ চারি পুত্রের যথাযোগ্য কুলীনের ঘরে বিবাহ দিয়া বংশমর্যাদা বৃদ্ধি করেন।

প্রথম পুত্র শ্রীকৃষ্ণের সহিত নৃসিংহ মিত্রের পুত্র অনিরুদ্ধর কন্যার সহিত হয়।

দ্বিতীয় পুত্র—চক্রপাণির লক্ষ্মীপতি মিত্রের পুত্র কংসারি মিত্রের কন্যার সহিত হয়।

তৃতীয় পুত্র—কামদেবের ভিওি পরাশর সুত ভাস্কর ঘোষের কন্যার সহিত হয়।

কনিষ্ঠ পুত্র—রতিনাথের শুক্লাম্বর মিত্রের পুত্র গৌরীনাথের কন্যার সহিত হয়।

কায়স্থ কারিকায় রতিনাথের বিবাহ গৌরীনাথের কন্যার সহিত উল্লেখ দেখা

যায় কিন্তু সার্বভৌমের কারিকায় দৈত্যারি ঘোষের কন্যার সহিত উল্লেখ দেখা যায়।

ঘটকশেখরের কারিকায় কেশব বসুর এক কন্যার সনাতন মিত্রের পুত্রের সহিত বিবাহের উল্লেখ আছে।

কেশব ছত্রী যে একজন বড় কবি ছিলেন তাহার প্রমাণ বহু প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়। তিনি অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। রূপ গোস্বামী সঙ্কলিত 'পদ্যাবলী'তে তাঁহার লিখিত অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। নিম্নলিখিত শ্লোকটি তাঁহার 'গোরক্ষ-লীলা' নামক গ্রন্থে লিখিত ছিল—

যাবদ্ গোপামধুরমুরলীনাদ মত্তা মুকুন্দং
মন্দস্পন্দৈরহহ সকলৈর্লোচনৈ বাপিবন্তি।
গাবস্তাবণ্মস্থণ যবস-গ্রাস-সুব্যধা বিদুরং
যাতা গোবর্দ্ধনগিরিদরী-দ্রোণিকাভ্যন্তরেষু॥

শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাস খান

কেশব বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণ পিতার ন্যায় যশস্বী এবং গুণবান ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার তিন সুযোগ্য ভ্রাতা নবাব দরবারে উচ্চ রাজপদ প্রাপ্ত হন এবং উজিরের কার্য করিতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাস নিজ বুদ্ধিবলে বঙ্গেশ্বরের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন এবং গৌড় সুলতানের নিকট হইতে 'বিশ্বাস খাঁ' উপাধি এবং জায়গীর প্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ নবাবের নিকট হইতে বিশ্বাস খাঁ উপাধির সঙ্গে যে জায়গীর প্রাপ্ত হন তাহা পুরন্দরপুরের দক্ষিণে শ্রীকৃষ্ণপুর নামে এখনও পরিচিত রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ মাহীনগরে পিতা-পিতামহের উদ্যান সুশোভিত রাজপ্রাসাদতুল্য বৃহৎ অট্টালিকায় বাস করিতেন এবং তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি অতুলনীয় ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ ১৫ পর্যায় সকল কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণের একজাই বা সমীকরণ করিয়া পিতার ন্যায় গোষ্ঠীপতি হন। কেশব খানের চারি পুত্রই বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও সর্বজনপ্রিয় হইয়া সমাজে বিশেষ নাম রাখিয়া গিয়াছেন।

বাচস্পতির কুলপঞ্জিকায় প্রথিত যশস্বী চারি ভ্রাতার বিষয় বর্ণিত আছে—

রেজে পুরন্দরসুতাঃ কিল কেশবোঽসৌ
নীলাম্বরঃ শুচিনিধামনুহরি প্রতিষ্ঠে

জাতঃ পুনর্হরিহরো বসুপুঙ্গবোহয়ং
খ্যাতাহি পঞ্চ বসু কলাবতংসোঃ ॥
ক্ষিতৌ শ্রীকৃষ্ণবসুঃ সার্ব্বভৌমস্ততশ্চত্রনাজীরকশ্চক্রপাণি
সবিশ্বাসখাসোহভবৎ কামদেবৌ রতিনাথ সমাত্মজাঃ
কেশবস্য।

অভূর্চ্চ শ্রীলকৃষ্ণাত্মজোহমন্তরায়ৌ রঘুস্তস্য পুত্রং
সদাচারুকীর্ত্তিঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ মহা ধার্মিক ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন। পিতা ও পিতামহের পদানুসরণ করিয়া তিনি ভ্রাতাগণের সহিত একত্র হইয়া ১৫শ পর্যায় দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীন ও মৌলিক কায়স্থগণের একজাই বা সমীকরণ করিয়া গোষ্ঠীপতি হন। তিনি সমাজপতি হইয়া এবং রাজদরবারে ও সমাজে শ্রেষ্ঠ পদে অধিষ্ঠিত থাকায় সকল বঙ্গবাসীর বিশেষ সম্মানের পাত্র হন। এই সময়ে কেশব খানের চারি পুত্রই অশেষ যশস্বী ও ধনবান হওয়ায়, মাহীনগরের পুরন্দর খাঁর বংশের ঐশ্বর্য ও পদমর্যাদা সর্বোচ্চশিখরে উঠে।

"কেশব খানস্য সুত ১৫ পর্য্যায স মু শ্রীকৃষ্ণবসোঃ
শ্রীকৃষ্ণঃ কুলভূষণো গুণযুতো বিশ্বাসখানো মহান্
দানাদানবিধানতঃ কুলকৃতী কৃষ্ণাদিনন্দং যযৌ।
কিংক্রমো মহিমানমস্য বিদিতো গৌড়াধিকারী যতো
ভাগাৎসোপি বিরাজতে বসুবরো মুখ্যাগ্রগণ্যঃ ক্ষিতো ॥
ঘটক বিশারদের সংস্কৃত কারিকা।

কেশব খান সুত ১৫ শ মু শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাস খান্
শ্রীকৃষ্ণ বসুর কুল প্রকৃতের সমতুল
মহাগুণ কি বলিব তার।
প্রামাণিকে পরিতোষ গোপাল শঙ্কর ঘোষ
দুই কুলীনে লইলা নমস্কার।
সাম্য কার্য্য মনোনীত আদান প্রদান কৃষ্ণমিত্র
প্রকৃত সঙ্গে কৈলা গলাগলি।
পৌত্রী গ্রহণ পরিতোষ জনানন্দন হৃদয় ঘোষ
মহিমা শেখর বলেন সার।
সর্ব্বশেষে চক্রপাণি করেন নমস্কার॥

ঘটকশেখরের কারিকা।

বিশ্বাস খানের কুল কর অবধান।
প্রকৃত কৃষ্ণানন্দ মিত্রে আদান প্রদান॥
সার্ব্বভৌম ঠাকুরী এই কুলে হৈল যশ।
শৌর্য্য দেখি কমলাকর দিলা আত্মরস।

শ্রীকৃষ্ণ বসু বিশ্বাস খানের একমাত্র পুত্র অনন্তরাম রায় এবং একটি কন্যা হয়।

কায়স্থ কারিকা ইত্যাদি সকল প্রাচীন ইতিহাস হইতে দেখা যায় যে তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্র এবং কন্যার বিবাহ বাড়ি প্রধান মুখ্য কুলীন কৃষ্ণানন্দ মিত্রের কন্যা ও পুত্রের সহিত আদান-প্রদান করেন।

ছত্রনাজির চক্রপাণি বসু

কেশব খানের দ্বিতীয় পুত্র চক্রপাণি একজন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অশেষ ক্ষমতাবান লোক ছিলেন। প্রাচীন কুলপঞ্জিকা এবং কারিকা হইতে তাঁহার মহাগৌরবের ইতিহাস পাওয়া যাইতেছে। তিনি রাজদরবারে প্রধান ও সর্বোচ্চ মন্ত্রীপদে ছিলেন এবং "ছত্রনাজীর" উপাধি পান।

ঘটকবিশারদের সংস্কৃত কারিকায় লিখিত আছে—

"স মু কেশবস্য ২য় সুত ১৫প বা স মু
ছত্রনাজীর চক্রপাণি বসোঃ
মুখ্যঃ শ্রীচক্রপাণি বসুমুকুটমণিশ্ছত্রনাজীরনামা
গৌড়ানাং সার্ব্বভৌম প্রতিনিধিরভবৎ সর্ব্বকার্য্যাধিকারী
কিংকার্য্যং তস্য শৌর্য্যং সকলগুণযুতোঘোষবর্য্যে মুরারৌ।
গৃহ্ণক্ষোজ্জ্বলমিত্রং সহজকৃতিবরং মাধবং বাসুদেবং॥

অর্থাৎ কেশব বসুর দ্বিতীয় পুত্র ১৫ পর্যায়ে বাড়ি সহজ মুখ্য ছত্রনাজীর চক্রপাণি বসু। মুখ্য কুলীন শ্রীচক্রপাণি বসু মুকুটের মণির ন্যায় উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন। ছত্রনাজীর নামে খেতাব ছিল। গৌড় রাজদরবারে সার্বভৌম বা সর্বেসর্বা রাজপ্রতিনিধি থাকিয়া সর্বকার্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার সকল কার্য করিবার ক্ষমতা ছিল। অশেষ বিক্রম ছিল এবং তিনি সর্বগুণযুক্ত ছিলেন। মুরারি ঘোষের সহিত তাঁহার এক কন্যার, মাধব মিত্রের সহিত এক কন্যার এবং বাসুদেব ঘোষের সহিত এক কন্যার বিবাহ দিয়া নিজ বংশ উজ্জ্বল করেন।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রবাবু তাঁহার সম্বন্ধে দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ কাণ্ডের মধ্যে লিখিয়াছেন—

"পুরন্দর খানের অসাধারণ প্রতিপত্তি ও প্রভাবের পরিচয় অনেকে শুনিয়াছিলেন। তৎপুত্র মন্ত্রীপ্রবর কেশবছত্রীর নামও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক লীলাগ্রন্থ সমূহে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু কেশব পুত্র ছত্রনাজীর চক্রপাণি বসুর নাম হয়ত অনেকে জানেন না। এই চক্রপাণি সাধারণ লোক ছিলেন না। তিনি গৌড়ের সার্ব্বভৌম নৃপতি বা সুলতানের রাজপ্রতিনিধি Viceroy ও সর্ব্বকার্য্যাধিকারী এবং সুলতানের পরই রাজকীয় শাসনবিভাগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সংস্কৃত কুলকারিকা হইতে সেই অতীত ইতিহাসের উজ্জ্বল স্মৃতি পাইতেছি।"

কেশব বসুর তৃতীয় পুত্র বাড়ি কোমল মুখ্য কামদেব রাজদরবারে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া বিশ্বাস খান খেতাব পান।

কেশব বসুর কনিষ্ঠ পুত্র রতিনাথ বিশেষ ধর্মজ্ঞ ও শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহাকে সকলে ছোট ঠাকুর বলিয়া সম্মান করিতেন। কায়স্থগণের মধ্যেও অনেক পণ্ডিত কায়স্থের নাম পাওয়া যায় যাঁহারা তন্ত্রানুসারে মন্ত্র প্রদান বা দীক্ষিত করিতেন এবং মন্ত্রদাতা গুরু ব্যবসায়ী ছিলেন। কায়স্থ কুলপাবন শ্রীমন্মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ শিষ্য ছিল। এই মাহীনগর বসুবংশের মধ্যেও অনেক মহাপণ্ডিত ও মন্ত্রদাতা গুরু ব্যবসায়ী ছিলেন।

বর্ধমান জেলার রাণীহাটী গাঙ্গুরিয়া থানার সীমাধীন কুলীনগ্রামের রামানন্দ বসু গুরু ব্যবসায়ী, গোস্বামী ও মোহান্ত বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি সকল জাতিই ইঁহার শিষ্য ছিলেন। ইঁহার ডুরি না পৌছিলে ৺জগন্নাথদেবের রথ টানা আরম্ভ হয় না।

ফরিদপুর চর কাশিমপুরের বড় আখড়ার মোহান্ত বসুবংশীয় রামচন্দ্র মোহান্ত বর্তমান আছেন।

মুক্তি বসুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অলঙ্কার বসু "বঙ্গগত" বলিয়া কুলগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি মাহীনগর হইতে বঙ্গে গিয়াছিলেন। এই পঞ্চম পর্যায়ভুক্ত অলঙ্কার বসুর একজন অধস্তন পুরুষ পঞ্চদশ পর্যায়ভুক্ত শ্রীনাথ বসু বঙ্গ হইতে পুনরায় রাঢ়ে আসিয়া ইচ্ছাপুরে বাস করেন। তাঁহার পুত্র ষোড়শ পর্যায়ভুক্ত (শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাসের জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র) মহাপণ্ডিত যদুনাথ বসু সার্বভৌম ১৬

পর্যায় দক্ষিণ রাঢ়ীয় বালি সমাজের কুলীন নিধিরাম ঘোষের কন্যার সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দিয়া দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে পুনঃ প্রবেশ করেন।

—কায়স্থ সমাজ পত্রিকা, কার্ত্তিক ১৩৪০।

অনন্তরাম বসু রায়

শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাস খানের একমাত্র পুত্র সহজ মুখ্য ১৬ পর্যায়ে অনন্তরাম। অনেক কুলকারিকায় তাহার নামের সহিত রায় উপাধি দেখা যায় এবং তাঁহার সময় হইতে আর কোন বংশধরের নামের সহিত খান উপাধি প্রাপ্তির সংবাদ পাওয়া যায় না।

মুসলমান সেনাপতি মহম্মদ-ই-বখতিয়ার ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ জয় করিবার পর তাঁহার পাঠান সেনাপতিগণ একে একে যে বলশালী হইয়া উঠিয়া সিংহাসন অধিকার করিতে পারিয়াছেন সেই নিজ বংশের রাজ্য বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের সিংহাসন পাঠান জাতির রাজারাই অধিকার করিয়া বঙ্গদেশ শাসন করিতেন এবং নামেমাত্র দিল্লীর অধীনে ছিলেন। সময় সময় হিন্দুগণ পাঠান রাজাকে দূরীভূত করিয়া নিজেরা স্বাধীন হইত। দিনাজপুরের হিন্দু জমিদার রাজা গণেশ বাঙ্গলার সিংহাসন অধিকার করিয়া প্রায় চল্লিশ বৎসর বিশেষ ন্যায়পরায়ণতার সহিত রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করায় আবার পাঠান রাজত্ব প্রতাপশালী হয়। যত দিবস পাঠান রাজগণ বঙ্গ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তত দিবস মাহীনগরের বসুবংশের সুবুদ্ধি খাঁ হইতে অনন্তরাম অবধি পর পর ছয় পর্যায়ের বংশধরগণ গৌড়েশ্বরের রাজদরবারে উচ্চ রাজপদে উজীরের কাজ করিয়া অসীম প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। সমাজে ও রাজদরবারে তাঁহাদের অপ্রতিহত ক্ষমতা ছিল এবং অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী ছিলেন। মোগল সম্রাট বাবর পাণিপথের যুদ্ধে দিল্লীর শেষ পাঠান সম্রাট ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বাবরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হুমায়ুন রাজা হন এবং হুমায়ুনের মৃত্যুর পর ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে মহামতি আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য স্থাপনের জন্য সকল দেশ জয় করিতে লাগিলেন। আকবর সাহের কালে বাঙ্গলার পাঠান নবাব দাউদ খাঁ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে আকবর দুইজন হিন্দু সেনাপতি

মহারাজ মানসিংহ ও রাজা টোডরমল্লকে বাঙ্গলাদেশ জয় করিতে পাঠান এবং ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে দাউদ খাঁ পরাজিত ও নিহত হইলে বাঙ্গলাদেশ আকবরের অধিকারভুক্ত হয়। উদারহৃদয় ও রাজনীতিজ্ঞ সম্রাট আকবর দেখিলেন বাঙ্গলাদেশের জমিদার ও জায়গীরদারগণ বিশেষ প্রতাপশালী এবং তাহারা বাঙ্গলার শাসনকর্তাকে মানিত না। তিনি হিন্দু জমিদার ও জায়গীরদারগণের সহিত সদ্ভাব রাখিবার জন্য উক্ত দুইজন তাঁহার পরাক্রান্ত সেনাপতি মহারাজ মানসিংহ ও টোডরমল্লকে বহুকাল বঙ্গদেশের শাসনকর্তা হিসাবে রাখিয়া স্থায়ীভাবে বঙ্গদেশ দিল্লীর অধীনে আনেন। গৌড়ের শেষ পাঠান নৃপতি দাউদ খাঁ বন্দী ও নিহত হইলে পাঠান রাজত্ব শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের গোষ্ঠীপতি বসুবংশের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। পাঠান হস্ত হইতে মোগল হস্তে রাজকীয় প্রভাব হস্তান্তরের সহিত পাঠান আমলের রাজ কর্মচারী-গণের সহায় সম্পত্তি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। মহারাজ মানসিংহ বঙ্গদেশের শাসনকার্য হস্তে লইয়া তাঁহার নির্বাচিত হিন্দু কর্মচারীদিগকে রাজকার্যে নিযুক্ত করিয়া পাঠান রাজগণের কর্মচারীগণকে কর্মচ্যুত করেন এবং গৌড় হইতে রাজধানী তুলিয়া ঢাকায় স্থাপিত করেন। মাহীনগর হইতে ঢাকা বহুদূর বলিয়া বসুরাজবংশের বোধ হয় আর কেহ তথায় উচ্চ রাজকার্য গ্রহণ করিতে যান নাই।

এই সময় দক্ষিণ রাঢ়ের সপ্তগ্রামে মোগল সম্রাটের একটি শাসনকেন্দ্র ছিল। এই সময় দশঘরার পালবংশের অভ্যুদয়ের সহিত মোগল শাসনকর্তার অনুগ্রহে সপ্তগ্রামে কায়স্থপ্রবর দয়ারাম পালের উপর ভাগ্যলক্ষ্মীর বিশেষ সুদৃষ্টিপাত হয়। বুদ্ধিবলে এবং কার্যদক্ষতায় দয়ারাম পাল ধনে, মানে সর্বজন বিখ্যাত হন এবং অনেক কুলীন দয়ারাম পালের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পুরন্দর খান ১৬ ঘর সাধ্য মৌলিকের মধ্যে পাল বংশকে গ্রহণ করিলেও দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে পালের উপযুক্ত সম্মান ছিল না। অর্থশালী দয়ারাম পাল মৌলিকগণের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একজাই করিয়া গোষ্ঠীপতি হওয়া বড় সহজ কার্য নহে। সকল কুলীন ও মৌলিকের শ্রেষ্ঠ বংশধরগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া তাহাদের সকলরূপ অভ্যর্থনা করিতে হইত এবং মর্যাদা হিসাবে টাকা ও পাথেয় দিতে হইত। এবং বহু প্রকার উদ্যোগ ও আড়ম্বরাদি করিতে বহু লক্ষ টাকা ব্যয় ও অনেক পরিশ্রম করিতে হইত। যিনি একজাই করিবেন তাঁহার সমাজে প্রকৃত সম্মান ও প্রতিপত্তি থাকা প্রয়োজন। মাহীনগরের বসুবংশই পরপর

গোষ্ঠীপতি হইয়া সমাজপতির কার্য করিয়া গিয়াছেন কিন্তু ১৬ পর্যায়ে অনন্ত বসু দশঘরার দয়ারাম পালকে গোষ্ঠীপতি পদে বরণ করিতে সম্মত হওয়ায় দয়ারাম পাল প্রধান প্রধান কুলজ্ঞগণের সাহায্যে দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজের সমস্ত সম্ভ্রান্ত বংশকে নিমন্ত্রণ করিয়া গোষ্ঠীপতি পদ লাভ করেন। দয়ারাম গোষ্ঠীপতি বংশীয়া কন্যাকে গ্রহণ করিয়া এবং বসু গোষ্ঠীপতি বংশের সাহায্যে গোষ্ঠীপতি হইলেন।

অনন্তরামের সম্বন্ধে সংস্কৃত কারিকায় লিখিত আছে—

শ্রীকৃষ্ণ বসোসুত ১৬ প স মু অনন্ত রায়স্য
শ্রীপতেস্তনয়াং প্রাপ্য নিনিন্দোঽনন্তরায়কঃ।
সেনমৃত্যুঞ্জয়ং প্রাপ্য ভাগ্যেনাপি বিরাজতে॥

শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বাসসুত ১৬ প স মু অনন্তরায়

দানহীন অনন্তরায় কুলেতে আকৃতি।
গ্রহণে কোমল মুখ্য মিত্র শ্রীপতি॥
নন্দরাম মিত্র বলেন শুনহে সভায়।
রস ভজে দিগঙ্গের সেন মৃত্যুঞ্জয়।

—নন্দরাম মিত্রের কারিকা।

শ্রীপতিমিত্রে কন্যা গ্রহণ কুলে অপযশ।
পুণ্যফলে মৃত্যুঞ্জয় সেনে আত্মরস॥
সার্ব্বভৌম ঢাকুরী এই কুলে লইল সাজ।
কুল করি অনন্তরায় বড় পাইলা লাজ।

—সার্ব্বভৌমের ঢাকুরী।

কায়স্থ কারিকায় অনন্তরামের কোন কন্যা না থাকায় দানের উল্লেখ নাই।

তাঁহার একমাত্র পুত্র রঘুনাথের বলভদ্র মিত্রের পুত্র বাড়ি কোমল মুখ্য শ্রীপতি মিত্রের কন্যার সহিত বিবাহ দেন।

অষ্টম অধ্যায়

রঘুনাথ বসুমল্লিক

অনন্তরাম বসু রায়ের একমাত্র পুত্র দশরথ বসু হইতে ১৭ সপ্তদশ পর্যায়ে সহজ মুখ্য কুলীন রঘুনাথ।

এই সময়ে দিল্লীর মুসলমান সম্রাটের অধীনে একজন শাসনকর্তা বা সুবেদার কর্তৃক বঙ্গদেশ শাসিত হইত। রঘুনাথ বাঙ্গলার সুবেদারের অধীনে দেওয়ানের কার্য করিতেন এবং পর পর তিনজন সুবেদারের অধীনে বিশেষ দক্ষতার সহিত কার্য করিয়া যশস্বী ও ঐশ্বর্যশালী হন এবং নবাব সরকার হইতে "মল্লিক" উপাধি পান। এই ১৭ পর্যায় রঘুনাথ বসু হইতে তাঁহার সকল বংশধর এযাবৎ উক্ত 'মল্লিক' উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন।

'মল্লিক' খেতাবটি পারস্য ভাষা হইতে উৎপত্তি হইয়াছে। পারস্য ভাষায় মালিক মানে রাজা বা শ্রেষ্ঠ বা মর্যাদাশীল বা মর্যাদাশালী। কর্ণেল স্যার জন মেলকলন সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ পারস্যের ইতিহাসে পারস্যদেশের অনেক নৃপতির নামের পূর্বে মলিক্ উপাধি দৃষ্ট হয়, যেমন—Malik Mahomed, Malik Rahimdilemee. Malik Shah Malik-ul Muzuffer.

Seif-u-deen, the prince of the Mamelukes of Egypt (1256) had the title of Malik-ul-Muzuffer.

আফ্‌গানিস্থানের প্রচলিত পুস্ত ভাষায় 'মালিক' শব্দের অপভ্রংশ মল্লিক। পাঠান রাজত্বকালে যে সকল রাজপুরুষ জমিদারী বা জায়গীর পাইত তাঁহাদের "মল্লিক" উপাধি হইত।

উক্ত পারস্য ভাষা হইতে কথাটি আমাদের বাঙ্গলা ভাষার মধ্যে প্রবেশ করিয়া মালিক মানে প্রভু, স্বামী বা স্বত্বাধিকারীকে বুঝায়। মুসলমান আমলে বড় জমিদার বা জায়গীরদারকে মালিক বলিত।

পূর্বেই লিখিয়াছি যে গোপীনাথ বসুকে এবং বল্লভ বা সুন্দরবর খাঁকে অনেক প্রাচীন কুলপঞ্জিকা ও কারিকায় মল্লিক উপাধিযুক্ত দেখা যায় কিন্তু তাহা তাঁহাদের বংশধরেরা তখন ব্যবহার করেন নাই। রঘুনাথ বসুর পর হইতেই

বংশপরম্পরায় 'বসুমল্লিক' উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন। এই বংশের অনেকে আবার অনেক সময় বসু না লিখিয়া কেবল মল্লিক লেখেন। ইহা অত্যন্ত অন্যায়। বসুই প্রকৃত সামাজিক পদবী। মল্লিক কেবল একটি খেতাব বা উপাধি।

রঘুনাথ তৎকালে 'চাঁদ মল্লিক' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। চাঁদ মল্লিক নামানুসারে 'চাঁদপুর' গ্রামে এখনও ২৪ পরগণার মধ্যে মাহীনগরের পার্শে কোদালিয়া গ্রামের পূর্বে মরা গঙ্গার নিকট এই মহাপুরুষের স্মৃতি ধারণ করিয়া বর্তমান আছে। ইঁহার জীবনী সম্বন্ধে দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঢাকুরীতে অনেক বর্ণনা আছে। কথিত আছে রঘুনাথ নিজ তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে ও কার্যদক্ষতা দেখাইয়া বাঙ্গলার সুলতানের দরবারে দেওয়ান হইতে ক্রমে রাজমন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন। তিনি সুপণ্ডিত, এবং জনপ্রিয় লোক ছিলেন।

রঘুনাথের বংশধরগণের মধ্যে অনেকেই পুরাতন পৈতৃক বাসস্থান মাহীনগর পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ বঙ্গের নানা স্থানে গিয়া বাসস্থান স্থাপন করেন। পুরন্দর খানের সময় হইতে সকল বংশধর দক্ষিণ বঙ্গের নানা স্থানে নবাব সরকারের কার্য করিয়া প্রভূত ধনশালী হইয়া নানা স্থানে জমিদারী খরিদ করেন এবং জায়গীর পান। বংশের সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির সহিত উক্ত জমিদারী সকল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এক এক বংশধর এক এক স্থানে গিয়া বসবাস স্থাপন করেন। অধিকাংশ জমিদারী বর্ধমান ও হুগলী জেলার মধ্যে থাকায় মাহীনগরের বসুবংশের অনেক বংশধরকেই উক্ত জেলার মধ্যে নানা স্থানে এখনও বসবাস করিতে দেখা যায়।

রঘুনাথের তিন পুত্র গোবিন্দচন্দ্র, গোপীনাথ ও কমলকৃষ্ণ এবং তিন কন্যা হয়।

রঘুনাথের দান ও গ্রহণ সম্বন্ধে সংস্কৃত কারিকায় দেখা যায়—

অনন্ত রায়স্য সুত ১৩প স মু রঘুনাথস্য
মুখ্যোঽসৌ রঘুমল্লিকঃ ক্ষিতিতলে দৃষ্টাকুলং, পৈত্রকং।
সোঽর্থং গুণ্ডতে প্রদায় তনয়াং রত্যাদিকান্তাত্মজে।
তৎপশ্চাৎ কমলাকরং বসুবরং ঘোষস্তথারাঘবং
সংপ্রাপ্তঃ কিলকন্যকাং বিধিবশাৎ ঘোষস্য লজ্জাম্বুধৌ।
মগ্নোঽসৌ বসুপুঙ্গবোবিজয়তে প্যাদানদানাদপি।
অনন্তরায় সুত ১৭প স মু রঘুমল্লিক

উত্থানেতে কন্যাদান প্রামাণিকে যাদব সেন
প্রথমেতে করিলা নমস্কার।
রতিকান্ত দান সাম্য ঈশানাদি বসুর কাম্য
গ্রহণাংশে কুলভ্রম সার।
গ্রহণে রতিকান্ত ঘোষ সমান পশ্চাৎ এই দোষ
দানবলে রাখা যায় কুল।
রঘু ধন অবিদ্যমানে রাঘব ঘোষ তেওজ জানে
দুই কার্য্য কনিষ্ঠের তুল॥
উত্থরিয়া সেই দোষ কন্যা দিল কমল ঘোষ
দৃষ্টি শ্রীপতি বিনে হয় নাহি কভু।
ঘটক শেখর কহেন হিত গ্রহণ নহে সমুচিত
দানেতে ভূষিত মল্লিক রঘু॥

কায়স্থ কারিকায় আমরা পাই—

রঘুনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র সহজ মুখ্য গোবিন্দচন্দ্রের এবং এক কন্যার বাড়ি প্রধান মুখ্য শিবানন্দ ঘোষের পুত্র প্রধান মুখ্য রতিকান্ত ঘোষের পুত্র ও কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া আদান-প্রদান করেন। দ্বিতীয় পুত্র গোপীনাথ এবং দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ বাড়ি কোমল মুখ্য শিবভদ্রের তৃতীয় পুত্র কোমল মুখ্য কমল ঘোষের কন্যা এবং পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়া আদান-প্রদান করেন। তৃতীয় পুত্র কমলকৃষ্ণের এবং তৃতীয়া কন্যার বিবাহ হৃদয় ঘোষের পুত্র বাড়ি তেয়জ রাঘব ঘোষের পুত্র এবং কন্যার সহিত দিয়া আদান-প্রদান করেন।

গোবিন্দ বসুমল্লিক

রঘুনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র ১৮ পর্যায়ের সহজ মুখ্য গোবিন্দচন্দ্র।

ঘটক বিশারদের সংস্কৃত সমীকরণ কারিকায় তাঁহার কুল পরিচয়ে লিখিত আছে—

রঘুনাথস্য সুত ১৮প স মু গোবিন্দস্য
প্রদ্যুম্নস্য সুতাংলব্ধবা রসেন জয়রামকং।
কোমলং মুখ্যমাসাদ্য গোবিন্দঃ শুশুভে মুদা॥

রঘুনাথস্য সুত ১৮প স মু গোবিন্দ মল্লিক

শ্রীদুর্লভ ঘোষের কন্যা কুলে লৈল সাজ।
আত্যরস জয়রাম মিত্র দাঁতিয়া সমাজ॥
সার্ব্বভৌম ঢাকুরী এই ঘোষের আনন্দ।
দৈবক্রমে কুল করেন মল্লিক গোবিন্দ॥

কায়স্থ কারিকায় লিখিত আছে যে গোবিন্দচন্দ্রের একমাত্র পুত্র রামভদ্র মল্লিকের রামলোচন ঘোষের পুত্র বাড়ি কোমল মুখ্য প্রদ্যুম্ন ঘোষের কন্যার সহিত বিবাহ হয়। গোবিন্দচন্দ্রের কোন কন্যা না থাকায় দানের উল্লেখ নাই।

রামভদ্র বসুমল্লিক

গোবিন্দচন্দ্র বসুমল্লিকের একমাত্র পুত্র ১৯ পর্যায়ে সহজ মুখ্য কুলীন রামভদ্র।

সংস্কৃত কারিকায় রামভদ্রের সম্বন্ধে লিখিত আছে—

গোবিন্দস্য সুত ১৯প স মু রামভদ্রবসোঃ
মুখ্য শ্রীযুত রামভদ্র উদিতঃ সংকীর্ত্তিভাজাম্বরঃ
দত্বা শ্রীজয়রামজে দুহিতরং গোবিন্দমিত্রাত্মজে।
তুষ্টি নৈব যযৌ যতঃ সহজকঃ পাত্মায় গোপীসুতাং
তৎপশ্চাৎ মথুরাত্মজাং গ্রহণতঃ সাপ্রাপ্য মোহং গতঃ॥

গোবিন্দ সুত ১৯প স মু রামভদ্র মল্লিক—

রামভদ্র বসুর দান জয় রাম গুণ পান
দৈবক্রমে মিত্র গোবিন্দ।
গোপী ঘোষে গ্রহণ করি মথুরা আইল তরি।
সার্ব্বভৌম হইল আনন্দ॥

—সার্ব্বভৌমের কারিকা।

গোপী ঘোষে কৈল কুল গ্রহণ নিকিত।
রসভজে অম্বিকাতে করুণ পালিত॥
অভিরাম ঘোষে দোজ পরে বলি আর।
মধ্যাংশ মথুরা ঘোষে কৈলা প্রমোদ্ধার॥

দুই অঙ্গে নহিল যশঃ নিন্দা অংশে কুল।
নন্দরাম কহেন তবু সহজের মূল ॥

—নন্দরাম মিত্রের কারিকা।

কায়স্থ কারিকায় রামভদ্র বসু মল্লিক মহাশয়ের তিন পুত্র রমাবল্লভ, রত্নেশ্বর এবং মধুসূদন এবং দুই কন্যার বিবাহের উল্লেখ আছে।

জ্যেষ্ঠ সহজ মুখ্য রমাবল্লভ বসুর কোমল মুখ্য রামচন্দ্র ঘোষের পুত্র কোমল মুখ্য গোপীনাথ ঘোষের কন্যার সহিত বিবাহ হয়। পরে তাঁহার কোমল মুখ্য রত্নেশ্বরের আবুয়ানিবাসী সাধা মৌলিক করুণা পালিতের কন্যার সহিত বিবাহ হইয়া আদ্যরস হয়।

দ্বিতীয় পুত্র কোমল মুখ্য রত্নেশ্বরের মুখ্য কুলীন শ্রীনাথ ঘোষের পুত্র বাড়ি কুলীন মথুরা ঘোষের কন্যার সহিত বিবাহ হয়।

রামভদ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ সহজ মুখ্য চণ্ডীদাস মিত্রের দ্বিতীয় পুত্র বাড়ি সহজ মুখ্য জয়রাম মিত্রের সহিত হয়।

দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহ বাড়ি কোমল মুখ্য প্রদ্যুম্ন মিত্রের পুত্র বাড়ি কোমল মুখ্য গোবিন্দ মিত্রের সহিত হয়।

১৯ পর্যায়ে কুলাচার্যগণ সমীকরণ বা একজাই করেন কিন্তু কে গোষ্ঠীপতি হয় তাহার বিষয়ে মতান্তর আছে। অনেক সমীকরণ কারিকায় গোপীকান্ত সিংহ গোষ্ঠীপতি হয় বলিয়াই উল্লেখ আছে। তবে ১৯ পর্যায়ের একজাই কারিকার মুখ্য কুলীনগণের মধ্যে রামভদ্র বসু মল্লিক সমীকুলীন বলিয়া মর্যাদা পাইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ আছে।

রমাবল্লভ বসুমল্লিক

রামভদ্র বসু মল্লিকের ২০ পর্যায়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র সহজ মুখ্য রমাবল্লভ, দ্বিতীয় পুত্র কোমল মুখ্য রত্নেশ্বর এবং কনিষ্ঠ পুত্র বাড়ি কোমল মুখ্য মধুসূদন। জ্যেষ্ঠ রমাবল্লভ বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ও যশস্বী লোক ছিলেন। তিনি খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে হুগলী জেলায় বাঙ্গলার নবাব দরবারে দেওয়ানের কার্য করিতেন এবং নবাব দরবার হইতে একটি বড় জায়গীর প্রাপ্ত হন। উক্ত জায়গীর অধুনা মল্লিকপুর নামে প্রসিদ্ধ। ২৪ পরগণার মধ্যে ই. বি. রেলওয়ের দক্ষিণ শাখায় অবস্থিত মল্লিকপুর ষ্টেশন এবং তৎসংলগ্ন গ্রামে এই মহাপুরুষের নাম এখনও

সুবিখ্যাত রহিয়াছে। রমাবল্লভ বহুকাল অবধি জীবিত ছিলেন বলিয়া তিনি 'বুড় মল্লিক' নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। পূর্বেই লিখিয়াছি প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্র-বাবুর মতে গোপীনাথ বসু বা পুরন্দর খাঁর কনিষ্ঠ সহোদর বল্লভ সুন্দরবর খাঁ উপাধি পান এবং তাহার নামও বুড়া মল্লিক ছিল। যাহা হউক এ বিষয়ে মতান্তর আছে।

সংস্কৃত কারিকায় :—

রামভদ্র বসু সুত ২০প স মু রমাবল্লভস্য
খ্যাতঃ শ্রীল রমাপতিঃ ক্ষিতিতলে ধন্যোঽহি ভূমণ্ডলে
দানেনৈব কুলোদ্ভবঃ বসুবরঃ সংপ্রাপ্য ঘোষঃ শিবঃ।
নোরেজে সতু কোমলঃ গ্রহণতো গোপাল ঘোষঃ মুদা
কাশীনাথসুতাঃ রসেন সহজঃ সংপ্রাপ্য মুখ্যোবভৌ ॥

ঘটক বিশারদ তাঁহার উক্ত সংস্কৃত সমীকরণ কারিকায় রমাবল্লভকে "খ্যাতঃ শ্রীল রমাপতিঃ ক্ষিতিতলে ধন্যোঽহি ভূমণ্ডলে" বলিয়া প্রশংসা করিয়াছিলেন। ঘটকাচার্যের কুলকারিকায় আমরা দেখিতে পাই ২০ পর্যায়ের একজাই বা সমীকরণ সভায় মহামতি শ্রীরমাবল্লভঃ সুধী প্রধান মুখ্য কুলীনগণের মধ্যে সম্মানিত এবং কুলমর্যাদা পাইয়াছিলেন।

রমাবল্লভের দান ও গ্রহণ সম্বন্ধে কুলকারিকায় লিখিত আছে—

রামভদ্র মল্লিকসুত ২০প স মু রমাবল্লভ
রমাবল্লভ বসুর দান শিবদাস গুণ পান
গ্রহণাংশে ঘোষজে গোপাল।
কাশীপুত্রে দিলা রস এই পাকে পাইলা যশ
সার্ব্বভৌম জানেন তৎকালে ॥

—সার্ব্বভৌমের ঢাকুর।

রমাই মল্লিকের দান প্রামাণিকে অপমান
মুরারি অচ্যুতে নৈল তোষ।
সাম্যদানে শিবদাস ঘোষের পুরিল আশ
গ্রহণাংশে রামগোপাল ঘোষ ॥
রস ভজে কাশীশ্বর দত্তজে মৌলিকবর
ইসফপুর চৌধুরী রায় নাম।

নন্দরাম মিত্র ভণে শুন বলি সভাজনে
দুই অঙ্গে কোমলে বিশ্রাম ॥

—নন্দরাম মিত্রের কায়স্থ-কারিকা।

কায়স্থ-কারিকায় রমাবল্লভ মল্লিকের একমাত্র পুত্র সহজ মুখ্য কুলীন রাজারামের প্রথম বিবাহ কোমল মুখ্য পার্বতী ঘোষের পুত্র বাড়ি কোমল মুখ্য কুলীন গোপালচন্দ্র ঘোষের সহিত দেন। পরে দ্বিতীয়বার ইসফপুর নিবাসী কাশীশ্বর দত্ত রায়চৌধুরীর সহিত বিবাহ দিয়া আন্তরস করেন।

রমাবল্লভ তাঁহার একমাত্র কন্যার বিবাহ সেকপুর নিবাসী কোমল মুখ্য পার্বতী ঘোষের দ্বিতীয় পুত্র বাড়ি কোমল মুখ্য শিবদাস ঘোষের সহিত দিয়া কুলকর্ম করেন।

রাজারাম বসুমল্লিক

রমাবল্লভের একমাত্র পুত্র ২১ পর্যায় সহজ মুখ্য কুলীন রাজারাম বসু মল্লিক। রাজারাম ধার্মিক ও যশস্বী লোক ছিলেন। তিনি মাহীনগরের নিকট পিতার জমিদারী মল্লিকপুরে সুবৃহৎ অট্টালিকায় বিশেষ ঐশ্বর্যশালী ও সকলের নিকট বিশেষ সম্মানিত হইয়া বাস করিতেন। প্রাচীন কুলপঞ্জিকার লেখন হইতে পাওয়া যায় যে রাজারাম পুণ্যবান ও দাতা ছিলেন। তিনি দেশের উপকারার্থে ও গরীব দুঃখীকে পালনের জন্য বহু দান করিতেন এবং একজন প্রকৃত এবং বড় দাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

সংস্কৃত কারিকায় তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে—

রমাবল্লভস্য সুত ২১শ প স মু রাজারাম মল্লিকস্য

সরাজাদিরামঃ কিতো পুণ্যশালী
নবাঢ়ং বিভিজে গুণং রামভদ্রে।
ততো ঘোষ শত্রুঘ্নকং সোপি লব্ধা।
নতোষং বাণেশ্বরং ঘোষকঞ্চ ॥
গৃহীত্বা চ ঘোষাধিপো রামদেবং
প্রপেদে গুণং যো ভৃশং দীপ্যমানঃ
রশেনাপি বাণেশ্বরং সোপি লব্ধা
বিরেজে চ সিংহং সদা কীর্ত্তিমন্তং ॥

২১ পর্যায়ের সমীকরণ বা একজাই ২২শে বৈশাখ ১১৪২ সনে অনুষ্ঠিত হয়। রাজারাম বসু উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া মুখ্য কুলীনগণের সহিত উচ্চ মর্যাদা পান এবং প্রাচীন সমীকরণ কারিকায় তাঁহার বিষয় অনেক উল্লেখ দেখা যায়। ২১ পর্যায়ের সমীকরণ কারিকায় ঘটকপ্রবর নন্দরাম মিত্র "রাজারাম সুভাজন" এবং কাশীরাম বসুর একজাই কারিকায় "রাজারাম দানেতে প্রচণ্ড" বলিয়া তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রাচীন কারিকায় রাজারামের দান ও গ্রহণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণনা আছে—

রমাবল্লভ সুত ২১ প স মু রাজারাম মল্লিক

পুরন্দর বংশে জন্ম বসু রাজারাম।
প্রামাণিকে দিলা কন্যা কহি শুন নাম॥
রামজীবন সরকার আর কল্যাণ দত্ত।
কন্যা দিল তার পাছে বংশ উপযুক্ত॥
সাম্যদান রামভদ্র ঘোষ কোমল প্রধান।
পিতৃদৃষ্টে দিলা দান নাহি অভিমান॥
দোছেই কন্যা শত্রুঘ্ন ঘোষ ভাবিকুল।
তেছেই বাণেশ্বর ঘোষ মধ্যাংশ প্রফুল্ল॥
গ্রহণে রামদেব ঘোষ প্রকৃতের সার।
বহুকাল পরে কার্য্য করিল উদ্ধার॥
বলে বাণেশ্বর ঘোষ কৃষ্ণনগরবাসী!
প্রফুল্ল হইল কুল ভণে কাশী॥

—কাশীরাম বসুর কারিকা।

রাজারাম মল্লিকের কুল শুন দিয়া মন।
প্রামাণিকের প্রথম কন্যা শ্রীমধুসূদন॥
পালিত পদ্ধতি সেই গোলাগড়ি বাস।
রামদেব ঘোষ কুল পুরিল মনে আশ॥
নন্দরাম মিত্র বলেন কি আর ভাবনা।
প্রকৃত কুলেতে তার দোষের মার্জ্জনা॥

—নন্দরাম মিত্রের কারিকা।

রাজারামের তিন পুত্র হয়। সহজ মুখ্য দুর্গারাম, বাড়ি কোমল মুখ্য সীতা-

রাম এবং বাড়ি কোমল মুখ্য রামরাম। এবং সাত কন্যা হয়। তিনি উক্ত তিন পুত্র এবং সাত কন্যার বিবাহ উচ্চ ঘরে দিয়া নিজ উচ্চবংশের গৌরব আরো বৃদ্ধি করেন।

রাজারাম জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ বাগুণ্ডিয়া নিবাসী প্রধান মুখ্য কুলীন ভরত ঘোষের পুত্র বাড়ি প্রধান মুখ্য রামদেব ঘোষের কন্যার সহিত দেন।

কায়স্থ-কারিকায় তাঁহার সাত কন্যার বিবাহ বিষয় লিখিত আছে—

দান

প্রামাণিক। কল্যাণনন্দীতে—সাং আবুয়া।
২য় প্রামাণিক। শ্রীরাম নাগে—সাং গাণ্ডড়া।
৩য় প্রামাণিক। মধুসূদন পালিতে—সাং গোলগড়ি।
৪র্থ প্রামাণিক। কল্যাণ দত্তে—সাং ছিনা আকনা।
সাম্য। বা কো মু রামভদ্র ঘোষে, নি কো মু কল্যাণ সুত।
দছে। বা বা ক শত্রুঘ্ন ঘোষ, নি কো মু শ্রীবল্লভের সুত ৩য়, সাং অয়না।
তেছে ভঙ্গ। আ, ম বাণেশ্বর ঘোষে, নি—ক বাসুদেবের বংশ সাং পিঙ্গলা।

রাজারামের তিন পুত্র দুর্গারাম, সীতারাম ও রামরাম।

জ্যেষ্ঠ দুর্গারাম ২২ পর্যায়ে প্রধান মুখ্য কুলীন এবং সীতারাম ও রামরাম বাড়ি কোমল মুখ্য কুলীন ছিলেন। তিন ভ্রাতাই বিদ্বান, ঐশ্বর্যশালী এবং যশস্বী ছিলেন। তিন ভ্রাতাই পৈতৃক বাসস্থান মাহানগরের নিকটস্থ মল্লিকপুর গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া যান। দুর্গারাম অকালপোষ গ্রামে এবং সীতারাম ও রামরাম কাঠাগোড়ে গিয়া বাস করেন।

কাঠাগোড় :—হুগলী জেলার মধ্যে পাণ্ডুয়া থানার অধীন ই. আই. রেল লাইনের পাণ্ডুয়া নামক ষ্টেসন হইতে তিন মাইল পশ্চিমে কাঠাগোড় নামক একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম এখনও বর্তমান আছে এবং তথায় মাহীনগরের বসু বংশীয় অনেক বংশধর এখনও বাস করিতেছেন। পূর্বেই গোপীনাথ বসুর জীবনীতে লিখিয়াছি যে উক্ত পাণ্ডুয়ার নিকট সেয়াখালা নামক স্থানে বসুবংশের সর্বোজ্জ্বল রত্ন মহাত্মা পুরন্দর খানের অনেক কীর্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। পাণ্ডুয়া

কলিকাতা হইতে ৩৮ মাইল উত্তরে রাঢ়দেশেই অবস্থিত এবং বঙ্গের একটি অতি প্রাচীন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নগর। দুই শতাব্দী পূর্বে পাণ্ডুয়া একটি অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। বহু প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাণ্ডুয়ার অনেক ইতিবৃত্ত এখনও পাওয়া যায়। জাতীয় ইতিহাসের ব্রাহ্মণ কাণ্ডে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব ৺নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন রাজা আদিশূরের পরে পাল বংশ আসিয়া শূরের শূরত্ব নাশ করিয়া গৌড় অধিকার করিলে পলাতক শূর রাজারা পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লন। আদি-শূরের পুত্র ভূশূর রাঢ়ে আসিয়া পুণ্ড্র নামে নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত বর্তমান পাণ্ডুয়া বা পেঁড়োই এই নূতন পুণ্ড্র ইহা অনুমিত হয়।

১৭০৩ শকে (ইং ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে) ২৪শে মাঘ তারিখে ছয় হাজারী মন্সবদার মহারাজ নবকৃষ্ণ শোভাবাজার রাজবাটীতে ২২ পর্যায়ের একজাই বা সমীকরণ করিয়া গোষ্ঠীপতি হন। উক্ত সভায় দুর্গারাম, সীতারাম এবং রামরাম নিমন্ত্রিত হইয়া মুখ্য কুলীনগণের মধ্যে সম্মানিত হন। সংস্কৃত কারিকা ইত্যাদি সমীকরণ কারিকায় কুলাচার্যগণ সীতারামকে "স্তুতঃশ্রীলসীতাদি রামঃ প্রসিদ্ধঃ," "মল্লিক কুলবিখ্যাত সীতারামঃ কুলব্রতঃ।" "সীতারাম বসুর কুল শ্রীকৃষ্ণ বসু সমতুল" প্রভৃতি বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। তিন ভ্রাতাই ধনবান ও সামাজিক লোক ছিলেন।

রাজারামের কনিষ্ঠ পুত্র রামরামের চারি পুত্র কৃষ্ণচরণ, রামশঙ্কর, বিষ্ণুরাম ও শ্যামচরণ বা শ্যামসুন্দর।

চারি পুত্র কাঠাগোড় গ্রামে পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া বাস করেন এবং সমাজে মুখ্য কুলীন থাকিয়া সকল কুলকর্ম যথারীতি পালন করিয়া সমাজে সম্মানিত হন।

রামশঙ্কর বসুমল্লিক

রামরামের দ্বিতীয় পুত্র ২৩ পর্যায়ে বাড়ি কোমল মুখ্য কুলীন রামশঙ্কর বিনয়ী ও মান্যবর লোক ছিলেন। তিনি কাঠাগোড় গ্রামেই বাস করিতেন।

রামশঙ্করের চারি পুত্র এবং কন্যা হয়, জ্যেষ্ঠ পুত্র রামগোবিন্দ কোমল মুখ্য, ২য় পুত্র রামনারায়ণ বাড়ি কোমল মুখ্য, ৩য় পুত্র রামপ্রসাদ বাড়ি কোমল মুখ্য, ৪র্থ পুত্র রামকুমার বাড়ি কোমল মুখ্য।

জ্যেষ্ঠ রামগোবিন্দের হরিপাল নিবাসী রাধাগোবিন্দ ঘোষের পুত্র বাড়ি কোমলমুখ্য গদাধর ঘোষের কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া কুলকর্ম করেন এবং একমাত্র কন্যার কাঠাগোড় নিবাসী সন্তোষ ঘোষের পুত্র বাড়ি কোমলমুখ্য গোকুলানন্দের সহিত বিবাহ দেন।

রামশঙ্করের চারি পুত্র নিজ নিজ বংশমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কাঠাগোড় গ্রামে বাস করিতেন। সকলেই অবস্থাপন্ন এবং সামাজিক লোক ছিলেন। স্বীয় স্বীয় প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি রক্ষা করিয়া নিজ গ্রামের অট্টালিকায় বার মাসে তের পার্বণ করিয়া গিয়াছেন এবং পূর্বপুরুষগণের অশেষ যশ ও মর্যাদা গৌরবের সহিত রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

এই বসুবংশের আদিপুরুষ হইতে এযাবৎ প্রত্যেকের নামই কোন না কোন হিন্দুদেবতার নাম লইয়া রাখা হইয়াছে। প্রথম বীজপুরুষ দশরথ, তৎপুত্র কৃষ্ণ, তৎপুত্র ভবনাথ এইরূপে ২৩ পর্যায় অবধি প্রত্যেকের নামই কোন দেবতার নাম। রাম নামই সর্বাপেক্ষা বেশী দেখা যায়। ১৯ পর্যায়ে গোবিন্দের পুত্র রামভদ্র, তৎসুত রমাবল্লভ, তৎসুত রাজারাম, তৎপুত্র দুর্গারাম, সীতারাম, রামরাম, রামরামের পুত্র রামশঙ্কর, তৎপুত্র রামগোবিন্দ, রামনারায়ণ, রামপ্রসাদ ও রামকুমার। ২৪ পর্যায় অবধি এখনও অধিকাংশ বংশধরের নাম কোন দেবতার নামে আছে। ২৭ পর্যায়ে সকল নামের সহিত চন্দ্র উপাধি আছে। ২৮ ও ২৯ পর্যায়ের অনেক বংশধরের নামের সহিত 'ইন্দ্র' যুক্ত দেখা যায় যেমন জ্ঞানেন্দ্র, গুণেন্দ্র, সত্যেন্দ্র, মনোজেন্দ্র, দেবেন্দ্র ইত্যাদি। প্রাচীন কুলাচার্যগণ ও ঘটকেরা তাঁহাদের কুলপঞ্জিকা ও কারিকায় এই বসু বংশের প্রত্যেক পুত্রের নাম অংশ বংশ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা প্রাচীন কারিকা সকল হইতে ২৩ পর্যায় শ্রীমন্ত বসুর সময় হইতে এই বংশের প্রত্যেক পুত্র ও কন্যার বিবাহের বিবরণ পাইয়াছি। কন্যা বা কুলবধূগণের নাম কোন গ্রন্থে উল্লেখ নাই। পুরাকালে কুলীন মহিলার নাম প্রকাশ করা অশোভনীয় ছিল বলিয়া কোন মহিলার নাম কোন কুলগ্রন্থে লেখা নাই।

রামকুমার বসুমল্লিক

রামশঙ্করের কনিষ্ঠ পুত্র ২৪ পর্যায়ে বাড়ি কোমলমুখ্য রামকুমার বসুমল্লিক।

রামকুমার অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাঠাগোড় গ্রামে বাস করিতেন এবং পৈতৃক সম্পত্তি জমি-জমা দেখাশুনা করিতেন। সেই সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গের শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ইংরাজ রাজত্ব স্থাপন করেন এবং কলিকাতায় তাঁহাদের ব্যবসার কেন্দ্র ও রাজধানী করেন। সেই সময় হইতে নানাদেশ হইতে নানা কার্যে বহু কায়স্থ ভদ্রলোক কলিকাতায় আসিয়া বসবাস স্থাপন করেন এবং ক্রমে ক্রমে কলিকাতা একটি বৃহৎ সমৃদ্ধিশালী নগরী হইয়া উঠে। কলিকাতার উচ্চবংশীয় কায়স্থগণ নবাগত কলিকাতার কায়স্থগণের সহিত সহজে বিবাহাদি কার্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন কারণ তাঁহাদের ধারণা ছিল যে কলিকাতায় নবাগত কায়স্থগণ বিশেষ উচ্চবংশসম্ভূত নহে এবং তখনও সমাজের বন্ধন অতীব দৃঢ় ছিল। উচ্চবংশের কলিকাতাবাসী কায়স্থ ও মৌলিকগণ পুরাতন পল্লীর উচ্চ কুলীন বংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া নিজ নিজ বংশমর্যাদা রক্ষা করিতে সদা চেষ্টা করিতেন।

রামকুমার প্রথমে নিজগ্রামে শ্রীমতী গঙ্গামণিকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার এক পুত্র পার্বতীচরণ এবং এক কন্যা হয়।

কলিকাতায় আধুনিক পটলডাঙ্গা নামক স্থান তখন পঞ্চানন গ্রামে কৃষ্ণরাম আইচ নামক একঘর উচ্চ মৌলিক বংশজাত ধনবান কায়স্থ বাস করিতেন। আধুনিক শ্রীগোপাল মল্লিক লেন নামক গলি তখন পঞ্চাননতলা লেন নামে অভিহিত হইত এবং এই রাস্তার উপর উক্ত কৃষ্ণরাম আইচ পাকা অট্টালিকায় বাস করিতেন এবং নানারূপ ব্যবসা-বাণিজ্যে রত ছিলেন।

উক্ত কৃষ্ণরাম আইচ কাঠাগোড় গ্রামনিবাসী উচ্চ কুলীন বংশজাত রামকুমারের সহিত তাঁহার কন্যা শ্রীমতী শঙ্করীর বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠান এবং রামকুমার ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত মৌলিক কন্যা শ্রীমতী শঙ্করীকে বিবাহ করিয়া আত্মরস করেন।

পুরাকালে বহুবিবাহ খুবই প্রচলিত ছিল। বিশেষতঃ কুলীন কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণ এক স্ত্রী বর্তমানেও দ্বিতীয়, তৃতীয় বা আরও অধিক দার পরিগ্রহ করিতেন।

মহারাজ পুরন্দর খাঁর কুলবিধি মতে কুলীন কায়স্থ সন্তান প্রথমা স্ত্রী জীবিত

থাকিলেও দ্বিতীয়বার কুলীন বা মৌলিকের কন্যা গ্রহণ করিতে পারিতেন এবং কুলীন কুমার প্রথমে কুলীন কন্যা গ্রহণ করিয়া পুনরায় মৌলিকের কন্যাকে গ্রহণ করিলে তাহাকে আত্মরস কহিত। পূর্বেই এবিষয়ে লিখিয়াছি যে মৌলিকগণ কুলীন কায়স্থকে কন্যাদান করিয়া নিজ বংশমর্যাদা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিত এবং এরূপ বিবাহ বিশেষ গৌরবের বিষয় ছিল ও আত্মরসকারী সমাজে বিশেষ আদৃত হইত।

রামকুমার দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণের সময় তাঁহার প্রথমা পত্নী শ্রীমতী গঙ্গামণির ও জ্ঞাতিবর্গের সহিত কাঠাগোড় গ্রামে বাস করিতেন। ধনবান শ্বশুর কৃষ্ণরাম আইচ জামাতা রামকুমারকে মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আনাইয়া নিজ পঞ্চাননতলার বাটীতে বিশেষ যত্নে রাখিতেন এবং রামকুমারের দ্বিতীয় পক্ষের সংসার প্রায় কলিকাতায় থাকিতেন।

রামকুমারের দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী শঙ্করীর দুই পুত্র রাধানাথ ও মহেশচন্দ্র এবং এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন।

রামকুমার অতি নিরীহ চরিত্রবান ও ধার্মিক ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁহার কোনরূপ অহঙ্কার ছিল না। শাস্ত্রগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া তিনি সময় কাটাইতেন।

দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজের একজাই করিয়া গোষ্ঠীপতি হইবার জন্য পর পর তিনবার একজাই সভা আহূত হয় এবং কুলগ্রন্থে কুলাচার্যগণ এই একজাই লইয়া তিনবার সমীকরণের বিবরণ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সেই সময় কলিকাতায় বিডন স্ট্রীট নিবাসী ভরদ্বাজ গোত্র দেববংশের মহাত্মা রামদুলাল সরকার এবং শোভাবাজার রাজবাটির মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের বংশধরগণ অতুল ঐশ্বর্যশালী হন এবং দুই বংশের মধ্যে সমাজপতি হইবার জন্য প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে।

১২ই মাঘ ১৭৬৬ শকে (১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে) শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর রাজবাটীতে একজাই করিয়া গোষ্ঠীপতি হন এবং উক্ত সভায় প্রকৃতমুখ্য কুলীনগণের মধ্যে মাহীনগর সমাজের রাজনারায়ণ বসু সর্বাধিকারী এবং ২১২ জন কোমলমুখ্য কুলীনগণের মধ্যে রামকুমার বসু উপস্থিত থাকিয়া সম্মানিত হন।

শোভাবাজার রাজবাটীতে একজাই হইবার চারি দিবস পর ১৭ই মাঘ তারিখে রামদুলাল সরকারের দুই পুত্র আশুতোষ দেব (ছাতুবাবু) এবং

প্রমথনাথ দেব (লাটুবাবু) একজাই সভা করিয়া গোষ্ঠীপতি হন। ১১৩২ সালে রামদুলাল সরকারের মৃত্যু হইলে তাঁহার দুই পুত্র আশুতোষ ও প্রমথনাথ প্রায় দেড়কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক হন এবং উভয় ভ্রাতা প্রায় ছয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া মহাসমারোহে পিতৃশ্রাদ্ধ করেন।

এই একজাই সম্বন্ধে মাধব বসুর একজাই কারিকায় বর্ণনা আছে—

আশুতোষ গোষ্ঠীপতি হইলেন সংসারে।
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের লোক ধন্য ধন্য করে॥
তস্য পুত্র গিরিশচন্দ্র খ্যাত পৃথিবীতে।
পুরন্দর সম মান্য পাইবে গেলেতে॥
মানেতে কৌরব সম প্রতিজ্ঞায় বলী।
দর্পেতে ভীষ্মের সম লজ্জা পায় কালি॥

উক্ত সমীকরণ সভায় উপস্থিত ২১০ জন কোমলমুখ্যের মধ্যে রামকুমার বসু মল্লিক উপস্থিত ছিলেন।

উক্ত একজাই সভার পর শোভাবাজার রাজবংশ ও সিমুলিয়ার দেববংশের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলিতে থাকে এবং শোভাবাজার রাজবংশ গোষ্ঠীপতি পদ পুনরায় পাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে থাকেন। উক্ত একজাই হইবার দশ বৎসর পরে ৮ই বৈশাখ ১৭৭৬ শকে রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তাঁহার পৌত্রের বিবাহ উপলক্ষে ২৪ পর্যায়ের কুলীনগণের একজাই করিয়া পুনরায় নিজ বংশে গোষ্ঠীপতি পদ ফেরৎ আনেন। ১২৬১ বঙ্গাব্দীয় ৮ই বৈশাখ ২৪ পর্যায়ের ষড়্‌ভ্রাতৃ নামক কুলীন মহাশয়গণের একজাই পত্রিকায় '৫। কাঁটাগড়ীয় রামহরি বসুসুত'র নাম দেখা যায়।

শোভাবাজার রাজবংশে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর গোষ্ঠীপতি পদ পাওয়ায় সিমুলিয়ার দেববংশ পুনরায় গোষ্ঠীপতি পদ ফেরৎ পাইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে থাকেন। ছাতুবাবুর একমাত্র পুত্র গিরিশচন্দ্র পিতার জীবদ্দশায় অপুত্রক হইয়াই পরলোকগমন করেন। লাটুবাবুর দুই স্ত্রী ছিল।

বড় স্ত্রী মন্মথনাথকে এবং ছোট স্ত্রী অনাথনাথকে পোষ্যপুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন। মন্মথনাথের কোন সন্তানাদি না হওয়ায় অনাথনাথ দেব সকল বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইয়া একজাই করিয়া পুনরায় গোষ্ঠীপতি পদ পাইবার জন্য উদ্যোগী হন। ১৬ই মাঘ ১২৮৬ সালে জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ উপলক্ষে অনাথনাথ দেব প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করিয়া কুলীনগণের একজাই করিয়া গোষ্ঠীপতি

হইলেন। উক্ত সমীকরণ সভায় প্রকৃতমুখ্যের মধ্যে মাহীনগর সমাজের অনাথ বসু সর্বাধিকারী অগ্রগণ্য হইয়াছিলেন এবং ৮০ জন সহজমুখ্যের মধ্যে রাধানাথ বসুমল্লিক উপস্থিত ছিলেন। অনাথনাথ দেব মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ত্রিপথনাথ দেবের উক্ত রাধানাথ বসুমল্লিক মহাশয়ের পৌত্র পার্শীবাগান নিবাসী নগেন্দ্রনাথ বসুমল্লিক মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যার সহিত শুভবিবাহ হয়।

রামকুমারের তিন পুত্র পার্বতীচরণ, রাধানাথ এবং মহেশচন্দ্র।

জ্যেষ্ঠ পুত্র পার্বতীচরণ পাণিহাটী নিবাসী বাড়ি কোমলমুখ্য কুলীন দর্পনারায়ণ মিত্রের পুত্র পার্বতীচরণ মিত্রের কন্যা শ্রীমতী সরস্বতী দেবীকে কুলকর্ম করিয়া বিবাহ করেন।

১৫ই অগ্রহায়ণ ১২৪৮ সনে ইং ৩০শে নবেম্বর ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে রামকুমার তাঁহার পঁচাশি বৎসর বয়ঃক্রমকালে পটলডাঙ্গা ভবনে ইহধাম ত্যাগ করেন।

রামকুমারের প্রথমা পত্নী শ্রীমতী গঙ্গামণি স্বামীর স্বর্গারোহণের পূর্বেই কাঠাগোড় গ্রামে থাকিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

রামকুমারের দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী শঙ্করী ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পটলডাঙ্গাস্থ স্বনামধন্য পুত্র রাধানাথের আলয়ে সাধ্বী পত্নী স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

রামকুমার ইহধাম ত্যাগ করিবার পূর্বেই তাঁহার অশেষ গুণবান পুত্র রাধানাথকে নিজ অধ্যবসায়বলে নানারূপ ব্যবসা করিয়া কলিকাতায় প্রভূত সম্পত্তি অর্জন করিতে এবং কলিকাতায় অট্টালিকাদি সম্পত্তি করিয়া এই বসুবংশের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে দেখিয়া গিয়াছেন। রামকুমারের সময় হইতে এই বংশ পটলডাঙ্গায় আসিয়া বসবাস স্থাপন করিয়া পরে পটলডাঙ্গার বসুমল্লিকবংশ বলিয়া সুবিখ্যাত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কলিকাতায় এই বংশের প্রতিষ্ঠা।

রামকুমারের জ্যেষ্ঠ পুত্র পার্বতীচরণ কাঠাগোড় গ্রামে নিঃসন্তান হইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন এবং তাঁহার স্ত্রী সরস্বতী দেবী কলিকাতায় শ্বশুর ও দেবরের নিকট শেষজীবন যাপন করিয়া যান।

রামকুমারের এক কন্যার ২৪ পরগণা জেলাস্থ ঘাটেশ্বর গ্রামবাসী হরিনারায়ণ চৌধুরীর সহিত বিবাহ হয়। হরিনারায়ণের একমাত্র পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া মাতুল রাধানাথের নিকট থাকিয়া বিদ্যার্জন করিয়া মাতুলের সাহায্যে কলিকাতায় কর্ম করিয়া চাঁপাতলায় বাসস্থান স্থাপন করেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের চারিপুত্র উমেশচন্দ্র, অক্ষয়কুমার, বিনোদবিহারী ও বিপিনবিহারী এবং এক কন্যা শ্রীমতী যোগেশমোহিনী। যোগেশমোহিনীর বর্ধমান নিবাসী সুবিখ্যাত উকিল রায় বাহাদুর নলিনাক্ষ বসু মহাশয়ের সহিত বিবাহ হয়। উমেশচন্দ্রের চারিপুত্র সুরেশচন্দ্র, নরেশচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ও গণেশচন্দ্র এবং অক্ষয়কুমারের একমাত্র পুত্র জীবনকৃষ্ণ। বিনোদ এবং বিপিন উভয় ভ্রাতাই দার পরিগ্রহণ করেন নাই।

নবম অধ্যায়

রাধানাথ বসুমল্লিক

রামকুমার বসুমল্লিকের পুত্র ২৫ পর্যায়ে বাড়ি কোমলমুখ্য কুলীন রাধানাথ ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা পঞ্চাননতলা লেনস্থ মাতামহ কৃষ্ণচন্দ্র আইচ মহাশয়ের ভবনে জন্মগ্রহণ করেন।

রাধানাথ বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত মেধাবী, শ্রমশীল ও অধ্যবসায়ী বালক ছিলেন। তিনি কলিকাতায় মাতুলালয়ে থাকিয়া স্থানীয় বাঙ্গলা ও ইংরাজী বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেন এবং ইংরাজী ভাষা ও হিসাবপত্র বিষয়ে সুদক্ষ হন।

কর্মজীবনে প্রবেশ :—রাধানাথ বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গঙ্গাধর বিশ্বাস নামক এক ব্যবসায়ীর আফিসে কর্মচারীরূপে প্রবেশ করেন। সেই সময় গঙ্গাধর বিশ্বাস কোন বিলাতী জাহাজের আফিসে বেনিয়ানের বা মুচ্ছুদ্দির কার্য করিতেন। রাধানাথ কিছু দিবস উক্ত কার্য করিয়া তাঁহার মাতামহ কৃষ্ণরাম আইচ মহাশয়ের সাহায্যে স্বয়ং একটি বিলাতী জাহাজের আফিসের বেনিয়ান বা মুচ্ছুদ্দির কার্য লইয়া কর্ম করিতে থাকেন। এই সময় হইতে ভাগ্যলক্ষ্মী রাধানাথের প্রতি বিশেষ সুপ্রসন্না হইতে থাকেন। উক্ত মুচ্ছুদ্দির কার্যের সঙ্গে সঙ্গে রাধানাথ নীলচাষী ইংরাজগণের দূরদেশস্থ বড বড় নীলচাষের উদ্যানে ও কারখানায় প্রয়োজনীয় মালপত্রাদি কলিকাতা হইতে সরবরাহ করিবার অর্ডার সাপ্লায়ারের কার্য করিতে থাকেন।

সেই সময় ভাগীরথীর তীরে মেসার্স বিচ্যাম্প-এর (Beauchamps & Company, Ship Builders) জাহাজ প্রস্তুত, মেরামত ইত্যাদির এক বড় কারবার ছিল। রাধানাথ অন্য কোম্পানির মুচ্ছুদ্দির এবং অন্যান্য কার্যাদি পরিত্যাগ করিয়া উক্ত বিচ্যাম্প কোম্পানির বেনিয়ান বা মুচ্ছুদ্দি এবং মালপত্রাদি সরবরাহের কার্য গ্রহণ করেন। উক্ত কার্য পরিচালনার জন্য রাধানাথকে সকল বাজার ঘুরিয়া সকল দ্রব্যাদির দাম অনুসন্ধান করিয়া সকল দ্রব্যাদি ও বাজার-দর সরবরাহ করিতে হইত। উক্ত কোম্পানির আরও অন্যান্য অর্ডার সাপ্লায়ার

দালাল ছিল এবং তাহারাও দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য সকল আবশ্যকীয় দ্রব্যের মূল্য কিরূপ তাহা জানাইয়া যাইত কিন্তু রাধানাথ যে দর দিতেন তাহার দর অপেক্ষা অন্যান্য দালালের দর অনেক বেশী হইত, ইহাতে উক্ত আফিসের সাহেবেরা রাধানাথের উপর বিশেষ বিশ্বাস স্থাপন করিতে লাগিল। রাধানাথকে উক্ত কার্যের জন্য বহু স্থানে গমন করিতে হইত কিন্তু অধ্যবসায়ী কর্মবীর রাধানাথ ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র ও ক্লেশকে কষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না এবং প্রাণপণে নিজ কার্য পালন করিয়া যাইতেন।

সৌভাগ্য সূচনা :—তখন উক্ত মেসার্স বিচ্যাম্প কোম্পানির আফিস হাওড়া সহরে গঙ্গার তটে অবস্থিত। রাধানাথ প্রত্যহ প্রাতে সাতটার মধ্যে কার্যে বাহির হইয়া সকল বাজার ঘুরিয়া দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া বেলা ১২টার সময়ে আফিসে গিয়া বাজার-দর ও মালপত্রাদি সরবরাহ করিতেন। একদিবস বেলা ১২টা বাজে, বর্ষাকাল, মুষলধারায় বৃষ্টি পড়িতেছে, তখন এখনকার মত বাস, ট্রাম বা মোটরগাড়ি হয় নাই। ঐ দিবস বেলা ১২টার মধ্যে কতকগুলি আফিসের প্রয়োজনীয় কার্য সমাপ্ত করিয়া রাধানাথকে আফিসে গিয়া সাহেবের নিকট রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে। রাধানাথের জন্য আফিসে সাহেব উৎসুক হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন। কর্মী রাধানাথ ভীষণ ঝড় বৃষ্টিকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া পদব্রজেই ভিজিতে ভিজিতে যথাসময়ে আফিসে উপস্থিত হইয়া সাহেবের নিকট যথাসময়ে সন্তোষজনকভাবে নিজ কর্তব্য পালন করিলেন। আফিসের বড় সাহেব কর্মবীর রাধানাথের কর্তব্যজ্ঞান এবং কার্যদক্ষতা দেখিয়া অশেষ পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে পুরস্কার দিয়া তাহার বেতন ও কমিসন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। আফিসের সকল স্বত্বাধিকারীই রাধানাথের উপর অতুল বিশ্বাস ও ভালবাসা প্রকাশ করিতেন।

উক্ত আফিসের সকল কর্মচারীই রাধানাথকে স্বত্বাধিকারীদিগের প্রিয়পাত্র এবং রাধানাথের সত্যনিষ্ঠার জন্য তাঁহাদের উপরি পাওনাদি বন্ধ হইয়া যাইতেছে দেখিয়া রাধানাথের সকল কার্যের নানারূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে থাকে। ধর্মভীরু রাধানাথ অন্যায় উপায়ে এক কপর্দকও কাহারও নিকট হইতে লইতেন না বা অন্যায়ভাবে উপরি পাওনাও কাহাকেও লইতে দিতেন না। ইহাতে অন্যান্য সকল কর্মচারীই রাধানাথের উপর বিশেষ বিরূপ হইয়া এরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল, যে রাধানাথ উত্যক্ত হইয়া এক দিবস সাহেবের নিকট গিয়া অবসর প্রার্থনা করিলেন। আফিসের স্বত্বাধিকারী মিষ্টার বিচ্যাম্প সাহেব

রাধানাথের অধ্যবসায়, কার্যকুশলতা ও ন্যায়পরায়ণতার বিষয় পূর্বেই সম্যক জ্ঞাত ছিলেন। সাহেব সকল বিষয় বুঝিতে পারিয়া তাঁহার প্রার্থনা নামঞ্জুর করিয়া তাঁহাকে তাঁহার আফিসের প্রধান কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন এবং আফিস পরিচালনার সকল ভারই রাধানাথের উপর অর্পিত হইল।

পরবৎসর উক্ত আফিসের স্বত্বাধিকারী সাহেব যখন কয় মাসের জন্য বিলাত গমন করিলেন, তিনি তখন রাধানাথের উপর এত প্রগাঢ় বিশ্বাসী ছিলেন যে তাঁহার আফিসের সকল কার্য পরিচালনার এবং আদায়পত্রের ভার তাঁহার উপর দিয়া গেলেন। কয়েক মাস রাধানাথ বিশেষ বিবেচনা ও ন্যায়-পরায়ণতার সহিত সকল কার্য পরিচালনা করিয়া সকল কর্মের উন্নতি করেন; এবং উক্ত সাহেব বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন রাধানাথ সকল কার্যই অতি সুশৃঙ্খলে পরিচালনা করিয়া আফিসের কার্যের সকল বিভাগের উন্নতি করিয়াছেন এবং স্বীয় মাসিক বেতন ভিন্ন এক কপর্দকও অতিরিক্ত গ্রহণ করেন নাই। ইহাতে উক্ত মিষ্টার বিচ্যাম্প সাহেব এবং কোম্পানির অন্যান্য অংশীদারগণ রাধানাথের বিদ্যাবুদ্ধি ও কার্য-কুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের উক্ত ব্যবসায়ে রাধানাথকে অংশীদার বা পার্টনার করিয়া লইলেন। উক্ত মেসার্স বিচ্যাম্প কোম্পানির জাহাজের কারবারের একজন অংশীদার ও পরিচালক হিসাবে রাধানাথ দ্বাদশ বৎসর কার্য করিয়া অতুল ঐশ্বর্যলাভ করেন।

সেই সময় অতি অল্প লোকই ইংরাজী ভাষা জানিত কিন্তু রাধানাথ ইংরাজী ভাষায় অতি সুন্দরভাবে কথা কহিতে এবং লিখিতে পারিতেন এবং বাঙ্গলা ও ইংরাজী হিসাব সুন্দরভাবে রাখিতে জানিতেন। সত্যবাদী ও বিশ্বাসী রাধানাথ কখনও নিজ পদমর্যাদা ভুলিতেন না ও কাহারও অপকার করিবার কখনও চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার সংস্পর্শে যে যে বড় বড় ইংরাজ ব্যবসায়ী আসিয়াছিলেন সকলেই রাধানাথের অধ্যবসায়, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং শ্রমশীলতা দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ ও বিশ্বাস করিতেন।

কর্মসূত্রে রাধানাথকে নিয়ত জাহাজে গমনাগমন করিতে হইত এবং এই সূত্রে কলিকাতা হইতে ডায়মণ্ডহারবার পর্যন্ত তাঁহার গতিবিধি ছিল। তিনি সকল জাহাজের গোরার সহিত সুন্দর ও সহজভাবে চট্‌পট্ ইংরাজীতে কথাবার্তা কহিতে পারিতেন। ঝড়, বৃষ্টি, ঝঞ্ঝা ও ক্লেশ কিছুতেই তাঁহার ভ্রূক্ষেপ ছিল না। এত ক্লেশ স্বীকার করিয়া তিনি জাহাজ সংক্রান্ত এবং ইংরাজগণের

ব্যবসাবুদ্ধির সকল তত্ত্বই অবগত হইয়াছিলেন এবং এই জ্ঞানই পরবর্তী জীবনে তাঁহার সৌভাগ্যের সূত্রপাতের মূল কারণ হইয়াছিল। জাহাজ সংক্রান্ত সকল বিষয় গোচরীভূত হওয়ায় এই বিষয়ে যে নিপুণতা তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাহার ফলেই তিনি প্রভূত অর্থোপার্জন করিয়া ধনবান ও যশস্বী হইয়াছিলেন।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রাধানাথ "স্যার উইলিয়ম ওয়ালেস" নামক দুইশত টনের একটি বড় ষ্টীমার দ্বাদশ সহস্র মুদ্রায় খরিদ করিয়া ইংরাজ নাবিক রাখিয়া মালপত্র বহনের ব্যবসা করিয়াছিলেন। বাণিজ্য ব্যবসায়ে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা জন্মে এবং এই সময় সকল ইংরাজ ব্যবসায়ী রাধানাথের কার্যদক্ষতা, ব্যবসাবুদ্ধি ও সাধুতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে এবং তাঁহার সহিত ব্যবসাসূত্রে আবদ্ধ হইতে আরম্ভ করেন।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে উক্ত মেসার্স বিচ্যাম্প কোম্পানির একজন অংশীদার মিষ্টার স্যামুয়েল রিড সাহেব উক্ত কোম্পানির সুপারিণ্টেডেণ্ট ও ম্যানেজার ছিলেন এবং রাধানাথের সহিত একত্রে কার্য করিয়া তাঁহার বিশেষ বন্ধু হন। রাধানাথ উক্ত রিড সাহেবকে তাঁহার সহিত অংশীদার হইয়া একটি ড্রাই-ডক্ নিজেদের মধ্যে খুলিয়া ব্যবসা করিবার প্রস্তাব করেন। সেই সময় দূরদূরান্তর দেশ হইতে নানারূপ পণ্যদ্রব্য লইয়া বহু জাহাজ কলিকাতার বন্দরে আসিত কিন্তু ভাল ডক বা বন্দর অতি অল্পই ছিল। তখন খিদিরপুরের ডক বা পোর্টকমিসনারের জেটি ইত্যাদি কিছুই ছিল না। রিড সাহেব রাধানাথের কার্যদক্ষতা এবং ব্যবসাবুদ্ধি ও সাধুতার বিষয় ভালরূপ জানিতেন এবং উক্ত নূতন ডক্ বা বন্দর প্রস্তুতের জন্য অংশীদার হইয়া কার্য করিতে রাজী হইলেন। ৩১শে অক্টোবর ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়ায় সালিখা নামক স্থানে গঙ্গার তটে বিষ্ণুবিহারী সেনের নিকট হইতে ১ বিঘা ১৭ কাঠা জমি খরিদ করিয়া বহু টাকা খরচ করিয়া বন্দর প্রস্তুত হইতে লাগিল। রাধানাথ এবং রিড সাহেব মেসার্স বিচ্যাম্প কোম্পানির কার্য পরিত্যাগ করিয়া হুগলী ডক্ ইয়ার্ড "Hoogly Dockyard" নামে বন্দর খুলিয়া শীঘ্রই কার্য আরম্ভ করিলেন। উক্ত ডকের দুইটি কার্যালয় ছিল, একটি উক্ত সালিখায় গঙ্গার তটে এবং আর একটি হাওড়ায়। রাধানাথ সেই সময় একজন বিশেষ ধনবান ও ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি ছিলেন। উক্ত বন্দর প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করিতে তিনি প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করেন এবং তাঁহার অশেষ পরিশ্রম এবং যত্ন ও কার্যকুশলতায় উক্ত হুগলী ডক্ অতীব সুন্দরভাবে পরিচালিত হইতে থাকে এবং অল্পদিবসের মধ্যে বহু টাকা আয় হয়। পরবৎসর একটি

ভীষণ ঝটিকায় কলিকাতায় আগত অনেকগুলি জাহাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া উক্ত হুগলীর ডকে মেরামত হইতে আসে এবং ইহাতে রাধানাথ ও রিড সাহেব প্রভৃত লাভবান হন। উক্ত ডকের রাধানাথ বার আনা এবং রিড সাহেব চারি আনার অংশীদার ছিলেন। দুই বৎসর মাত্র কার্য করিয়া উক্ত ডক্ হইতে বহুলক্ষ টাকা আয় হয়।

রাধানাথ দুর্ভাগ্যক্রমে বেশী দিবস উক্ত ডক্ পরিচালনা করিতে পারেন নাই। ক্ষণজন্মা পুরুষ রাধানাথকে উক্ত ডক্ প্রতিষ্ঠার দুই বৎসরের মধ্যেই ভগবান মর্ত্যের কর্মক্ষেত্র হইতে উপরে ডাকিয়া লইলেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর তাঁহার উপযুক্ত পুত্র জয়গোপাল এবং দ্বারিকানাথ উক্ত ডক্ পরিচালনা করিয়া বহু টাকা লাভ করেন, পরে উক্ত ডক্ রাধানাথের পৌত্রগণ কলিকাতার মার্টিন কোম্পানির হস্তে পরিচালনার ভার দেন। এখনও উক্ত ডক উক্ত হুগলী ডক্ ইয়ার্ড নামে উক্ত স্থানেই মেসার্স মার্টিন কোম্পানির দ্বারা লিমিটেড বা যৌথ কারবার হিসাবে পরিচালিত হইতেছে এবং সেই মহাপুরুষ রাধানাথের অক্ষয় কীর্তি ঘোষণা করিতেছে।

রাধানাথ ইংরাজ জাতির ব্যবসা নীতি প্রকৃষ্টরূপে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। সকল গুণ ও দোষ নিবিষ্টচিত্তে আলোচনা করিয়া স্বীয় কর্মজীবনে ঐ নীতির যথাসম্ভব অনুসরণ করিয়া নিজ তীক্ষ্ণবুদ্ধিবলে উন্নতির দিকে সদাই চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে রাধানাথ জীবনের প্রথমভাগে ইংরাজের আফিসে দ্বাদশ মুদ্রার সামান্য কর্মচারীরূপে কার্য করিতে আরম্ভ করেন সেই রাধানাথ মাত্র কয় বৎসরের মধ্যে বড় ইংরাজের জাহাজের ব্যবসায় অংশীদার হইয়া এবং নিজে অনেক ইংরাজকে মাহিনা দিয়া ভৃত্যস্বরূপ রাখিয়া ব্যবসা চালাইয়াছিলেন এবং বহুলক্ষ টাকা খরচ করিয়া বড় ডক্ নিজে প্রতিষ্ঠা করিয়া পরিচালিত করিয়াছিলেন। পিতার সহিত কলিকাতায় আসিয়া মাতুলালয়ে থাকিয়া সামান্য গৃহস্থ বালক হইতে নিজ পরিশ্রম এবং কার্যকুশলতায় অতুল ঐশ্বর্য অর্জন করিয়া বঙ্গদেশের একজন ধনবান এবং প্রথিতযশা লোক হইয়াছিলেন। অসাধারণ মেধাবী পুরুষ ছিলেন এই রাধানাথ।

কিন্তু হায়! রাধানাথ তাঁহার স্বহস্তে রোপিত ডক্‌রূপ উদ্যানের ফল বেশী দিবস ভোগ করিতে পারেন নাই। উক্ত হুগলী ডক্ প্রতিষ্ঠার দুই বৎসরের মধ্যেই এই সার্থকজন্মা কর্মী ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ, ১২৫০ সনের ১লা চৈত্র তারিখে কর্মময় জীবন পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলোকে বিশ্রাম করিতে চলিয়া

গেলেন। মনুষ্যের কীর্তিই অবিনশ্বর। এই কর্মী রাধানাথ একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ।

রাধানাথ ব্যবসা করিয়া যে অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন তাহার এক কপর্দকও ভোগবিলাসে বা বাবুয়ানা করিয়া খরচ করেন নাই। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে রাধানাথ ত্রিশবৎসর বয়ঃক্রমকালে পঞ্চাননতলা লেনে তাঁহার মাতুল রামমোহন আইচের নিকট হইতে প্রথমে আড়াই কাঠা জমি ক্রয় করেন; ক্রমে উক্ত জমির সংলগ্ন আরো সাত কাঠা তের ছটাক জমি বিভিন্ন লোকের নিকট হইতে স্বোপার্জিত অর্থ হইতে খরিদ করিয়া সমস্ত জমির উপর দুইতালা পাকা অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া কলিকাতায় বসুমল্লিকবংশের ভিত্তি স্থাপন করান। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস হইতে বৃদ্ধ মাতা-পিতাকে এবং নিজ ভ্রাতা-ভগ্নীগণের সহিত উক্ত পাকাবাটীতে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। উক্ত বাটীর তৎসময়ে নম্বর ছিল ২৩নং পঞ্চাননতলা লেন; যাহা এখন ৪৬নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেনস্থ শ্রীসতীশচন্দ্র বসুমল্লিক মহাশয়ের অট্টালিকার উত্তর ভাগ এবং ১৮নং রাধানাথ মল্লিক লেনস্থ ৺চারুচন্দ্র বসুমল্লিক মহাশয়ের বাটীর দক্ষিণ অংশ। ইহা ভিন্ন রাধানাথ কলিকাতায় এবং নিকটবর্তী স্থানে আরো অনেক জমি ও বাটী স্বোপার্জিত অর্থ হইতে খরিদ করেন।

রাধানাথ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধ পিতামাতার উপর শ্রদ্ধা ও ভক্তি অপরিমেয় ছিল। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা ৮৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইহলোক ত্যাগ করিলে, তিনি মহাসমারোহে বহু অর্থব্যয় করিয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও দীন দরিদ্রকে অকাতরে বিদায় ও দানে তৃপ্তি করিয়া বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ যথারীতি শাস্ত্রমতে সুসম্পন্ন করেন। তিনি নিজ বাটীতে "শ্রীশ্রীধরজীউ" দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্রাহ্মণের দ্বারা দৈনিক পূজার ব্যবস্থা করেন। কালনা নিবাসী কুলগুরু ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিয়া প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেন।

তিনি তাঁহার নূতন অট্টালিকায় নাটমন্দির দালান নির্মাণ করাইয়া প্রতি বৎসর মহাসমারোহে ৺শারদীয়া দুর্গোৎসব করাইতেন। বহু দরিদ্র তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য পাইত।

রাধানাথ নিরহঙ্কারী ও অকলঙ্ক চরিত্রের পুরুষ ছিলেন। বহুলক্ষ মুদ্রার মালিক হইয়াও রাধানাথ বিলাসিতার ধার ধারিতেন না। তাঁহার বেশভূষা আহার বিহার সাধারণ গৃহস্থ লোক অপেক্ষা কোন অংশে অতিরিক্ত ছিল না।

তিনি সকল স্থানেই তৎকালীন মোটা কাপড় এবং বেনিয়ান জামা পরিয়া যাতায়াত করিতেন। জীবনে কখনও ইংরাজী ভাবাপন্ন হন নাই। ব্যবসার খাতিরে অনেক সময়েই তাঁহাকে বহু বড় বড় ইংরাজের সহিত দেখা করিতে যাইতে হইত; তিনি কখনও দেশীয় পোষাক ভিন্ন ইংরাজী পোষাক পরিধান করিয়া যান নাই।

রাধানাথ নিস্বার্থপরায়ণ লোক ছিলেন। নিজে অক্লান্ত পরিশ্রম দ্বারা ধনবান হইয়াছিলেন বটে কিন্তু স্বীয় ভ্রাতা ও আত্মীয়দিগকেও কখনও ভিন্নভাবে দেখেন নাই। রাধানাথ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পার্বতীচরণের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা স্ত্রী শ্রীমতী সরস্বতী দেবীকে কাঠাগোড় গ্রামস্থ পৈত্রিক বাসভবন হইতে কলিকাতায় আনাইয়া তাঁহার নিজ সংসারে রাখিয়া সমস্ত ভরণপোষণের ভার লন। রাধানাথ তাঁহার উইলে উক্ত বিধবা ভ্রাতৃজায়ার ভরণপোষণের জন্য মাসোহারার বন্দোবস্ত করিয়া যান।

রাধানাথ কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহেশচন্দ্রকে বহুবার বহু টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন এবং ভ্রাতার পরিবারবর্গকে নিজ পরিবারবর্গের সহিত সমান আদর-যত্নে ভরণপোষণ করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে অনেক দরিদ্র আত্মীয় তাঁহার দত্ত ভরণপোষণে মানুষ হইয়াছে। তাঁহার ভ্রাতা মহেশচন্দ্র তাঁহার অমতে এক বৎসরের মধ্যে দুইবার বিবাহ করেন কিন্তু উদার চরিত্রের রাধানাথ ভ্রাতাকে তথাপি ভিন্ন করেন নাই, এমনকি দানবীর রাধানাথ তাঁহার উইলে তাঁহার এক্‌জিকিউটারকে আদেশ দিয়াছিলেন তাঁহার সম্পত্তি হইতে উক্ত ভ্রাতার দুই পত্নীই যত দিবস জীবিত থাকিবেন, তাঁহার বিষয় হইতে প্রত্যেকেই নিয়মিত মাসোহারা পাইবেন ও তাঁহার গৃহে থাকিতে পাইবেন। আশ্চর্য তাঁহার ভ্রাতৃপ্রেম!

রাধানাথ হাটখোলা দত্তবংশের কন্যা শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী দেবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার চারি পুত্র জয়গোপাল, দ্বারিকানাথ, দীননাথ ও শ্রীগোপাল এবং দুই কন্যা শ্রীমতী করুণাময়ী ও শ্রীমতী নবীনকালী।

রাধানাথ কলিকাতায় বাসস্থান ও সম্পত্তি করিয়া কলিকাতাবাসী হন এবং তাঁহার সময় হইতে মাহীনগর বসুবংশের ২৪ পর্যায় রামকুমারের সকল বংশধরের বাসস্থান কাঠাগোড়ে গ্রাম হইতে আসিয়া কলিকাতায় বসবাস স্থাপন করেন। কলিকাতার উচ্চ সকল সম্রান্ত লোকের সহিত রাধানাথের বিশেষ সৌহার্দ্য স্থাপিত হয় এবং সমাজে তাঁহার মানসম্রম, প্রভাব ও প্রতিপত্তি

অতুলনীয় হয়। সামান্য মাসিক বেতনে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া স্বীয় অসামান্য প্রতিভা ও অধ্যবসায়বলে কর্মবীর রাধানাথ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া মাত্র চুয়াল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে প্রায় কোটি মুদ্রার সম্পত্তি করিয়াছিলেন।

মহানুভব রাধানাথ ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে ন্যায়পথে থাকিয়া অতুল ঐশ্বর্য উপার্জন করিয়া শ্রমশীলতার আদর্শ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। আরো কিছু দিবস জীবিত থাকিলে তিনি একজন দানশীল অদ্বিতীয় মহাপুরুষ হইতেন সন্দেহ নাই।

আমরা এই বাংলাদেশের প্রায় সকল ধনবান সম্ভ্রান্ত বংশের ইতিহাসে দেখিতে পাই একজন আদিপুরুষ রাধানাথের ন্যায় অসাধারণ অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতার গুণে বহু অর্থোপার্জন করিয়া স্বীয় বংশের নাম সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তির সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করিয়া ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। সেই একজন মহাপুরুষের অসীম পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও কার্যকুশলতার সুফল তাঁহার বংশের কতজন উত্তরাধিকারী দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শুইয়া এবং বিলাসিতায় কালযাপন করিয়া উপভোগ করিতেছে। রামদুলাল সরকার, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, মহারাজ নবকৃষ্ণ দেব, রামলোচন ঘোষ ইত্যাদি বহু মহাপুরুষ এই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া দরিদ্র অবস্থা হইতে নিজ নিজ শ্রমশীলতা, অধ্যবসায় ও বুদ্ধিবলে অতুল ঐশ্বর্য রাখিয়া গিয়া কত শত পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র ও দৌহিত্রাদির ভরণপোষণের সুবন্দোবস্ত করিয়া নিজ নিজ বংশধরগণকে সমাজে শ্রেষ্ঠ স্থানে বসাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু হায় বাঙ্গালী! আমরা ভোগবিলাসের পঙ্কে মগ্ন থাকিয়া সেই পূজার্হ মহাপুরুষগণের স্মৃতিরক্ষার কি কিছুই করিতে পারিব না? কালস্রোতে ধনী দরিদ্র হইতেছে, দরিদ্র ধনী হইতেছে কিন্তু যে সকল মহাপুরুষ নিজ অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতায় দরিদ্র অবস্থা হইতে ধর্ম ও কর্মে জীবনের যথাযথ সদ্ব্যবহার করিয়া কার্য করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছেন ও নিজ সুখশান্তির দিকে মোটেই দৃষ্টিপাত করেন নাই সেই সকল মহাপুরুষের অসীম পরিশ্রমের দ্বারা অর্জিত সম্পদ পাইয়া তাঁহাদিগের বংশধরগণের কি তাহাদিগের পদানুসরণ করিয়া চলা উচিত নহে? "চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।" লক্ষ্মী সত্যই চঞ্চলা। সেই চঞ্চলা মা লক্ষ্মীকে আমরা কি উপায়ে ধরিয়া রাখিতে পারি? কথায় আছে "উদ্যোগীনাং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ"; কর্মজীবনে প্রবেশ করিয়া ধর্মপথে থাকিয়া সকল ঝড়বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝার সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া যে মানব

অগ্রসর হয় চঞ্চলা লক্ষ্মী অচলা হইয়া তাঁহাকেই পথ দেখাইয়া রক্ষা করেন।

রাধানাথ বসুমল্লিক মহাশয়ের বংশধরগণের সকলের অবস্থা এখন সমান নহে। কেহ সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়া অতুল ঐশ্বর্যশালী হইয়াছে, কেহ বা ভাগ্যচক্রে দরিদ্র হইয়াছে। কিন্তু এই বংশের প্রত্যেক পুরুষ সেই মহারাজ পুরন্দর খাঁ, কেশব খাঁ, রাধানাথ ইত্যাদি মহাপুরুষগণের এক বংশের সন্তান। প্রত্যেকের উচিত সকল জ্ঞাতিকে সমান চক্ষে দেখা এবং সুখে দুঃখে সহকারী হওয়া। এই বাঙ্গলাদেশের কায়স্থ সন্তান মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের কথায় বলিতে ইচ্ছা হয় :—

হে বসুমল্লিক বংশের সন্তান! ভুলিওনা তোমার গৃহদেবতা, ভুলিও না তোমার কুলীন বংশ; তোমার কুলকর্ম করিয়া বিবাহ, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের —নিজ ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিওনা তুমি জন্ম হইতে এই বংশ-গৌরবের জন্য বলি প্রদত্ত; ভুলিওনা তোমার সমাজ, ভুলিওনা—তোমার মূর্খ, অজ্ঞ, দরিদ্র আত্মীয় তোমার এক রক্তের ভাই। হে বীর! সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি মাহীনগর বসুবংশের সন্তান, সকলেই আমার আত্মীয়। তুমি কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—বসুমল্লিক বংশের সকলেই আমার প্রাণ, বংশের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, কায়স্থ সমাজ আমার শিশুশয্যা। বঙ্গের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, বংশের কল্যাণ আমার কল্যাণ আর দিনরাত বল— হে শ্রীধরজীউ, হে গোপীনাথ, হে রাধানাথ, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, হে মহানুভব পিতা পিতামহগণ আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।

৺সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সরল বাঙ্গলা অভিধানে লিখিত আছে—

"রাধানাথ বসু মল্লিক—ইনি কলিকাতা পটলডাঙ্গার সুবিখ্যাত বসু মল্লিক বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কান্যকুব্জ হইতে সমাগত পঞ্চ কায়স্থের মধ্যে দশরথ বসু এই বংশের আদিপুরুষ। এই বংশে পুরন্দর খাঁ নামক প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রাণ ও সমাজ সংস্কারক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কঠোর বল্লালী প্রথার অনেক অংশের পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়া সমাজের বহু উপকার সাধন করেন। বল্লালের নিয়মে কুলীন কায়স্থের কুল কন্যাগত ছিল। ইহাতে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে সবিশেষ ক্লেশ পাইতে হইত। পুরন্দর ইহার পরিবর্ত্তন করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রগত কুল প্রবর্ত্তিত করেন। ইহা ভিন্ন তিনি আরো অনেক প্রথার পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রথাকে "পুরন্দরী প্রথা" বলে। পুরন্দর মাহীনগর সমাজভূক্ত বসুবংশের শ্রেষ্ঠ রত্ন স্বরূপ। পুরন্দরের সহোদর সুন্দরবর খাঁ মল্লিক

ও তদীয় বংশধরগণের যে স্থানে বাস ছিল, ইহা মল্লিকপুর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই বংশীয় রঘুনাথ বসু বাঙ্গলার তিনজন নবাবের অধীনে দেওয়ানী কার্য্য করিয়া মল্লিক উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি হুগলী জেলার পুণ্ডুয়ার অন্তর্গত কাটাগোড়ে গ্রামে বাস করিতেছেন।

এই রঘুনাথের অধস্তন ৭ম পুরুষ রামকুমার বসু রাধানাথের জনক। ইনি কাটাগোড়ে গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতার পটলডাঙ্গায় বাস স্থাপন করেন। রাধানাথ বাল্যকাল হইতে মেধাবী শ্রমশীল এবং তীক্ষ্নবুদ্ধি ছিলেন। ইনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া বিলাত হইতে আগত জাহাজের মুচ্ছুদ্দীর কার্য্য করিতে থাকেন এবং স্বীয় অধ্যবসায় বলে যেকস্ এণ্ড কোম্পানি নামক আফিসের মুচ্ছুদ্দী হন। ইংরাজী ভাষার অভিজ্ঞ বলিয়া তৎকালে অনেক ইংরাজের সহিত ইঁহার সৌহৃদ্য ছিল। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইনি মিঃ রিড নামক সাহেবের সহিত সম্মিলিত হইয়া কলিকাতা হাওড়ায় একটী ডক্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই ডকের আয়ে ইনি প্রভুত অর্থ উপার্জ্জন করেন। ডকের অন্যতম অংশীদার রিড সাহেব রাধানাথের সাধুতা ও অধ্যবসায় গুণে মুগ্ধ হইয়া বিলাত প্রত্যাবর্ত্তন কালে রাধানাথকে হুগলী ডকের একমাত্র অংশীদার করিয়া যান। ইংরাজদের সহিত সর্ব্বদা মিশিলেও ইনি কখনও হিন্দুধর্ম্ম বিগহিত কার্য্য বা ইংরাজী পোষাক পরিধান করেন নাই। ইঁহার বাটীতে বার মাস তের পর্ব্ব হইত। স্বীয় চরিত্র গুণে ইনি জনসাধারণের অতুল ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করেন।"

রাধানাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা নবীনকালীর তেলাড়ি নিবাসী মুখ্য কুলীন গোপাল ঘোষের বংশধর কিশোরীপ্রসাদের পুত্র মুখ্য কুলীন বদন ঘোষের সহিত বিবাহ হয়। রাধানাথ এই বিবাহে বহু টাকা ব্যয় করেন এবং জামাতাকে একটি গৃহ খরিদ করিয়া দেন।

রাধানাথের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী করুণাময়ীর চোরবাগান নিবাসী ধনবান মাধবচন্দ্র দে সরকারের সহিত শুভবিবাহ হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে বিবাহের কয়েক বৎসরের মধ্যেই মাধবচন্দ্র অল্পবয়সেই বিধবা পত্নী ও একটিমাত্র কন্যা রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। করুণাময়ী অল্পবয়সে বিধবা হইয়া স্নেহময় পিতৃগৃহে আসিয়া ভ্রাতা ও ভ্রাতৃজায়াগণের আদর-যত্নে জীবন অতিবাহিত করেন এবং যৌথ সংসারের একরূপ কর্ত্রীরূপে ছিলেন। একান্নবর্তী সংসারের সকলেই তাহাকে কর্ত্তা-মা বলিয়া ডাকিতেন এবং অন্দরমহলের গৃহস্থালীর কার্য

তত্ত্বাবধানের সকল ভারই তাঁহার উপর ছিল। যৌথ সংসারে জ্যেষ্ঠরা তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং কনিষ্ঠেরা সকলে তাঁহাকে ভয় ও ভক্তি করিত। তাঁহার ভ্রাতাগণ তাঁহাকে আদর করিয়া বাটীর সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট বলিয়া ডাকিত।

করুণাময়ীর একমাত্র কন্যা যোগমায়ার বিডন স্ট্রীট নিবাসী রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পুত্র অতুলচন্দ্র মিত্রের সহিত বিবাহ হয়। ১০ই মাঘ ১২৬৯ সনে ইংরাজী ১৫ই জানুয়ারী ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে যোগমায়া একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া সূতিকা গৃহেই দুর্ভাগ্যক্রমে ইহধাম ত্যাগ করেন। যোগমায়ার একমাত্র পুত্র প্রতাপচন্দ্র শিশুকাল হইতে পটলডাঙ্গা বসুমল্লিক বংশে মাতুলালয়ে লালিত-পালিত ও শিক্ষিত হন। প্রতাপচন্দ্র মেধাবী সরলচিত্ত এবং নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি বয়স্থ হইয়া বিডন স্ট্রীটে নূতন ভবন প্রস্তুত করাইয়া তথায় গিয়া বাস করেন। প্রতাপচন্দ্রের সুন্দর ব্যবহারে সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত ও প্রশংসা করিত।

প্রতাপচন্দ্র রাজলক্ষ্মীকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার চারিপুত্র সুবোধচাঁদ, অমলচাঁদ, ও অরুণচাঁদ এবং তিন কন্যা শ্রীমতী কাত্যায়নী, শ্রীমতী শিবানী ও শ্রীমতী ভবানী। মুখ্য কুলীন প্রতাপচাঁদের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী শিবানীর সহিত রাধানাথের পৌত্র চারুচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের শুভবিবাহ কুলকর্ম করিয়া হয়। রাধানাথ বসুমল্লিকের সকল বংশধরের সহিত প্রতাপচাঁদ ও তাঁহার পুত্রগণের বিশেষ হৃদ্যতা ও ঘনিষ্ঠতা দেখা যায়।

১৪ই ফাল্গুন ১২৯৮ সনে বৃহস্পতিবার ইং ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে অতি বৃদ্ধবয়সে শ্রীমতী করুণাময়ী ৺কাশীধামে তাঁহার ভ্রাতাগণের ভবনে সজ্ঞানে কাশীপ্রাপ্ত হন।

মহেশচন্দ্র বসুমল্লিক

মহাত্মা রাধানাথের একমাত্র সহোদর মহেশচন্দ্র। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পটলডাঙ্গাস্থ মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় বিদ্যালয়ে বাংলা ও ইংরাজী শিক্ষা করেন।

মহেশচন্দ্র শিক্ষালয় পরিত্যাগ করিয়া প্রথম জীবনে সেণ্ট জেমস্ গীর্জার সংলগ্ন মিসনারীদিগের বিদ্যালয়ের আফিসে অল্প বেতনে কর্মচারীরূপে কার্য করিতে আরম্ভ করেন। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধানাথ মেসার্স বিচ্যাম্প

কোম্পানির আফিসে মুচ্ছুদ্দির বা বেনিয়ানের কার্যে নিযুক্ত হইলে তিনি মহেশচন্দ্রকে প্রথমে মাল-গুদামের সরকার ও পরে অফিসের একজন কর্মচারীরূপে নিযুক্ত করেন এবং এই সময়ে মহেশচন্দ্র কিছু মোটা টাকাই রোজগার করেন। কয়েক বৎসর বাদে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত অফিসের অন্য একজন কর্মচারী ঠাকুরদাস বসুর চক্রান্তে পড়িয়া মহেশচন্দ্রকে প্রায় দশ হাজার মুদ্রার জন্য আফিসের তহবিলের গোলমালে দায়ী হইতে হইলে ভ্রাতৃবৎসল ধনবান রাধানাথ ৩১শে আগস্ট ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে ভ্রাতাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য দশ সহস্র মুদ্রা আফিসের তহবিলে দিয়া উক্ত ঠাকুরদাস বসু এবং মহেশচন্দ্রের নিকট হইতে একটি হ্যাণ্ডনোট লয়েন কিন্তু দয়ার্দ্রচেতা রাধানাথ কখনও ভ্রাতার নিকট হইতে উক্ত টাকা ফেরৎ লয়েন নাই।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মহেশচন্দ্র সালিখায় ইংরাজি জাহাজ নির্মাতা টমাস্‌রিভ, কোম্পানির আফিসে মুচ্ছুদ্দি বা বেনিয়ানের কার্য লন কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে তিনি উক্ত কার্য পরিত্যাগ করিলে, তাঁহার ভ্রাতা রাধানাথ কিছু দিবস উক্ত কোম্পানিতে উক্ত বেনিয়ানের কার্য করেন।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে মহেশচন্দ্র কুলীন কায়স্থের কন্যা শ্রীমতী কামিনী দেবীকে বিবাহ করেন কিন্তু উক্ত পত্নী অত্যন্ত রুগ্না ও পীড়িতা থাকায় মহেশচন্দ্র এক বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয়বার হাটখোলা দত্ত বংশের মৌলিকের কন্যা শ্রীমতী প্রসন্নময়ীকে বিবাহ করিয়া আভ্যরস করেন।

মহেশচন্দ্র কর্মজীবনে বিশেষ সুফল লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি স্বোপার্জিত অর্থ হইতে কলিকাতায় বহুবাজার নামক পল্লীতে দুইখানি পাকা বাটী খরিদ করেন। মহেশচন্দ্র তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ সহোদরের সহিত পটলডাঙ্গাস্থ ভ্রাতার বাটীতে সপরিবারে বাস করিতেন এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃতুল্য ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন।

মহেশচন্দ্রের প্রথমা পত্নীর কোন সন্তানাদি হয় নাই; দ্বিতীয়া পত্নী প্রসন্নময়ীর একমাত্র কন্যা শ্রীমতী নিস্তারিণী জন্মগ্রহণ করেন।

মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে মহেশচন্দ্র ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ১২৪৯ বৈশাখ মাসে বিসূচিকা রোগে অকালে ইহধাম ত্যাগ করেন।

মহেশচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর রাধানাথ দুইটি ভ্রাতৃজায়াকে নিজ সংসারে রাখিয়া ভরণপোষণ করেন।

মহেশচন্দ্রের মৃত্যুর ত্রিশ বৎসর পরে তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী প্রসন্নময়ী

শ্বশুরালয় পরিত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে গিয়া তাঁহার শ্বশুর ৺রামকুমার বসুমল্লিকের সম্পত্তির অর্ধেক দাবী করিয়া ৺রাধানাথের তিন জীবিত পুত্র দ্বারিকানাথ, দীননাথ ও শ্রীগোপাল এবং ৺জয়গোপালের তিন পুত্রকে বিবাদী করিয়া কলিকাতায় হাইকোর্টে একটি বিষয়-বণ্টনের মামলা করেন।

কয়েক বৎসর উভয় পক্ষের বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইবার পর বিবাদীগণই জয়ী হন এবং বাদী পরাজিতা হইয়া বৃদ্ধবয়সে মনোকষ্টে ভবলীলা সাঙ্গ করেন।

মহেশচন্দ্রের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী নিস্তারিণীর বহুবাজার নিবাসী অমৃতলাল দে মহাশয়ের সহিত বিবাহ হয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র চুনিলাল এবং দুই কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণমণি ও শ্রীমতী কৃষ্ণ আমোদিনী জন্মগ্রহণ করেন।

———

দশম অধ্যায়

জয়গোপাল বসুমল্লিক

মহাত্মা রাধানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র ২৬শ পর্যায়ে বাড়ি কোমল মুখ্য কুলীন জয়গোপাল ।

জয়গোপাল বাল্যকাল হইতে শ্রমশীল, মেধাবী ও ধীরপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষা ভালরূপ শিক্ষা করিয়া পিতার সকল কর্মের পদানুসরণ করেন। রাধানাথের মৃত্যুর সময় জয়গোপাল ব্যতীত অপর তিন পুত্রই নাবালক ছিলেন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়গোপালকে তাঁহার উইলের একমাত্র একজিকিউটার নিযুক্ত করিয়া তাঁহার অতুল সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া যান। জয়গোপাল তৎকালীন কলিকাতার সুপ্রীম কোর্ট হইতে প্রোবেট লইয়া পৈত্রিক সকল সম্পত্তি সুন্দরভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

জয়গোপাল তাঁহার পিতার প্রধান সম্পত্তি হুগলীর ডক্‌ সর্বদা নিজ তত্ত্বাবধানে পরিচালনা করিতে থাকেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে উক্ত ডকের চারি আনার অংশীদার মিষ্টার রিড সাহেব ভারত ভূমি পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে চলিয়া যাইবার কালে জয়গোপাল উক্ত চারি আনার অংশ ক্রয় করিয়া লইয়া উক্ত ডকের ষোল আনার মালিক হন।

জয়গোপাল ভ্রাতাগণকে শিক্ষিত করিয়া উক্ত ডকের কার্যে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করেন এবং ভালভাবে ডক্‌ পরিচালনা করিয়া বহু টাকা অর্জন করিতে থাকেন। একান্নবর্তী পরিবারের তিনি কর্তা হিসাবে সকল ভ্রাতাভগ্নী এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে বিশেষ স্নেহ ও যত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করেন। সংসার এই সময়ে অনেক বৃদ্ধি হয় এবং কয় ভ্রাতারই বিবাহ হওয়ায় অট্টালিকার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন হয়। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে জয়গোপাল পৈত্রিক ভবনের সংলগ্ন অনেক জমি ও বাটী খরিদ করিয়া পৈত্রিক ভবনের সংলগ্ন জমিতে একটি সুবৃহৎ ত্রিতলা অট্টালিকা নির্মাণ করেন। জয়গোপাল ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী দেখিয়া বিবাহ দেন এবং সকলের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া সুন্দরভাবেই সংসার প্রতিপালন করেন। স্বর্গীয় পিতার উইলে অনেক

আত্মীয়াকে তাঁহাদের ভরণপোষণ দিবার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া ছিল। জয়গোপাল সকলকে সমান ভক্তি স্নেহ ভালবাসা দিয়া শান্তিতে সংসারধর্ম পালন করেন।

জয়গোপাল ভালরূপেই ইংরাজীতে কথা কহিতে ও লিখিতে পারিতেন। ব্যবসার খাতিরে অনেক সময় তাঁহাকে বড় বড় ইংরাজের সহিত মেলামেশা করিতে হইত কিন্তু তিনি কখনও দেশী বেনিয়ান জামা ও পাগড়ী পরিধান ভিন্ন ইংরাজী পোষাক পরিধান করেন নাই বা ইংরাজীভাবাপন্ন হয়েন নাই। জয়গোপাল নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। স্বধর্মে তাঁহার বিশেষ বিশ্বাস ও হিন্দু পূজা-পদ্ধতিতে তাহার প্রগাঢ় আসক্তি ছিল। তিনি পৈতৃক ভবনে প্রতিবৎসর খুব ধূমধামের সহিত দুর্গাপূজা করিতেন এবং বারমাসেই তাঁহার বাটীতে তের পর্ব হইত। তিনি তাঁহার কুলগুরু কালনার বিদ্যাবাগীশপাড়া নিবাসী ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেন। জয়গোপাল তাঁহার বৃদ্ধ মাতার অভিলাষ অনুসারে বহু মুদ্রা ব্যয় করিয়া কালনায় একটি শিবমন্দির প্রস্তুত করেন এবং উক্ত মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কুলগুরুর হস্তে জমি খরিদ করিয়া দিয়া দেবসেবার আয়ের ব্যবস্থা করিয়া দেন।

জয়গোপাল বিশেষ চরিত্রবান লোক ছিলেন। অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াও তাঁহার কোনরূপ গর্ব ছিল না। সমাজে তাহার বিশেষ প্রভাব ও প্রতিপত্তি এবং কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্য হয়। তিনি পৈত্রিক সকল সম্পত্তি উত্তমরূপে তত্ত্বাবধান করিয়া প্রচুর আয় বৃদ্ধি করেন এবং পটলডাঙ্গা বসুমল্লিক বংশের "লক্ষ্মী" হুগলীর ডকৃটির উন্নতির জন্য মনপ্রাণ ঢালিয়া দিয়া এবং তাহার যথাযথ পরিচালনা করিয়া নিজ বংশের সকলের জন্য অতুল ঐশ্বর্য অর্জন করিয়া যান। সেই সময় যৌথ বংশের সকলের ব্যবহারের জন্য দশটি ঘোড়া, ছয়খানি গাড়ি, চারিটি কোচমান এবং বহু দুগ্ধবতী গাভী ছিল।

জয়গোপাল প্রথমে সিমুলিয়া নিবাসী বাড়ি কোমল মুখ্য নৃসিংহ ঘোষের পুত্র জয়গোপাল ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করিয়া কুলকর্ম করেন। প্রথমা পত্নীর স্বর্গারোহণের পর তিনি বহুবাজার মলোঙ্গা লেন নিবাসী দুর্গাচরণ দত্তের কন্যা ও যোগেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের ভগ্নী শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনীকে বিবাহ করিয়া আত্মরস করেন।

জয়গোপালের তিনটি প্রথিতযশা পুত্র প্রবোধচন্দ্র, মন্মথচন্দ্র এবং হেমচন্দ্র এবং একমাত্র কন্যা মহামায়া জন্মগ্রহণ করেন।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ৩ই এপ্রিল তারিখে জয়গোপাল বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী এবং তিনটি নাবালক পুত্র রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন।

জয়গোপালের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী মহামায়া হোগলকুড়িয়া নিবাসী বিখ্যাত গুহবংশের অম্বিকাচরণ গুহকে বিবাহ করেন। অম্বিকাবাবু সুবিখ্যাত পালোয়ান ও শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। মহামায়ার ছয় পুত্র অন্নদা, ক্ষেত্রচরণ, হরিচরণ, রামচরণ, সত্যচরণ এবং সারদাচরণ জন্মগ্রহণ করেন। দেশবিখ্যাত মল্লযোদ্ধা "গোবর" বা যতীন্দ্র গুহ উক্ত রামচরণ গুহ মহাশয়ের একমাত্র পুত্র।

জয়গোপালের স্ত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দয়াবতী ও ধর্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন। তিনি গৃহস্থালীর জ্যেষ্ঠা বধূ হিসাবে বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের সকলের সহিত স্নেহ ও ভালবাসার সহিত একতা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর সকাল ১০টার সময় কৃষ্ণভাবিনী তাঁহার দেবরপুত্র সতীশচন্দ্রের এঁড়িয়াদহের ভাগীরথী তীরবর্তী উদ্যানে অতীব বৃদ্ধবয়সে সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন। তাঁহার তিন পুত্রের অবর্তমানে তাঁহার পৌত্র রাজা সুবোধচন্দ্র বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া যথোচিত হিন্দুশাস্ত্র মতে তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ দানসাগর ও বৃষোৎসর্গ করিয়া সুসম্পন্ন করেন।

কৃষ্ণভাবিনী তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রবোধচন্দ্রের স্বাস্থ্যলাভের আশায় এবং শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার মানসে ১২৯৪ সালের ৪ঠা শ্রাবণ তারিখে কাশীধামে যাত্রা করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মন্দির প্রতিষ্ঠা কার্য সুসম্পন্ন হইবার পূর্বেই তাঁহার পুত্র প্রবোধচন্দ্রের রোগ বৃদ্ধি পায় এবং ৩রা আশ্বিন, মঙ্গলবার প্রাতে প্রবোধচন্দ্র লোকান্তর গমন করেন। এই শোকাবহ ঘটনায় কৃষ্ণভাবিনী একেবারে উন্মাদের মত হইয়া উঠেন। সেই সময় তিনি শোকার্তহৃদয়ে কতকগুলি খেদোক্তি গীতিকাকারে লিপিবদ্ধ করেন। উক্ত গীতিগুলি শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দত্ত মহাশয় "ভক্তি সঙ্গীত" নাম দিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। রচয়িত্রী এই গান-গুলিকে তাঁহার প্রলাপ উক্তি বলিয়া মনে করিতেন কিন্তু ওইগুলি পাঠ করিলেই ভাবের গভীরতা ও বিশ্বাসী ভক্তহৃদয়ের প্রেম-প্রবণতা সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়।

"রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের পিতামহী ৺গঙ্গালাভ করিয়াছেন। ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্র হেমচন্দ্রের মৃত্যুর পর ইনি কলিকাতার বাটীতে একবারও আসেন নাই—পাণিহাটির বাগান বাটীতেই গঙ্গাস্নান ও ধ্যানধারণায় দিনযাপন

করিতেন। ইনি কাশীধামে ইঁহার স্বর্গীয় শ্বশুরের নামে এক শিবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। পতিহীনা পুত্রশোককাতরা হিন্দু রমণীর ধর্ম্মই একমাত্র সহায়। ইঁহার মধ্যম পুত্র শ্রীযুক্ত মন্মথচন্দ্র মল্লিক বিলাতে আছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺প্রবোধচন্দ্র মল্লিকের একমাত্র পুত্রই রাজা সুবোধচন্দ্র। কনিষ্ঠ পুত্রেরও একটি পুত্র শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র মল্লিক। গুরুজন বিরহিত পৌত্রদ্বয়কে ভগবান সান্ত্বনা দিন।"

—প্রতিবাসী, ১লা কার্ত্তিক ১৩১৩ সন।

প্রবোধচন্দ্র বসুমল্লিক

জয়গোপাল বসুমল্লিক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ২৭শ পর্যায়ে প্রধান মুখ্য কুলীন প্রবোধচন্দ্র।

প্রবোধচন্দ্র বাল্যে হিন্দু ইস্কুলে বিদ্যার্জন করেন এবং প্রথম জীবনে তিনি পৈতৃক ভবন ১৮নং রাধানাথ মল্লিক লেনে খুল্লতাত ও পিতৃব্যপুত্রগণের সহিত একান্নে বাস করেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ৺রাধানাথ মল্লিক মহাশয়ের সকল বিষয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা দিগম্বর মিত্র এবং কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় আরবিট্রেটর বা সালিসী হইয়া সকল অংশীদারগণের মধ্যে আপোষে বণ্টন করিয়া দেন। পটলডাঙ্গার বসুমল্লিক বংশের ভাগ্যলক্ষ্মীস্বরূপ সালিখার হুগলী ডক জয়গোপাল বসুমল্লিক মহাশয়ের তিন পুত্র প্রবোধচন্দ্র, মন্মথচন্দ্র ও হেমচন্দ্র অন্যান্য সম্পত্তির সহিত গ্রহণ করেন এবং প্রবোধচন্দ্র উক্ত ডক নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিয়া পরিচালনা করেন। যৌথ সম্পত্তি বিভাগের সময় উক্ত ডকের মূল্য মাত্র একলক্ষ ছাব্বিশ সহস্র টাকা নির্দিষ্ট হয়। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে প্রবোধচন্দ্র দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে এবং মাতাকে লইয়া পৈত্রিক ভবন ত্যাগ করিয়া প্রথমে বহুবাজারে ডিঙ্গেভাঙ্গা নামক স্থানে গিয়া একটি ভাড়াটে বাটীতে কিছু কাল বাস করেন এবং শীঘ্র ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পূর্বধারে প্রায় এক বিঘার উপর জমিতে একটি রাজপ্রাসাদতুল্য অট্টালিকা ও উদ্যান প্রস্তুত করাইয়া তথায় গিয়া তিন ভ্রাতায় সপরিবারে বাস করেন। এক্ষণে উক্ত ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার ভবনে প্রবোধচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদরের পুত্র নীরদচন্দ্র বাস করিতেছেন।

প্রবোধচন্দ্র একজন বিদ্বান ও সামাজিক লোক ছিলেন। সকল বড় বড়

সভাসমিতিতে তিনি যোগদান করিতেন এবং দেশহিতকর অনেক কার্যে তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড নর্থব্রুকের স্মৃতিরক্ষাকল্পে টাউন হলে যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তিনি শম্ভু পণ্ডিত মহাশয়ের সহিত উক্ত সভাগৃহ হইতে চলিয়া আসেন। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় উক্ত সভা হইতে প্রত্যাগত যে দশজন ভদ্রলোককে Immortal Ten "অমর দশজন" বলিয়া আখ্যা প্রদান করেন, প্রবোধচন্দ্র তাঁহাদের দশজনের মধ্যে একজন।

প্রবোধচন্দ্র ১৮৭৬, ১৮৭৯, ১৮৮২ এবং ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে পর পর চারিবার কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিসনার নির্বাচনে ভোটাধিক্যে কমিসনার নির্বাচিত হইয়া সহরবাসীর সেবায় নিযুক্ত হন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতা চারুচন্দ্র কমিসনার পদপ্রার্থী হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে স্যার ও বিচারপতি) সুরেন্দ্রনাথ দাস ও সি. ডি. কোটাকে পরাজিত করিয়া নয় নম্বর ওয়ার্ড হইতে নির্বাচিত হন।

প্রবোধচন্দ্র মল্লিক—৬১৫ ভোট
চারুচন্দ্র মল্লিক—২৪৬ "
সুরেন্দ্রনাথ দাস—১৮১ "
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—১৪৯ "
সি, ডি, কোটা—৩ "

ধর্মে ও সামাজিক সকল কার্যে প্রবোধচন্দ্রের বিশেষ মতি ছিল। এবং নিজ উচ্চ বংশমর্যাদা ও কুল মর্যাদা সম্যক পালন করিয়া গিয়াছেন। তিনি প্রধান মুখ্য কুলীন ছিলেন এবং পৈত্রিক কুলপ্রথা রক্ষা করিয়া দর্জিপাড়া নিবাসী উচ্চ কুলীন মিত্র বংশের ৺রাজকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী কুমুদিনীকে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বিবাহ করেন।

১২৯৪ সনের আষাঢ় মাসের শেষ হইতে প্রবোধচন্দ্রের শরীর ভগ্ন হয়। স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে এবং স্নেহময়ী জননীর অভিলাষ অনুসারে কাশীধামে শিবপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছায় ১২৯৪ সনের ৪ঠা শ্রাবণ তারিখে তিনি কাশীধামে যাত্রা করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠাকার্যের পূর্বেই তাঁহার রোগ বৃদ্ধি পায় এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর ৩রা আশ্বিন ১২৯৪ সনে মঙ্গলবার প্রাতঃ ৭ ঘটিকার সময় প্রবোধচন্দ্র মাসাবধি মূত্ররোগে ভুগিয়া ৺কাশীধামে নিজ আলয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন।

প্রবোধচন্দ্র স্বল্পকালব্যাপী কর্মজীবনের অঙ্গে বিশেষ কিছু মহদনুষ্ঠানের চিহ্ন

আঁকিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই সত্য কিন্তু তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, অকপট সরলতা এবং চরিত্রের দৃঢ়তার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার সকল আত্মীয় বন্ধু তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিত না।

প্রবোধচন্দ্রের একমাত্র পুত্র ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, স্বার্থত্যাগী দেশপ্রিয় রাজা সুবোধচন্দ্র এবং একমাত্র কন্যা শ্রীমতী ইন্দুমতী।

প্রবোধচন্দ্রের একমাত্র কন্যা ইন্দুমতী ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮৩ সনের বৃহস্পতিবার (ইংরাজী জুন ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রাতঃ ৫।৩০ ঘটিকার সময়) জন্মগ্রহণ করেন। ১২৯২ সনে ২৩শে আষাঢ় তারিখে তাঁহার চোরবাগান দত্ত বংশের দ্বারিকানাথ দত্ত মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র হীরেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত বিবাহ হয়। হীরেন্দ্রনাথ ১৭ই জানুয়ারী ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। হীরেন্দ্রনাথের সমতুল্য হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ ও অধ্যবসায়শীল জ্ঞানীব্যক্তি বর্ত্তমান বাঙ্গালাদেশে আছে কিনা সন্দেহ। তিনি বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত মেধাবী ও অধ্যবসায়শীল ছিলেন এবং অতি অল্পবয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া এম-এ এবং বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হাইকোর্টের এটর্ণী হইয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রালোচনা এবং হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে তিনি অমূল্য গ্রন্থাবলীসকল প্রকাশ করিয়া অতুল যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহাকে দেশবাসী বেদান্তরত্ন ইত্যাদি নানা উপাধিদানে সম্মানিত করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় নির্ম্মল চরিত্র এবং মিষ্টভাষী ভদ্রলোক অতি অল্পই দেখা যায়। হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার অতুল বিশ্বাস এবং তিনি একজন নিষ্ঠাবান্ নিরামিষাহারী ধার্মিক মহাপুরুষ। অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইয়াও তিনি সকলের সহিত অতি অমায়িকভাবে মেলামেশা করেন এবং তাঁহার অমূল্য সময়ের মধ্যে অধিকাংশই দেশের সেবায় অতিবাহিত হয়। দেশের কার্যে তিনি সর্বোচ্চ আসন পাইবার অধিকারী।

শ্রীমতী ইন্দুমতীর চার পুত্র শ্রীসুধীন্দ্র, হরীন্দ্র, রণেন্দ্র এবং সৌরেন্দ্র এবং তিন কন্যা শ্রীমতী নর্মদা, শ্রীমতী রমা এবং শ্রীমতী ইলারাণী।

মন্মথচন্দ্র বসুমল্লিক

জয়গোপালের দ্বিতীয় পুত্র সুপ্রসিদ্ধ মন্মথচন্দ্র ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে পটলডাঙ্গাস্থ ১৮নং রাধানাথ মল্লিক লেনস্থ ভবনে জন্মগ্রহণ করেন।

মন্মথচন্দ্র হিন্দু ইস্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি

কলেজে উচ্চশিক্ষার জন্য অধ্যয়ন করেন। প্রথম জীবনে তিনি পটলডাঙ্গার পৈতৃক ভবনে ও পরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ নূতন ভবনে দুই সহোদর প্রবোধচন্দ্র এবং হেমচন্দ্রের সহিত বাস করেন।

১১শে নবেম্বর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে মন্মথচন্দ্র শিক্ষা এবং ব্যারিষ্টারী পরীক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গমন করিয়া প্রথমে লণ্ডন ইউনিভারসিটি কলেজে অধ্যয়ন করিয়া পরে কেম্ব্রিজ ক্রাইষ্ট কলেজে প্রবেশ করেন। কেম্ব্রিজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যারিষ্টারী অধ্যয়ন করিয়া ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিলাতের ইন্ হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া তিনি ইউরোপের নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং স্বদেশের নানারূপ হিতকর কার্যে আত্মনিয়োগ করেন।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে কলিকাতা কর্পোরেশনের মিউনিসিপালিটির কমিসনার নির্বাচনে তিনি দশ নম্বর ওয়ার্ড হইতে দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্বোচ ভোটে নির্ব্বাচিত হন। তিনি উক্ত নির্বাচনে ২৫০ ভোট পান এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সুবিখ্যাত এটর্ণী গণেশচন্দ্র চন্দ্র ২৪৮ ভোট এবং মিষ্টার বি. এ মেণ্ডাস ২১৯ ভোট পান। কয় বৎসর তিনি স্বদেশে থাকিয়া নানা দেশহিতকর কার্য করিয়া দেশবাসীর নিকট বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হন।

৮ই এপ্রিল ১৮৯৩ তারিখে তিনি আমেরিকায় গিয়া প্রথমে চিকাগো সহরে কিছুকাল থাকিয়া পরে আমেরিকার অন্যান্য বড় বড় সহর সকল ভ্রমণ করিয়া আমেরিকাবাসীর শিক্ষা এবং উন্নতির কারণ সকল নিখুঁতভাবে জ্ঞাত হইয়াছিলেন। ৯ই ডিসেম্বর ১৮৯৩ তারিখে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সুবোধচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ সহোদর হেমচন্দ্রের সহিত দুই বৎসর বাস করেন। পটলডাঙ্গার বসুমল্লিক বংশের মধ্যে তিনি প্রথম বিলাত, আমেরিকা ইত্যাদি দেশ ভ্রমণ করিতে যান। পরে সুবোধচন্দ্র, মনোজেন্দ্র ইত্যাদি অনেকে বিলাত গিয়াছেন। সেই সময়ে অতি অল্প ভারতবাসীই বিলাত ভ্রমণে যাইত এবং সমুদ্রযাত্রা হিন্দুসমাজে নিষিদ্ধ ছিল। অনেক গোঁড়া হিন্দুর ধারণা ছিল যে, বিলাত যাইলে জাতিচ্যুত হয়। কয়জন গোঁড়া হিন্দু মন্মথচন্দ্রকে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া সমাজে সহজভাবে মিশিতে দেখিয়া বিশেষ অসন্তুষ্ট হন এবং ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ বসুমল্লিক বংশকে তাঁহাদের সমাজের মধ্যে স্থান দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া এক আন্দোলনের সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করেন কিন্তু সমাজে তখন উদারনৈতিক প্রভাব বিস্তারলাভ

করায় এই আন্দোলনে কোনই ফল হয় নাই। বিভিন্ন স্বাধীন দেশ পর্যটনে ঐ সমস্ত দেশের শিক্ষা, ধর্ম, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি পর্যালোচনা করিয়া যে অশেষ জ্ঞান ও বুদ্ধির বিকাশ হয় তাহা কেবল নিজের গৃহে বসিয়া থাকিলে অর্জন করা যায় না। মহাত্মা গান্ধী, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, গোখলে, তিলক ইত্যাদি ভারতবর্ষের খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ পৃথিবীর নানা দেশ পর্যটনের ফলে যে বীজ তাঁহাদের হৃদয়ে বপন করিয়াছিলেন তাহার ফলেই তাঁহারা দেশপ্রেমের উচ্চাকাঙ্ক্ষায় প্রণোদিত হইয়াছিলেন। পৃথিবীর মধ্যে ইংরাজ, ফ্রান্স, জাপান ইত্যাদি যে জাতিই আজ উচ্চ ক্ষমতাশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছে তাঁহাদের ইতিহাস পাঠ করিলেই দেখা যায় যে, সেই দেশের মানবগণ নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া যে অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছে তাহারই ফলে তাহারা এত বড় বড় সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে পারিয়াছে।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মন্মথচন্দ্র পুনরায় ইংলণ্ডে গমন করিয়া কয় বৎসর তথায় বাস করিয়া তথাকার অধিবাসী বা Citizen হন। ইংলণ্ডের Citizen বা অধিবাসী হইয়া মন্মথচন্দ্র দুইবার পার্লামেণ্টের মেম্বর বা সভ্য হইবার জন্য দণ্ডায়মান হন। প্রথমে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে উদারনৈতিক দলভুক্ত হইয়া সেণ্ট জর্জ হোভার বিভাগের তরফে চেষ্টা করেন। পরে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে মিড্‌লসেক্সের আক্সজ বিভাগের পক্ষ হইতে পুনরায় পার্লামেণ্টের সভ্য হইবার চেষ্টা করেন কিন্তু অতি অল্প ভোটেই পরাস্ত হন। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক মণ্ডলে এবং সম্ভ্রান্ত সমাজে তাঁহার অনেক বন্ধু ছিলেন এবং মন্মথচন্দ্রের নানা গুণগরিমায় সেই বিদেশেও অনেকে মুগ্ধ হন। তিনি ইংলণ্ডে বাস করিবার কালে নানারূপ গবেষণাপূর্ণ অনেকগুলি সাধারণ বক্তৃতা দেন।

মন্মথচন্দ্র একজন বিখ্যাত পর্যটক ছিলেন। তিনি সমগ্র ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান ইত্যাদি পৃথিবীর বহু দেশের বড় বড় সহরে বহুবার ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ড, আমেরিকা এবং জাপানে যাইয়া অনেকবার কয়েক বৎসর করিয়া বাস করিয়া আসেন এবং সকল দেশের বিদ্বানমণ্ডলী তাঁহার জ্ঞানগরিমা ও দার্শনিক পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বহু সম্মানিত করিতেন। জাপানের মন্ত্রী কাউণ্ট ওটেমো মন্মথচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। উক্ত প্রিন্স কাউণ্ট ওটেমো জাপানসম্রাটের নিকট আত্মীয় ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি কলিকাতায় ভ্রমণ করিতে আসিলে মন্মথচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর হেমচন্দ্রের নিমন্ত্রণে ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ ভবনে আসিয়াছিলেন।

মন্মথচন্দ্রের বিশেষ অভিলাষ ও আকাঙ্ক্ষা ছিল সকল এসিয়া এবং ইউরোপ-বাসীর মধ্যে একতা ও মিলন আনয়ন করা। পরস্পর পরস্পরের দেশে যাতায়াত না করিলে এবং কথাবার্তা করিয়া ভাববিনিময় না করিলে পরস্পর পরস্পরকে সঠিক চিনিতে পারে না। ভারতবাসীগণ তাহাদের দেশের বিজ্ঞান দর্শন শিল্পকলা ইত্যাদি প্রাচীন অমূল্য সম্পদ সকল অন্য দেশবাসীর নিকট প্রকাশ না করিলে ভারতবর্ষ যে প্রাচীন যুগে এক সময়ে সভ্যতা ও শিক্ষাদীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল তাহা জগৎবাসী জানিবে কিরূপে? মন্মথচন্দ্র আন্তরিক-ভাবে স্বামী বিবেকানন্দের মত পৃথিবীর নানাদেশে গিয়া ভারতবর্ষের গুপ্ত ঐশ্বর্য ইতিহাস হিন্দু বিজ্ঞান ও দর্শনাদির বিষয় বক্তৃতা দিয়া ভারতবাসী যে সকল সভ্য জাতির মধ্যে এক উচ্চ জাতি তাহা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার আরো উদ্দেশ্য ও চেষ্টা ছিল যে ভারতবাসী এবং ইউরোপ, আমেরিকা, ও সকল এসিয়াবাসীর মধ্যে বিশ্বাস এবং বন্ধুত্ব স্থাপন করা। ভারতবর্ষের ধর্ম দর্শন বিজ্ঞান এবং যাহা যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা জগতের নিকট প্রকাশ করিয়া অন্য জাতিকে দেওয়া এবং ইউরোপীয় ও অন্যান্য দেশের যে যে গুণ আছে তাহা গ্রহণ করা এবং অন্য দেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা রীতিনীতি পর্যালোচনা করিয়া নিজের দেশবাসীকে তাঁহাদের ন্যায় জগতে শ্রেষ্ঠ আসন পাইবার উচ্চ আদর্শে গঠন করা। মন্মথচন্দ্র তাঁহার এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করিয়া দুই জাতিকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিবার জন্য কেবল মৌখিক কার্য করেন নাই। তিনি ছিলেন একজন বড কর্মী ও বাগ্মী। বহু বৎসর ধরিয়া তিনি ভারতবর্ষের সকল স্থান এবং ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান ইত্যাদি দেশের বড় বড় সহরে ভ্রমণ করিয়া পূর্ব পশ্চিম দেশ সম্বন্ধে নানারূপ বক্তৃতা দিয়া বেড়াইয়াছেন। তাঁহার প্রথম পক্ষের হিন্দু স্ত্রীর স্বর্গারোহণের পর ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি এক ফরাসীদেশীয় মহিলার পাণিগ্রহণ করেন।

The Joygopal Mallik Scholarship Fund—মন্মথচন্দ্র তাঁহার পিতার অতুল ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকারী হইয়া তাহা কেবল নিজের খরচায় ব্যয় করিতেন না। তিনি তাঁহার পিতার মহৎ উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহার পিতা ৺জয়গোপাল বসুমল্লিকের নামে একটি ফাণ্ড বা ধনভাণ্ডার স্বীয় অর্থে প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত ফাণ্ডের টাকা হইতে প্রতি বৎসর কয়জন ভারতবর্ষের বালক বিলাতে গিয়া উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য অধ্যয়নের খরচ সম্পূর্ণ পাইবে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে উক্ত ধনভাণ্ডার The Joygopal Mallik Scholarship

Fund প্রতিষ্ঠা হইয়া ট্রাস্টীগণের দ্বারা পরিচালিত হইতে আরম্ভ হয়।

মন্মথচন্দ্র ভারতবর্ষের এবং ইয়োরোপের, আমেরিকা ও জাপানের অনেক বড় বড় সভার সভ্য ছিলেন এবং দেশীয় ও বিলাতী সমস্ত বিখ্যাত সভা-সমিতিতে অবসর পাইলেই যোগদান করিতেন এবং সকল জাতীয় লোকের সহিত তিনি মেলামেশা করিতে ভালবাসিতেন। বহু ইংরাজ ও জাপানী মন্মথচন্দ্রের বিশেষ সুহৃদ ছিলেন এবং তাঁহাদের সহিত আন্তরিকভাবে ভাববিনিময় করিতে তিনি ভালবাসিতেন।

নানা স্বাধীন দেশে বহুবার ভ্রমণ করিয়াও মন্মথচন্দ্রের স্বদেশভক্তি প্রগাঢ় ছিল। তাঁহার স্বদেশপ্রীতির মূলে কোন হুজুগ ছিল না এবং তিনি প্লাটফরমে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা দিয়া দেশোদ্ধারের চেষ্টা করেন নাই, তিনি ছিলেন কর্মী পুরুষ আন্তরিকভাবে প্রকৃত কার্য করিয়া দেশবাসীকে উন্নত করাই ছিল তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য। বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পাস করিয়া কলিকাতায় আসিয়া তিনি হাইকোর্টে নাম লিখিয়াছিলেন কিন্তু নানা দেশ ভ্রমণ এবং সাহিত্য দর্শন শাস্ত্রাদি লইয়া আলোচনা ও পুস্তক প্রকাশ এবং নানারূপ জগৎব্যাপী কার্য লইয়াই তাহার মহামূল্যবান জীবন অতিবাহিত হইয়াছে।

মন্মথচন্দ্র অত্যন্ত তেজস্বী ও দৃঢ়চিত্তের লোক ছিলেন। সত্য কথা ও স্পষ্ট কথা বলিতে তিনি কখনও ভীত হইতেন না। একটি ঘটনা হইতেই তাঁহার তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা সুন্দররূপে প্রকাশ পায়। আর্ল অফ্ নর্থব্রুক ১৮৭২ হইতে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ অবধি ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল বা বড়লাটসাহেব ছিলেন। তিনি বরোদার মল্লাররাও গাইকোয়াড়কে রাজ্যচ্যুত করায় এবং বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগে হস্তক্ষেপ করায় ও একেবারে গ্রামে গ্রামে শাসনের গ্রাম্য বোর্ড করিবার চেষ্টা করায় দেশের লোকের অত্যন্ত অপ্রিয় হন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড নর্থব্রক সাহেব ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলে, তাঁহার ভক্তগণ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবাব উদ্দেশ্যে তৎকালীন রাজধানী এই কলিকাতা সহরে টাউন হলে জনসাধারণের এক বৃহৎ সভার অনুষ্ঠান করেন। বাঙ্গালার তৎকালীন লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণর স্যার রিচার্ড সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভা বড় বড় রাজপুরুষ, জমিদার, জজ্ ও অন্যান্য সহস্রাধিক লোকে পরিপূর্ণ। সভায় প্রস্তাব হইল "গভর্ণর জেনারেল নর্থব্রুক মহাশয়ের নাম ভারতবর্ষে চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত এবং স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হউক।" মন্মথচন্দ্র বিলাত হইতে ব্যারিষ্টারী পাস করিয়া কয় মাস মাত্র পূর্বে

কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। উক্ত সভায় তিনি এবং তাঁহার দুই ভ্রাতা প্রবোধচন্দ্র এবং হেমচন্দ্র ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। উক্ত প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে মন্মথচন্দ্র সেই রাজশক্তির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া স্থিরচিত্তে বলিলেন—"আমার এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কিছু বক্তব্য আছে।" সভার সকলে আশ্চর্য এবং স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে 'বসুন বসুন' বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল, কিন্তু নির্ভীক মন্মথচন্দ্র কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি প্রস্তাব করিলেন "লর্ড নর্থব্রুক-এর দ্বারা ভারতবর্ষের কোন বিশেষ উপকার সাধিত হয় নাই এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা ভারত-বাসীর মনঃপূত নয়।" সভাপতি মহাশয় বলিলেন "আচ্ছা ভোট লওয়া হউক।" কিন্তু উক্ত সভার মধ্যে কেবলমাত্র উক্ত মন্মথচন্দ্র বসু মল্লিক ও তাঁহার দুই ভ্রাতা প্রবোধচন্দ্র ও হেমচন্দ্র, ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র দত্ত এবং অন্যান্য পাচটি স্বাধীনচেতা ভদ্রলোক ব্যতীত কেহই উক্ত প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোট দিলেন না। তখন উক্ত দশজন ভারতবাসী সভার মধ্য হইতে চলিয়া আসেন। সকলেই স্তম্ভিত, কি ভীষণ সাহস! ভারতবর্ষের হর্তাকর্তা বিধাতা প্রাক্তন গভর্ণর জেনারেল সাহেবের সম্মানের জন্য সভা এবং সভাপতি স্বয়ং বঙ্গের খোদ লাটসাহেব। তাঁহাদের সম্মুখে এই নির্ভীক তেজস্বী দেশপ্রেমিকগণ তাঁহাদের যে নৈতিক সাহস দেখাইয়া চলিয়া গেলেন তাহা ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে হইলে বোধ হয় আশ্চর্যকর হইত না কিন্তু ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রবলপ্রতাপ ইংরাজ গভর্ণরের সম্মুখে এরূপ তেজস্বিতা ও মানসিক বল দেখান যে কতদূর আশ্চর্যজনক তাহা তৎকালীন মহাপুরুষগণ সম্যক বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্যই তৎকালীন একজন শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক নেতা ৺কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় বলিয়াছিলেন যে উক্ত দশজন Immortal Ten বা অমর দশজন মহাপুরুষ এবং হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় তাঁহাদের অশেষ প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন।

Congress and National Movement 1928 নামক পুস্তকে লিখিত আছে।

Immortal Ten—Lord Northbrook was Viceroy of India 1872-1876. In 1878 when he left India a public meeting was held in the Town Hall Calcutta under the presidentship of the then Lieutenant Governor of Bengal to commemorate the memory of Lord Northbook who was not popular with

certain section of people. Lord Northbook deposed the Gaekwar of Baroda. In the said meeting a resolution was moved to commemorate his memory when Mr. Manmatha Mallik new Barrister with Hem Chandra, Probodh Chandra Mallik, Jogesh Dutta, Dr. Shambhu Chandra Mukerjee and five others were against this resolution and Mr. M. C Mallik moved an amendment against the resolution which was not carried and then the ten gentlemen left the Hall atonce. Kristo Das Pal called them Immortal Ten.

—The Congress and National Movement 1928, p. 12.

মন্মথচন্দ্র একজন বড় দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন। হিন্দু দর্শন ও বিজ্ঞান শাস্ত্র সকল তিনি বিশেষ গবেষণার সহিত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা, সংস্কৃত, ইংরাজী ও ল্যাটিন সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং অধ্যয়নস্পৃহা তাঁহার প্রবল ছিল। ইংরাজী ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং একজন শ্রেষ্ঠ লেখক ও বাগ্মী ছিলেন। ইংরাজী ভাষায় তিনি বহু সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এবং হিন্দু ও ইংরাজী দর্শন সম্বন্ধে অনেকগুলি বিশেষ গবেষণাপূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার লিখিত পুস্তকের মধ্যে "Orient and Occident", "Impressions of an Wanderer", "Problems of Existence", "Great Britain and India" বইগুলি বিশেষ এবং বহু মূল্যবান ও উচ্চদরের সাহিত্য পুস্তক। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মন্মথচন্দ্র ইংলণ্ডের সুলেখক মিষ্টার ফিসার ইউনিয়নের সহিত 'A Study in Ideas' নামক পুস্তকে ভারতবাসী এবং ইংরাজের ভাবের সম্বন্ধে সুন্দর সাহিত্য গ্রন্থ লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

বিবাহ

মন্মথচন্দ্র ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ৯ই জুন ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে হাটখোলা দত্তবংশের ৺নরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী কুসুমকুমারীকে বিবাহ করেন কিন্তু বিবাহের কয়েক বৎসরের মধ্যেই কুসুমকুমারী কোন সন্তানাদি না রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। প্রথমা পত্নীর স্বর্গারোহণের পর মন্মথচন্দ্র কয়েক

বৎসর ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া কাটান। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মন্মথচন্দ্র দ্বিতীয়বার ফ্রান্স দেশের রাজধানী প্যারিসে একটি সুন্দরী উচ্চবংশজাতা ফরাসী মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। উক্ত মহিলা বিধর্মী হইলেও হিন্দু ঘরের স্ত্রীর ন্যায় পতিব্রতা এবং স্বামীপ্রাণা ছিলেন। তিনি স্বামীর দেশবাসীকে ইউরোপীয়ান-দের ন্যায় সমান চক্ষে দেখিতেন এবং ভারতবর্ষের উপর তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তিনি সর্বদা সকল স্থানেই স্বামীর সহিত ভ্রমণ করিতেন এবং ভারতবর্ষে আসিয়া তিনি বহু বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি অনেক সময়ই বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের ন্যায় সাড়ী ও কাপড় পরিতেন এবং কলিকাতায় থাকিবার সময় স্বামীর জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয়গণের মহিলাদিগের সহিত খুব মেলামেশা করিতেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বামী, পুত্র ও কন্যাদিগের সহিত ভারতবর্ষে আসিয়া কাশীধামে বিশ্বনাথ মন্দিরের নিকটস্থ স্বামীর পৈত্রিক কাশীধামের ভবনে হিন্দু সাধ্বী স্ত্রীর ন্যায় প্রায় দুই বৎসর অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। স্বামীর স্বর্গারোহণের পরেও তিনি ভারতবর্ষেই অধিককাল বাস করেন।

মন্মথচন্দ্র ইউরোপ ও আমেরিকা ইত্যাদি দেশ-বিদেশে বহুকাল অতিবাহিত এবং বিদেশী মহিলার পাণিগ্রহণ করিলেও, হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা কিছুমাত্র কমে নাই। তিনি খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষা লন নাই। তিনি জীবনের বহু বৎসর ইংলণ্ডে নাম করিয়া ছিলেন; ইংরাজ বন্ধু তাঁহার অনেক ছিল কিন্তু তিনি কখনও ভুলেন নাই যে, "ভারতবর্ষ তাঁহার জন্মভূমি এবং ভারতবাসী তাঁহার স্বজাতি ও ভাই।" কলিকাতায় যখনই ফিরিতেন তখনই তিনি তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্ব ও আত্মীয়গণের সহিত বাঙ্গালীর ন্যায় মিশিতেন। তিনি ছিলেন আমার খুল্লতাত, আমি যখনই তাঁহার কলিকাতার ভবনে গিয়াছি, তিনি আমাকে অতি স্নেহে ও আদরে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কাশীতে আত্মীয়স্বজন আসিলে তিনি বড়ই সুখী হইতেন। বাহির হইতে দেখিলে তাঁহাকে একজন ইংরাজ বলিয়া ভ্রম হইত কিন্তু অন্তরে এবং ব্যবহারে তিনি একজন প্রকৃত হিন্দু এবং ভারতবাসী ভিন্ন অন্যকিছু ছিলেন না।

৺জয়গোপাল বসুমল্লিক মহাশয়ের তিন পুত্র প্রবোধচন্দ্র, মন্মথচন্দ্র ও হেমচন্দ্র পটলডাঙ্গাস্থ ভবন হইতে গিয়া ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ ভবনে একত্রে সকলে বাস করিতেন। প্রবোধচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর তিন ভ্রাতায় সকল বিষয় আপোষে বণ্টন করিয়া লন এবং মন্মথচন্দ্র কলিকাতায় যখন অবস্থান করিতেন তখন তাঁহার নিজের ১নং উড্ স্ট্রীটস্থ ভবনে বাস করিতেন।

মন্মথচন্দ্রের কোনোরূপ গর্ব ছিল না। তিনি শান্তভাবে জীবন অতিবাহিত করিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার চরিত্র অতি নির্মল ও ঋষিতুল্য ছিল এবং কোনোরূপ বাহ্যাড়ম্বর তিনি ভালবাসিতেন না। তাঁহার মূর্তি অতি সৌম্য, গঠন সুন্দর বলিষ্ঠ এবং ইংরাজদের ন্যায় রক্তিম সুন্দর রঙ ছিল।

মন্মথচন্দ্র যেরূপ বড় সাহিত্যিক সেইরূপ প্রসিদ্ধ বাগ্মী ছিলেন। ইংরাজীতে তিনি সুন্দরভাবে বক্তৃতা দিতে পারিতেন। পৃথিবীর যে স্থানে তিনি যখনই গিয়াছেন, সহরের বড় বড় মহাপুরুষগণের সহিত আলাপ করিয়াছেন এবং তাঁহাকে সেই দেশের জনসাধারণের দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া দেশভ্রমণ, সাহিত্য ইত্যাদি সম্বন্ধে বহু গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা দিতে হইয়াছে। কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট হলে তিনি অনেকবার ছাত্রসমাজের মধ্যে বক্তৃতা দিয়াছেন।

মন্মথচন্দ্র কেবলমাত্র বাঙ্গালাদেশের একজন যশস্বী লোক ছিলেন না। তাঁহার সুনাম ও যশ ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান ইত্যাদি পৃথিবীর বহুস্থানেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবগণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। চাণক্য ঠিকই বলিয়া গিয়াছেন—

বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥

মন্মথচন্দ্র জাপান দেশকে এবং জাপানী জাতিকে বড়ই ভালবাসিতেন। জাপানীদিগের কর্মময় জীবন, তাঁহাদের শৌর্য, বীর্য ও ব্যবহারে তিনি মুগ্ধ হইয়া জীবনে বহুবার সপরিবারে জাপানে গিয়া বহুদিবস ধরিয়া বাস করিয়া গিয়াছেন। জাপানের রাজপুরুষ এবং বিদ্বান সমাজে তাঁহার অনেক বন্ধু ছিলেন। জাপানে Indo-Japanese Association নামে একটি বড় সভা আছে। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে উক্ত সভায় সভায় সভাপতি ছিলেন জাপানসম্রাটের ভ্রাতা H. E. Count Shigenoba Okuma। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মন্মথচন্দ্র তৃতীয়বার জাপানে গিয়া দুই বৎসর বাস করেন এবং নানা সভাসমিতিতে নিমন্ত্রিত হইয়া বক্তৃতা দেন।

From Journal of the Indo-Japanese Association, Tokyo. No. II, dated December 1914, page 281,—"Mr. M. C. Mallik well-known member of the Bar in England, came to our country. He was born in Bengal and went to England in his boyhood to be educated there. After his graduation from

the Middle Temple he lived in different parts of England and Scotland. Twice he was a candidate for the British Parliament and his reputation is well established among the lawyers' circle in England and in Calcutta.

Besides his professional study, he is versed in English and Indian literature and is the author of several publications relating to Europe, America and Japan. For a long time he appears to have cherished a liking for our country and accompanied by his family he now in his third visit came to Tokyo to live. We can assure him that we are certainly most pleased to have a learned and honourable gentleman like him with us and sincerely wish him good health and happiness while he lives here.

On 26 June, our Association gave a wel-come dinner at the Imperial Hotel for the sake of the above gentleman at which Baron Kanda Vice-President was present.

"মন্মথচন্দ্র বসুমল্লিক—বাঙ্গালা ১২৬০ সালের আশ্বিন মাসে কলিকাতায় রাধানাথ মল্লিকের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জয়গোপাল বসুমল্লিক, মাতার নাম কৃষ্ণভামিনী দাসী। হিন্দু স্কুলে ও পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিয়া মন্মথচন্দ্র ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় কেম্ব্রিজের ক্রাইষ্ট কলেজে প্রবিষ্ট হন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ইনি ব্যারিষ্টার হন ও সেই অবধি বিলাতেই অধিকাংশ কাল যাপন করেন। ইনি প্রথমে হাটখোলার দত্তবংশীয় নরেন্দ্রনাথ দত্তের কন্যার ও তাঁহার লোকান্তর ঘটিলে ইংলণ্ডে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে এক ইংরাজ মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। পার্লামেণ্টের মেম্বার হইবার জন্য ইনি দুইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—প্রথমে লণ্ডনের হানোভার বিভাগের ও দ্বিতীয়বার মিডলসেক্সের আক্সজ বিভাগের পক্ষ হইতে। ইনি একজন বিখ্যাত পর্যটক ছিলেন এবং সমগ্র ইউরোপ, আমেরিকা, চায়না ও জাপান ভ্রমণ করিয়াছেন। "Orient and Occident, Study in Ideals, Impressions of a Wanderer, Problems of Existence" প্রভৃতি ইংরাজী ভাষায় লিখিত বহু পুস্তক ইনি প্রকাশিত করিয়াছেন। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল যে দশজন ব্যক্তিকে

'Immortal Ten' বা 'অমর দশ' আখ্যাপ্রদান করেন ইনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।"—সরল বাঙ্গালা অভিধান, ৺সুবলচন্দ্র মিত্র প্রণীত, পৃষ্ঠা ৯৯১।

মন্মথচন্দ্রের একমাত্র পুত্র জয় এবং তিন কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। জয় ইংলণ্ডে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ব্যারিষ্টার হইয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষে প্রায়ই আগমন করেন।

মন্মথচন্দ্রের তিন কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা দুই কন্যা দুর্ভাগ্যক্রমে অল্পবয়সেই অবিবাহিতা অবস্থায় ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। কনিষ্ঠা কন্যা লুসিয়া পুণা নিবাসী ডাক্তার বিশ্বনাথ চিতনিশকে বিবাহ করিয়াছেন। লুসিয়া ইংলণ্ডে উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় থাকিয়া ভবানীপুরস্থ গোখেল মেমোরিয়ল বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর কার্য কয়েক বৎসর করেন। তাঁহার স্বামী ডাক্তার চিতনিশ ইংলণ্ডের বার্মিংহামের একজন খ্যাতনামা চিকিৎসক।

হেমচন্দ্র বসুমল্লিক

জয়গোপাল বসু মল্লিক মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র হেমচন্দ্র বসুমল্লিক পটলডাঙ্গাস্থ পৈতৃক ভবনে জন্মগ্রহণ করেন।

হেমচন্দ্র শৈশবে হিন্দু বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া পরে বাটীতে ইংরাজ শিক্ষকের নিকট ভালরূপে শিক্ষালাভ করেন। হেমচন্দ্র বাল্যকাল হইতে সকলের সহিত মেলামেশা করিতে ভালবাসিতেন এবং বয়স্থ হইয়া একজন সামাজিক সম্ভ্রান্ত লোক হন। দেশের বিদ্বান এবং উচ্চসমাজের সকলের সহিত তাহার বিশেষ সৌহার্দ্য হয়।

হেমচন্দ্রের ন্যায় স্বদেশানুরাগ সে সময় অতি অল্প লোকেরই ছিল। তিনি বাহিরে বাহিরে হৈ চৈ করিতে ভালবাসিতেন না কিন্তু তিনি গোড়ার কথা ভাবিতেন। দেশভক্তি কিরূপে ভিতর হইতে সঞ্চারিত হইতে পারে সে বিষয় লইয়া তিনি সর্বদাই আন্দোলন করিতেন। কিরূপে বাঙ্গালী যুবকেরা কঠোর সংযম সাধনা করিয়া শক্তিমান হইতে পারে সে বিষয়ে অনেকপ্রকার উপায় চিন্তা করিতেন। তিনি প্রথম জীবনে বিলাতীভাবাপন্ন ছিলেন কিন্তু হিন্দুধর্মে তাঁহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও হিন্দু দেবদেবীর উপর তাঁহার যথার্থ ভক্তি ছিল। গোড়ামি তাঁহার কোন বিষয়ে ছিল না এবং গোলামি ও কাপুরুষতাকে তিনি

অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। সকল দেশহিতকর কার্যে তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল তবে তিনি ছিলেন নীরব কর্মী।

তিনি যেমন তেজস্বী তেমনি সাহসী ছিলেন। ১৩১৩ সনে কলিকাতায় যে প্রথম শিবাজী উৎসবের আয়োজন করা হয়, হেমচন্দ্র তাহার একজন অগ্রণী নেতা ছিলেন। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থ পান্তির মাঠে শিবাজী উৎসবের আয়োজন করা হয় এবং হেমচন্দ্র উৎসব সভার মধ্যে অগ্রগামী সেনার ন্যায় প্রথমে প্লাট্‌ফরমে প্রবেশ করেন। উক্ত শিবাজীর প্রথম উৎসবে কোন এক উচ্চ-শিক্ষিতা সম্রান্ত মহিলা একটি গেরুয়া পতাকায় শিবাজীর 'ভবানীর খড়্গ' অঙ্কিত কবিয়া উপহার দেন। "লাল কাপড় দেখাইয়া ষাঁড়কে ক্ষেপাইবার প্রয়োজন নাই" বিজ্ঞ বৃদ্ধদের উপদেশ শুনিয়া উদ্যোগীরা যখন কি করা কর্তব্য ভাবিতেছেন ; হেমচন্দ্র তখন পতাকাটি গ্রহণ করিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন এবং নিজের যষ্টিতে পতাকাটি পরাইয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সুবোধচন্দ্রকে বলিলেন "মঞ্চের উপর রাখিয়া দাও।" শিবাজী উৎসবের জন্য তিনি যথাসম্ভব সাহায্য করিয়াছিলেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রদেশবাসী বালগঙ্গাধর তিলক মহারাজকে রাজ-দ্রোহের অপরাধে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অভিযুক্ত করেন। এই দেশপ্রেমিক তিলক মহারাজের বিপদে মহারাষ্ট্রদেশ বাদ দিলে বাঙ্গালাদেশ যেরূপ ব্যথা প্রকাশ করিয়াছিল সেরূপ ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশই করে নাই। হেমচন্দ্র তিলকের ত্যাগে ও দেশপ্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিলক মহারাজকে সাহায্য করিবার জন্য বাঙ্গালাদেশ নিজ দেশ বিপন্ন মনে করিয়া, তাঁহাকে রাজদ্বার হইতে মুক্ত করিবার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা হইতে বহু সহস্র মুদ্রা এবং একজন সুবিখ্যাত ব্যবহারজীবিকে পাঠাইয়া ছিলেন। শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং হেমচন্দ্র এই কার্যের অগ্রণী হইয়াছিলেন। হেমচন্দ্র তিলকের সাহায্যের জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বহু টাকা তুলিয়াছিলেন। তিলক মহারাজ হেমচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি কলিকাতায় আসিলেই হেমচন্দ্রের ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ ভবনে আসিতেন এবং হেমচন্দ্রের সহিত নানাবিষয়ে দেশের কথা কহিতেন।

হেমচন্দ্র পূর্বে সাহেবিয়ানার পক্ষপাতী ছিলেন এবং ইংরাজীভাবাপন্ন হইয়া ইংরাজী চালচলনেই চলিতেন কিন্তু উক্ত তিলক মহারাজের মকর্দমার পর হইতে তিনি সাহেবিয়ানা পরিত্যাগ করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি

জাতীয়তার অত্যন্ত পক্ষপাতী হন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার জন্য সমগ্র বঙ্গপ্রদেশের উপর যে দেশাত্মবোধের প্রবল বন্যা আসিয়াছিল, হেমচন্দ্র সেই আন্দোলনে মনেপ্রাণে যোগদান করিয়াছিলেন। তবে হেমচন্দ্র কর্মীপুরুষ ছিলেন, তিনি সভায় গিয়া বক্তৃতা দিয়া হৈ চৈ করিতে ভালবাসিতেন না। তাঁহার প্রবল ইচ্ছা ছিল দেশের যুবকগণকে মানুষ করিতে। ব্যায়াম শিক্ষার দ্বারা বহু যুবককে শক্তিশালী করিবার জন্য তিনি প্রচুর সাহায্য করেন। বাগবাজারে ৺পশুপতিনাথ বসু মহাশয়ের ভবনে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ১৬ই অক্টোবর, ৩০শে আশ্বিন তারিখে রাখীবন্ধন দিবসে যে বঙ্গভঙ্গের শোক প্রকাশের সভা আহুত হয় হেমচন্দ্র তাহার একজন উদ্যোক্তা ছিলেন এবং স্বয়ং নগ্নপদে উক্ত সভায় যোগদান করিয়া দেশবাসীকে উৎসাহিত করেন। সেই সময়ে বিলাতী দ্রব্য বর্জন এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের জন্য যে আন্দোলন বঙ্গদেশে ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বে আরম্ভ হয়, হেমচন্দ্র তাহা অনুমোদন করেন এবং তাহাতে সম্পূর্ণ সহানুভূতি দেখান।

হেমচন্দ্র একজন সম্ভ্রান্ত সমাজের সর্বজনপ্রিয় মান্যবর লোক ছিলেন। তাঁহার অমায়িকতা, চরিত্রের দৃঢ় সত্যনিষ্ঠা, অকপট সরলতা এবং উদার সহৃদয়তায় যে কেহ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ রাজপ্রাসাদতুল্য নূতন অট্টালিকা তখন কলিকাতার বড় বড় রাজা, মহারাজা, জমিদার, ব্যারিষ্টার, উকিল, দেশপ্রেমিক ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকের একটি মিলন মন্দির ছিল। ভগবান যেমন তাঁহাকে অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর করিয়াছিলেন, তিনিও তেমনি বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের আদর অভ্যর্থনায় অকাতরে অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া একত্রে আহার করিতে ভালবাসিতেন এবং তাঁহার আলয়ে ডিনার, লাঞ্চ ইত্যাদির পার্টি ও সম্মেলন প্রতি সপ্তাহে দুই তিনটি করিয়া হইত। হেমচন্দ্রের সৌহার্দ্য কেবল কলিকাতা নিবাসী সম্ভ্রান্ত লোকগণের সহিত ছিল না, তাঁহার ভবনে সুবিখ্যাত আগা খাঁ মহাশয়, জাপান রাজবংশীয় মন্ত্রী কাউন্ট ওকাহামা, তিলক মহারাজ, গোখেল মহাশয় ইত্যাদি বহু জগৎবিখ্যাত লোক বহুবার অতিথি হন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ১৪ই নভেম্বর তারিখে বরোদা রাজ্যের অধিপতি সয়াজীরাও গাইকোয়ার তাঁহার আলয়ে আসিয়া ভোজন করেন।

হেমচন্দ্র তৎকালীন বড বড় সকল সভা সমিতিরই সভ্য ছিলেন। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে 'ভারত সঙ্গীত সমাজ' নামক কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক-

গণের একটি উচ্চ অঙ্গের সমিতি ছিল। উক্ত সমিতিতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, পশুপতি বসু, পাইকপাড়ায় শরৎচন্দ্র সিংহ, সতীশচন্দ্র সিংহ, রমানাথ ঘোষ ইত্যাদি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নিজেরা প্রায়ই নাট্যাভিনয় করিতেন এবং প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে নানারূপ সঙ্গীত ও সাহিত্যের আলোচনা হইত। হেমচন্দ্র ছিলেন উক্ত সমিতির প্রাণ। তিনি উক্ত ভারত সঙ্গীত সমাজের সম্পাদক ও ট্রাষ্টী হিসাবে থাকিয়া সমাজের সুনাম এবং উন্নতির জন্য কিরূপ স্বার্থত্যাগ, অর্থব্যয় এবং পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তিনি তৎকালীন কলিকাতার বড় বড় রাজপুরুষ, রাজা, মহারাজা, জমিদার ও অন্যান্য সকল সম্ভ্রান্ত লোকের মিলন স্থান করিয়াছিলেন এই ভারত সঙ্গীত সমাজ। এই সমাজের নাট্যাভিনয়ে হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, সতীশচন্দ্র সিংহ, মন্মথনাথ মিত্র, পশুপতি বসু ইত্যাদি ভদ্রলোকগণের সহিত 'অশ্রুমতী', 'রাজারাণী', 'মৃণালিনী' ইত্যাদি নাট্যাভিনয় করিয়া শ্রোতাবর্গকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন এবং সেরূপ উচ্চাঙ্গের অভিনয় আজকাল বড় একটি দেখা যায় না। উক্ত এক একটি নাট্যাভিনয়ে সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয় হইত।

সেই সময়ে হেমচন্দ্রের ন্যায় সৌখিন লোক সম্ভ্রান্ত সমাজে অন্য কেহ ছিল না। অনেকেই ঠাট্টা করিয়া হেমচন্দ্রকে বলিত "Originator of the fashion of the day"। তিনি যেরূপ জামা জুতা পোশাক ইত্যাদি পরিধান করিতেন অনেকেই তাহার অনুকরণ করিত।

১৩০৯ সনে ৺রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে যে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রতিষ্ঠা করা হয় হেমচন্দ্র তাহাতে যোগদান করিয়া একজন কর্মী হন এবং উক্ত সভার উন্নতির জন্য সর্ববিষয়ে সাহায্য করেন।

হেমচন্দ্র বাহিরে সাহেবিয়ানা করিলেও ভিতরে হিন্দুর আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গৃহে প্রতি সকাল-সন্ধ্যা গৃহ-দেবতার পূজা হইত এবং ব্রাহ্মণগণ যথোচিত সম্মান পাইতেন। তাঁহার ন্যায় এত উচ্চ অন্তকরণের লোক সমাজে খুব বিরল দেখা যায়।

জর্জ ওয়াসিংটনের তৈলচিত্র

হেমচন্দ্র বিডন ষ্ট্রীট নিবাসী ৺দয়ালচাঁদ মিত্র মহাশয়ের নিকট হইতে জর্জ ওয়াসিংটনের সুবিখ্যাত তৈলচিত্রখানি খরিদ করেন। দেশবিখ্যাত চিত্রকর

মিষ্টার গিলবার্ট ষ্টুয়াট সাহেব ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ অফ্ আমেরিকার প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষ জর্জ ওয়াসিংটনের উক্ত চিত্রখানি প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে আমেরিকায় অঙ্কিত করেন। কলিকাতার সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী রামদুলাল দে মহাশয়কে কতকগুলি আমেরিকান ব্যবসাদার উক্ত তৈলচিত্রখানি ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদির সহিত উপহার পাঠান। ঐ অমূল্য ভুবন-বিখ্যাত ছবিখানিতে মহাত্মা জর্জ ওয়াসিংটনের সম্পূর্ণ মূর্তিটি অতীব সুন্দর-ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। বিশেষ যত্নের সহিত উক্ত চিত্রখানি হেমচন্দ্র তাঁহার ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ ভবনে রক্ষা করেন। ইউনাইটেড স্টেট অফ্ আমেরিকার গবর্ণমেণ্ট ১২০০০ সহস্র পাউণ্ড বা প্রায় দুইলক্ষ মুদ্রায় উক্ত তাঁহাদের দেশের মহাগুরুর চিত্রখানি খরিদ করিতে চাহেন কিন্তু তিনি তাহা বিক্রয় কবিতে অস্বীকার করেন। উক্ত চিত্রখানি এখনও হেমচন্দ্রের পুত্র নীরদচন্দ্রের উক্ত ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ পৈত্রিক ভবনে সযত্নে রক্ষিত আছে। বহু সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও আমেরিকান ভদ্রলোক প্রায়ই উক্ত ছবিখানি দেখিতে আসেন। বঙ্গের লেফটেনেণ্ট গবর্ণর অ্যাণ্ড্রু ফ্রেজার ও অন্যান্য অনেক বড় রাজপুরুষ উক্ত ছবিখানি দেখিয়া গিয়াছেন।

হেমচন্দ্র যেরূপ ভদ্রলোক ছিলেন তাঁহার চরিত্রও সেইরূপ নির্মল ছিল। স্বার্থপরতা বা কার্পণ্য তিনি জানিতেন না। তাঁহার ন্যায় উচ্চ মেজাজের লোক খুব অল্পই দেখা যায়।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মে সোমবার দিবস হাটখোলা দত্তবংশের নরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ভুবনমোহিনীর সহিত হেমচন্দ্রের শুভ-পরিণয় হয়। উক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত হেমচন্দ্রের দ্বিতীয় ভ্রাতা মন্মথচন্দ্রের শুভবিবাহ হইয়াছিল।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে হেমচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভগ্ন হয় এবং তিনি সপরিবারে পুরীধামে স্বাস্থ্যলাভের আশায় গমন করেন। তথায় দুইমাস থাকিয়া তাঁহার প্রথমে অল্প উপকার দেখা যায় কিন্তু হঠাৎ একদিবস বেশী জ্বর হয় এবং উক্ত জ্বরে ১২ দিবস মাত্র ভুগিয়া পুরীধামে সাগরতীরস্থ সাগরসৌধ ভবনে ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ৬ই ফাল্গুন বেলা ১০ ঘটিকার সময় সজ্ঞানে স্বর্গারোহণ করেন। প্রাণত্যাগের পূর্বে নিজে চশমা খুলিয়া অনিমেষ নয়নে সমুদ্র দেখিতে দেখিতে পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র সুবোধচন্দ্র প্রভৃতি সকল আত্মীয়ের মস্তকে হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া ভগবানের নাম করিতে থাকেন এবং সর্বশেষে দুই হস্তে

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন।

"It is with deep sorrow that we have announce the death of Babu Hem Chandra Mallik of Wellington Square. This melancholy event happened at Puri where he had gone for a change as he had not been in good health since time past. No one however had the faintest idea that his end was so near. He was one of the most prominent figures in Calcutta, and there was scarcely a public movement of importance in which he did not take a leading part. He was a patriot in the truest sense of the word, for he hated prominence and served his country in silence.

—Amrita Bazar Patrika.

হেমচন্দ্রের এক পুত্র নীরদচন্দ্র এবং তিন কন্যা শ্রীমতী লীলাবতী, শ্রীমতী মৃণালিনী এবং শ্রীমতী বসুমতী জন্মগ্রহণ করেন।

হেমচন্দ্রের সাধ্বী স্ত্রী ভুবনমোহিনী স্বামীর স্বর্গারোহণের পর নানা তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে থাকেন। শেষ জীবনের কয়েক বৎসর পুরীধামে গিয়াই বসবাস করেন। ১৩২৯ সনের আশ্বিন মাস হইতে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইতে থাকে এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র নীরদচন্দ্র সেই সময়ে ইউরোপে ছিলেন। তিনি মাতার অসুখের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়া মাতাঠাকুরাণীকে পুরীধাম হইতে কলিকাতায় আনাইয়া নানারূপ চিকিৎসা করান কিন্তু কোন ফল হয় না। ২৬শে জানুয়ারী ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে রবিবার ১০ই মাঘ ১৩৩৬ তারিখে স্বামীর ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ ভবনে ইহধাম ত্যাগ করেন।

শ্রীনীরদচন্দ্র বসুমল্লিক

হেমচন্দ্রের একমাত্র পুত্র ২৮ পর্যায়ে মুখ্য কুলীন নীরদচন্দ্র। তিনি ২৯শে ডিসেম্বর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে লোরেটো পরে সেণ্ট জেভিয়ার কলেজে বিদ্যাশিক্ষা করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি দুইবৎসর সেণ্ট জেভিয়ার কলেজে অধ্যয়ন করেন। বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত

করিয়া তিনি জাপানে গিয়া কয় মাস ভ্রমণ করিয়া আসেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে নীরদচন্দ্র শ্যামবাজার নিবাসী ৺মোহনলাল মিত্র মহাশয়ের পৌত্রী এবং বিপিনবিহারী মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরোজ-সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে নীরদচন্দ্র ইংলণ্ডে ভ্রমণ করিতে যান এবং এক বৎসর ইংলণ্ডে ইউরোপের নানাদেশ দেখিয়া ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। নীরদচন্দ্র ইউরোপ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন তাঁহার মাতাঠাকুরাণী পুরীধামে অত্যন্ত অসুস্থ। তিনি প্রাতঃকালে কলিকাতায় পৌছান এবং সেই দিবসই রাত্রের ট্রেনে পুরীধামে গিয়া, তথায় দুই দিবস থাকিয়া কলিকাতায় মাতাঠাকুরাণীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। তাঁহার মাতাঠাকুরাণী কয়মাস মাত্র ভুগিয়া ১২ই মাঘ ১৩৩৬ সনে স্বামী সকাশে চলিয়া যাইলে, নীরদচন্দ্র যথারীতি হিন্দু শাস্ত্রমত একমাস অশৌচ পালন করিয়া বিশেষ সমারোহে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় এবং দরিদ্রগণকে তুষ্ট করিয়া মাতার শেষ কার্য যথাযোগ্যভাবে সুসম্পন্ন করেন।

নীরদচন্দ্র উচ্চহৃদয়ের চরিত্রবান পুরুষ। সকলের সহিত তিনি পিতার ন্যায় অমায়িকভাবে হৃদ্যতা করেন। তাঁহার হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ খুবই প্রবল। তাঁহার খুল্লতাতপুত্র দেশপ্রসিদ্ধ রাজা সুবোধচন্দ্রের সহিত নীরদচন্দ্র সপরিবারে একত্রে ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে বসবাস করিয়াছেন এবং সুবোধচন্দ্রের দেশের কার্যে তিনি কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় পদানুসরণ ও সাহায্য করিয়াছেন। কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত নীরদচন্দ্রের বিশেষ সৌহার্দ্য আছে।

নীরদচন্দ্র একজন আন্তরিক হিন্দুসন্তান। তাঁহার স্ত্রী সরোজসুন্দরী বেলুড়ের রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মঠ হইতে মন্ত্র লইয়া সকাল সন্ধ্যা জপ, পূজা, আহ্নিক করিয়া থাকেন এবং সকাল সন্ধ্যা তাঁহার আলয়ে গৃহদেবতার পূজা হইয়া থাকে।

Nerode Chandra Basu Mallik comes of the well known Wellington Square Malliks, renowned for their study, independence and enlightened culture. He got the whole of his schooling at St. Xaviers. Nerode passed out of College to take a leading part in the industrial development of his father's business. To-day he controls one of the largest and most modern Docking and Engineering yards in the East.

At present he is deeply interested in the work of the League of Nations at Geneva.

—St. Xaviers College Magazine, July 1929, p. 66.

নীরদচন্দ্রের একমাত্র পুত্র হামীরচন্দ্র ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর মঙ্গলবার ৭ই কার্ত্তিক তারিখে ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। হামীরচন্দ্র প্রথমে সেণ্ট জেভিয়ার কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং উপস্থিত আইন অধ্যয়ন করিতেছেন।

হামীরচন্দ্র মেধাবী ও অতি সরলচিত্তের বালক। তাহার স্বভাব বড়ই নম্র অমায়িক ও মধুর। ১৮ই বৈশাখ ১৩৪৩ (১১ই মে ১৯৩৬) সোমবার দিবস হামীরচন্দ্র বিডন ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্রের কন্যা শ্রীমতী বাণীকে কুলকর্ম করিয়া বিবাহ করেন।

লীলাবতী ও চারু দত্ত

হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী লীলাবতী। কুচবিহার রাজষ্টেটের দেওয়ান ৺কালিকাদাস দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত লীলাবতীর বিবাহ হয। চারুচন্দ্র ইংলণ্ড হইতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে বম্বে প্রেসিডেন্সিতে উচ্চ সিভিলিয়ানদিগের রাজকার্যে নিযুক্ত হন এবং ডিষ্ট্রিক্ট জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য করিতে থাকেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে চারুচন্দ্র রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেছেন। ১৯৩২ সন হইতে তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে বোলপুরের বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠানের সহকারী সভাপতি এবং বিশ্বভারতী কলেজের প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হইয়া অবৈতনিকভাবে কার্য করিতেছেন। তিনি উপস্থিত মধ্যে মধ্যে কলিকাতা হইতে বোলপুরে গিয়া বিশ্বভারতীর কার্যাদির পর্যবেক্ষণ করেন।

চারুচন্দ্র একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক। তিনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় একজন অতি উচ্চদরের লেখক। তাঁহার লিখিত বহু গবেষণাপূর্ণ পুস্তক-প্রবন্ধাদি সাহিত্যে সমাজে বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে। সঙ্গীত বিদ্যায়ও চারুচন্দ্র একজন বিশেষ অনুরাগী। তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী ও গুণী লোক উচ্চ সমাজে এখন অতি অল্পই দেখা যায়। তিনি একজন আন্তরিক দেশভক্ত। বহুকাল

ইংরাজ দরবারে রাজকার্য করিয়াও তাঁহার দেশভক্তি একটুও লাঘব হয় নাই।

লীলাবতীর একমাত্র পুত্র অরিন্দম এবং এক কন্যা লোপামুদ্রা।

অরিন্দম দত্ত একজন তীক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন তেজস্বী বালক। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. ডিগ্রি লইয়া বিলাত যান। তথায় এ্যাবারিস্টউইক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এল. এল. বি. ডিগ্রি লইয়া মিডল টেম্পল হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যবহারজীবী হইয়াছেন। ১৯৩৭ সনে তিনি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন।

লীলাবতীর একমাত্র কন্যা লোপামুদ্রার পূর্ব্ববঙ্গের সুবিখ্যাত দেশসেবক শ্রীকামিনীকুমার চন্দ মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান অপূর্ব চন্দের সহিত শুভবিবাহ হয়। কিন্তু হায়! কয়েক বৎসরের মধ্যে লোপামুদ্রা তিনটি শিশুকন্যা রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে অপূর্বকুমার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বোলপুর বিদ্যালয়ে ও পরে বারাণসী সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বিলাত যাইয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন করিয়া অধ্যাপক র‍্যালের সহিত কার্য করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে এডুকেশন সার্ভিসে কর্ম লইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া প্রথমে ঢাকা কলেজে অধ্যাপক ও পরে প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক হইয়া কয় বৎসর কার্য করেন। পরে কৃষ্ণনগর কলেজ ও চট্টগ্রাম কলেজের প্রিন্সিপালের কর্ম করিয়া বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের সরকারী শিক্ষার ডাইরেক্টর পদ গ্রহণ করেন। বাঙ্গালার শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী মিস্টার উইলকিন্‌সন্ সাহেব চার মাসের জন্য অবসর গ্রহণ করিলে অপূর্ব চন্দ তাঁহার স্থানে ডাইরেক্টর অফ পাবলিক ইনস্‌ট্রাকসন্ পদে নিযুক্ত হন। এই উচ্চপদে তিনিই প্রথম বাঙ্গালী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উপস্থিত তিনি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের টিচার ট্রেনিং কলেজের প্রিন্সিপাল।

হেমচন্দ্রের দ্বিতীয় কন্যা মৃণালিনী ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ২১শে নবেম্বর ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ঝামাপুকুর নিবাসী গবর্ণমেণ্টের উকিল রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পুত্র ডাক্তার ফণীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সহিত মৃণালিনীর বিবাহ হয়। মৃণালিনীর একমাত্র কন্যা অশ্রুকণা। ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে ১০ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দিবস মৃণালিনী ইহধাম ত্যাগ করেন।

হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা বসুমতী ২২শে নবেম্বর ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে অবিবাহিত অবস্থায় অতি অল্পবয়সেই ইহধাম ত্যাগ করেন।

একাদশ অধ্যায়

রাজা সুবোধচন্দ্র

প্রবোধচন্দ্র বসুমল্লিক মহাশয়ের একমাত্র পুত্র ২৮ পর্যায়ে মুখ্য কুলিন সুবোধচন্দ্র ২৮শে মাঘ ১২৮৫ ইং ৯ই ফেব্রুয়ারী রবিবার ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বেলা তিন ঘটিকার সময় শুভ মুহূর্তে পটলডাঙ্গার বসুমল্লিক বংশে আবির্ভূত হন।

সুবোধবচন্দ্র শৈশবে তাঁহার খুল্লতাত ও ভ্রাতাগণের সহিত ১৮নং রাধানাথ মল্লিক লেনস্থ ভবনে একান্নবর্তী পরিবারে অতিবাহিত করেন। পৈত্রিক সম্পত্তি সকল আপোষে বিভাগ হইয়া গেলে, সুবোধচন্দ্র তাঁহার পিতা এবং দুই খুল্লতাত মন্মথচন্দ্র ও হেমচন্দ্রের সহিত প্রথমে গিয়া বহুবাজার শাঁখারিটোলার একটি বাটীতে কিছুকাল বাস করেন, এবং পরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ পূর্বদিকে নূতন উদ্যান সংযুক্ত রাজপ্রাসাদতুল্য অট্টালিকার নির্মাণকার্য শেষ হইয়া গেলে তথায় গিয়া বাস করেন এবং উক্ত ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ ভবনে তাঁহার জীবনের লীলাভূমিরূপে প্রায় সারাজীবন অতিবাহিত হয়।

নয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে সুবোধচন্দ্র তাঁহার স্নেহময় পিতাকে হারান এবং তাঁহার খুল্লতাত হেমচন্দ্র তাঁহাকে নিজ সন্তানের ন্যায় লালনপালন ও শিক্ষিত করেন। হেমচন্দ্রের একমাত্র পুত্র নীরদচন্দ্রের সহিত সুবোধচন্দ্রের দুই ভ্রাতার বিশেষ সদ্ভাব ও বন্ধুত্ব ছিল এবং সুবোধচন্দ্র আজীবন নীরদচন্দ্রের সহিত যেন এক মায়ের সন্তানরূপে বন্ধুত্বভাবে সপরিবারে অতিবাহিত করেন।

সুবোধচন্দ্র প্রথমে সিটি ইস্কুলে পরে ভবানীপুরস্থ সেণ্ট জেভিয়ার বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। সেণ্ট জেভিয়ার বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন এবং তথা হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্স্ট আর্টস্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি. এ. ক্লাসে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের বি. এ. ক্লাসে অধ্যয়ন করিবার কালে সুবোধচন্দ্র শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গিয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে প্রবেশ করেন এবং তথা হইতে সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সুবোধচন্দ্র ব্যারিষ্টারশিপ অধ্যয়ন করিবার জন্য 'ইনে' যোগদান করেন।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টারী অধ্যয়ন করিবার কালে তিনি কলিকাতায় আসেন এবং নানা কারণে আর ইংলণ্ডে যাইতে পারেন নাই।

সুবোধচন্দ্র বাল্যকাল হইতে অসাধারণ মেধাবী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বালক ছিলেন। বাঙ্গালা ও ইংরাজী তিনি খুব ভালভাবেই শিক্ষা করেন এবং ইংরাজী ভাষায় অতি সুন্দরভাবে লিখিতে ও কথা কহিতে পারিতেন। সুবোধচন্দ্রের পিতা অতুল বিভব রাখিয়া যান এবং সুবোধচন্দ্র অতুল ঐশ্বর্যে ও নানারূপ ভোগবিলাসেই মানুষ হইয়াছিলেন। সুবোধচন্দ্রের খুল্লতাত হেমচন্দ্র সেই সময় কলিকাতার সম্ভ্রান্ত সমাজের একজন নেতা এবং দেশের ও দশের নিকট তাঁহার সম্মান অতুলনীয় ছিল। সুবোধচন্দ্র অমায়িকভাবে সকলের সহিত মিশিতেন এবং জীবনের প্রথম হইতেই সমাজের মধ্যে সুবোধচন্দ্রের সকল প্রকার লোকের সহিত বিশেষ বন্ধুত্ব হয়। তাঁহার খুল্লতাত মন্মথচন্দ্র তখন প্রায় একজন ইংলণ্ডবাসী এবং তিনি ভারতবর্ষে আসিলেই সুবোধচন্দ্রের সহিত অনেক সময় একত্রে অতিবাহিত করিতেন। সেই সময়ে সুবোধচন্দ্রকে অনেকেই ইংরাজীভাবাপন্ন সাহেবী মেজাজের লোক বলিত কারণ তিনি ইংরাজী কায়দা-কানুনে খুবই অভ্যস্ত ছিলেন এবং অনেক ইংরাজ ও ব্যারিষ্টার বন্ধু তাঁহার নিকট খুবই যাতায়াত করিতেন। সুবোধচন্দ্রের বাটীতে প্রত্যহই ইংলিস ডিনার বা বিলাতী খানা খাওয়া হইত এবং অনেক রাজা, মহারাজা, উকিল, ব্যারিষ্টার ইত্যাদি গণ্যমান্য লোক আসিতেন। সুবোধচন্দ্রের মন ছিল উদার ও মহৎ এবং সকলের সহিত মিশিতে এবং পাঁচজনকে লইয়া আমোদ-প্রমোদ করিতে তিনি ভালবাসিতেন। বন্ধুবান্ধবকে আদর অভ্যর্থনা করিতে তিনি জানিতেন এবং কোন বিষয়ে কার্পণ্য করিতেন না। এইরূপ আন্তরিকভাবে সকল প্রকার লোকের সহিত মেলামেশার ফলে সুবোধচন্দ্রের জ্ঞান-চক্ষু উন্মোচিত হইল এবং তিনি বুঝিলেন এইরূপ ভোগবিলাসে কেবল অর্থনাশ করা উচিত নহে।

বাল্যকাল হইতেই সুবোধচন্দ্র অনেক সভাসমিতিতে মিশিতেন। ভারত সঙ্গীত সমাজে তিনি প্রায়ই যাইতেন এবং তথায় সভ্যগণ কর্তৃক নাট্যাভিনয়ে তিনিও কয়বার অভিনয় করিয়াছিলেন। ১৭ই মার্চ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে সুবোধচন্দ্র 'A Club' নাম দিয়া তাঁহার ভবনে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সুবোধচন্দ্র তাঁহার বন্ধুবর্গকে লইয়া সিমলার শিবনারায়ণ দাসের লেনস্থ ৺মহেন্দ্রনারায়ণ দাস মহাশয়ের ভবন ভাড়া লইয়া 'ফিল্ড এণ্ড একাডেমী' নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন এবং উক্ত ক্লাব সেই সময় বড় বড়

ব্যারিষ্টার ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোক ও দেশপ্রেমিকগণের একসঙ্গে মেলমেশার একটি বিশেষ কেন্দ্র হয়। উক্ত 'ফিল্ড এণ্ড একাডেমী'র গৃহের সংলগ্ন কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের উপরের মাঠে ক্লাবের টেনিস ইত্যাদি খেলিবার Field ছিল। উক্ত মাঠকে তখন 'পান্তির মাঠ' বলিত। তখন কেহই ভাবে নাই যে এই Field and Academyর সংলগ্ন জমি পান্তির মাঠ শীঘ্রই বঙ্গের একটি সুপ্রসিদ্ধ স্মরণীয় স্থান হইবে। এখন এই পান্তির মাঠের উপর মেট্রোপলিটন বা বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রগণের থাকিবার হোস্টেল নির্মাণ হইয়াছে।

সুবোধচন্দ্র এই সমিতির সম্পাদক, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণস্বরূপ ছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, কবি রবীন্দ্রনাথ, মিস্টার এ চৌধুরী, রসুল সাহেব ইত্যাদি কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উক্ত সমিতিতে বিশেষভাবে যোগদান করেন।

স্বদেশসেবা

বাল্যকাল হইতেই সুবোধচন্দ্রের দেশের প্রতি আন্তরিক ভালবাসা ছিল এবং ১৯০৩ সনে সুবোধচন্দ্র বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেশের বিষয় ভাবিতেন এবং দেশের বড় বড় নেতাগণের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার হৃদয় দেশের সেবার জন্য ধাবিত হয়।

১৯০৩ খৃষ্টাব্দের পর হইতে এদেশে দেশসেবকদিগের মধ্যে দুইটি দলের সৃষ্টি হয়। একটি মডারেট, আর একটি এক্সট্রিমিস্ট বা বিরুদ্ধদল। রাজনীতিক্ষেত্রে মডারেট্ দল গবর্ণমেন্টের সহযোগী হইয়া দেশসেবা করাই ভাল বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং নবপ্রবুদ্ধ সম্প্রদায়ের মত ছিল আত্মনির্ভর করিয়া গবর্ণমেন্টের সাহায্য না লইয়া দেশের উন্নতি করা। এই নব সম্প্রদায়ের প্রধান নেতা ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাস, বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত, সখারাম গণেশ দেউস্কর, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, কুমারকৃষ্ণ মিত্র, হরিদাস হালদার, রজত রায় ইত্যাদি। বঙ্গভঙ্গের পূর্ব হইতেই ইহারা কার্য আরম্ভ করেন এবং বঙ্গভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে দেশের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন।

বঙ্গভঙ্গ

বঙ্গভঙ্গের আন্দোলন বঙ্গদেশের একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা এবং বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে যে সকল মহাপুরুষ আত্মবলি দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সুবোধচন্দ্রের নাম ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন বঙ্গদেশকে বিভাগ করিয়া দুইটি পৃথক গবর্ণমেণ্টের সৃষ্টি করেন। ইহাতে বঙ্গবাসীরা বিশেষ অসন্তুষ্ট হয় এবং বহুশত বৎসরের নিদ্রার পর বাঙ্গালী জাতির নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং এই বঙ্গবিভাগ লইয়া একটি প্রবল ঝড় উঠে। সমগ্র বঙ্গদেশবাসী দেখিল ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এক বাঙ্গালী জাতিকে দুইভাগে পৃথক করিয়া দিতেছে এবং সমগ্র বঙ্গদেশবাসীর একতা বিনষ্ট হইতেছে। পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের সকল বঙ্গসন্তান এই বিচ্ছেদ রদ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিল। "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই ভেদ নাই ভেদ নাই" রব উঠিল। এই বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে নানাস্থানে বহু সভাসমিতি হইতে লাগিল। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট বলিলেন "It is a settled fact." বঙ্গবাসী প্রতিজ্ঞা করিল ইহাকে unsettled fact করিতেই হইবে। সুপ্রসিদ্ধ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই আন্দোলনের প্রধান নেতৃত্ব পদ পাইলেন এবং বিপিনচন্দ্র পাল, কবি রবীন্দ্রনাথ, কৃষ্ণকুমার মিত্র ইত্যাদি দেশের সকল মহাপ্রাণই এই আন্দোলনে যোগদান করিলেন। নেতাগণ বিলাতী দ্রব্য বর্জনের প্রথম উৎসাহ বাঙ্গালাদেশে আবির্ভাব করাইলেন। বহু ছাত্র উক্ত রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে লাগিল। গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের কর্তা কার্লাইল সাহেব সকল বিদ্যালয়ে এক পরওয়ানা দিলেন যে, যে ছাত্র প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিবে, তাহাকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে। এই পরওয়ানা প্রকাশিত হইলে কলিকাতায় হুলুস্থুলু পড়িয়া যায় এবং ৭ই কার্তিক ১৩১২ সনে ফিল্ড এণ্ড একাডেমীর মাঠে একটি বিরাট সভা হয়। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত এ রসুল এম. এ. সভাপতি হন এবং বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয় এই কার্লাইল পরওয়ানার তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন, "গবর্ণমেণ্ট স্বদেশী অন্দোলন নষ্ট করিবার জন্য ছাত্রগণকে যোগান করিতে নিষেধ করিতেছে এবং ইহার প্রতিকার আমাদের শিক্ষাকে স্বাধীন করা।" তৎপর ১০ই কার্তিক শুক্রবার দিবস পটলডাঙ্গায় ক্ষেত্রচন্দ্র বসুমল্লিক (সুবোধচন্দ্রের খুল্লতাত) মহাশয়ের ২২নং রাধানাথ মল্লিক লেনস্থ ভবনে ছাত্রগণের এক বিরাট সভা হয়। ঐ সভায় ভিন্ন ভিন্ন কলেজের

প্রায় সহস্রাধিক ছাত্র যোগদান করেন। মান্যবর সুবোধচন্দ্রের খুল্লতাত চারুচন্দ্র বসুমল্লিক মহাশয়ের প্রস্তাবে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মান্যবর ভূপেন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, মনোরঞ্জন গুহ, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সিটি কলেজের ছাত্র শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ বসু প্রস্তাব করেন, "গবর্ণমেণ্ট সম্প্রতি ইস্কুল ও কলেজের ছাত্রগণের বিরুদ্ধে যে সার্কুলার জারি করিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগকে স্পষ্টভাবে স্বদেশের সেবা হইতে বিরত থাকিতে বলা হইতেছে। ইহাতে আমরা কখনও সম্মত হইতে পারি না বা ভবিষ্যতে পারিব না, অতএব আমরা কলিকাতার ছাত্রবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিতেছি যে, যদি গবর্ণমেণ্টের বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের পরিত্যাগ করিতে হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি স্বদেশসেবারূপ যে মহাব্রত আমরা গ্রহণ করিয়াছি তাহা কখনও পরিত্যাগ করিব না।" প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রগণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সিংহ এবং মুসলমান ছাত্রগণের পক্ষ হইতে মহম্মদ সিদ্দিক এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে উহা গৃহীত হয়। তাহার পর সভাপতি কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মান্যবর ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ছাত্রগণকে উৎসাহ দান করিয়া বক্তৃতা করেন।

ইহার পর বঙ্গদেশের নানা স্থানে সভাসমিতি হইতে থাকে এবং বহু সহস্র ছাত্র গভর্ণমেণ্ট স্কুল পরিত্যাগ করে। রাজনৈতিক সভায় যোগদান করার অপরাধে বহু ছাত্র গভর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় ও কলেজ হইতে বহিষ্কৃত এবং নানারূপে লাঞ্ছিত ও প্রহারিত হইতে লাগিল।

দেশপ্রাণ সুবোধচন্দ্র দেখিলেন যে দেশের ছাত্রগণকে কেবল ইস্কুল কলেজ হইতে বাহির করিলে শুভফল হইবে না। তাহাদের প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা করা আশু প্রয়োজন এবং ইহার জন্য জাতীয় বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া জাতীয় ভাবে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা অগ্রে উচিত কিন্তু অর্থ না হইলে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা বা ইস্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা যায় না। চাই শিক্ষার বিস্তার। কেবল মিটিং করিয়া বক্তৃতা দিলে কার্য সফল হইবে না। ছেলেদের শিক্ষা দিয়া অগ্রে মানুষ করা দরকার।

এই সময়ে সুবোধচন্দ্রের ভবনে এবং ফিল্ড এণ্ড একাডেমী ক্লাবে কলিকাতার নেতাগণের প্রায়ই বৈঠক বসিত এবং নানারূপ দেশহিতকর কার্যের আলোচনা

হইত। একদিবস সুবোধচন্দ্র শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয়কে কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "ছেলেদের জাতীয় শিক্ষা দেওয়ার এই সময়। যদি আপনারা এই রকম কলেজ করেন আমি একলক্ষ টাকা দিতে পারি।" সেই দিন বৈকালে রামতনু বসুর লেনে কুমারকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের ভবনে পার্টির মিটিং ছিল। সকলে সেখানে সমবেত হইয়াছেন। শ্যামসুন্দরবাবু উক্ত সভায় উপস্থিত হইয়া সুবোধচন্দ্রের একলক্ষ টাকা দানের কথা বলিতেই সুবোধবাবুর বিশেষ বন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় ইহা শুনিয়া "বলেন কি" বলিয়া সভার কার্য ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ শ্যাম-বাবুর হাত ধরিয়া তাঁহার গাড়ীতে সুবোধবাবুর ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ ভবনে যান এবং দুইঘণ্টা বসিয়া সুবোধবাবুর নিকট হইতে এ বিষয় পাকা কথা লইয়া আসেন।

পরদিবস ৯ই নবেম্বর ১৯০৫ (২৩শে কার্তিক ১৩১২) তারিখের অপরাহ্নে 'ফিল্ড এণ্ড একাডেমী'র পার্শ্বের পান্তির মাঠে এক বিরাট সভার অধিবেশন হয় এবং সকলের বিশেষ অনুরোধে সুবোধচন্দ্রকে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে হয়। চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন। শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, মৌলবী আবুল হোসেন প্রভৃতি সুবক্তাগণ জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিয়া বক্তৃতা দেন।

রাজা সুবোধচন্দ্র

আমাদের শিক্ষার ভার যে আমাদের নিজেদের হাতে লইতে হইবে সভাপতি সুবোধচন্দ্র তাহা একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় বিবৃত করিয়া বলেন, "জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য আমি আপাততঃ একলক্ষ টাকা দান করিব।" এই কথায় সেই বিপুল শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে উৎসাহ এবং আনন্দের যে তরঙ্গ উঠিয়াছিল তাহা বর্ণনার অতীত। উক্ত সভায় মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় সুবোধচন্দ্রকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাঁহাকে তাঁহাদের রাজা বলিয়া দেশবাসীর পক্ষ হইতে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল ইত্যাদি মনীষিগণ অভিনন্দন করেন। এই সভায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের জন্য আরো ১৫।২০ হাজার টাকার প্রতিশ্রুতি

পাওয়া যায় এবং ইহাই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রথম সূচনা। সভাভঙ্গ হইলে অন্যূন দশ সহস্র যুবক মিলিত হইয়া সুবোধচন্দ্রের গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া দিয়া নিজেরা টানিয়া "রাজা সুবোধচন্দ্র" বলিয়া উল্লাসে চিৎকার করিতে করিতে তাঁহার বাটীতে রাখিয়া আসেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন কর্মক্লান্ত শরীর লইয়া স্বাস্থ্যলাভের জন্য শিমুলতলায় গিয়াছিলেন। ৩০শে কার্তিক ইং ১২ই নবেম্বর তারিখে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলে, সহস্র সহস্র লোক বেলা দশটার সময় তাঁহাকে লতাপুষ্পশোভিত গাড়ীতে উপবেশন করাইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্কোয়ারের পূর্ব দিয়া গোলদীঘিতে উপস্থিত হন এবং সহস্র কণ্ঠে "আমাদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় চাই।" বলিয়া নিনাদ করিতে থাকে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। মিছিল গোলদীঘির ধারে দাঁড়াইলে, গাড়ীর ওপরে দাঁড়াইয়া মাল্যভূষিত সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রগণকে সম্বোধন করিয়া এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দিয়া বলিলেন—"সে দিবস আপনাদের যে বিরাট সভা হইয়াছিল, আমি শুনিলাম তাহাতে আমার তরুণ বন্ধু বাবু সুবোধচন্দ্র মল্লিক (সকলে সমস্বরে বলিল—রাজা সুবোধচন্দ্র), না, আমি বলি মহারাজ সুবোধচন্দ্র—আপনাদিগকে একলক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আপনারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সকলের মনে এমন উৎসাহের সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন যে লোকে বিনা বিবেচনায় লক্ষ টাকা পর্যন্ত দিতে স্বীকার করিয়াছেন। এই উৎসাহ হইতেই যে আপনাদের অর্থাভাব দূরীভূত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই।"

তখন দেশবাসীর মধ্যে যে আন্তরিক আনন্দধ্বনি উঠিয়াছিল তাহা রাজা সুবোধচন্দ্র ভিন্ন অন্য কোন পার্থিব মহারাজার শুনিবার সৌভাগ্য হয় নাই।

৮ই অগ্রহায়ণ ১৩১২ তারিখে ফিল্ড এণ্ড একাডেমীর মাঠে এক বিরাট সভা হয় এবং উক্ত সভায় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলেন, "কাল এইখানে বসে ফিল্ড এণ্ড একাডেমী ক্লাবে—আমরা, আমার বন্ধু মিত্র সাহেব (প্রমথনাথ মিত্র), জ্ঞান বাবু, আর আমরা যাঁ'র প্রজা হয়েছি সেই রাজা সুবোধচন্দ্র রংপুরে পাঠাবার জন্য একখানা টেলিগ্রাম লিখছিলাম 'আপনারা National Institution' দৃঢ়ভাবে ধারণ করুন। আমরা আপনাদিগকে আশা দিচ্ছি যে আমরা National College স্থাপন ক'রবো; তাতে Literary আর Scientific উভয়বিধ শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, আপনাদের রংপুরের আদর্শ তাতে প্রসারিত হবে। …আমি

কেবল শূন্যগর্ভ কথা বলিতেছি না। সে দিন আমাদের সুবোধবাবুকে Landholders Associationএর মন্ত্রণা সভায় যখন গুরুদাসবাবু (পরে বিচারপতি স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) নগেন্দ্রবাবু (নগেন্দ্রনাথ ঘোষ) প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলেন—কমিটির মন্তব্য এখনও প্রকাশিত হয় নাই, এ সকল কথা ব'লে বোধ হয় কোন দোষ কচ্ছি না, কেন না সুবোধবাবু (রাজা সুবোধচন্দ্র) এ কথাটা বলবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছেন, যখন জিজ্ঞাসা কল্লেন আপনার প্রদত্ত এই লক্ষ টাকা কি ভাবে ব্যয়িত হ'বে ? তখন আমাদের রাজা সুবোধচন্দ্র কিছুমাত্র দ্বিধা না করে বল্লেন 'রংপুর, ঢাকা, রাণীগঞ্জ এবং অন্যান্য যে সকল স্থানের ছাত্রগণ বন্দেমাতরম্ বলার জন্য কিম্বা স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য সাক্ষাৎভাবে হোক পরোক্ষভাবে হোক, উচ্চ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হ'বে তাদের শিক্ষার জন্য আমার এই এক লক্ষ টাকা সর্বপ্রথম ব্যয়িত হ'বে। স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেছে বলে, পবিত্র বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারণ করেছে বলে যে তাদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা হবে না, তাদের ছুতোর কামার হ'য়ে থাকতে হবে, তাতো নয়। আমরা একদিকে যেমন তাদের জ্ঞানোপার্জনের ব্যবস্থা ক'রবো, অন্যদিকে তেমনি তাদের উদরান্নের ব্যবস্থাও ক'রবো ; যাতে তাদের উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন জীবিকার ব্যবস্থা হয়, তার জন্য সর্বাগ্রে আমার এই এক লক্ষ টাকা ব্যয়িত হবে। তিনি আরো বলেছেন, "এই টাকা এই কার্য্যে এখন ব্যয়িত হউক, প্রয়োজন হ'লে আরো অর্থ দিব।" আমি সভাপতি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি সুবোধবাবু ত কোটীশ্বর ন'ন, কোটীশ্বর হ'লে কখনও এ টাকা তিনি বাহির করিতে পারতেন না। আমি জিজ্ঞাসা করি কোটীশ্বর না হয়ে সুবোধবাবু কেমন করে এত টাকা দিতে পারলেন ? তাঁর যতটা শক্তি তিনি মায়ের নামে তা তুলে দিয়েছেন। তিনিত অগ্রসর হয়েছেন, আমরাই কি কেবল পশ্চাৎপদ হব ? ...যদি কমিটী তার কোন কার্য্য নাও করতে পারেন, তবে সুবোধবাবুই College Council করবেন একথা মনে রেখো। ..."

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা ও কমিটি গঠন ও কর্তব্য নির্ধারণের জন্য ৩০শে কার্তিক ১৩১২ তারিখের অপরাহ্ণে Landholders Association-এর ভবনে নেতৃবৃন্দের এক মন্ত্রনা সভা হয়। ইহাতে মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, কুমার মন্মথনাথ মিত্র, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ, মান্যবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ব্যারিস্টার তারকনাথ পালিত, আশুতোষ চৌধুরী, লালমোহন ঘোষ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ডাক্তার নীলরতন সরকার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, চারুচন্দ্র বসুমল্লিক, নরেন্দ্রনাথ সেন ইত্যাদি সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিতি ছিলেন। এবং এই সভায় উক্ত ভদ্র-মহোদয়গণ এবং চিত্তরঞ্জন দাস, স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতিকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। উক্ত কমিটি জাতীয়ভাবে এবং জাতীয় তত্ত্বাবধানে সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, এবং শিল্পবিদ্যা (Literary, Scientific and Industrial) এই ত্রিবিধ শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া একটি জাতীয় শিক্ষা সমাজ প্রতিষ্ঠা করিবে। উক্ত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ধনভাণ্ডারের ট্রাস্টী নিযুক্ত হন—তারকনাথ পালিত, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, গণেশচন্দ্র চন্দ্র, কালীনাথ মিত্র, এবং সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক এই পাঁচজন।

এই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের নাম দেওয়া হয় বেঙ্গল কাউন্সিল অব এডুকেশন Bengal Council of Education. পরপর উক্ত কার্য নির্বাহক সমিতির অধিবেশন হইতে থাকে এবং দেশের রীতিনীতি অনুসারে ও স্বদেশীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে ঐতিহাসিক, দার্শনিক, সাহিত্যিক, ভেষজ ও শিল্প সম্বন্ধে ছেলেদের শিক্ষাদান করিবার প্রধান উদ্দেশ্য লইয়া জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রতিষ্ঠার কার্য অগ্রসর হইতে থাকে। রাজা সুবোধচন্দ্রের মত গৌরীপুরের সুবিখ্যাত জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন। স্যার তারকনাথ পালিত মহাশয় বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য উক্ত পরিষদের হস্তে বহু অর্থ দিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন এবং তাঁহার অর্থে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় কিন্তু পরে পালিত মহাশয় তাঁহার অগাধ অর্থ জাতীয় শিক্ষা পরিষদের হস্তে না দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দিলেন। উক্ত অর্থে পার্শীবাগানে নগেন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ বসুমল্লিক মহাশয়ের সুবৃহৎ অট্টালিকা ও জমি ক্রয় করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

অধুনা বসুমতী পত্রিকার কার্যালয় যে গৃহে অবস্থিত (১৬৬নং বহুবাজার স্ট্রীট) সেই গৃহে পূর্বে সরকারী শিল্প ইস্কুলের চিত্রশালা ছিল। সেই ভবনে প্রথমে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ইস্কুল স্থাপিত হইল। ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত মহাশয় বিনা সর্তে আড়াই লক্ষ টাকা দিলেন। রাজা সুবোধচন্দ্রের খুল্লতাত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসুমল্লিক মহাশয় দ্বাদশ সহস্র টাকা এবং আরো অনেক ভদ্রলোক বহুটাকা উক্ত শিক্ষা পরিষদের হস্তে দান করিলেন। ৺গুরুদাস

বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে স্যার ও বিচারপতি) এই কার্যে বিশেষ উৎসাহের সহিত তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। এই জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠার পর ১৫ই আগস্ট ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার টাউনহলে একটি বৃহৎ সভা আহুত হয়। ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ ডি. এল. মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং দেশের সমগ্র গণ্যমান্য লোক সমবেত হন। আকাশের দৈবদুর্যোগের বাধাবিঘ্ন তুচ্ছজ্ঞান করিয়া দেশের অসংখ্য বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি টাউনহলের সমগ্র স্থান পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। উক্ত সভায় জাতীয় শিক্ষার পক্ষে স্যার রাসবিহারী ঘোষ এবং স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে বক্তৃতা দেন তাহা সকলের পঠনীয়। সকল বক্তাই রাজা সুবোধচন্দ্রের এবং অন্যান্য দাতাগণের অশেষ প্রশংসা করিয়া ধন্যবাদ দেন। সেই সময় সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ লিখিয়াছিলেন যে এই প্রকার মহতীসভা বহুকাল টাউনহলে হয় নাই।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইলে যে সমস্ত হোতা মাতৃযজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়াছিলেন রাজা সুবোধচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী। উদীয়মান ছাত্রদের মন হইতে দেশাত্মবোধ অপসারিত করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গে রিজলি সাহেব এবং পূর্ববঙ্গে লায়ন সাহেব যখন ইস্তাহার জারি করিয়াছিলেন তখন বাঙ্গলার জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছিল, রাজা সুবোধচন্দ্র সেই অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়াছিলেন। বাঙ্গালীর আশাতরু হয়ত তখনই অঙ্কুরে শুকাইয়া যাইত যদি রাজা সুবোধচন্দ্র তাহাতে তাঁহার লক্ষটাকা দানরূপ সলিল সিঞ্চন না করিতেন। রাজা সুবোধচন্দ্র প্রথমে এই লক্ষটাকা দান না করিলে নেতৃবৃন্দের ইচ্ছা কার্যে পরিণত হইত কিনা সন্দেহ এবং যাদবপুরের এই বিরাট জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠিত হইত না। ক্রমে স্যার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় তাঁহার যথাসর্বস্ব সম্পত্তি যাদবপুরের উক্ত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের হস্তে দিয়া রাজা সুবোধচন্দ্রের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছেন। এই জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় বরোদা হইতে কর্ম ত্যাগ করিয়া বাংলাদেশের জাতীয় জীবন ও জাতীয় শিক্ষার মহাশক্তি প্রবল ঝড়ের ন্যায় বাংলাদেশে ছুটিয়া আসিলেন এবং রাজা সুবোধচন্দ্রের একজন আন্তরিক বন্ধু ও সহকর্মী হইয়া একযোগে কার্য করিতে লাগিলেন। অরবিন্দ ঘোষের কর্মস্থান সেই সময়ে ছিল সুবোধচন্দ্রের ভবনে এবং তাঁহার প্রথম রাজনৈতিক জীবনের সহকর্মী ছিলেন রাজা সুবোধচন্দ্র।

১৯০৫ সন হইতে দেশসেবাই হইল রাজা সুবোধচন্দ্রের মূলমন্ত্র এবং দেশের

জন্য তিনি যথাসর্বস্ব পণ করিলেন। তিনি ধনী ছিলেন ইচ্ছা করিলে অমল ধবল দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া রাজপ্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় রাজার ন্যায় ভোগসুখে জীবন যাপন করিয়া যাইতে পারিতেন কিন্তু দেশের সেবা করিবার জন্য ভগবান যাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন সেই ভগবৎ আদিষ্ট মহাপুরুষ কি ভোগৈশ্বর্যের মধ্যে জীবনকে আবদ্ধ আবদ্ধ রাখিতে পারেন? না, তাহা পারেন না। তিনি দেশের কার্যে আপনাকে বিলাইয়া দিলেন। সুখ, ঐশ্বর্য, অবসর, আহার, নিদ্রা সব ভুলিয়া গেলেন। দেশের কার্য করা হইল তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা জীবনের—একমাত্র ব্রত।

স্বদেশী মণ্ডলী ও শিবাজী উৎসব

১৯০৫ খৃস্টাব্দে বারাণসীতে জাতীয় কংগ্রেস বসে এবং লালা লাজপৎ রায় তাঁহার বক্তৃতায় বঙ্গভঙ্গ ব্যাপারে বাঙ্গলাদেশকে বিশেষ প্রশংসা করেন। ৩রা ডিসেম্বর তারিখে ফিল্ড এণ্ড একাডেমী ক্লাবে আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও আত্মরক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা হইল এবং ১৮ই, ২১শে এবং ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে উক্ত ক্লাবে দেশের কার্য করিবার জন্য একটি সমিতির প্রতিষ্ঠার বিষয় আলোচনা হইবার পর ২৪শে তারিখে চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়ের ভবনে স্বদেশী মণ্ডলী নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হইল। উক্ত স্বদেশী মণ্ডলী শিবাজী উৎসব করিবেন স্থির করিয়া সকল উদ্যোগ করিলেন এবং জুন মাসে বঙ্গদেশবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ সখারাম গণেশ দেউস্কর এবং শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের পরিশ্রমে ফিল্ড এণ্ড একাডেমী ক্লাবের ভবনে এবং পার্শ্বের পান্তির মাঠের বৃহৎ মণ্ডপে শিবাজী উৎসব ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। বালগঙ্গাধর তিলক, গণেশ শ্রীকৃষ্ণ খাপর্দে, ডাক্তার মুঞ্জে, বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত ইত্যাদি ভারতবর্ষের বড় বড় নেতাগণ উক্ত উৎসবে যোগদান করিতে কলিকাতায় আসিয়া উৎসব সভায় বক্তৃতা দেন। সুবোধচন্দ্র এবং তাঁহার খুল্লতাত হেমচন্দ্র এই উৎসবে যথাসাধ্য সাহায্য করেন। শিবাজী উৎসবে যাঁহারা স্বেচ্ছাসেবকের কার্য করিয়াছিলেন ১১ই জুন তারিখে সুবোধচন্দ্র তাঁহাদিগকে তাঁহার ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ ভবনে একটি সম্মেলনে নিমন্ত্রণ করিয়া বিশেষ আদর-যত্ন করিয়া খাওয়াইলেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, তিলক, মহারাজ খাপার্দে, সখারাম গণেশ দেউস্কর, চিত্তরঞ্জন দাস, বিপিনচন্দ্র পাল ইত্যাদি সকল নেতৃগণ সুবোধচন্দ্রের গৃহে উক্ত সম্মেলনে যোগদান

করেন এবং তিলক ও খাপার্দে স্বেচ্ছাসেবকগণকে তাঁহাদের কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য বিশেষ প্রশংসা করেন এবং স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করেন।

বন্দেমাতরম্ সংবাদ পত্র

১লা আগস্ট ১৯০৬ তারিখ হইতে দেশপ্রাণ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয় এক জাতীয় দলের ইংরাজী দৈনিক পত্র প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইলেন কিন্তু অর্থ-সাহায্য ভিন্ন কোন কার্যই সফল হয় না। সুবোধচন্দ্র দেখিলেন জাতীয় দলের লোকমত গঠনের জন্য একখানি সংবাদপত্র বাহির করা বিশেষ প্রয়োজন। তাঁহার বন্ধু কালীঘাটের সুবিখ্যাত হরিদাস হালদার মহাশয় সহসা "সন্ধ্যা" মুদ্রা-যন্ত্র হইতে 'বন্দেমাতরম্' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া সুবোধচন্দ্রকে তাঁহার সাহায্য করিতে বলিলেন। উদারহৃদয় সুবোধচন্দ্র তাঁহার কার্যে সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। ১৯০৬ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসের প্রথমেই সুবোধচন্দ্রের গৃহে একদিবস বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী এবং হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই চারিজনকে লইয়া সম্পাদক-সঙ্ঘ গঠিত হইল এবং বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়কে প্রধান সম্পাদক বলিয়া প্রকাশ করা হইল। অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতেই নবগঠিত জাতীয় দলের মুখপত্রস্বরূপ India for Indians আদর্শলিপি মস্তকে ধারণ করিয়া 'বন্দেমাতরম্' নামে দৈনিক কাগজখানি প্রকাশিত হইল। সুবোধচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন দাস এবং রজত রায় এই তিনজনের অর্থে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮ই অক্টোবর হইতে নূতন ব্যবস্থায় সুবোধচন্দ্র তাঁহার ১২ নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ বাটীর পূর্বদিকে তাঁহারই ২।১ নং ক্রীকরোয়ের বাটীতে 'বন্দেমাতরম্' কাগজের অফিস এবং ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং সর্বভার নিজে লইয়া সর্বদা সকল বিষয় তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

সুবোধচন্দ্র এই সংবাদপত্রের জন্য অর্থ, সামাজিক সম্মান ও মূল্যবান সময়ের যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মত ধনী ও বিলাসলালিত যুবকের পক্ষে অসাধারণ। তাঁহার ত্যাগে সে অনুষ্ঠান পবিত্র হইয়াছে। সুবোধচন্দ্র উক্ত বন্দেমাতরম্ কাগজের পরিচালক মণ্ডলীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন। উক্ত পত্রে সম্পাদকীয় কলমে সুবোধচন্দ্র প্রায়ই লিখিতেন। ১৯০৭

খৃস্টাব্দে মার্চ মাসে সুবোধচন্দ্রের পত্নী মৃত্যুশয্যায়। সর্বদা বড় বড় ডাক্তার তাঁহাকে দেখিতে আসিতেছেন কিন্তু দেশসেবক মহাপুরুষ সেই প্রেমময়ী পত্নীর জন্য কাতর হইলেও নিজ কর্তব্য ভুলেন নাই। সর্বদা বন্দেমাতরম্ পত্রিকার অফিসে গিয়া সর্ববিষয় পর্যবেক্ষণ করিতেছেন এবং এমনকি রাত্রি ১টা বা ২টা অবধি পত্রিকার জন্য নানারূপ প্রবন্ধ লিখিতেছেন। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার এইরূপ অসাধারণ কর্তব্যনিষ্ঠা ও আত্মত্যাগ দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিলেন।

ক্রমে ক্রমে জাতীয় দলের মুখপত্র বন্দেমাতরম্ পত্রিকা একখানি উৎকৃষ্ট দৈনিক সংবাদপত্র লইয়া উঠিল। চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় বলিতেন বিপিন-বাবু ও অরবিন্দবাবু কি চমৎকার লিখিতে পারেন—এঁদের প্রবন্ধ এ বলে আমায় দেখ ও বলে আমায় দেখ। ১৯০৭ খৃস্টাব্দের ৭ই আগস্ট তারিখের বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় জাতীয়ভাবের প্রথম বিকাশ প্রকাশ হয়—

Nationalism means two things. (1) The self consecration to the gospel of national freedom and the practice of independence.

Let us then calculate the two—let it be the reconsecration of the whole Bengal to the new spirit and the new life, a purification of heart and mind to make it an undivided temple and the consecrated temple and habitation of the Mother. And secondly let it be a calm brave and masculine reaffii mation of our independent existence.

এই সময়ে যুগান্তর, বন্দেমাতরম্, নবশক্তি, সন্ধ্যা প্রভৃতিতে যে অগ্নিময়ী লেখা বাহির হইত তাহাতে তরুণের প্রাণ উত্তেজনায় শিহরিয়া উঠিত। প্রথম কয় মাস বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় উক্ত বন্দেমাতরম্ পত্রিকার সম্পাদক হন. পরে তিনি উক্ত পদ পরিত্যাগ করেন। অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় এই পত্রিকার জন্য কিরূপ স্বার্থত্যাগ করিয়াছেন ও প্রাণ দিয়া পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সুবোধচন্দ্র, অরবিন্দ ঘোষ এবং চিত্তরঞ্জন দাস এই তিনটি দেশপ্রাণ কর্মী এই সময়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু হইয়া সর্বদা একত্রে মিলিত হইয়া দেশের কার্য করিতেন এবং একত্রে মিলিত হইয়া সর্বদা পরামর্শ করিতেন। ইহা বলিলে মিথ্যা কথা হয় না যে সুবোধচন্দ্রের ত্যাগ ও উৎসাহের ইন্ধনই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের হৃদয়-অগ্নিকে পরে প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছিল।

ক্রমে "বন্দেমাতরম্" পত্রিকা গভর্ণমেণ্টের বিষ-নজরে পতিত হয়। ১৯০৭ খৃস্টাব্দের ২৭শে জুন তারিখে Policies for Indians এবং ২৭শে জুলাই তারিখে যুগান্তরের মোকর্দমার সম্পর্কে the Judgement Case এর বিষয় লেখার কারণ এবং যুগান্তরে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের অনুবাদ বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য কর্তৃপক্ষ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা করিতে মনস্থ করিলেন। ৩০শে জুলাই তারিখে পত্রিকার কার্যালয় খানাতল্লাস করা হয় এবং ৬ই আগস্ট তারিখে পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট বাহির হয়। ১১ই আগস্ট ১৯০৭ খৃস্টাস্টে অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় তাঁহার নামে পরোয়ানা বাহির হইয়াছে এই কথা শুনিয়া স্বয়ং গোয়েন্দা বিভাগে গিয়া আত্মসমর্পণ করেন। বঙ্গবাসী কলেজের প্রিন্সিপাল অধ্যাপক গিরিশচন্দ্র বসু এবং সুবোধচন্দ্রের ভ্রাতা নীরদচন্দ্র বসুমল্লিক মহাশয় জামিন হইয়া অরবিন্দবাবুকে খালাস করিয়া আনেন।

২৩শে আগস্ট তারিখে অরবিন্দবাবু প্রধান সম্পাদকরূপে এবং হেমেন্দ্র বাগচী ও অপূর্বকৃষ্ণ বসু ম্যানেজার ও প্রিণ্টাররূপে দণ্ডবিধির ১২৪ ক ধারা অনুসারে রাজদ্রোহ অপরাধে কলিকাতার চিফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত হয়েন। উক্ত মোকর্দমা সুবিখ্যাত ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয় পরিচালনা করিতেছিলেন এবং কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক মহাশয়ের সাক্ষ্য গ্রহণের পর সাক্ষীস্বরূপ বিপিনবাবুর তলব হয়। বিপিনবাবুর সাক্ষ্য হইলে অরবিন্দবাবু জেলে যাইবেন; পত্রিকাখানি উঠিয়া যাইবে এবং দেশ শক্তিহীন হইবে; এই আশঙ্কায় চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় বিপিনবাবুকে সাক্ষীস্বরূপ দণ্ডায়মান হইয়া হলও লইতে নিষেধ করেন। যুক্তিতর্কের দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে বিপিনবাবুর যদ্যপি জেলও হয় তাহার জন্য সমস্ত দেশ তাঁহার পক্ষে। বিপিনবাবু তখন জাতীয় দলের নেতা এবং যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার প্রভাব অসীম ছিল। বিপিনবাবু সাক্ষ্যমঞ্চে দাঁড়াইয়া সুগভীর স্বরে বলিলেন—

I have conscientious objections to take part or swear in this proceeding. I honestly believe that prosecution like Bande Mataram are calculated to stiffle freedom of thought and speech in this country and interfere with the civil advancement of the people. I have therefore conscientious

objections to take any part in such prosecutions. This is why I decline to be sworn in and co-affirmed as a witness for the prosecution in Bande Mataram case."

"এই মোকর্দ্দমার কোনরূপ সাহায্য করা, অথবা হফ গ্রহণ করা বিবেক অনুমোদিত নয় বলিয়া আমি হলফ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নই।" এই বাক্য শুনিয়া আদালতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলে নির্বাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। হাকিম, কৌন্সিলি, সরকার পক্ষের উকিল যতবার বিপিন বাবুকে হলফ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তিনি প্রতিবারেই দৃঢ়ভাবে উত্তর করিতে লাগিলেন, "I refuse to answer to any question in connection with this case."

অবশেষে পরের দিন উপস্থিত হইবার জন্য ৫০ টাকার মুচলেকা লইয়া বিপিন-বাবুকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এই দিবস পুলিস কোর্টে এত অধিক লোকের জনতা হইয়াছিল যে পুলিস প্রহার করিয়া লোক সরাইতে উদ্যত হইলে সুশীল-কুমার সেন নামক একটি যুবক ইনস্‌পেক্টর হেনরীকে আক্রমণ করিবার অপরাধে ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ড কর্তৃক পনেরটি বেত্রাঘাতে দণ্ডিত হন। এই দিবসও বিপিনবাবুর মনের কোনরূপ পরিবর্তন না হওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেট দণ্ডবিধি আইনের ১৭৮ ধারা ও ১৭৯ ধারা অনুসারে বিপিনবাবুকে অভিযুক্ত করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট রামানুগ্রহ নারায়ণ সিংহের এজলাসে মোকর্দমা পাঠাইয়া দেন। এই মোকর্দমার দণ্ড সুনিশ্চিত, কাহারও সাধ্য নাই বিপিনবাবুকে রক্ষা করে কিন্তু আদালতে চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় বিপিনবাবুর পক্ষে যে মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন, তাহাতে সমগ্র জনতা এমনকি হাকিম কৌন্সিলিও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই এবং মনে হইয়াছিল অনন্যোপায় হইয়াই ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে হাকিম বিপিন-বাবুকে ছয় মাসের জন্য বিনাশ্রমে শাস্তি প্রদান করেন।

২৩শে সেপ্টেম্বর সোমবারে বন্দেমাতরম্ পত্রিকার বিরুদ্ধে রায় প্রকাশ হয়। অরবিন্দবাবু খালাস পান। মুদ্রাকর অপূর্বের তিন মাস সশ্রম কারাবাসের আদেশ হয়। রায়ে ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন, বন্দেমাতরম্ সর্বদাই রাজদ্রোহের উত্তেজক নহে not habitually seditious.

অরবিন্দবাবু রাজদ্রোহ অপরাধে বন্দেমাতরম্ মামলায় অভিযুক্ত হইলে শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী এবং সুবোধচন্দ্র চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয়কে বলেন, "আপনি সম্পাদনার ভার গ্রহণ করুন।" চিত্তরঞ্জনবাবু বলিলেন, "আমাকে যদি ৩০০০

টাকা মাসে দিতে পারেন, তাহলে আমি editor (সম্পাদক) হতে পারি। নতুবা বাড়ীর খরচ চলবে কি করে ?" সত্যই সে সময় তাঁহার অর্থাভাব খুব বেশী ছিল কারণ তিনি তখনও পিতৃঋণ শোধ করিতে পারেন নাই। চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় প্রধান সম্পাদকের ভার গ্রহণ না করিলেও এই বন্দেমাতরম্ পত্রিকার জন্য তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করিতে কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার লিখিত বহু প্রবন্ধ উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

উক্ত মামলার পরও সুবোধচন্দ্রের অক্লান্ত যত্নে বন্দেমাতরম্ পত্রিকা বাহির হইতে থাকে এবং পরপর চারিবার উক্ত পত্রিকা আফিস খানাতল্লাস করা হয়। ১৯০৮ খৃস্টাব্দের মধ্যভাগে সুবোধচন্দ্র কয় দিবসের জন্য বিশ্রাম করিতে কাশীধামে যান। ১০ই মে তারিখে সুবোধচন্দ্রের কাশীধামের ও কলিকাতার ভবন খানাতল্লাসি হয়। সেই সময় বন্দেমাতরম্ কার্যালয়েও খানাতল্লাসি হয়। ৪ঠা জুন তারিখে পুনরায় পুলিস সুবোধচন্দ্রের কলিকাতার ভবন খানাতল্লাসি করে।

অক্টোবর মাসের প্রথমে পুলিস কমিসনার বন্দেমাতরম্ পত্রিকার উপর নোটিশ জারি করিলেন যে, 'জেলে নরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর হত্যা' সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধের জন্য পত্রিকার ছাপাখানা কেন বাজেয়াপ্ত হইবে না তাহার কারণ ৩০শে অক্টোবর ১৯০৮ তারিখে দর্শাইতে হইবে এবং ইহাতেই বন্দেমাতরম্ পত্রিকার ছাপাখানা গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা হয়।

সুবোধচন্দ্র ১৯০৪ খৃস্টাব্দ হইতে জাতীয় কংগ্রেসের একজন কর্মী হন এবং ১৯০৫ খৃস্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেস বসিলে তিনি তাহার বিশেষ সাহায্য করেন। ১৯০৬ খৃস্টাব্দে সুবোধচন্দ্র ডেলিগেট নির্বাচিত হইয়া বঙ্গদেশ হইতে অন্যান্য নেতাগণের সহিত সুরাট কংগ্রেসে যোগদান করিতে যান।

সুবোধচন্দ্র প্লাট্‌ফরমে দাঁড়াইয়া দীর্ঘ বক্তৃতা দিতে ভালবাসিতেন না এবং মিথ্যা হৈ-চৈ করিয়া সভাসমিতিতে গিয়া নাম কিনিতে চাহিতেন না। তিনি ছিলেন কর্মীপুরুষ। নীরবে কার্য করিয়া যাইতে ভালবাসিতেন। তিনি তিনি নিজের সুখ, ঐশ্বর্য এবং বিশ্রাম ভুলিয়া দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, অরবিন্দ ঘোষ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ইত্যাদি কয়জন দেশপ্রাণ কর্মীর সঙ্গে, ঢাকা, রংপুর বরিশাল, ময়মনসিং ইত্যাদি জেলায় গিয়া জাতীয় আন্দোলন, শিল্প ও শিক্ষা-বিস্তারের জন্য জনসাধারণকে উৎসাহিত করিয়া আসেন। দেশের কার্য করিতে ত্যাগী সুবোধচন্দ্র কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না।

বরিশাল কন্‌ফারেন্স—১৯০৬ খৃস্টাব্দে এপ্রিল মাসের প্রথমে বরিশালে

বঙ্গীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। মহম্মদ আবদুল রসুল সাহেব উক্ত কনফারেন্সের সভাপতি নির্বাচিত হন। সুবোধচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অরবিন্দ ঘোষ ইত্যাদি নেতাগণের সহিত উক্ত কনফারেন্সে যোগদান করিতে বরিশালে যান। পুলিশ উক্ত কনফারেন্স ভাঙ্গিয়া দেন এবং উক্ত স্থানে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু ইত্যাদির মত কয়জন নেতা লাঞ্ছিত হন। এমনকি কনফারেন্স জোরপূর্বক ভঙ্গ করার সময় কয়জন নেতা এবং বহু বালক বিশেষভাবে প্রহার খান। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কনফারেন্স ভঙ্গের জন্য তথায় প্রতিবাদ করায় পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট এমারসনের নিকট লইয়া যায় এবং তাঁহার জরিমানা হয়। এই অনাচারের পর বরিশালেই ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন, "আজ ইংরাজ রাজত্বের শেষ হইল।"

সমগ্র বঙ্গদেশে বরিশাল কন্‌ফারেন্স ভঙ্গের পর হইতে স্বদেশী আন্দোলন ভীষণ আকার ধারণ করে। সুবোধচন্দ্র বরিশাল কনফারেন্স ভঙ্গ হইলে পর তথা হইতে পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া নানা সভায় জাতীয় শিক্ষা বিস্তারের এবং বিদেশী বর্জনের জন্য দেশবাসীকে উপদেশদানে উৎসাহিত করেন। তৎসময়ে সুবোধচন্দ্র ছাত্রসমাজের মধ্যে দেবতুল্য সম্মান অর্জন করেন।

রাজবন্দী—১৯০৮ খৃস্টাব্দের শেষভাগে সুবোধচন্দ্র স্বাস্থ্যলাভের জন্য কাশীধামে সপরিবারে গিয়া বাস করিতেছিলেন। ১৩ই অক্টোবর ১৯০৮ খৃস্টাব্দে পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সাহেব মিলিটারী পুলিশ লইয়া তাঁহার কাশীধামের বাংলোয় আসিয়া ১৮১৮ খৃস্টাব্দের ৩নং রেগুলেসনে সুবোধচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যান। গবর্ণমেণ্ট প্রথমে তাঁহাকে বেরিলি জেলে রাখেন এবং পরে আলমোড়ায় নজরবন্দী করিয়া রাখেন। সুবোধচন্দ্রকে বিশেষ যত্নের সহিতই আটক করিয়া রাখা হয় এবং তাঁহার একজন পুরাতন খানসামাকে তাঁহার সহিত থাকিতে দেওয়া হয়। সেই একই দিবসে সুবোধচন্দ্রকে গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে বরিশাল অশ্বিনীকুমার দত্ত, কলিকাতার কৃষ্ণকুমার মিত্র, পণ্ডিত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, পুলিনচন্দ্র দাস, ভূপেন্দ্রনাথ নাগ এবং মনোরঞ্জন গুহ এই নয়জনকেই উক্ত ১৮১৮ খৃস্টাব্দের তিন নম্বর রেগুলেসন বলে ভারত গভর্ণমেণ্ট গ্রেপ্তার করিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখেন। উক্ত নয়জন নেতৃবৃন্দকে কি দোষে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল তাহার বিষয় অদ্যাবধি কেহ জানিতে পারে নাই। সুবোধচন্দ্রকে চৌদ্দ মাস আটক রাখিয়া ১০ই

ফেব্রুয়ারী ১৯১০ তারিখে গভর্ণমেণ্ট আলমোড়া হইতে ছাড়িয়া দেন।

নির্বাসন দণ্ড ভোগ করিয়াও সুবোধচন্দ্রের দুর্দমনীয় দেশসেবার স্পৃহা কিছু মাত্রায় কমে নাই। তেজস্বী সুবোধচন্দ্র দেশসেবার কার্য হইতে বিরত হইলেন না। তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে হৈ-চৈ না করিয়া দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি এবং দেশবাসীকে শিল্পাদি শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন নানা বিদেশী আসিয়া নানারূপ ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া দেশের অর্থ লইয়া যাইতেছে এবং সকল বড় বড় ব্যবসা বিদেশীয় বণিকগণের হস্তে রহিয়াছে। দেশের লোক নানারূপ ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া দেশের টাকা ঘরে রাখিতে না পারিলে দেশ দরিদ্র হইয়া যাইবে।

সুবোধচন্দ্র দেখিলেন বিদেশীয় বণিকগণ অতি সামান্য মূলধন লইয়া ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা ইত্যাদির কার্যালয় স্থাপন করিয়া দেশীয় লোকদের নিকট হইতে জমার টাকায় বহুরূপ কারবার করিয়া বহুটাকা অর্জন করিয়া বিদেশে লইয়া যাইতেছে। দেশবাসীরা স্বদেশীয় কোন ব্যাঙ্ক বা জীবনবীমার কোন আফিস না থাকায় বিদেশীদিগের ব্যাঙ্কে টাকা রাখে এবং বিদেশীয় জীবনবীমা কোম্পানীতে নিজেদের জীবনবীমা করিয়া বিদেশীয়গণকে বহুটাকা দিতেছে। দেশের লোক নিজেরা ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশবাসীর টাকা দেশীয় শিল্পাদি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে নিয়োগ করিলে দেশের নানারূপে উপকার হয়।

১৯১২ খৃস্টাব্দে সুবোধচন্দ্র Reid & Co রিড এণ্ড কোম্পানি লিমিটেড নাম দিয়া একটি বড় যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠা করিলেন। পটলডাঙ্গার বসুমল্লিক বংশের সৌভাগ্যলক্ষ্মী হুগলীর ডক্ সুবোধচন্দ্রের প্রপিতামহ রাধানাথ বসুমল্লিক মহাশয় মিস্টার রিড নামক সাহেবের সহযোগে প্রতিষ্ঠা করিয়া অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর হন। সে কারণে সুবোধচন্দ্র উক্ত রিড সাহেবের নাম দিয়াই ব্যবসার সূত্রপাত করেন। তিনি নিজে বহুটাকা দিয়া এবং কয়েকটি সম্ভ্রান্ত অংশীদারের সহযোগে ডালহৌসি স্কোয়ারে একটি বড় আফিস প্রতিষ্ঠা করেন। নিজে প্রত্যহ গিয়া, উক্ত আফিসের সকল কার্যাদি দেখিতেন। কয় বৎসর আফিসের কার্য বেশ ভালরূপে চলে এবং বিদেশীয় কয়েকটি ব্যাঙ্কের সঙ্গে লেন-দেন হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য কয়েকটি ছোট ব্যাঙ্কও উক্ত ব্যাঙ্ককে তাহাদের কলিকাতার এজেণ্ট নিযুক্ত করেন কিন্তু কয় বৎসর কারবার চলিবার পর দেখা যায় দয়ার্দ্র-হৃদয় সুবোধচন্দ্রের অনেক বন্ধু ও আত্মীয়বর্গ তাঁহার ব্যাঙ্ক হইতে অনেক টাকা কর্জ লইয়া আর পরিশোধ করেন নাই। তিনি ১৯১৬ খৃস্টাব্দে সকলের ন্যায্য

পাওনার টাকা পরিশোধ করিয়া ব্যাঙ্কের কারবার বন্ধ করিয়া দেন কিন্তু ঐ সঙ্গে লাইট অফ এশিয়া নামে যে জীবনবীমার কার্যের আফিস প্রতিষ্ঠা করেন তাহা সুন্দরভাবে এখনও চলিতেছে।

১৯১২ খৃস্টাব্দে Light of Asia Insurance Company Limited নাম দিয়া একটি জীবনবীমার আফিস প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত বীমা কোম্পানীর কুচবিহারের স্বাধীন নৃপতি মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর সদস্য, এবং কুচবিহারের প্রিন্স ভিক্টরনারায়ণ, প্রিয়নাথ ঘোষ, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, অটল-কুমার সেন এবং নীরদচন্দ্র মল্লিক মহাশয় ডাইরেকটর হন এবং রিড এণ্ড কোম্পানি লিমিটেড উক্ত জীবনবীমা কোম্পানীর ম্যানেজিং এজেণ্ট হন। ১৯১২ খৃস্টাব্দের ভারতবর্ষের জীবনবীমা কোম্পানির আইনমতে এই কোম্পানি সর্বপ্রথম রেজেস্ট্রী করা হয় এবং উক্ত আইনমতে গবর্ণমেণ্টের নিকট মোটা টাকা গচ্ছিত রাখিতে হয়। এই দেশীয় প্রথম জীবনবীমা কোম্পানি সুন্দর-ভাবেই সুবোধচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়া দেশে সুনাম অর্জন করে এবং অদ্যাবধি ৫ ও ৬নং ডালহৌসি স্কোয়ারের ষ্টিফেন্স বিল্ডিংএ উক্ত জীবনবীমা কোম্পানির কার্য সুন্দরভাবে চলিতেছে এবং সেই মহাপুরুষের কীর্তি ঘোষণা করিতেছে।

১৩৪০ সনে কাগজে বিজ্ঞাপন

"লাইট্‌ অফ্‌ এশিয়া ইন্‌সিওরেন্স্‌ কোম্পানি লিমিটেড্‌" স্বদেশী যুগের দানবীর সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিকের পরিকল্পিত দেশ ও দশের সেবাপ্রতিষ্ঠানগুলির অন্যতম নিদর্শন। রাজা সুবোধচন্দ্র যেমন একদিকে বাঙ্গালীর শিক্ষাবিস্তারের জন্য অর্থ দান করিয়া "কলেজ অফ্‌ ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড টেক্নলজি, যাদবপুর" এর ভিত্তি স্থাপন করিয়া বাঙ্গালায় কারুশিল্প গঠনপ্রচেষ্টায় পুরোবর্ত্তী হইয়াছিলেন, তেমনি অপর দিকে ১৯১৩ সালে উক্ত ইন্‌সিওরেন্স্‌ কোম্পানীর পত্তন করিয়া তিনি বঙ্গবাসী জনসাধারণের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি ও সঞ্চয় প্রবৃত্তিকেও জাগাইবার সহায়তা করিয়া গিয়াছেন।

তেইশ বৎসর পূর্বে যাহা তাঁহার স্বপ্নের বিষয় ছিল, আজ তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে, বাঙ্গালী মাত্রেই এখন বুঝে যে অদৃষ্টের উৎপীড়ন বীমার দ্বারা সহজেই নিবারিত হইতে পারে। সুতরাং রাজা সুবোধচন্দ্রের স্বকীয় প্রতিষ্ঠানটির

প্রতি আমরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি ; আমাদের আশা যে, এই কোম্পানীতে জীবনবীমা করিয়া এবং কোম্পানীর জীবনবীমা কার্য্যের সহায় হইয়া বাঙ্গালী সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার স্মৃতিতর্পণ করিবে।

আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম যে লাইট্ অফ্ এশিয়ার ডিরেক্টরগণ সুবোধচন্দ্রের পদানুসরণে উক্ত কোম্পানীর পরিচালনা বিনা পারিতোষিকেই করিয়া আসিতেছেন। কোম্পানীর কোন ম্যানেজিং এজেণ্ট নাই, এমন-কি উহাতে সেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থও গৌণ, উহার প্রধান চেষ্টা বীমাকারীদিগের সেবা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায়
শ্রীশরৎচন্দ্র বসু	(মহারাজা, নাটোর)
শ্রীবিজয়কুমার বসু	শ্রীনির্মলচন্দ্র চন্দ্র
শ্রীসুন্দরীমোহন দাস	শ্রীতুলসীচন্দ্র গোস্বামী

সুবোধচন্দ্রের অধ্যয়নস্পৃহা অতিরিক্ত ছিল। তিনি নানাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক নানারূপ পুস্তক সর্বদা অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার মত ইংরাজীতে কথা কহিতে ও লিখিতে অল্প লোকেই পারিত। বন্দেমাতরম্ পত্রিকা এবং অন্যান্য পত্রিকায় তাঁহার অনেক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তবে কখনও তিনি তাহাতে নিজের নাম প্রকাশ করিতেন না। কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ ছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এবং সুবোধচন্দ্র দুইজনে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং ১৯০৩ খৃস্টাব্দে সুবোধচন্দ্র বিলাত হইতে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসার পর হইতে উভয়ে একত্রে বহুসময় অতিবাহিত করিয়াছেন এবং নানা বিষয়ে পরামর্শ করিয়া কার্য করিয়াছেন। দেশবন্ধু পরে পরমবন্ধু সুবোধচন্দ্রের পদানুসরণে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া দেশের কার্যে আত্মাহুতি দেন এবং ত্যাগব্রত গ্রহণ করেন। দেশমান্য তিলক মহারাজ সুবোধচন্দ্রের সহিত নানারূপ দেশহিতকর কার্যের পরামর্শ করিতেন। ১৯০৫ খৃস্টাব্দের জাতীয় আন্দোলনের সময় হইতে বহু দরিদ্র দেশসেবারত বালক সুবোধচন্দ্রের গৃহে থাকিয়া ভরণপোষণ ও শিক্ষার খরচ পাইয়াছে। বহু দেশহিতকর কার্যে রত বাঙ্গালীকে সুবোধচন্দ্র অকাতরে অর্থ সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। সুবোধচন্দ্রের নিকট কোন দেশহিতকর অনুষ্ঠানের জন্য সাহায্য ভিক্ষা করিতে গিয়া কোন ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হইয়া কখনও ফিরিয়া আসে নাই।

উচ্চহৃদয়ের সুবোধচন্দ্র কপটতা কাহাকে বলে জানিতেন না, মিথ্যা কথাকে

আন্তরিক ঘৃণা করিতেন। অকপট সত্য কথা কহিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। উচ্চ বা নীচ, ধনী বা দরিদ্র সকলের সহিত একভাবে আলাপ করিতেন এবং সকলকে এক চক্ষে দেখিতেন। সুবোধচন্দ্রের হিন্দুধর্মে সম্পূর্ণ আস্থা ছিল। হিন্দুশাস্ত্রে তাঁহার আন্তরিক বিশ্বাস ছিল। তাঁহার আলয়ে প্রতি সন্ধ্যায় গৃহদেবতার পূজা হইত এবং বংশের গুরু, পুরোহিত ইত্যাদি ব্রাহ্মণগণ তাঁহার নিকট হইতে যথোচিত মর্যাদা পাইতেন। তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষ মহারাজ পুরন্দর খাঁন নামক মহাপুরুষের বংশধর এবং পটলডাঙ্গা বসু-মল্লিক বংশের ২০শে পর্যায়ের জ্যেষ্ঠ সন্তান হইয়া মুখ্য কুলীন ছিলেন এবং তাঁহার প্রাচীন বংশমর্যাদা যথাযথ পালন করিয়া গিয়াছেন।

বন্দেমাতরম্ পত্রিকার পরিচালনায় ভার গ্রহণ করিয়া সুবোধচন্দ্র কিরূপ ক্ষতি ও অর্থব্যয় এবং পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন তাঁহার সহকর্মী অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাস, হরিদাস হালদার প্রভৃতি মহাশয়গণ যখন সে কথা বলিতেন তখন তাঁহাদের হৃদয় আনন্দ ও গর্বে পূর্ণ হইত। সুবোধচন্দ্রের স্বার্থত্যাগ, একনিষ্ঠ দেশসেবার জন্য যে ত্যাগস্বীকার ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন সেরূপ স্বার্থত্যাগ অন্য কোন দেশসেবকের মধ্যে এযাবৎ দেখা যায় নাই। সেই সময়ের সকল বড় বড় নেতাই সুবোধচন্দ্রের চরিত্র মুনি ঋষিগণের চরিত্রের ন্যায় বর্ণনা করেন। ১৯০৭ খৃস্টাব্দে তাঁহার স্নেহময়ী পত্নী রোগে কয় মাস মৃত্যুশয্যায় থাকিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন, আত্মীয়স্বজন সকলেই তাঁহার বন্দেমাতরম্ পত্রিকা এবং দেশের কার্যে এইরূপ অকাতরে অর্থব্যয় এবং শরীর ক্ষয় করিতে দেখিয়া তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন কিন্তু দেশপ্রাণ সুবোধচন্দ্রের সেদিকে দৃক্‌পাত ছিল না। তিনি জাতীয় কার্যে অকাতরে অর্থব্যয় এবং সকল কার্য ভুলিয়া দেশের সেবায় সময় ব্যয় করিতে লাগিলেন। মাতৃভক্ত পুত্র সুবোধচন্দ্র মার সেবায় দেহ মন সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া তাহার পুরস্কার পাইলেন কারাগার। কারাগাররূপ নির্বাসনকে সুবোধচন্দ্র পুরস্কার পাইয়াও দমিয়া যান নাই। কিসে বাঙ্গালী জাতি মানুষ ও বড় হয় তাহাই ছিল তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা। দেশের কল্যাণের জন্য তাঁহাকে ধীরে ধীরে অকাতরে কত ত্যাগস্বীকার ও কঠোরতা সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা লেখনী বর্ণনা করিতে অক্ষম। তাঁহার স্বভাব ছিল বড়ই মধুর এবং শত্রু বলিয়া তাঁহার কোন লোক ছিল না। সুবোধচন্দ্র জীবনে কখনও কাহারও কোনরূপ অনিষ্ট করেন নাই। তিনি গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষে অনেক সময় মত প্রকাশ করিলেও ইংরাজদের তিনি

ভালবাসিতেন। তাঁহার বহু ইংরাজ বন্ধু ছিল। তিনি বিপ্লবী দলের লোক ছিলেন না। সুবোধচন্দ্র ছিলেন নীরব কর্মী—কার্য করিয়া গিয়াছেন। প্লাটফর্মে গিয়া বসিয়া বড় বড় বক্তৃতা দিয়া তিনি দেশ উদ্ধার করিতে বা নিজের নাম কিনিতে কখনও চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার আদর্শ, স্বার্থত্যাগ। অলৌকিক আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব তাঁহার কার্যকুশলতায় সম্যক প্রকাশ পাইয়াছে। দেশের মঙ্গলের জন্য সুবোধচন্দ্র তাঁহার ধনসম্পত্তি, এমনকি নিজের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পর্যন্ত দান করিয়াছিলেন। তিনি সেই সময়ে দেশের প্রচলিত শিক্ষার ব্যর্থতা বুঝিতে পারিয়াই জাতীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপন করিয়া তিনি দেশকে যে মর্যাদা দান করিয়াছেন, তাহা অনুভব করিবার জিনিষ। বাংলার জাতীয় আন্দোলনের প্রথম যুগের একমাত্র স্থায়ী ফল যাদবপুরের জাতীয় শিক্ষা পরিষদ এবং ইহাই সুবোধচন্দ্রের অক্ষয় কীর্তি। আজ যাদবপুরে যে কেবল বাঙ্গালা দেশের ন্যায় সমুদয় ভারত-বর্ষের সকল ভারতবাসীর মহাগৌরবের স্বদেশী প্রতিষ্ঠান জাতীয় শিক্ষা পরিষদ দেশীয় লোকের দ্বারা পরিচালিত হইয়া সহস্র সহস্র ভারতবাসীকে নানারূপ শিক্ষা দিতেছে, সেই প্রতিষ্ঠানের প্রথম এবং প্রধান উদ্যোগী ছিলেন রাজা সুবোধচন্দ্র। তিনি মনেপ্রাণে এই প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা না করিলে আজ ইহা কখনও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইত না। তিনি স্বইচ্ছায় নিজ সম্পত্তি হইতে লক্ষ টাকা দান করিয়া ইহার সুদৃঢ় ভিত্তি করিয়া দিয়া গিয়াছেন। উক্ত যাদবপুরের জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনোলজী বিভাগে মেক্যানিকেল, ইলেকট্রিকেল ও কেমিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ান হয়।

রাজা সুবোধচন্দ্রের লক্ষ টাকা দানের পর উক্ত পরিষদে ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পাঁচ লক্ষ টাকা, মহারাজ শশিকান্ত আচার্য চৌধুরী বাহাদুর আড়াই লক্ষ টাকা, ভবানীপুরের গোপালচন্দ্র সিংহ একলক্ষ টাকা, স্বর্গীয় দুর্গাদাস বসু ২৫০০০ টাকা এবং অন্যান্য দাতাগণ ভিন্ন স্যার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় তাঁহার বহুলক্ষ টাকার সম্পত্তি এই প্রতিষ্ঠানে দান করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতার কর্পোরেসন্ উক্ত কলেজের সংলগ্ন ৯২ বিঘা জমি বার্ষিক ২০০ মাত্র জমায় ৯৯ বৎসরের জন্য দিয়াছেন, যে জমিতে কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক আয় এখন প্রায় আড়াই হইতে তিন লক্ষ টাকা এবং প্রতি বৎসর ৫০০ হইতে ৮০০ ছাত্র নানারূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া নিজেদের ও দেশের নানারূপ অর্থকরী কার্যে লিপ্ত হইতেছে। সকল দেশবাসীর এই পুণ্যক্ষেত্রে

গিয়া দেখা এবং সাহায্য করা কর্তব্য।

স্বনামধন্য রাজা সুবোধচন্দ্র গুরুজনদিগকে যথোচিত ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন এবং জ্ঞাতি কুটুম্বগণকে যথোচিত ভালবাসিতেন। যাহাকে যেরূপ সম্মান দেওয়া উচিত তিনি কখনও তাহা দানে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি তাঁহার খুল্লতাত হেমচন্দ্রের সহিত একান্নবর্তী পরিবারে বাস করিতেন এবং উক্ত খুল্লতাতকে তিনি পিতৃবৎ মান্য করিতেন এবং সকল কার্যেই পিতৃব্যের পরামর্শ অনুসারে চলিতেন। ১৯০৬ খৃস্টাব্দে উক্ত খুল্লতাতের পুরীধামে রোগ বৃদ্ধির সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ পুরীধামে গিয়া তাঁহার শেষ কার্যে যোগদান করেন।

রাজা সুবোধচন্দ্র স্বর্গীয় পিতা এবং পিতৃব্যের স্মৃতি রক্ষার জন্য উক্ত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের হস্তে একটি পৃথক ধন-ভাণ্ডারে বহু অর্থ দিয়া "প্রবোধচন্দ্র বসু-মল্লিক বৃত্তি" এবং "হেমচন্দ্র বসুমল্লিক বৃত্তি" নামে দুইটি বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দেন। উক্ত বৃত্তির অর্থে প্রতিবৎসর একজন করিয়া অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া সাহিত্য বিজ্ঞান ও হিন্দুদর্শন ইত্যাদি সম্বন্ধে দেশবাসীর নিকট বিশেষ গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা দিবেন এবং উক্ত বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। এখনও নিয়মিতভাবে উক্ত অর্থে প্রতিবৎসর অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া নানা বিষয়ে গবেষণাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়া থাকেন। ৩১শে ভাদ্র ১৩১৮ তারিখে হেমচন্দ্র বসু-মল্লিক বৃত্তির অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম. এ. রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ স্কলার মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অধিবেশনে "মালদহের রাধেশচন্দ্র" নামে একটি সাহিত্যের প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত কালিদাস গুপ্ত এম. এ. মহাশয় "হিন্দু সমাজ বিজ্ঞান" নামে প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত প্রবন্ধ সকল পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া মূল্যবান গ্রন্থাদির মধ্যে স্থান পাইতেছে। সুবোধচন্দ্র আজীবন বৃদ্ধা মাতাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া প্রকৃত মাতৃভক্ত পুত্রের ন্যায় সেবা করিয়া গিয়াছেন। বৈদ্যনাথ, কাশীধাম, দার্জিলিং পাহাড় ইত্যাদি যেখানে তিনি গিয়াছেন তথায়ই মাতাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াছেন।

তেজস্বী সুবোধচন্দ্র কখনও কাহাকেও ভয় করিতেন না। সারাজীবন তিনি সমানভাবে স্বীয় মানসম্ভ্রম ও পতিপ্রত্তি সম্যকভাবে বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। একটি ঘটনা হইতেই তাঁহার তেজস্বিতা সম্যক প্রকাশ পায়। তাঁহার ২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ ভবনে আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটের প্রথম সভাপতি জর্জ ওয়াশিংটনের সুবিখ্যাত তৈলচিত্রখানি দেখিতে বহু বড় বড় সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও আমেরিকান প্রায় আসিতেন এবং তিনি মহাসমাদরে সকলকেই তাহা

দেখাইতেন। বাংলার তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গবর্ণর স্যার এণ্ড্রু ইলফ্রেজার এক দিবস তাঁহার ভবনে উক্ত তৈলচিত্রখানি দেখিতে আসেন। যে সময় তৎকালীন সর্ব ক্ষমতাশালী রাজপ্রতিনিধি বঙ্গেশ্বর উক্ত তৈলচিত্রখানি দেখিতে আসেন সেই সময় সুবোধচন্দ্র যাহাতে গভর্ণরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ না হয় সেই উদ্দেশ্যে পার্শ্বের বাটীতে গিয়া অবস্থান করেন এবং গবর্ণরকে সম্যক অভ্যর্থনা করিবার ভার নিজ ভ্রাতা নীরদচন্দ্রের উপর দিয়া ও উপযুক্ত সকল ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া দেন। ইহাতে সকলেই অবাক হইয়া যান এবং তাঁহাকে এরূপ অন্যায় আচরণ করিবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করিলে সুবোধচন্দ্র বলেন, "স্যার এণ্ড্রু লফ্রেজার সাহেব আমার ন্যায় নগণ্য লোকের ভবনে এসেছিলেন ক্ষমতাশালী রাজপ্রতিনিধিরূপে এবং এসেছিলেন তৈলচিত্রটি মাত্র দেখিতে। তিনি যদ্যপি সামান্য অভ্যাগতের মত আসিতেন এবং আমার সহিত দেখা করিতে চাহিতেন তাহা হইলে আমি স্বয়ং তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও আলাপ করিয়া সম্মানিত করিতাম কিন্তু তিনি আমার সহিত দেখা করিতে আসেন নাই বা সাধারণ বন্ধুভাবে আমার সহিত পরিচিত হইতে বা দেখা করিতে চাহেন নাই—তখন আমি সামান্য লোক কেন নিজেকে নীচু করিয়া যেচে গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিব।" কি নির্ভীক তীব্রকঠোর ও তেজস্বী পুরুষসিংহ। ইহাই তাঁহার চরিত্র। তিনি নিজ সম্মান রাখিতে জানিতেন। মহৎ বংশে তাঁহার জন্ম, চিরজীবন নিজ বংশমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি যাহা কর্তব্য বুঝিতেন তাহা সাধন করিতে কোন কিছুই ভয় করিতেন না।

সুবোধচন্দ্রের দেহ সুন্দর রাজপুত্রের ন্যায় ছিল। তাঁহার শান্তিপূর্ণ সৌম্য ও বলিষ্ঠ মূর্তি এবং অমায়িক মধুর মুখের ভাব যে দেখিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে। স্বাস্থ্য তাঁহার সারাজীবন অত্যন্ত সুন্দর ছিল এবং তিনি জীবনে কখনও কোন কঠিন রোগে ভোগেন নাই। তাঁহার কর্মঠ ও শ্রমশীল দেহের গঠন ঠিক রাজপুত রাজাদের ন্যায় ছিল। তাঁহাকে তাঁহার আত্মীয়স্বজন শৈশব হইতে "মদন" বলিয়া ডাকিত এবং বাটীতে তাঁহার নাম মদন ছিল। সত্যই তাঁহার দেহাকৃতি মদনের সমতুল্য ছিল। তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবদের নিকট তাঁহার একটি ইংরাজী ডাকনাম ছিল "বোকো"।

সুবোধচন্দ্রের সহিত তাঁহার আত্মীয়স্বজনের কিরূপ ভালবাসা ছিল তাহা তাঁহার খুড়তুত ভ্রাতাকে স্বহস্তে লিখিত পত্র হইতে বেশ প্রকাশ পায়—

"কল্যাণবরেষু

দেবেন, তোমার কাশী যাবার কথা লিখেছিলে ও বোধ হয় সেখানে গিয়াছ। সেইজন্য আর কলিকাতায় তোমাকে পত্র দিলাম না তোমাদের বাড়ির নম্বর ও ঠিকানা জানিনা তাই ছোট ঠাকুরমার কাছে এই পত্র পাঠাইলাম তোমাকে দেবার জন্য। তুমি মেজকাকিমাকে আমার বিজয়ার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাইবে ও তোমরা আমার ভালবাসা ও আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে।

তোমরা কে কে ওখানে গেছ আর সকলে কেমন আছে জানাইও। তুমি যে তোমার ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ মনে করে পূজার খাবার পাঠাইয়াছ তাহার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিও। তোমাদের কুশল সংবাদ দানে আমাকে সুখী করো, ইতি—

তোমার—

মদন দাদা।

উক্ত পত্রখানি মহৎহৃদয় সুবোধচন্দ্র ১৩০৭ সনের কার্তিক মাসে তাঁহার স্বর্গারোহণের ১৫ দিবস পূর্বে তাঁহার খুল্লতাত পুত্র দেবেন্দ্রচন্দ্রকে দার্জিলিং পাহাড় হইতে ৺কাশীধামে লিখিয়াছিলেন। দেবেন্দ্র সুবোধচন্দ্রের অপেক্ষা ২২ বৎসরের কনিষ্ঠ কিন্তু সুবোধচন্দ্র তাঁহার সকল আত্মীয়কেই স্নেহ ও ভালবাসায় মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার কোন জ্ঞাতি-কুটুম্বের কোনরূপ মনোমালিন্য কখনও দেখা যায় নাই। তিনি দেশের কার্যে আত্মবলি দিয়াও আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবগণের প্রতি যথোচিত কর্তব্য কখনও ভুলেন নাই। বৈদ্যনাথধামে তাঁহার পিতৃব্য চারুচন্দ্রের ৪ঠা জুন ১৯১৬ খৃস্টাব্দে স্বর্গারোহণ করিবার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে সে সুন্দর পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহা হইতেই তাঁহার বংশের সকলের নাম উজ্জ্বল রাখিতে তিনি কিরূপ চেষ্টা করিতেন তাহার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়।

Deoghar

9-6-16

My dear cousin.

The news of our our uncle's sad demise came rather suddenly though no quite unexpectedly. In losing him, the

whole family truly lost its head. He perhaps was the last of the gaints of our family and maintained for it a name and a distinction. With him its influence will be gone. We are an unfortunate family. May the souls of these departed by their good wishes, blsssings from the other world help and uplift us To you especially the shock will be great but he has left behind for your guidance his life long example. He was a model of domesticity and the incarnation of those virtues which keeps family together and their influence and power intact.

Our saintly aunt though heart broken will remain to shed her benign influence for good of us all.

yours in grief
Subodh.

উক্ত জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যের প্রতি তাঁহার ভক্তি এত ছিল যে তিনি পিতৃব্যের শেষ কার্যে তত্ত্বাবধানের জন্য দেওঘর হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং যথোচিত হিন্দুমতে অশৌচাদি গ্রহণ করিয়া এবং তাঁহার শ্রাদ্ধকর্ম সুসম্পন্ন করাইয়া দেওঘরে চলিয়া যান।

বিবাহ—সুবোধচন্দ্র ২৬শে নবেম্বর ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে নরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী প্রকাশিনীকে নিজ কুলমর্যাদা রক্ষা করিয়া বিবাহ করেন। এই বিবাহে বিশেষরূপ ঘটা হয় এবং বিবাহের পর কয় দিবস ধরিয়া নানারূপ নাচ, গান, থিয়েটার ও যাত্রা ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদে ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ বাসভবন তাঁহার সকল আত্মীয়স্বজন ও কলিকাতার সকল সম্রান্ত লোকের আগমনে অতুল উৎসবে উদ্দীপ্ত হয়।

প্রথমা পত্নী পতিগতপ্রাণা সাধ্বী প্রকাশিনী, চারটি কন্যা সুপ্রভা, সুচন্দ্রা, সরমা এবং সুষমাকে রাখিয়া অল্প কয়েক দিবস মাত্র জ্বরে ভুগিয়া ১২ই মার্চ ১৯০৯ খৃস্টাব্দে অসময়ে স্বামীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া স্বর্গালোকে চলিয়া যান।

প্রথমা স্ত্রীর স্বর্গারোহণের প্রায় চারি বৎসর বাদে আত্মীয়স্বজনের বিশেষ অনুরোধে ২৬শে জুন ১৯১০ খৃস্টাব্দে সুবোধচন্দ্র মজিলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের কন্যা এবং নড়াইলের জমিদার যোগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের দৌহিত্রী শ্রীমতী কমলপ্রভাকে বিবাহ করেন। শ্রীমতী কমলপ্রভা স্বামীর সুখদুঃখে প্রকৃত জীবনসঙ্গিনী হন। তাঁহার তিনটি পুত্র প্রবীর, সমীর ও মিহির এবং দুই কন্যা মাধুরী ও সুজাতা জন্মগ্রহণ করেন।

সুবোধচন্দ্রের গার্হস্থ্য জীবন বেশ সুখ ও শান্তিতেই অতিবাহিত হইত। তিনি স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে আন্তরিক স্নেহ ও ভালবাসায় মুগ্ধ রাখিয়াছিলেন এবং যখনই কোন বিদেশে যাইতেন সকলকে সঙ্গে লইয়া যাইতেন।

শেষ জীবন—জীবনের শেষ কয় বৎসর সুবোধচন্দ্র বেশীর ভাগ বিদেশে গিয়া সপরিবারে বাস করেন। বাল্যকাল হইতে চল্লিশ বৎসর তিনি প্রবল ঝড়ের মধ্য দিয়া চলিয়াছিলেন। জীবনের সুখ, শান্তি, ধনসম্পদ ভুলিয়া অসীম পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন। নানা দেশহিতকর কার্যে তিনি দাতাকর্ণের ন্যায় তাঁহার অতুল সম্পত্তি অকাতরে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। লক্ষ লক্ষ টাকা তাঁহার নানা কার্যে খরচ হইয়া গিয়াছে। কত নেতাকে বিনা লেখাপড়ায় কত সহস্র টাকা দিয়াছেন তাহার হিসাব নাই। সেইজন্য এখনও সকলে তাঁহাকে দানবীর রাজা সুবোধচন্দ্র বলিয়া থাকে।

কিছুদিবস শান্তিতে বাস করিবার জন্য তিনি ১৯১৬ খৃস্টাব্দে ৺বৈদ্যনাথধামে গিয়া একবৎসর বাস করেন। পরে কলিকাতায় আসিয়া কিছুদিবস থাকিয়া পুনরায় সপরিবারে সাঁওতাল পরগণার জেসিডিতে গিয়া "কৃষ্ণধাম" ভবনে দুই বৎসর অতিবাহিত করেন। সেই সময় বৈদ্যনাথের এবং জেসিডির সকল প্রকার লোকের সহিত তিনি বিশেষ মেলামেশা করিতেন এবং স্থানীয় সকল লোকেই সুবোধচন্দ্রকে আন্তরিক ভালবাসিত। সুবোধচন্দ্র ধনী দরিদ্র সকলকে সমান চক্ষে দেখিতেন। স্থানীয় সাঁওতালদের মোড়লগণ সুবোধচন্দ্রের নিকট সকাল সন্ধ্যা আসিয়া তাঁহার সহিত নানাবিষয় আলাপ করিত। সুবোধচন্দ্রের সহিত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার বড় ঔষধের সকলরূপ সরঞ্জাম এবং এলোপ্যাথিক ঔষধও অনেক প্রকার থাকিত। তিনি এবং তাঁহার উপযুক্ত সহধর্মিণী উভয়ে প্রতি সন্ধ্যায় স্থানীয় বহু লোককে বিনা পয়সায় ঔষধ দিতেন এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানারূপ উপদেশ দান করিতেন। এক এক সময় মনে হইত তাঁহার বাটীটি যেন একটি দাতব্য ঔষধালয়ের ভবন। সুবোধচন্দ্রের জেসিডির

বাটীর দ্বার বড় ছোট সকলের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত থাকিত। দানবীর সুবোধ-চন্দ্র সেখানে গিয়াও বিনা বিবেচনায় স্থানীয় বহু লোককে বহু অর্থ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন।

সুবোধচন্দ্র জেসিডিতে একটি বড় বাটী ও বাগান প্রস্তুত করিবার জন্য রোহিণী রোডের উপর চারি বিঘা জমি ক্রয় করেন এবং একটি অট্টালিকা নির্মাণ করাইতে আরম্ভ করেন। তিনি প্রথমে জেসিডি স্টেসন হইতে দুই মাইল দূরে রোহিণী রোডের উপর "কৃষ্ণধাম" নামক ভবন ভাড়া লইয়া তথায় বাস করিতেন। ক্রমে নিজের বাটীর এক অংশের প্রস্তুত কার্য শেষ হইলে তথায় গিয়া বাস করেন। উক্ত জেসিডির বাটী নির্মাণ সমাপ্ত হইবার পূর্বে সুবোধচন্দ্র গরমের জন্য দার্জিলিং পাহাড়ে সপরিবারে যান এবং দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি আর দার্জিলিং পাহাড় হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারের নাই। বৈদ্যনাথের নিকটে তিনি তাঁহার মাতাঠাকুরাণীর নামে একটি বড় মৌজা ক্রয় করেন।

১৯১৮ খৃস্টাব্দে সুবোধচন্দ্র সপরিবারে জেসিডি হইতে দার্জিলিং পাহাড়ে যান এবং প্রথমে কুচবিহার স্টেটের "বেচলার কট্" ভবনে বাস করেন এবং পরে বার্চহিলের নীচে লাটসাহেবের বাটীর পাহাড়ের দক্ষিণে "প্রসপেক্ট হাউস" নামক বড় একটি বাটী কুচবিহার স্টেট হইতে লিজ লইয়া সুন্দরভাবে সজ্জিত ও মেরামত করাইয়া তথায় গিয়া বাস করিতে থাকেন। উক্ত বাটীর উপরের পাহাড়ে তাঁহার ভ্রাতা নীরদচন্দ্রের সুবৃহৎ ভবন "ক্যাসলটন" এবং নীচের দিকে তাঁহার পিসতুত ভাই শ্রীযুক্ত সারদাচরণ গুহ মহাশয় তাঁহার "লাউঞ্চ" নামক ভবনে সপরিবারে বাস করিতেছেন।

সুবোধচন্দ্রের উক্ত "প্রস্‌পেক্ট হাউস" দার্জিলিং নিবাসী ও অভ্যাগত সকল বাঙ্গালীর মিলন মন্দির হইয়া উঠে। সারাজীবনই সুবোধচন্দ্র পাঁচজনকে লইয়া সর্বদা আমোদ-প্রমোদ করিয়া অতিবাহিত করিতে ভালবাসিতেন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার দার্জিলিং-এর বাটীও কলিকাতার বাটীর ন্যায় সকল সম্ভ্রান্ত লোকের মিলনের স্থান হয়। তাঁহার বাটীতে প্রত্যহ বৈকালে বহু সম্ভ্রান্ত রাজকর্মচারী হইতে রাজা, মহারাজা ইত্যাদি সম্ভ্রান্ত লোক চা পান করিতে আসিতেন এবং প্রতি রবিবার মধ্যাহ্নে অনেক স্থানীয় বাঙ্গালী ভদ্রলোককে তিনি নিমন্ত্রণ করিয়া বাঙ্গালীদের প্রিয় খাদ্য ভাত ব্যঞ্জন ইত্যাদি খাওয়াইতেন। স্যার প্রভাস মিত্র, স্যার নৃপেন্দ্র সরকার, স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র, কুচবিহারের মহারাজা, দীঘাপতিয়ার

মহারাজা ইত্যাদি সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ প্রতি সপ্তাহে দুই তিন দিবস মধ্যাহ্নে তাঁহার প্রস্‌পেক্ট হাউসে আসিয়া ব্রিজ খেলিতেন এবং মধ্যে মধ্যে লাঞ্চ খাইতেন। সুবোধচন্দ্রের অমায়িক ব্যবহার ও মিষ্টকথায় সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসিত।

স্বর্গারোহণ—নব্যভারতের গৌরবস্থল বঙ্গজননীর সুসন্তান সুবোধচন্দ্রের কর্মময় জীবনলীলা অতি অল্পবয়সেই ইহজগতে শেষ করিতে হইল। প্রবাদ আছে—ভগবান যাঁহাকে ভালবাসেন তিনি তাঁহাকে শীঘ্রই লইয়া যান।

১৯২০ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে সুবোধচন্দ্র দার্জিলিং পাহাড়ে তাঁহার বৃদ্ধ মাতা স্ত্রী পুত্র কন্যাগণকে লইয়া বেশ শান্তিতেই কালাতিপাত করিয়াছিলেন। তিনি ভ্রমণ করিতে ভালবাসিতেন এবং পাহাড়ের উঁচু নীচু রাস্তা দিয়া ছয় সাত মাইল পথ সহজেই ভ্রমণ করিতে পারিতেন। বার্চহিলের নিম্নে তাঁহার বাটী হইতে তিনি জলাপাহাড়ের উপর দিয়া ঘুম্ স্টেসন অবধি গিয়া তথা হইতে বিশ্রাম না করিয়া পদব্রজে কার্ট রোড দিয়া তাঁহার বাটীতে ফিরিয়া আসিতেন। দেহ তাঁহার তখনও খুব শক্ত ও বলিষ্ঠ ছিল। নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে এক দিবস তিনি লেবং নামক ঘোড়দৌড়ের মাঠ অবধি ভ্রমণ করিতে গিয়া ফিরিবার পথে বৃষ্টিতে আক্রান্ত হন তাহাতেই তাঁহার ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর আসে দুর্ভাগ্যক্রমে উক্ত জ্বর ক্রমে টাইফয়েড রোগে পরিণত হয় এবং স্থানীয় সকল বড় বড় ডাক্তারের অশেষ চেষ্টা ও যত্নেও কোন ফল হইল না। ১৩২৭ সনের ২৮শে কার্তিক ইংরাজী ১৩ই নভেম্বর ১৯২০ তারিখে মহাপ্রাণ সুবোধচন্দ্র অমরধামে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার বৃদ্ধ মাতা ও পতিপ্রাণা স্ত্রী নাবালক পুত্রকন্যাগণসহ ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

দার্জিলিং শহরের সকল বাঙ্গালী, বহু ইংরাজ ও স্থানীয় পাহাড়ী ইত্যাদি সহস্র সহস্র লোক "প্রস্‌পেক্ট হাউসে" আসিয়া পরলোকগত মহাপুরুষের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং সেই দুর্জয় শীতে তাঁহার দেহ লইয়া বহু সহস্র লোক দাহস্থান অবধি অনুসরণ করেন। সেই ত্যাগী ও দানবীর স্বদেশ-প্রেমিকের চিরবিদায় সংবাদ শ্রবণে সকল বাঙ্গালীর হৃদয় বিষাদে পূর্ণ হয়। তাঁহার অন্তিমকালে বয়স হইয়াছিল মাত্র একচল্লিশ বৎসর। এত অল্পবয়সে তাঁহার পরিবারবর্গের মধ্যে খুব কম লোকেই দেহ রাখিয়াছেন কিন্তু দেবতার আসন মর্ত্যে বেশী দিবস থাকে না।

সুবোধচন্দ্রের তিরোভাবে সমগ্র বঙ্গদেশ শোকসাগরে নিমগ্ন হয় এবং নানা—

স্থানে তাঁহার স্মৃতিতর্পণের আয়োজন হয়। কলিকাতার নগরবাসীরা ১০ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে গোলদীঘির উত্তর-পূর্বস্থ ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে সমবেত হইয়া সেই দেশহিতব্রতী সর্বপ্রকার জাতীয় অনুষ্ঠানের উৎসাহদাতা, জাতীয় শিক্ষার প্রথম প্রবর্তক ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা দানবীর রাজা সুবোধচন্দ্রের অকালমৃত্যুতে তাঁহাদের প্রাণের বেদনা নিবেদন করেন। উক্ত শোকসভায় অত্যন্ত আবেগ পরিলক্ষিত হয় এবং সভাগৃহে অসংখ্য লোকসমাগম হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে স্যার আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কবি শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর প্রেরিত একটি সহানুভূতিসূচক পত্র এবং তাঁহার রচিত একটি সুন্দর শোকগাথা সভায় পঠিত হয়। উক্ত সভায় কৃষ্ণকুমার মিত্র, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, বি. সি. চ্যাটার্জী, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাপ্রসাদ বাজপাই, সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি বহু সম্রান্ত লোক উপস্থিত হন এবং সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হয়—

"আমরা বাঙ্গলাদেশের লোকগণ কলিকাতার রাজা সুবোধচন্দ্র বসু মল্লিক মহাশযের অকাল তিরোধানে গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি। মাতৃভূমির প্রথম আহ্বানেই তাঁহার সন্তানগণকে জাতীয়ভাবে ও জাতীয় কর্তৃত্বাধীনে শিক্ষিত করিয়া তোলার জন্য তিনি সর্ব্ব প্রথমে "জাতীয় শিক্ষা পরিষদ"এর ভিত্তি স্থাপনার্থে এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন। যখনই মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে তখনই তিনি সাহায্য করিয়াছেন।"

উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়—

"আমরা প্রস্তাব এবং প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আরো বিস্তৃতি করিয়া এবং কলিকাতায় উহার জন্য তাঁহার নামে একটী বাটী নির্মাণ করিয়া রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিকের স্মৃতি রক্ষা করা হউক।"

উক্ত সভায় রাজার মৃত্যুদিবস ১০ই নভেম্বর তারিখ প্রতি বৎসর জাতীয় ছুটির দিন বলিয়া ঘোষণা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সেই সময়ে ভারতবর্ষের সকল দৈনিক, সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকায় রাজা সুবোধচন্দ্রের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার জীবনী প্রকাশিত হয়।

"…সুবোধচন্দ্রের সেই লক্ষ টাকা দানেই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ভিত্তি গঠিত হইয়াছিল। তাই সেদিন তাঁহার কৃতজ্ঞ স্বদেশবাসীরা তাঁহাকে তাহাদের হৃদয়রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রাজা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল। সুবোধচন্দ্র তখন যুবক—বিলাসে লালিত, পিতৃব্য হেমচন্দ্র কলিকাতার সমাজে ফেশানের নেতা ও নিয়ন্তা। সেই সুবোধচন্দ্র একসঙ্গে—লক্ষ টাকা দিবার দিবার মত ধনী না হইলেও দেশের জন্য লক্ষ টাকা দিলেন। বাঙ্গলার জাতীয় জাগরণে তিনি সারথী হইলেন। তাহার পর তিনি উদ্যোগী হইয়া অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর, হেমেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতিকে লইয়া বন্দেমাতরম্ পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশসেবার জন্য তিনি কত ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা মনে করিতেও আনন্দে ও গর্ব্বে হৃদয় পূর্ণ হয়, জাতির উন্নতি সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না। পত্নী মৃত্যুশয্যায়—সুবোধচন্দ্রের সেদিকে দৃক্‌পাত নাই; তিনি জাতীয় কল্যাণকল্পে অকাতরে যে অর্থ ও শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন তাহার পুরস্কার হইল নির্ব্বাসন। সুবোধচন্দ্র সে পুরস্কারকে পুরস্কার বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলাদেশ সুবোধচন্দ্রের মত পুত্র পাইয়া ধন্য হইয়াছিল। বাঙ্গালী সুবোধচন্দ্রের ত্যাগের আদর্শে পবিত্র হইয়াছে। সেই সুবোধ আজ যৌবনে আমাদের সহসা ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এ শোকে সান্ত্বনা নাই। এ শোক তাঁহার বন্ধুজনের বুকে চিরদিন রাবণের চিতার মত জ্বলিবে। আজ তাঁহার জন্য শোক প্রকাশের সভা। যদি লক্ষ লোক সে সভায় সমবেত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন না করে তবে বুঝিব—বাঙ্গালী মরিয়াছে—সে আর জাগিবে না।"

—দৈনিক বসুমতী, বৃহস্পতিবার, ১০ই অগ্রহায়ণ ১৩২৭।

"…বাঙ্গলার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যখন সুবোধচন্দ্র প্রতাপ সিংহের ন্যায় দেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—যখন তাঁহার দুগ্ধপোষ্য সন্ততিগণের জন্য দুগ্ধ সংগ্রহ করাও কঠিন হইয়াছিল; তখন তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হন নাই—দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে তাঁহার ত্যাগ মহিমা মণ্ডিত মুখশ্রী অক্ষুণ্ণই ছিল। তিনি বাঙ্গলাকে ত্যাগ করিতে পারেন না—তিনি মনেপ্রাণে বাঙ্গালীকে বুঝিয়াছিলেন—তাহার দোষকে উপেক্ষা করিবেন, অকৃতজ্ঞতায় নিজের জন্য ব্যথিত হইবেন না। কিসে বাঙ্গালী মানুষ হয়, তাহাই তাঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। দেশের কল্যাণের জন্য তাঁহাকে ধীরে ধীরে অকাতরে কত ত্যাগ স্বীকার ও কঠোরতা সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা লেখনী বর্ণনা

করিতে অক্ষম। ···অদ্য যে সভা হইবে—তাহাতে সকল বাঙ্গালী সম্মিলিত হইয়া সুবোধচন্দ্রের তৃপ্তি বিধানের ব্যবস্থা করুন। তখন তিনি সর্ব্বস্ব দিয়াছিলেন—আজ প্রাণ দিয়া গেলেন। সকল স্বদেশবাসীর আত্মোৎকর্ষ ও চেষ্টায় তাঁহার পবিত্র জীবনের প্রভাব বর্ষিত হউক···"

—নবযুগ, ১০ অগ্রহায়ণ ১৩২১।

রাজা সুবোধচন্দ্রের প্রতি সাধারণের এতদূর শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল যে তাঁহার তিরোভাবের পর হইতে (১৩২১ সন হইতে) প্রতিবৎসর বঙ্গবাসীগণ একটী করিয়া সাম্বৎসরিক শোকসভা করিয়া তাঁহার পুণ্যস্মৃতি জাগরূক রাখিয়া আসিতেছে।

১৩৩২ সনের ২৮শে কার্তিক অপরাহ্নে এলবার্ট হলে তাঁহার পঞ্চম বার্ষিকী মৃত্যুর স্মৃতিসভায় মান্যবর ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত সভায় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলেন যে—"সুবোধচন্দ্র এই লক্ষ টাকা দান না করিলে জাতীয় বিদ্যালয়ের ভিত্তি প্রোথিত হইত না; কারলাইল সারকুলারের প্রত্যুত্তর প্রদানও হইত না—জাতীয় অপমানের প্রতিকার হইত না। সুবোধচন্দ্রকে এই দানের জন্য আমলাতন্ত্রের কোপানলে পড়িয়া নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিতে হইয়াছিল কিন্তু মাতৃসেবক সুবোধচন্দ্র সেজন্য একদিনও আপন সঙ্কল্পচ্যুত হয়েন নাই।" স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁহার স্বভাবসুলভ তেজস্বী ভাষায় এক হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা দিয়া সুবোধচন্দ্রের মহৎ ত্যাগের বিষয় বর্ণনা করিয়া বলেন,—"সুবোধচন্দ্র মূর্ত্তিমান হইয়া প্রত্যেক বাঙ্গালী যুবকের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। মানুষের নশ্বর দেহের অবসান হইলেও তাঁহার কর্ম্মজীবনের সমাপন হয় না। দেশবন্ধুর (চিত্তরঞ্জন দাসের) অতুল দানের উৎস সুবোধচন্দ্র। তিনি দেশের জন্য আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন—দেশ সেবাই তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল, তাই তিনি বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাসে অক্ষয় স্বর্ণ অক্ষরে তাঁহার নাম লিপিবদ্ধ করিয়া যাইতে পারিয়াছে। বাঙ্গলার যুবকগণ! তোমরা যদি সুবোধচন্দ্রের প্রকৃত স্মৃতি তর্পণ করিতে চাও; যদি সুবোধচন্দ্রের অমর আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাভক্তির স্রক্‌চন্দন বিল্বাঞ্জলি প্রদান করিতে চাও তবে দেশাত্মবোধ, দয়া, দাক্ষিণ্য, অতুল সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণ সম্পদে সুবোধ প্রভৃতি গুণ সম্পদে সুবোধচন্দ্রের মূর্ত্তবিগ্রহ হও, তাহা হইলেই প্রকৃত পক্ষে সুবোধচন্দ্রের স্মৃতি রক্ষিত হইবে।"

Raja Subodh Chandra Mallik

The tenth anniversary of the death of Raja Subodh Chandra Basu Mallik was celebrated yesterday (Friday) with solemnity. Our young men to-day might not fully know what and who Subodh Chandra was. The title of 'Raja' was conferred on him by his admiring countrymen not because of the wealth and social position he had but because of the many qualities of head and heart which made him easily win the hearts of all who came in contact with him. Though born with a silver spoon in his mouth and nurtured in luxury and affluence, his heart bled for his poor and suffering country men. The Swadeshi Movement which witnessed an unprecedented quickening of national consciousness in Bengal brought the Raja into the field of politics. He was a sincere patriot and self-less worker and readily joined the movement which had fired his countrymen with remarkable national fervour. But shunned the lime-light and detested ostentation. What service he rendered to his mother land, he did in silence and in all sincerity. Subodh Chandra was the pioneer of the movement for national education and was the first to donate a Lakh of rupees for the purpose. The National Council of Education in Bengal owed its inception to his initiative and efforts, He wrs also the founder of the Bonde Mataram that become in these days a power in the land, Above all, he was a great advocate of Swadeshism. Not only did the Raja spend money for the national cause but he readily unloosened his purse strings for the poor and the distressed. His private benefactions were too numerous to mention This was the Raja whose contributions to national well being, posterity will not willingly let die.

—The Amrit Bazar Patrika, 10 November 1932.

"Subodh Chandra Basu Mallik comes of the well known Wellington Square Malliks renowned for their sturdy

independance and enlightened culture. He got the whole of his schooling at St Xavier's. Subodh joined the Presidency College Calcutta, went on to Trinity College, Cambridge and entered one of the Inns of court. On his return to India he took an active part in the foundation of the Field and Academy Club, and the formation of the National Council of Education. The institution at Jadabpur which is today one of the best equipped and perhaps the largest Technical College in India stands as a movements to the administrative ability of that educational body. Subodh's last years were spent in retirement. He was not quite forty at his death in 1920."

—St. Xavier's Magazine, July 1929, p 66.

স্মরণ সঙ্গীত

প্রথমে বাজিল তোমার পরাণ,—
গড়িতে জাতির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ;
করিতে বোধন সর্ব্বস্ব প্রধান,
যাদবপুরে যাহার উড়িছে নিশান।
ওগো বঙ্গ জননীর সুবোধ সন্তান
হৃদয়ের রাজা দেশগত প্রাণ।
(তুমি) করিয়া প্রকাশ "বন্দে-মাতরম্ ;
সাধিলে না কত দেশের করম্ ;
মিলিল যথায়, স্বদেশ সেবায়,
কত শত ত্যাগী, জ্ঞানী, কর্ম্মী-মহাপ্রাণ।
ওগো বঙ্গ জননীর সুবোধ সন্তান
হৃদয়ের রাজা দেশগত প্রাণ।

স্বদেশ সেবায় ঢালি প্রাণ মন,—
হাসিমুখে,—দুখে করিলে বরণ ;
কর্ত্তব্য কঠিন করিয়া সাধন,
জীবন মধ্যাহ্নে কোথা করিলে গমন ?
ওগো বঙ্গ জননীর সুবোধ সন্তান
হৃদয়ের রাজা দেশগত প্রাণ ॥
আকাশে বাতাসে তোমার মহিমা,—
গাহিল দেবতা করিয়া গরিমা ;
দেশবাসী সবে আপনারে ভেবে
দানিল তোমায় রাজার সম্মান ।
ওগো বঙ্গ জননীর সুবোধ সন্তান
হৃদয়ের রাজা দেশগত প্রাণ ॥

উক্ত স্মরণসঙ্গীত গীতটি শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক রচিত হয় এবং রাজা সুবোধচন্দ্রের পঞ্চম বার্ষিকী—মৃত্যু স্মৃতিসভায় ২৮শে কার্তিক ১৯৩২ তারিখে এ্যালবার্ট হলে সুকুমারমতি বালকবালিকাগণের দ্বারা সমস্বরে এই গানটি গীত হয় ।

রাজা সুবোধচন্দ্র তিনটি পুত্র এবং ছয়টি কন্যা রাখিয়া যান ।

প্রবীরচন্দ্র

রাজা সুবোধচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান প্রবীরচন্দ্র ১লা জুলাই ১৯১১ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে সেণ্ট জেভিয়ার কলেজে ও রাণীভবানী বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া ১৯২৯ খৃস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন। ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়া বি. এ. পরীক্ষাকালে ১৯৩৩ খৃস্টাব্দে বিলাতে শিক্ষার জন্য গমন করিয়া কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজে প্রবেশ করেন। চারি বৎসর কেম্‌ব্রিজে থাকিয়া তথা হইতে বি. এ. অনার্স ডিগ্রি লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ।

প্রবীরচন্দ্র বাল্যকাল হইতে তেজস্বী, অল্পভাষী, বুদ্ধিমান বালক। বঙ্গদেশের

প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ও বঙ্গীয় ছাত্র সম্মিলনীর তিনি একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। ইংলণ্ডে থাকাকালে তথাকার সকল ভারতীয় ছাত্রের সহিত তাঁহার বিশেষভাবে বন্ধুত্ব হয়। তথাকার ছাত্র-প্রতিষ্ঠানের সহিত বিশেষ সংশ্লিষ্ট হন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন। লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রগণের Federation of Indian Students in Great Britainএর তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি উচ্চ সাহিত্য চর্চা করিতেছেন এবং কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ইতিহাসের অস্থায়ী অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩০শে শ্রাবণ ১৩৪৬ তারিখে তিনি দর্জিপাড়া নিবাসী রায় দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুরের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অর্পণাকে বিবাহ করেন।

সুবোধচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র সমীরচন্দ্র ১০ই আগস্ট ১৯১৪ খৃস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি খেলাতচন্দ্র ইনষ্টিটিউসন্ বিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি. এ. ডিগ্রি পান। উপস্থিত তিনি তাঁহার পিতার স্থাপিত লাইট অফ এসিয়া জীবনবীমা অফিসে জীবনবীমার কার্য শিক্ষা করিতেছেন।

সুবোধচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র মিহিরচন্দ্র ২৩শে জুন ১৯১৬ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। মিহিরচন্দ্র খেলাতচন্দ্র বিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপস্থিত কলিকাতায় হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিদ্যা অর্জন করিতেছেন।

সুবোধচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুজাতা ১২ই জুন ১৯১৩ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার হাইকোর্টের উকিল শ্যামবাজার নিবাসী শ্রীঅজিতচন্দ্র ঘোষের সহিত পরিণয় হয়।

শ্রীমতী সুজাতা তিনটি পুত্র রণজিৎ, অশোক এবং সুজিতকে রাখিয়া রাখিয়া ১লা মাঘ মঙ্গলবার ১৫ই জানুয়ারী ১৯৩৫ তারিখে ইহধাম ত্যাগ করেন।

সুবোধচন্দ্রের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সুচন্দ্রা। শ্রীমতী সুচন্দ্রার কলিকাতা হাইকোর্টের এটর্ণী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মিত্রের সহিত শুভ বিবাহ হয়। ১৯৩৬ সালে ধীরেন্দ্র স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া ইয়োরোপ ভ্রমণ করিতে যান। ১৯৩৭ সন হইতে ধীরেন্দ্রনাথ ভারত গভর্ণমেণ্টের সলিসিটার নিযুক্ত হইয়া দিল্লীতে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। উক্ত পদ পূর্বে কোন ভারতবাসী প্রাপ্ত হন নাই। ১৯২৯

সনে তিনি গভর্ণমেণ্ট হইতে সি. বি. ই. খেতাব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

সুবোধচন্দ্রের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী সুরমা। শ্রীমতী সুরমার ৬ই মার্চ ১৯২১ তারিখে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ঘোষের সহিত শুভবিবাহ হয়। মনোরঞ্জন বিলাত এবং আমেরিকা হইতে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া ভারতবর্ষে ফিরিয়া ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য করিতেছেন।

শ্রীমতী সুরমার চার পুত্র—সুধীররঞ্জন, টুনু, এবং বোকন এবং দুইটি কন্যা শ্রীমতী মঞ্জুলিকা এবং শ্রীমতী সুমিত্রা।

সুবোধচন্দ্রের চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী সুষমা। শ্রীমতী সুষমার ১০ই মার্চ ১৯২১ খৃস্টাব্দে কলেজ স্কোয়ার নিবাসী হাইকোর্টের উকিল শ্রীমান সুকুমার দের সহিত বিবাহ হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে বিবাহের দুই বৎসরের মধ্যে সুষমা ইহধাম ত্যাগ করেন।

সুবোধচন্দ্রের পঞ্চম কন্যা শ্রীমতী মাধুরী। শ্রীমতী মাধুরীর ২১শে বৈশাখ বুধবার ১৩৩২ গড়পাড়ের লক্ষ্মীবিলাস ভবনে সুবিখ্যাত ডাক্তার শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান প্রভাতকুমারের সহিত শুভবিবাহ হয়। প্রভাত-কুমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. ডিগ্রি লইয়া ইংলণ্ডে গিয়া একাউণ্ট্যাণ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া Charted Incorporated A. S. H. H, Lond. Accountant হইয়া কলিকাতায় একজন বিশিষ্ট একাউণ্ট্যাণ্ট বা হিসাব পরীক্ষক হইয়া নিজে বড় অফিস করিয়া সুযশের সহিত কার্য করিতেছেন।

শ্রীমতী মাধুরীর এক পুত্র অজয় এবং এক কন্যা ইরাণী।

সুবোধচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুজাতা। ১৯৩৮ সনে সুজাতা লোরেটো ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয় হইতে জুনিয়ার কেম্ব্রিজ এবং সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। ১৯৩৯ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপস্থিত বি. এ. দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

দ্বারিকানাথ বসুমল্লিক

রাধানাথ বসুমল্লিক মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র ২৬ পর্যায়ে দ্বারিকানাথ ১৮৩০ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রথম জীবনে তিনি হিন্দু কলেজ হইতে বিদ্যাশিক্ষা করেন। তৎকালে বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রতিষ্ঠা হয় নাই। ১৮১৭ খৃস্টাব্দে শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের উদ্যোগে সম্ভ্রান্ত হিন্দু বালকগণকে ইংরাজী শিক্ষা দিবার জন্য কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহোদয়গণ কর্তৃক চাঁদা তুলিয়া হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং বাঙ্গালার গবর্ণর উক্ত কলেজের সাহায্য করেন। উচ্চ শিক্ষা দিবার জন্য সে সময় অন্য কোন বিদ্যালয় বা কলেজ ছিল না। হিন্দু কলেজে কেবল সম্ভ্রান্ত লোকের সন্তানদিগকে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হইত। তখন প্রবেশিকা, আই এ, বি এ, ইত্যাদির সৃষ্টি হয় নাই। উক্ত হিন্দু কলেজে যাহারা উচ্চ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত তাহাদিগকে 'স্কলার' বলিত। ১৮৪৮ খৃস্টাব্দে সিনিয়ার স্কলার ৫৩৩ জন এবং জুনিয়ার স্কলার ৩৭২ জন ছিল। বালকগণকে উচ্চ শিক্ষার ডিগ্রি লইবার জন্য স্কলারসিপ পরীক্ষা দিতে হইত এবং যাহারা জুনিয়ার ও সিনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইত তাহাদের বৃত্তির স্কলারসিপ দেওয়া হইত। সেই সময় সিনিয়ার স্কলারসিপ শিক্ষার উপর আর কোনরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইবার কলেজ ছিল না। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়, এবং ১৮৫৫ খৃস্টাব্দে হিন্দু কলেজ হইতে প্রেসিডেন্সি কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। গবর্ণমেণ্ট সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকগণকে লইয়া Council of Education প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহারাই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন। ১৮৪৮ খৃস্টাব্দে হিন্দু কলেজে ৫৩২ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিত। জুনিয়ার পরীক্ষায় ২২ জন উত্তীর্ণ হন এবং তাহার মধ্যে দ্বারিকানাথ একজন এবং ১৮৫০ খৃস্টাব্দে দ্বারিকানাথ সিনিয়ার পরীক্ষা দিয়া ২২ জন ছাত্রের মধ্যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পান।

Hindu College Calcutta.

Dwarka Nath Bose

1848-1849

Raja of Burdwan's Junior Scholarship

Eight Rupees per month.

lst. year

W. R. Bethune { President Council of Education.

Secretary with Council

29. Russomoy Dutt Secretary Hindu College,

Hindu College Calcutta

1849-50

Dwarka Nath Bose

Raja of Burdwan's Senior Scholarship

Eight Co's Rupees per month

W. R. Bethunce { President Council of Education.

Secretary with Council.

Russomoy Dutt Secy to the Hindu College.

বাল্যকাল হইতে দ্বারিকানাথ বিশেষ বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষা উত্তমরূপেই শিক্ষা করেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় সুন্দরভাবে লিখিতে এবং কথা কহিতে পারিতেন।

দ্বারিকানাথ সুশিক্ষিত হইয়া কর্মজীবনে প্রবেশ করেন! তাঁহার পিতার মৃত্যুর সময় তিনি নাবালক ছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া এবং শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জয়গোপালের সহিত নিজের ডকের কার্য এবং বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা করিতে থাকেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সকলরূপ কার্যে তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন এবং তিনি সপরিবারে ভ্রাতাগণের সহিত একান্ন যৌথ পরিবারে বিশেষ সদ্ভাবে মিলিত হইয়া বাস করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বনামধন্য পিতা মহাশয় অতুল ঐশ্বর্য রাখিয়া গিয়াছিলেন। ১৮৫৯ খৃস্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জয়গোপাল স্বর্গারোহণ করিলে দ্বারিকানাথ একান্নবর্তী

পরিবারে কর্তা হইয়া সকল বিষয়-সম্পত্তি ও ডকের কারবার যথাযথ বিবেচনা এবং পরিশ্রমের সহিত তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন। জয়গোপাল ভ্রাতা দ্বারিকানাথের নির্মল চরিত্র এবং বিদ্যা-বুদ্ধির বিষয় সম্যক জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকে সকল সম্পত্তির একমাত্র একজিকিউটার নিযুক্ত করিয়া যান। দ্বারিকানাথ জয়গোপালের নাবালক পুত্রত্রয় প্রবোধচন্দ্র, মন্মথনাথ এবং হেমচন্দ্রকে নিজের পুত্রগণের ন্যায় দেখাশুনা করিয়া তাঁহাদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করেন।

দ্বারিকানাথ অতি বুদ্ধিমান, বিদ্বান এবং চরিত্রবান লোক ছিলেন। সমাজে তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট ছিল এবং কলিকাতার সম্রান্ত সকল লোকের সহিতই তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তৎকালীন বড় বড় প্রায় সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক সভা-সমিতিতে তিনি যোগদান করিতেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ২৬শে মার্চ ১৮৭২ খৃস্টাব্দে দ্বারিকানাথকে কলিকাতায় অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ও জাষ্টিস অফ পিস নিযুক্ত করেন।

Honorary Presidency Magistrate and Justice of Peace.

No. 482 J.

From A. Mackenzee Esq.

Junior Secretary to the Government of Bengal

To

Baboo Dwarka Nath Mullick.

Fort William, the 26 March 1872.

Sir,

I am directed to inform you that the Lieutenant Governor has been pleased to appoint you, under the provisions of section 4 of Act II of 1869 to Act as a Justice of Peace for the town of Calcutta.

I have the honour to be

Sir,

Your most obedient servant.

A. Mackenzee.

Junior Secretary to the Government of Bengal.

'সেই সময় অতি অল্প সম্ভ্রান্ত লোকই অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট এবং জাষ্টিস অফ পিস ছিলেন। ১লা জানুয়ারী ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে ভারতেশ্বরী মহারাণী সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া এম্প্রেস অফ ইণ্ডিয়া বা 'ভারত সম্রাজ্ঞী' পদবী গ্রহণ করেন এবং এই উপলক্ষে ভারতবর্ষে বিশেষ উৎসব হয়। সেই শুভ উৎসবে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট দ্বারিকানাথ বসুমল্লিক মহাশয়কে Certificate of Honour দিয়া সম্মানিত করেন।

দ্বারিকানাথ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের একজন বিশেষ সভ্য এবং কর্মী ছিলেন। ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে কার্যনির্বাহক সভার সভ্য নির্বাচিত হইয়া আজীবন তিনি উক্ত সভার সকল কার্যেই যোগদান করিতেন।

মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দ্বারিকানাথের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় দ্বারিকানাথের পটলডাঙ্গাস্থ ভবনে প্রায়ই পদধূলি দিতেন এবং উভয়ের মধ্যে সামাজিক এবং দেশহিতকর নানারূপ কার্যের বিষয় আলোচনা হইত এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেক কার্যে দ্বারিকানাথ বিশেষ সহানুভূতি দেখাইতেন। ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্গদেশীয় কুলীনদিগের অনুষ্ঠিত বহুবিবাহ প্রথা রহিত করিবার জন্য নানারূপ আন্দোলন করিয়া বিবিধ প্রকারে বিশ বৎসর ধরিয়া এই অন্যায় সামাজিক প্রথাকে রদ করিবার জন্য চেষ্টা করেন। এই সমাজহিতকর আন্দোলনে দ্বারিকানাথের সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫৭ ও ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে ১৯শে মার্চ তারিখে দুইবার রাজদরবারে এই বহুবিবাহরূপ কুলপ্রথার উচ্ছেদসাধন করিবার জন্য আইন প্রস্তুতের প্রার্থনা করিয়া কৃষ্ণনগরের মহারাজা সতীশচন্দ্র প্রভৃতি বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত মহোদয় স্বাক্ষরিত যে আবেদনপত্র প্রেরণ করেন দ্বারিকানাথ তাহার একজন উদ্যোগী ছিলেন। দ্বারিকানাথের যৌথ সম্পত্তি সকল বিভাগের জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে একজন আরবিট্রেটর বা সালিসী মনোনীত করা হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় সবিশেষ চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া দ্বারিকানাথ ও তাঁহার তিন ভ্রাতার মধ্যে আপসে সকল বিষয় বিভাগ করিয়া দেন। তিনি ২৩শে আগস্ট ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে কার্মাটার হইতে দ্বারিকানাথকে স্বহস্তে একটি পত্র লিখিয়া তাঁহার পিতাঠাকুরের অসুস্থতার জন্য এই সালিসী কার্য হইতে শেষে অবসর লইবার জন্য যেরূপভাবে লিখিয়াছেন ইহা হইতে তাঁহার এই বংশের মঙ্গলের জন্য "ইচ্ছাপূর্ব্বক" কিরূপ ভার লইয়াছিলেন তাহা সুস্পষ্ট প্রকাশ পায়—

শ্রীশ্রীহরিঃ

শরণম্

শুভাশীর্ব্বাদ সাদরসম্ভাষণ নিবেদনম্

আমি অনেক বিবেচনা করিয়া দেখিলাম আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে আমার দ্বারা আপনাদের কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সম্ভাবিত নহে। বিশেষত কাশীর পত্রে পিতাঠাকুরের শরীরের অবস্থা যেরূপ অবগত হইতেছি তাহাতে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেই তথায় গিয়া থাকিতে হইবেক বোধ হইতেছে। এই সমস্ত কারণে আপনারা আপনাদের কার্য্যের যে ভার আমার উপর অর্পণ করিয়াছিলেন নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক তাহা পরিত্যাগ করিতে হইতেছে। ইহাতে আমি যারপর নাই দুঃখিত হইতেছি। ইচ্ছাপূর্ব্বক ভারগ্রহণ করিয়া কার্য্যকালে পরিত্যাগ করিতে হইল, ইহা অত্যন্ত দুঃখ ও আক্ষেপের বিষয়। আপনারা আর আমার প্রতীক্ষা না করিয়া অন্য ব্যক্তিকে স্থির করিবেন।

আমি কিছু ভাল আছি জানিবেন ইতি—৮ই ভাদ্র

শুভাকাঙ্খিণঃ

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণ।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় দ্বারিকানাথের একজন অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন। উভয়ে প্রায়ই একত্রে বেড়াইতেন এবং নানারূপ সভাসমিতিতে যোগদান করিতেন। প্রায় প্রতি সপ্তাহে বুধবার দিবস সন্ধ্যাকালে মহারাজা দ্বারিকানাথের ভবনে আসিতেন এবং রবিবার সন্ধ্যাকালে দ্বারিকানাথ পাথুরিয়া-ঘাটায় মহারাজের ভবনে যাইতেন। দয়ার্দ্রহৃদয় দ্বারিকনাথ বহু গরীব ছাত্র এবং অনাথা ও বিধবাকে মাসিক সাহায্য দিতেন। কোন সৎকার্যের জন্য দ্বারিকানাথের নিকট হইতে সাহায্য চাহিয়া কেহ কখনও বিফলমনোরথ হইয়া ফেরেন নাই। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহার ভবনে বার মাসে তের পর্ব হইত। প্রতি বৎসর তাঁহার ভবনে বিশেষ ধুমধামের সহিত ৺শারদীয়া দুর্গাপূজা এবং শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা হইত এবং এই পূজার সময় কয়দিবস বহু দরিদ্র তাঁহার ভবনে আহার ও ভিক্ষা পাইত। তিনি কুলগুরু কালনা বিদ্যাবাগীশ পাড়া নিবাসী ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিয়া প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেন। বৃদ্ধা মাতাকে এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়াদের দেবীর ন্যায় ভক্তি করিতেন এবং কনিষ্ঠদের সকলকে বিশেষ স্নেহ করিতেন।

তাঁহার অমায়িক ব্যবহার এবং মিষ্টকথায় বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের সকলে তাঁহাকে ভক্তি করিত ও ভালবাসিত। তিনি সকল জ্ঞাতিকুটুম্ব এবং আত্মীয়-স্বজনকে স্নেহ ও ভালবাসার ডোরে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা যে সকল দরিদ্র আত্মীয়গণকে নিজ সংসারে রাখিয়া ভরণপোষণ দিতেন, দ্বারিকানাথও সসম্মানে তাঁহাদিগকে স্বীয় পরিবারবর্গের মধ্যে স্নেহযত্নে রাখিয়াছিলেন।

দ্বারিকানাথ ন্যায়পরায়ণ এবং উদারচেতা লোক ছিলেন। তিনি ধনী ও দরিদ্র সকলের সহিত সমানভাবে মিশিতেন এবং সকল পল্লীবাসী তাঁহার অমায়িক ব্যবহারের জন্য তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করিতেন। অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াও তাঁহার কোনরূপ গর্ব ছিল না। তিনি সকল কার্য নিজ তত্ত্বাবধানে দেখাশুনা করিতেন এবং অলসভাবে কখনও বসিয়া থাকিতেন না। তিনি ইংরাজী ভাষা ভালরূপ জানিতেন এবং হুগলী ডকের কার্যের জন্য এবং নানারূপ রাজকীয় কার্যের জন্য অনেক সময়ে তাঁহাকে ইংরাজ ব্যবসায়ী ও রাজপুরুষগণের সহিত দেখা করিতে যাইতে হইত কিন্তু তিনি কখনও ইংরাজী-ভাবাপন্ন হন নাই। মোটা কাপড় এবং বেনিয়ান জামাই ছিল তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচ্ছদ। সকল সাহেব-সুবোর সহিত তিনি বেনিয়ান জামা পরিধান করিয়াই দেখাশুনা করিতেন।

দ্বারিকানাথের পিতা রাধানাথ ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়াই অতুল সম্পত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। দ্বারিকানাথ উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। তিনি ব্যবসা বাণিজ্য বিষয় বেশ বুঝিতেন এবং সকলরূপ হিসাবপত্র ভালরূপ রাখিতে জানিতেন। হুগলী ডকের তখন ষোল আনা অংশীদার ছিলেন দ্বারিকানাথ ও তাঁহার ভ্রাতাগণ। দ্বারিকানাথ উক্ত হুগলীর ডক্ নিজ তত্ত্বাবধানে এবং বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত পরিচালনা করেন এবং নিজে গিয়া দেখাশুনা করিয়া উক্ত পৈতৃক ব্যবসা হইতে যথেষ্ট আয়বৃদ্ধি করেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে তাঁহার বিশেষ দূরদর্শিতা ও কার্যকুশলতা থাকায় তিনি পৈতৃক সম্পত্তির আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি করেন এবং ভাগ্যলক্ষ্মী কর্মীপুরুষ দ্বারিকানাথের উপর অপার স্নেহ বর্ষণ করেন।

দ্বারিকানাথ হুগলীর ডক্ ভিন্ন অন্যান্য ব্যবসা করিয়াও অনেক অর্থোর্জন করেন। ১৮৭১ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতে দ্বারিকানাথ হোগলকুড়িয়ার শিবচরণ গুহ মহাশয়ের সহিত মেসার্স পিল ব্রেয়ার আফিসের মুচ্ছদ্দির বা

বেনিয়ানের কার্য করিতেন। তিনি যৌথ সম্পত্তির আয় হইতে কলিকাতায় এবং নিকটবর্তী স্থানে বহুলক্ষ টাকার জমি, বাটী ও উদ্যান খরিদ করেন এবং বাঙ্গলাদেশের নানাস্থানে কয়েকটি বড় বড় জমীদারী ক্রয় করেন। ২৪-পরগণা, নদীয়া এবং যশোহর জেলায় তিনটি বড় বড় পরগণা যৌথ সম্পত্তি হইতে ক্রয় করিয়া সুন্দরভাবে পরিচালনা করিয়া বহু আয় বৃদ্ধি করেন। ১৮৭০ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে নদীয়া জেলাস্থ ২৭৪ নং তৌজির খোসদাহ নামক সম্পত্তি তিনলক্ষ মুদ্রায় খরিদ করেন। যৌথ সম্পত্তি বিভাগের সময় উক্ত খোসদাহ সম্পত্তি তাঁহার তৃতীয় ভ্রাতা দীননাথ গ্রহণ করেন।

বিবাহ—দ্বারিকানাথ প্রথমে জোড়াসাঁকো নিবাসী মহাভারত প্রণেতা ৺কালীপ্রসন্ন সিংহের কন্যা বলাইচন্দ্র সিংহের ভগ্নী শ্রীমতী মনোমোহিনীকে বি াহ করেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে প্রথমা স্ত্রী বিবাহের অল্পদিবস পরেই নিঃসন্তান হইয়া ইহধাম ত্যাগ করেন।

প্রথমা পত্নীর স্বর্গারোহণের পর দ্বারিকানাথ দ্বিতীয়বার বিডন স্ট্রীটস্থ কর বংশের কন্যা শ্রীমতী পঙ্কমণিকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয়া পত্নী দুই পুত্র—চারুচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্র এবং এক কন্যা শ্রীমতী শরৎমণিকে রাখিয়া অল্পবয়সে ২০শে জ্যৈষ্ঠ শনিবার ১৭৭৭ শকাব্দে ইংরাজী ১৮৫৫ খৃস্টাব্দে জুন মাসে ইহধাম ত্যাগ করেন।

দ্বিতীয়া পত্নীর স্বর্গারোহণের পর চোরবাগান নিবাসী জীবনকৃষ্ণ সেন মহাশয়ের ভগ্নী শ্রীমতী নিস্তারিণীকে বিবাহ করেন। শ্রীমতী নিস্তারিণীর একমাত্র পুত্র ক্ষেত্রচন্দ্র এবং তিন কন্যা শ্রীমতী সৌদামিনী, শ্রীমতী রতনমণি এবং শ্রীমতী মৃণালিনী।

১৮৬৭ খৃস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে দ্বারিকানাথের বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণী শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী হাটখোলা দত্তবংশের কাশীপুরস্থ ভাগীরথীর তীরস্থ উদ্যানে স্বর্গারোহণ করিলে দ্বারিকানাথ তাঁহার পটলডাঙ্গাস্থ পৈতৃক ভবনে প্রায় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া যথাযথ হিন্দুমতে বৃদ্ধা মাতার শেষ কার্য দানসাগর শ্রাদ্ধ এবং বৃষোৎসর্গ ইত্যাদি সুসম্পন্ন করেন। নানাদেশ হইতে বড় বড় ব্রাহ্মণকে আনাইয়া পারিতোষিক দানে সন্তুষ্ট করেন। দ্বারিকানাথ বৃদ্ধা মাতার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে ১৫ই জানুয়ারী ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে যৌথ সম্পত্তি হইতে "বিন্দুবাসিনী ট্রাস্ট ফাণ্ড" নামক একটি ধনভাণ্ডার স্থাপন করিয়া তিনজন ট্রাস্টী নিযুক্ত করিয়া একটি ট্রাস্ট দলীল রেজিস্টারী করেন। উক্ত ফণ্ডের টাকার

সুদ হইতে দরিদ্র বিধবা স্ত্রীলোকগণের মাসিক বৃত্তি পাইবার ব্যবস্থা হয়। উক্ত ফাণ্ডের ১৮০০ সহস্র মুদ্রার শতকরা ৩।৷০ সুদের গবর্ণমেন্টের কোম্পানির কাগজ তাঁহার বংশধরগণের হস্তে গচ্ছিত রহিয়াছে। বহু দরিদ্র বিধবা প্রতি মাস মাস উহা হইতে বৃত্তি পাইতেছে এবং বসুমল্লিক বংশের সুনাম এবং গুণকাহিনী কীর্ত্তন করিতেছে।

দ্বারিকানাথকে শেষ জীবনে দুইটি বিষয় সংক্রান্ত মোকদ্দমায় লিপ্ত হইতে হয়। তাঁহার খুল্লতাত মহেশচন্দ্র দুইটি স্ত্রী শ্রীমতী কামিনী ও শ্রীমতী প্রসন্নময়ীকে রাখিয়া ১৮৪২ খৃস্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করেন। দ্বারিকানাথ তাঁহার দুই কাকিমাতাকে নিজ সংসারে মাতৃবৎ রাখিয়া পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে ভরণ-পোষণ এবং মাসহারা দিতেন।

উক্ত দুই কাকিমার মধ্যে কনিষ্ঠা শ্রীমতী প্রসন্নময়ী তাঁহার স্বামীর স্বর্গারোহণের তিরিশ বৎসর পরে ১৮৭২ খৃস্টাব্দে শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া পিতৃ-ভবনে গিয়া তাঁহার ৺শ্বশুর রামকুমার বসুমল্লিকের সকল সম্পত্তির অর্ধাংশ দাবী করিয়া তিন ভাসুরপুত্র দ্বারিকানাথ, দীননাথ এবং শ্রীগোপাল এবং ৺জয়গোপালের তিন নাবালক পুত্রের নামে কলিকাতার হাইকোর্টে একটি পার্টিশন সুট্ করেন। ১৮৭২ খৃস্টাব্দের ৪৭৩ নং মামলা বাদিনী শ্রীমতী প্রসন্নময়ী এবং বিবাদী দ্বারিকানাথ বসুমল্লিকাদি। প্রায় চারি বৎসর পরে বাদিনী সম্পূর্ণ পরাজিত হন এবং ইহা প্রমাণিত হয় যে যৌথ সম্পত্তি সকল রাধানাথের স্বোপার্জিত এবং বাদিনীর স্বামী কিছুই রাখিয়া যান নাই।

যৌথ সম্পত্তি বিভাগ—১৮৪৪ খৃস্টাব্দে রাধানাথ স্বর্গারোহণ করিলে প্রায় আঠাশ বর্ষ তাঁহার পুত্র পৌত্রগণ একান্নে যৌথ সম্পত্তি উপভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে ১০ই অক্টোবর তারিখে যৌথ সম্পত্তির পাঁচজন কর্তা—দ্বারিকানাথ, দীননাথ, শ্রীগোপাল, প্রবোধ এবং মন্মথনাথ একখানি একরারনামা রেজিস্টারী করিয়া যৌথ সম্পত্তির পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। তাহার একটি ধারা—

"৭নং শ্রীদ্বারিকানাথ মল্লিক জমিদারী ও হুগলী ডকের কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন এবং পুজাদির লোক-লৌকিকতা সাংসারিক সামাজিকতা তিনি দেখিবেন। শ্রীদীননাথ মল্লিক পিনরস্ কোম্পানীর বাটীর বেনিয়নি কর্ম্ম ও কলিকাতার ভাড়াটীয়া বাটী মেরামত ও ঘোড়ার গাড়ী ইত্যাদির সুপারিন্টেনডেন্টের কার্য্য করিবেন। ঘোড়ার গাড়ি বেচা-কেনার ভার তাঁহার উপর থাকিবেক কিন্তু তাহা

করার পূর্বে তিনি সকলের সম্মতি লইয়া করিবেন তাহা না করিয়া যাহা খরিদ করিবেন তাহার মূল্য এবং যাহা বিক্রয় করিবেন তাহার ক্ষতি যাহা সকলে বিবেচনা করিয়া অবধারিত করিবেন সেই টাকা তাহাকে নিজে দিতে হইবে এবং সেই টাকা তাহার নামে খরচ পড়িয়া অপরের নামে জমা হইবে। বাটীর ভিতরের কর্ত্রির স্বরূপ সরস্বতী দাসী আছেন এবং জয়গোপাল মল্লিকের স্ত্রী বাটীর মধ্যে যে সকল ক্রিয়াকলাপাদি হইয়া থাকে ও হইবে তাঁহারা উভয়ে দেখিবেন। তাহার খরচ পত্র তাহাদের মতে অংশীদারদিগের সম্মতিতে হইবে। তাঁহাদের অবর্ত্তমানে অপর স্ত্রীলোক যাহার প্রতি অংশীদারেরা ভার দিবেন তিনিই সেই কর্ম্ম করিবেন। শ্রীগোপাল সংসারের কর্ম্ম কার্য্য এবং প্রচলিত ব্যয়াদির তহবিল হিসাব পত্র রাখিবেন সকল খাতাদি তাহার জিম্মায় থাকিবে এবং তাহার সকল জবাব দিহি তাহাকেই করিতে হইবে।”

উক্ত যৌথ সম্পত্তির তৎকালীন বার্ষিক আয় মন্দ ছিল না—

১৮৫৮	সনে	মোট	আয়	=	৬২৩৮৯৩৲৲০
১৮৫৯	”	”	”	=	২৮৩০৩০/১০
১৮৬০	”	”	”	=	৪৫১০৩৭৲
১৮৬১	”	”	”	=	২৩০৫২৮।৶৫
১৮৬২	”	”	”	=	৩২৫৯৪১॥/১৫
১৮৬৩	”	”	”	=	৪৪৪০৯১৸৶১৫
১৮৬৪	”	”	”	=	৪৭৯৬৫২৸৶১৫
১৮৬৫	”	”	”	=	৫৮০৪৯২৶/১০
১৮৬৬	”	”	”	=	৩১৩৪২৩৲১৫

পরে দ্বারিকানাথের তৃতীয় ভ্রাতা দীননাথ সাহেবীভাবাপন্ন হ। এবং ১৮৭২ খৃস্টাব্দে তিনি পৃথক হইবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। একান্নবর্ত্তী পরিবার বেশ সুখে ও শান্তিতেই প্রায় তিরিশ বর্ষ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল কিন্তু ক্রমে সংসার খুব বড় হইয়া পড়ে এবং সকলের সন্তান সন্ততি লইয়া একত্রে থাকা সম্ভবপর হয় না। আপসে সকল সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লওয়াই সাব্যস্ত হয় কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার তিন পুত্র প্রবোধচন্দ্র, মন্মথনাথ ও হেমচন্দ্র তখনও নাবালক। কোর্ট হইতে হুকুম না হইলে নাবালকদিগের বিষয় ভাগ হইতে পারে না, সেই কারণে হাইকোর্টে যৌথ সম্পত্তি বিভাগ করিবার জন্য ১৮৭২ খৃস্টাব্দে ৭১নং একটি পার্টিশন মোকদ্দমা দীননাথ মল্লিক বাদী হইয়া দ্বারিকানাথ, শ্রীগোপাল,

প্রবোধচন্দ্র, মন্মথনাথ ও হেমচন্দ্রের নামে দাখিল করেন। হাইকোর্ট হইতে দ্বারিকানাথ নাবালকগণের গার্জেন ও সকল যৌথ সম্পত্তির রিসিভার নিযুক্ত হন। ১৮৭৩ খৃস্টাব্দ ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের একটি আদেশে মহারাজা যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা দিগম্বর মিত্র এবং কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় সালিসী বা কমিশনার অফ পার্টিশন নিযুক্ত হইয়া সকল সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিবার আদেশ হয় এবং সালিসিগণ ৺রাধানাথ মল্লিক মহাশয়ের সকল সম্পত্তি চারি অংশে বিভাগ করিয়া দেন এবং তাঁহাদের মতানুসারে ২১শে আগস্ট ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে যৌথ সম্পত্তি বিভাগের শেষ আদেশ হয়।

১৮৭৫ খৃস্টাব্দ হইতে একান্নবর্তী পরিবার পৃথক হইয়া যায়। জ্যেষ্ঠ জয়গোপাল মল্লিকের তিন পুত্র প্রবোধচন্দ্র, মন্মথনাথ এবং হেমচন্দ্র কয়েক বৎসর দ্বারিকানাথের সহিত এক সংসারে থাকিয়া সাবালক হইয়া প্রথমে বহুবাজার শাঁখারিটোলায় চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ৩নং শাঁখারিটোলা লেনস্থ বাটী ভাড়া লইয়া কিছুকাল তথায় বাস করিয়া পরে ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ ভবন নির্মাণ করাইয়া তিন ভ্রাতায় একত্রে সপরিবারে বাস করেন।

দ্বারিকানাথ পৈতৃক ভবনের উত্তরাংশ যাহা এখন ১৮নং রাধানাথ মল্লিক লেন তথায় গিয়া বাস করেন।

দীননাথ পার্সিবাগানে সারকুলার রোডের উপর সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া তথায় গিয়া বাস করেন। উপস্থিত উক্ত বাটীর জমিতে টি. পালিত মহাশয়ের অর্থে বিজ্ঞান কলেজ নির্মাণ হইয়াছে।

কনিষ্ঠ শ্রীগোপাল দ্বারিকানাথের সহিত একত্রে বাস করিতে থাকেন। দুই ভাইয়ে বিশেষ ভালবাসা ছিল এবং দ্বারিকানাথের স্বর্গারোহণের পরও শ্রীগোপাল দ্বারিকানাথের পুত্র চারুচন্দ্রের সহিত এক সংসারে থাকেন। পরে পৈতৃক ভবনের দক্ষিণ দিকে ৪৬নং ক্যাথিড্রেল মিশন লেনে (অধুনা শ্রীগোপাল মল্লিক লেন) নূতন অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে তথায় গিয়া বাস করেন।

স্বর্গারোহণ—দ্বারিকানাথ তিন দিবস মাত্র জ্বর রোগে এবং পেটের গোলমালে ভুগিয়া, তিন কন্যা এবং পত্নীকে রাখিয়া ২৪শে অক্টোবর ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে বাংলা ১২৮৪ সনে বুধবার ৯ই কার্তিক পূর্ণিমা তিথিতে রাত্র ১০ ঘটিকার সময় ১৮নং রাধানাথ মল্লিক লেনস্থ ভবনে স্বর্গারোহণ করেন।

দ্বারিকানাথ একখানি উইল পত্র করিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র চারুচন্দ্রকে তাঁহার

সকল সম্পত্তির একজিকিউটার নিযুক্ত করিয়া যান এবং প্রত্যেক কন্যাকে আট হাজার টাকা করিয়া দিয়া যান। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রচন্দ্র তখন নাবালক ছিলেন।

দ্বারিকানাথের স্বর্গারোহণে কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত লোক বিশেষ দুঃখিত হন এবং সকল সংবাদপত্রে তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।

"Since last few weeks Death has been busy among the high and educated in Calcutta. Babu Dwarkanath Mullik of College Square a Zemindar but better known as the most enterprising and successful dock-proprietor, has been gathered to his father. A shrewd man of business and hard common sense with winning manners and without any blemish in his character he had the rare faculty of enlivening with his quaint humour and broad laugh any company in which he was placed. He was a Justice of the Peace and Honorary Magistrate in Calcutta. His sudden death is mourned by a large circle of relatives, friends and acquaintances."

—Hindu Patriot, 29 October 1877.

We are sorry to announce the death of Babu Dwarkanath Mullick of Puttledanga. He was a noted wealthy Native gentleman of Calcutta and possessed some public spirit, He was a Justice of Peace. He had many friends by whom he was much esteemed.

—Indian Mirror, 27 October 1877.

"এই ভয়ঙ্কর কার্ত্তিক মাস যে কত লোককে স্বামী পুত্র প্রভৃতি আত্মীয় বিরহে কাতর করিবে তাহা ভাবিলে প্রাণ আকুল হয়। পূর্ব্ববারে আমরা যাহাদের নাম করিয়াছি তাহা ছাড়া আরও কয়েকটী শিক্ষিত যুবার মৃত্যু হইয়াছে। সম্প্রতি আমাদের প্রতিবাসী বাবু দ্বারকানাথ মল্লিক মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। ইনি একজন ধনী ও মান্যমান লোক ছিলেন।"

—সুলভ সমাচার, ১লা কার্ত্তিক ১২৮৪

দ্বারিকানাথের স্ত্রী শ্রীমতী নিস্তারিণী ২৬শে মে রবিবার ১৯০১ খৃষ্টাব্দে

তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রচন্দ্রের ২২নং রাধানাথ মল্লিক লেনস্থ ভবনে ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার স্বর্গারোহণে তাঁহার তিন পুত্র চারুচন্দ্র, শরৎচন্দ্র এবং ক্ষেত্রচন্দ্র বিশেষ ধুমধামের সহিত দানসাগর শ্রাদ্ধ করিয়া যথারীতি হিন্দুমতে মাতার শেষ কার্য সুসম্পন্ন করেন।

দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী স্বরতমণীর বহুবাজার নিবাসী যোগেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সহিত শুভবিবাহ হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অতি অল্পবয়সে ২২শে জুন ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

দ্বারকানাথের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সৌদামিনীর ৪ঠা মে ১৮'৮ খৃস্টাব্দে পাথুরিয়াঘাটার সুবিখ্যাত ঘোষবংশের খেলাতচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের দত্তক পুত্র স্বনামধন্য পুরুষ রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের সহিত শুভবিবাহ হয়। ভারতের প্রথম ইংরাজ গবর্ণর ওয়ারেন হেস্টিংস সাহেব রামলোচন ঘোষকে আপনার দেওয়ান নিযুক্ত করেন এবং রামলোচন অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হন। রামলোচনের পৌত্র খেলাতচন্দ্র তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র রমানাথকে দত্তক গ্রহণ করেন। রমানাথ সুশিক্ষিত হইযা যৌবনে সকল সভা-সমিতি ও দেশহিতকর কার্যে যোগদান করেন এবং সমাজের সকল বিষয়ে উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হন। রাজদরবারে তাঁহার অসীম সম্মান এবং সমাজে তাঁহার অশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহাকে ভগবান যেমন অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী করিয়াছিলেন সেইরূপ তাঁহার হৃদয়ে দানের উৎস দিয়াছিলেন। সম্ভ্রান্ত বংশের তিনি একটি অতি উজ্জ্বল রত্ন ছিলেন।

তাঁহার সম্বন্ধী চারুচন্দ্র ও ক্ষেত্রচন্দ্রের সহিত তাহার আন্তরিক সৌহার্দ্য এবং বন্ধুত্ব ছিল। পাথুরেঘাটার ঘোষবংশের সহিত পটলডাঙ্গার মল্লিকবংশের অনেকগুলি আদানপ্রদান হইয়া উভয় বংশের মধ্যে অত্যন্ত নিকট আত্মীয়তার সৃষ্টি হইয়াছে। রমানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র সিদ্ধেশ্বরও একজন উপযুক্ত সন্তান ছিলেন। সিদ্ধেশ্বরের অল্পকালব্যাপী জীবনে তাঁহার অশেষ গুণগরিমায় দেশবাসী মুগ্ধ হইয়াছিল। ভগবান রমানাথ ও সিদ্ধেশ্বরকে অকালেই ডাকিয়া লন। ১১ই শ্রাবণ ১৩১১ বঙ্গাব্দে রমানাথ তিনপুত্র গণেশ, সিদ্ধেশ্বর ও অক্ষয় এবং পাঁচ কন্যা রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন।

সিদ্ধেশ্বর ৯ই শ্রাবণ ১৩০৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিন্দু স্কুল ও গৃহশিক্ষকের নিকট হইতে বাঙ্গলা ও ইংরাজী ভাষা ভালভাবেই শিক্ষা করেন। অল্পবয়স হইতেই সিদ্ধেশ্বর সকলের সহিত মিশিতেন এবং নানারূপ দেশহিতকর

কার্যে যোগদান করিতেন। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার আলয়ে একবার পদার্পণ করিলে সিদ্ধেশ্বর তাঁহার হস্তে হরিজন ভাণ্ডারে দানস্বরূপ পাঁচ হাজার টাকা দেন এবং নানারূপ কার্যে তিনি বহু টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ১লা ফাল্গুন ১৩৩৬ তারিখে অল্পবয়সে একমাত্র কন্যা এবং স্ত্রীকে রাখিয়া সিদ্ধেশ্বর ইহধাম ত্যাগ করেন। রমানাথের কনিষ্ঠ পুত্র অক্ষয়ও অল্পবয়সে একটিমাত্র কন্যা ও স্ত্রীকে রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন।

পাথুরিয়াঘাটার ঘোষবংশ
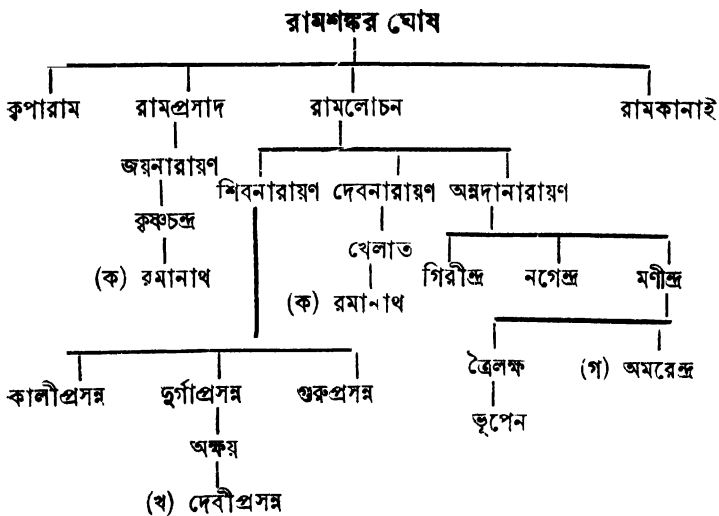
(ক) রমানাথ দ্বারিকানাথ বসুমল্লিকের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সৌদামিনীকে বিবাহ করেন।

(খ) দেবীপ্রসন্ন যতীন্দ্রচন্দ্র বসুমল্লিকের কন্যা শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ীকে বিবাহ করেন।

(গ) অমরেন্দ্রনাথ নগেন্দ্র বসুমল্লিকের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী ইন্দুমতীকে বিবাহ করেন।

দ্বারকানাথের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী তরঙ্গিণীর দর্জিপাড়া মিত্র বংশের কুমুদকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র পুরেন্দ্রনাথের সহিত বিবাহ হয়। ২৩শে ডিসেম্বর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্তান স্ত্রীকে রাখিয়া পুরেন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন।

দ্বারকানাথের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মৃণালিনী ২৭শে মে ১৮৭৮ তারিখে অল্পবয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চারুচন্দ্র বসুমল্লিক

দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র ২৭ পর্যায়ে মুখ্য কুলীন চারুচন্দ্র ৩রা অক্টোবর ১৮৫০ খৃস্টাব্দে শনিবার ১৯শে কার্তিক ১২৫৭ সনে ৺কালীপূজার দিবস রাত্র ১২টায় শুভলগ্নে তাঁহার মাতুল বিনয়কৃষ্ণ রায় মহাশয়ের বিডন স্ট্রীটস্থ ভবনে ভূমিষ্ঠ হন।

চারুচন্দ্র বাল্যকাল হইতে মেধাবী এবং তীক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন তেজস্বী বালক ছিলেন। তিনি প্রথমে হিন্দু স্কুলে বিদ্যার্জন করিয়া ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে আই. এ. পরীক্ষা দেন। এবং ১৮৭০ খৃস্টাব্দে উক্ত প্রেসিডেন্সি কলেজ পরিত্যাগ করিয়া কর্মজীবনে প্রবেশ করেন।

ভ্রাতৃপ্রেম—চারুচন্দ্রের পিতা দ্বারিকানাথ একান্নবর্তী পরিবারের এবং যৌথ সম্পত্তি ও কারবারের কর্তা ছিলেন এবং চারুচন্দ্র বাল্যকাল হইতে পিতার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ সর্বদা নিকটে থাকিয়া সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১০৮৭ খৃস্টাব্দে তিনি চারুচন্দ্রকে আমমোক্তারনামা পত্র দিয়া তাঁহার উপর সকল কার্য পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। ঐ সনের ২৪শে অক্টোবর তারিখে চারুচন্দ্রের পিতাঠাকুর স্বর্গারোহণ করিলে চারুচন্দ্র যথোচিত হিন্দুশাস্ত্রমতে ৺পিতার শেষ কর্ম বিশেষ সমারোহে দানসাগর শ্রাদ্ধ করিয়া সুসম্পন্ন করেন। চারুচন্দ্র তাঁহার পিতামহের পৈতৃক ভবন ১৮নং রাধানাথ মল্লিক লেনে আজীবনই সপরিবারে বাস করিয়া গিয়াছেন। চারুচন্দ্র ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে অবধি দুই কনিষ্ঠ সহোদর শরৎচন্দ্র এবং ক্ষেত্রচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ পিতৃব্য শ্রীগোপালের সহিত একত্রে সপরিবারে বাস করিয়াছিলেন এবং চারুচন্দ্র সকলকে নিজ মহৎগুণে আপনার করিয়া বাটীর কর্তা হিসাবে সকল সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করিতেন। ক্রমে তাঁহার ভ্রাতৃগণের পরিবারবর্গ বৃহত্তর হইতে থাকে এবং একসঙ্গে থাকা অসুবিধা হইয়া উঠে। ১৮৮৮

খৃস্টাব্দের ১২ই এপ্রিল তারিখ হইতে পৈতৃক সম্পত্তি তিন সহোদরে অপরের বিনা মধ্যবর্তিতায় নিজেদের মধ্যে আপসে বিভাগ করিয়া লন। বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি বেশ সদ্ভাবের সহিত নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া পৃথক হইলেও তাঁহাদের একতা কোনরূপ নষ্ট হয় নাই। তিন ভ্রাতার মধ্যে চিরজীবন ভ্রাতৃপ্রেম এবং মিলন ছিল। জ্যেষ্ঠকে কনিষ্ঠ দেবতুল্য ভক্তি এবং সম্মান করিতেন এবং জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ দুই ভাইকে স্নেহ ও ভালবাসা দানে কখনও শৈথিল্য করেন নাই।

চারুচন্দ্রের সকল জ্ঞাতি ভ্রাতা এবং ভ্রাতুষ্পুত্রগণ পৈতৃক ভবন পরিত্যাগ করিয়া অন্যান্য বাটীতে গিয়া বাস করিতে থাকেন বটে ; কিন্তু এত বড় সংসারের এতগুলি জ্ঞাতির সন্তান সকলের মধ্যে জ্ঞাতিবিরোধ বলিয়া কিছু ছিল না। কাহারও বাটীতে কোন পূজা পর্ব বিবাহাদি কার্য হইলে, এই বৃহৎ পরিবারের প্রত্যেকেই তথায় উপস্থিত হইয়া নিজ বাটীর কার্যের ন্যায় তত্ত্বাবধান করিতেন। ৺রাধানাথ বসুমল্লিক মহাশয়ের আটজন প্রপৌত্রের মধ্যে চারুচন্দ্র বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং বংশের মধ্যে কর্তা হিসাবেই গণ্য হইতেন। প্রবোধচন্দ্র অল্পবয়সে স্বর্গারোহণের পর, চারুচন্দ্রকে হেমচন্দ্র, মন্মথচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, ক্ষেত্রচন্দ্র, নগেন্দ্র, যোগেন্দ্র এবং সতীশচন্দ্র মেজদাদা বলিয়া ডাকিতেন এবং মেজদাদার সহিত পরামর্শ না করিয়া কোন কাজ করিতেন না। চারুচন্দ্র সকল সময়ে সকলের বাটী সদা সর্বদা যাতায়াত করিতেন এবং সকল বিষয়ে পরামর্শ দিতেন এবং সাহায্য করিতেন। উক্ত আট জন জ্ঞাতি ভ্রাতা কোন পর্বাদি না থাকিলেও প্রতি মাসে অন্তত একবার কাহারও বাটীতে বা উদ্যানে আত্মীয় বন্ধুগণ সমভিব্যাহারে মিলিত হইতেন এবং আহারাদি করিতেন এবং এই মিলন বন্ধন কখনও শিথিল হইতে দেন নাই। কেবল ভ্রাতৃগণের মধ্যে নহে, সকলের স্ত্রী-পুত্রগণের মধ্যেও ভালবাসার ও একতার প্রীতিডোর আজীবন পরস্পরের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ১৮৮৭ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কনিষ্ঠ সহোদর ক্ষেত্রচন্দ্র যখন বিদেশে ভ্রমণ করিতে যান, তিনি মেজদাদার উপর তাঁহার বিষয়সম্পত্তি দেখিবার আমমোক্তারনামা দিয়া যান। প্রতি বৎসর পটলডাঙ্গাস্থ চারুচন্দ্র, ক্ষেত্রচন্দ্র এবং সতীশচন্দ্রের বাটীতে বিশেষ ধুমধামের সহিত ৺শারদীয়া দুর্গাপূজা হইত। উক্ত ৺পূজার সপ্তমীদিবস মধ্যাহ্নে চারুচন্দ্রের ভবনে, অষ্টমী দিবস মধ্যাহ্নে ক্ষেত্রচন্দ্রের ভবনে এবং নবমী মধ্যাহ্নে সতীশচন্দ্রের ভবনে সকল ভ্রাতা স্বপরিজন লইয়া গিয়া আহার করিতেন এবং

ইহা যেন বাৎসরিক কুলপ্রথার মত ছিল। ৺শারদীয়া পূজার সময় তিন দিবসই থিয়েটার, যাত্রা প্রভৃতি নানারূপ আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান হইত।

রাজদরবারে—ন্যায়পরায়ণতা ও বিচারশক্তি চারুচন্দ্রের অসীম ছিল। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট চারুচন্দ্রের বিদ্যাবুদ্ধির বিষয় সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার মাত্র তেইশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে ৬ই জুন মঙ্গলবার হইতে তাঁহাকে ২৪ পরগণা জেলার অবৈতনিক প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মনোনয়ন করিয়া প্রথমে দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা এবং অল্পদিবস পরেই প্রথম শ্রেণীর ক্ষমতা দিয়া সম্মানিত করেন। ১৮৮১ খৃস্টাব্দে এপ্রিল মাস হইতে বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্ট চারুচন্দ্রকে জাষ্টিস্ অব্ পিস্ রূপে নির্বাচিত করেন।

No. 1937 A

Government of Bengal

Appointment Department.

Notification.

Calcutta, the 11th April 1887.

Babu Charoo Chandra Mullick is appointed under Section 8. Act IV of 1877 to be a Presidency Magistrate for the town of Calcutta.

By order of the Lieutenant Governor of Bengal.

(Sd) Horace A. Cockerell

Secretary to the Government of Bengal.

চারুচন্দ্র অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে আজীবন প্রতি মাসে লালবাজার পুলিস কোর্টের বেঞ্চে দুইদিবস এবং শিয়ালদহ পুলিস কোর্টের বেঞ্চে একদিবস বসিয়া অতি সুন্দরভাবে বিচারকার্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনেক রায় তৎকালীন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৮৮২ খৃস্টাব্দের প্রারম্ভ হইতে চারুচন্দ্র হাইকোর্টের স্পেশাল জুরী নিযুক্ত হন। চারুচন্দ্র বহু বিষয়ে বাঙ্গালার গভর্ণমেণ্টের কার্যের সাহায্য করিয়া গিয়াছেন এবং বহুরূপে সম্মানিত হইয়াছেন। গভর্ণমেণ্ট নানাবিধ দেশহিতকর কার্যের কমিটিতে চারুচন্দ্রকে কমিটির সভ্য নির্বাচন করিতেন। বড়লাট সাহেব এবং বাঙ্গালার গভর্ণরের লিস্টে Viceroy's List and Governor's List of Guests-এ চারুচন্দ্রের নাম ছিল এবং গভর্ণমেণ্ট হাউসের সকলরূপ

উৎসবাদিতে চারুচন্দ্র নিমন্ত্রিত হইতেন। চারুচন্দ্র ২২শে ডিসেম্বর ১৮৮২, ২৫শে ডিসেম্বর ১৮৯৬ এবং আরও কয়েকবার বাঙ্গালার গভর্ণরের সহিত সাক্ষাৎ Private interview করিতে গিয়াছিলেন। ৫ই জানুয়ারী ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারেল আর্ল অব্ ডাফরিন সাহেব কলিকাতা হইতে তারেকেশ্বর অবধি প্রথম রেলপথ উন্মোচন করিতে যাইলে চারুচন্দ্র ভাইস্‌রয় কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহার সহিত নূতন রেলশকটে তারকেশ্বর অবধি যাতায়াত করিয়াছিলেন।

১৮৮০ খৃস্টাব্দের ৬ই নবেম্বর তারিখের একটি অর্ডারে গভর্ণমেণ্ট কোনরূপ লাইসেন্স না রাখিয়া সকলরূপ বন্দুক তরবারি ইত্যাদি অস্ত্রশস্ত্র রাখিবার এবং চারিজন "Retainers" বা সশস্ত্র শরীররক্ষক সর্বদা সঙ্গে রাখিবার অনুমতি দিয়া তাঁহাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

No. 3645

From the Commissioner of Police Calcutta.
To Babu Charu Chandra Mullick
Pattaldanga
Dated 6th November 1880.

Sir,

I have the honour to inform you that Notifiication of the Government of Bengal dated the 26th ultimo the Lieutenant Governor of Bengal has been pleased to exempt you from the operation of all prohibitions and directions contained in section 13 to 16 of the Indian Arms Act XI of 1878 other than those referring to common articles designed for torpedo service, war rockets and machinery for the manufacture of of arms & ammunitions and to sanction you entertaining four armed retainers.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant;
(Sd) W. M. Santher,
Commissioner of Police.

রাজদরবারে এবং সকলরূপ গভর্ণমেণ্টের কার্য্যেই তাঁহার অশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। ১৯০১ খৃস্টাব্দে ভারতসম্রাজ্ঞী মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বর্গারোহণ করিলে, কলিকাতায় তাঁহার স্মৃতির জন্য যে শোকসভার ব্যবস্থা করা হয়, বঙ্গদেশের সর্বসাধারণের পক্ষ হইতে সকল অনুষ্ঠানের জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়। উক্ত কমিটিতে শোভাবাজার রাজবংশের মহারাজা স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সভাপতি এবং পাইকপাড়ার কুমার সতীশচন্দ্র সিংহ এবং চারুচন্দ্র বসু-মল্লিক মহাশয় সম্পাদক নির্বাচিত হন। উক্ত কমিটি লক্ষাধিক টাকা চাঁদা তুলিয়া চারুচন্দ্র ও অন্যান্য রাজা মহারাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সাহচর্যে কলিকাতার গড়ের মাঠে একটি বিরাট শোকসভার অনুষ্ঠান করেন এবং একলক্ষ দরিদ্রকে আহার করান। তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন সাহেব এই কাঙ্গালী ভোজনের বিরাট অনুষ্ঠান দেখিয়া বিস্মিত হন এবং কর্মকর্তাদের প্রশংসা করিয়া আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

১৯১১ খৃস্টাব্দে ভারতসম্রাট জর্জ দি ফিফ্‌থ এবং ভারতসম্রাজ্ঞী ভারতবর্ষে আসেন। ১৯১২ খৃস্টাব্দে জানুয়ারী মাসে তাঁহারা কলিকাতায় আসিলে বঙ্গবাসী-দিগের পক্ষ হইতে একটি কমিটি গঠন করিয়া তাঁহাদিগকে যথোচিত অভ্যর্থনার জন্য নানারূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং চারুচন্দ্র উক্ত কমিটির একজন বিশেষ কর্মী নির্বাচিত হন। ৩রা জানুয়ারী তারিখে রাত্রি ৯টার সময় গড়ের মাঠে বাজী পোড়ান এবং অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান করা হয়। উক্ত কমিটির চারিজন সভ্য মিস্টার জে. জে. আপকার, রাজা কৃষ্ণদাস লাহা, মিস্টার এমারসন এবং চারুচন্দ্র মল্লিক মহাশয় গভর্ণমেণ্ট হাউস হইতে সম্রাজ্ঞীকে অভ্যর্থনা করিয়া অনুষ্ঠানের স্থানে আনিতে যান। ভারতবর্ষের গভর্ণর লর্ড মিণ্টো সাহেব উক্ত চারিজনকে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর সহিত পরিচিত করিয়া দেন এবং সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী তাঁহাদিগের সহিত করমর্দন করিয়া আলাপ করেন এবং একসঙ্গে উৎসবক্ষেত্রে আগমন করেন।

Court Circular

Calcutta 4 January, 1912.

The following gentlemen members of the Illumination Committee had the honor of being presented to the King Emperor and Queen Empress by His Excellency—

Mr. J. G. Apcar
Raja Kristo Das Law
Mr. Emerson and
Babu Charu Chundra Mallick.

লর্ড কার্জন সাহেব ১৯০৩ খৃস্টাব্দে ১লা জানুয়ারী তারিখে দিল্লীতে যে সুবৃহৎ করোনেশন দরবারের অনুষ্ঠান করেন এবং ১৯১১ খৃস্টাব্দে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ ও সম্রাজ্ঞী মেরী ভারতে শুভাগমন করিলে ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জের উপস্থিতিতে ১১ই ডিসেম্বর ১৯১১ খৃস্টাব্দে যে বিরাট দরবার হয় এই দুইটি দরবারে চারুচন্দ্র ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া বঙ্গের প্রতিনিধি-স্বরূপ অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহোদয়ের সঙ্গে দিল্লীতে গিয়া দরবারে যোগদান করেন এবং সম্মানিত হন। ঐ দুইটি দিল্লীর দরবারে ভারতসম্রাটের অভিষেকক্রিয়া সুসম্পাদনের জন্য যেরূপ মহা আড়ম্বর হয় তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ভারতবর্ষের প্রায় সকল রাজন্যবর্গ এবং বিশিষ্ট প্রজাগণ এই মহোৎসবে যোগদান করেন। কথিত আছে লর্ড কার্জন সাহেবের প্রথম দরবারে প্রায় এক কোটি টাকা খরচ হইয়াছিল। ১৯১১ খৃস্টাব্দের দিল্লীর দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ ঘোষণা করিয়া কলিকাতা হইতে ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত করেন, এবং লর্ড কার্জন বঙ্গবাসীদের প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া বঙ্গদেশকে যে বিচ্ছেদ করিয়া দুইটি প্রদেশ করেন তাহা রহিত করিয়া বঙ্গবাসীর মনস্তুষ্টির জন্য বাঙ্গালাদেশ একজন গভর্ণরের শাসনকর্তার অধীনে প্রেসিডেন্সী করেন।

১৯০৩ খৃস্টাব্দের দরবারের পর চারুচন্দ্র কাইসার-ই-হিন্দ পদক প্রাপ্ত হন। চারুচন্দ্রের গভর্ণমেণ্টের নিকট যেরূপ সম্মান ও খাতির ছিল তিনি ইচ্ছা করিলে খুব বড় উপাধি লাভ করিতে পারিতেন এবং তাঁহার সহিত বড় বড় রাজ-কর্মচারীর বিশেষ পরিচয় থাকায় দুই-একবার তাঁহাকে খেতাব দিবার [illegible] কন্তু তিনি কোনরূপ খেতাব লইয়া বড় হইতে অভিলাষ করেন নাই। তিনি বলিতেন, "খেতাব বা কোন উপাধি বিহীন মিষ্টার গ্ল্যাডস্টোনের

সম্মান অনেক লর্ডের অপেক্ষা উচ্চ ছিল। খেতাব লইলে তাহার সম্মান বজায় রাখিতে কেবল বড় বড পার্টি দিতে হইবে এবং অনবরত কেবল চাঁদার খাতায় সই চাই।"

তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক বিনা লাইসেন্সে যত ইচ্ছা বন্দুক তরবারি রাখিবার ক্ষমতা এবং চারিজন বন্দুকধারী শরীররক্ষক সঙ্গে লইয়া বেড়াইবার অনুমতি পাইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার বাটীতে বহু ভাল ভাল বন্দুক, তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র থাকিলেও কখনও ফটক দরবানের হাতে বন্দুক দিয়া বা সঙ্গে তরবারিধারী শরীররক্ষক লইয়া বাহির হন নাই।

চারুচন্দ্র গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ১৯০০ খৃস্টাব্দে Indian Charitable Famine Relief Fund, Indian Museum, Lady Duffrine Hospital ইত্যাদি বহু বড় বড় কমিটির সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন।

চারুচন্দ্র বহু বড় বড় বিষয়সম্পত্তি লইয়া মামলা-মোকদ্দমায় সালিশী বা আর্বিট্রেটর কমিশনার অফ্ পার্টিশন হইয়া বহু বিবাদ আপোষে মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন এবং বহু ব্যক্তির সম্পত্তি অকারণ অপব্যয় হইতে রক্ষা করিয়া দিয়াছেন। দর্জিপাড়ার ভুবনমোহন মিত্রের সম্পত্তি এবং ঐ বংশের মহিমেন্দ্র-কৃষ্ণ মিত্রের তিন ভ্রাতার সম্পত্তি চারুচন্দ্র মধ্যস্থ হইয়া আপোষে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮ই মার্চ ১৯০২ খৃস্টাব্দে ২৪ পরগণার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কমিশনার অফ্ পার্টিশন নিযুক্ত হইয়া চারুচন্দ্র টালিগঞ্জের নবাব বংশের নবাব ইয়াসুফ আলি, মহম্মদি হোসেন, আমেদী বেগম এবং মুন্নি বেগম প্রভৃতির সম্পত্তি বণ্টন করিয়া দেন। উক্ত টালিগঞ্জের নবাব বংশের সকলের সহিত চারুচন্দ্রের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। কলিকাতা হাইকোর্টের ১৯১১ খৃস্টাব্দের ১৬নং মোকর্দমায় চারুচন্দ্র ১৬৮।১নং লোয়ার সারকুলার রোডস্থ নবাব সৈয়দ আসদ আলি খাঁর নাবালিকা কন্যা সাহানা বানু মুন্নি বেগমের বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং অন্যান্য উক্ত বংশের শরিকানদিগের সহিত তাহার বিষয়সম্পত্তি বিভাগের জন্য নসিরাম বিবির সহিত গার্জেন বা অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তাঁহার নিজের পল্লীর মধ্যে বহু পল্লীবাসীর সম্পত্তি শরিকানদের মধ্যে আপোষে বিভাগ করিয়া দিয়া মামলা-মোকদ্দমার বহু খরচ হইতে সম্পত্তি রক্ষা করিয়া দিয়াছেন।

ধীর বিবেচনাশক্তি তীক্ষ্ণ মেধা ও অপরিসীম সত্যনিষ্ঠার বলে চারুচন্দ্র

সামাজিক এবং দেশহিতকর ও সর্বসাধারণের উন্নতিবিধান কার্যে যেরূপ সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছিলেন, ব্যবসা-বাণিজ্যে তেমন আশানুরূপ কৃতকার্যতা লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু অকৃতকার্যতা তাহার জীবনে যে শান্তি এবং যে সন্তোষ বহন করিয়া আনিয়াছিল তাহাতেই তিনি সুখী ছিলেন। সর্বজনহিতকর কার্যেই চারুচন্দ্রের মহামূল্য সময় অতিবাহিত হইত কিন্তু বিষয়বুদ্ধি এবং জমিদারীর কার্যে এবং নিজ পৈতৃক অতুল বিভব রক্ষণাবেক্ষণের নীতি ও কর্মজ্ঞান তাঁহার অসাধারণ ছিল।

ইণ্ডিয়ান ম্যাচ ফ্যাক্টরী—চারুচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ ছিল দেশের শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তার করিয়া দেশের টাকা দেশে যাহাতে থাকে তাহার চেষ্টা করা। ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে চারুচন্দ্র রাজা জানকীনাথ, রমানাথ ঘোষ ইত্যাদি মহোদয়ের সহিত Indian Match Factory Ltd. বা ভারতীয় দেশলাই-এর কারখানা নামক একটি যৌথ কারবার প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত কোম্পানির হেড অফিস হয় ৬৬নং কলেজ স্ট্রীটে এবং নূতন খালের ধারে বেলেঘাটা রোডের উপর উক্ত দেশলাই-এর কারখানা বাটীতে দেশলাই প্রস্তুতের কল বসান হয়। কারখানার মূলধন ছিল ৭০,০০০৲ টাকা। ২১শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ তারিখে মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, জাস্টিস গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, রমানাথ ঘোষ ইত্যাদি বহু বাঙ্গালী ও ইংরাজ ভদ্রলোকের উপস্থিতিতে উক্ত কারখানা প্রতিষ্ঠা হয়। চারুচন্দ্র সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত যৌথ কারবারের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর নির্বাচিত হন। দুর্ভাগ্যক্রমে চারুচন্দ্রের বহু চেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও ভাল এবং উপযুক্ত কাষ্ঠের অভাবে তাহা কৃতকার্য হয় নাই।

চারুচন্দ্রের অন্যান্য সকল কারবারের মধ্যে বেঙ্গল বণ্ডেড ওয়ার হাউস, ১৮৩৮ ও ১৮৫৪ খৃস্টাব্দের ৫ আইনের দ্বারা ১৩,৫০,০০০ লক্ষ টাকার মূলধন লইয়া অংশীদারগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। গঙ্গার ধারে স্ট্র্যাণ্ড রোড এবং ক্লাইভ স্ট্রীট এর মধ্যে বহুলক্ষ মুদ্রার বড় বড় কয়টি অট্টালিকায় মাল রাখিবার ও আফিসঘর ভাড়া দিবার জন্য বাটী প্রস্তুত হয়। গুদামঘরগুলিতে বিদেশ হইতে জাহাজের মাল সকল আনিয়া রক্ষিত হয়। উক্ত কারবারের অনেকগুলি শেয়ার খরিদ করিয়া চারুচন্দ্র একজন বড় অংশীদার হন এবং ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে উক্ত যৌথ কারবারে ডাইরেক্টর নির্বাচিত হইয়া আজীবন উক্ত ব্যবসায় সকল বিষয় পর্যবেক্ষণ করিয়া সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন। প্রতি বৎসর উক্ত

কারবারের উন্নতি হইয়া প্রভূত লাভ হয় এবং অংশীদারগণ নিয়মিতভাবে বিশেষ লাভবান হন।

১৯০০ খৃস্টাব্দে চারুচন্দ্রজোন্স স্টুয়ার্ড ব্রাউন সাহেবের সহিত বিলাতী তৈলের রংএর একটি কারবার খোলেন এবং এই কারবারের নাম হয় J. Steward Brown and Co. এবং হেয়ার স্ট্রীটের একটি বাটীতে আফিস করা হয়। চারুচন্দ্র উক্ত কারবারে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা খরচ করেন এবং ইংলণ্ড ও জার্মানী হইতে নানারূপ রং আমদানী করা হয়। দুই বৎসর উক্ত কারবার সুন্দর চলে। ব্রাউন সাহেবের অন্যান্য কয়টি কারবার ছিল এবং তিনি অন্য কয়েকটি কারবারের জন্য ঋণী হইয়া হঠাৎ হাইকোর্টে ইনসলভেন্সি ফাইল করিয়া অস্ট্রেলিয়ায় চলিয়া যান। ইহাতে চারুচন্দ্রের আর্থিক কিছু ক্ষতি হয়। চারুচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন বাণিজ্যে লক্ষ্মী তাঁহার উপর সুপ্রসন্ন নহেন। সেই কারণে তিনি বিশেষ সাবধানে ব্যবসায় অগ্রসর হন এবং বড় কোন কারবার করিতে সাহসী হন নাই।

বগুড়া এবং দিনাজপুরের মধ্যে মিস্টার উইলিয়ম পিটার সাহেবের কয়টি নীলকুঠি এবং একটি বড় জমিদারী ছিল। উক্ত পিটার সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যা মিসেস্ ক্যাম্বেল উক্ত জমিদারী ও কারবার বিক্রয় করিয়া বিলাত প্রত্যাগমন করিবার মনস্থ করিলে চারুচন্দ্র ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯০ খৃস্টাব্দে ৯১০০০৲ টাকা দিয়া উক্ত জমিদারী এবং স্থাবর অস্থাবর সকল সম্পত্তি ক্রয় করেন এবং নিজ তত্ত্বাবধানে দেখাশুনা করিতে থাকেন। তিনি উক্ত জমিদারীতে নূতন অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া স্বয়ং কয়বার গিয়া সকল বিষয় বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আসেন। স্থানীয় বালকবালিকাগণের শিক্ষার জন্য বাগজানা এবং পাঁচবিবি নামক স্থানে দুইটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া বিদ্যালয়ের সকল ব্যয় তিনি বহন করিতে থাকেন। এখনও বাগজানায় উক্ত "চারুচন্দ্র মিডল্ ইংলিস ইস্কুল" তাঁহার নামে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। তিনি সকল প্রজার অভিযোগ ও আবেদন নিজে দেখাশুনা করিয়া হুকুম দিতেন এবং প্রজাগণ তাঁহাকে রাজার ন্যায় মান্য ও দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। চারুচন্দ্র উক্ত সম্পত্তির কয় বৎসরে এত উন্নতিসাধন করেন যে উক্ত ৯১০০০৲ মূল্যের সম্পত্তি তাঁহার স্বর্গারোহণের পর গবর্ণমেণ্ট প্রোবেট ডিউটি ট্যাক্স লইবার জন্য ছয় লক্ষ টাকা মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া তাহার উপর ট্যাক্স ধার্য করেন।

সভাসমিতি—চারুচন্দ্রের জীবনের অধিকাংশ সময়ই জনহিতকর কার্যে

ব্যয় হইয়াছিল। তাঁহার সময়ের কলিকাতায় সকল সভাসমিতিতে চারুচন্দ্র যোগদান করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতেই চারুচন্দ্র সকল সভাসমিতিতে মিশিতেন এবং সকল শ্রেণীর লোকের সহিত সকল রকম ভাবের বিনিময় করিতেন। ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে তিনি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র সেই সময়ই তিনি তথায় Presidency College Debating Club বা ছাত্রগণের মধ্যে একটি তর্কসভা প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত ক্লাবের ছাত্রগণের মধ্যে তিনি মধ্যে মধ্যে বক্তৃতার আয়োজন করিতেন এবং নিজেও বক্তৃতা দিতেন। উক্ত সভায় ছাত্রবয়সেই চারুচন্দ্র "On Duties we owe to God, men and ourselves." (আমাদের ঈশ্বরের, মানবের এবং নিজেদের প্রতি কি কর্তব্য) এবং "রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়" বিষয় ইংরাজী ভাষায় গবেষণাপূর্ণ দুইটি বক্তৃতা দেন। বাল্যকাল হইতেই চারুচন্দ্রের হৃদয়ক্ষেত্রে যে সকল সুন্দর বীজ বপন হয়, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেইসকল বীজ হইতে সুন্দর সুন্দর নানাগুণ-সম্মিলিত ফলপুষ্পরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া চারুচন্দ্রকে একজন মহৎ ব্যক্তিতে পরিণত করে।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন—১৮৭১ খৃস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী হইতে চারুচন্দ্র জমিদারগণের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সভ্য হন এবং জীবনের শেষ দিবস অবধি উক্ত এসোসিয়েশনের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া নানারূপ দেশহিতকর কার্য করেন। ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে তিনি উক্ত সভার সহকারী সভাপতি এবং তৎপর অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। উক্ত সভার রাজনৈতিক এবং জনহিতকর আলোচনায় চারুচন্দ্র বিশেষভাবে বিবেচনা-পূর্বক মতামত প্রকাশ করিতেন এবং গবর্ণমেণ্টের আইন ও আদেশের বিষয়ে নির্ভীকভাবে নিজ মত ব্যক্ত করিতেন। ১৯০০ খৃস্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখের উক্ত সভার বার্ষিক অধিবেশনে সভার সভাপতি দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বাহাদুরের অনুপস্থিতিতে চারুচন্দ্র সভাপতি নির্বাচিত হইয়া যে বক্তৃতা দেন এবং ব্যবস্থাপক সভায় জমিদারগণের প্রতিনিধি লইবার জন্য যেরূপ সুন্দর যুক্তিপ্রদর্শন করিয়া নিজ মত প্রকাশ করেন তাহা তৎকালীন সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

British Indian Association,

The Annual meeting.

The Chairman's speech.

"In the absence of the Honourable the Maharaja of Darbhanga, the President of the Association, Babu Charu Chandra Mullick occupied the chair. In opening the proceeding he said that it was customary for the Chairman to give them a brief address. When he came to the meeting, he was not prepared with a speech, but as he had been asked to preside, he would say a few words. Last year the Government had not been busy with much legislation. The best of their time had been occupied in combating the plague and famine. Then there was war in a foriegn land. They were not a fighting nation, and so could not help their Governors with man and arms; but they had been ready with their purse as the letter from the Lord Mayor of London to their secretary would bear witness. In connection with the new Municipal Act which had come into operation last year, their Association had made suggestions many of which had been accepted. They would watch the working of the Act with care, and if the necessity arose, they would take action. As the members were aware they had been fighting for many years for a representative of their Association in the local Legislative council, in connection with which the Government of India had framed certain rules and had asked the Bengal Government to give effect to it. He therefore cherished the hope that the Landholders of Bengal would soon have the right to elect a member to the Legislative Council. He would conclude his remarks by saying that hitherto the Association had a paid Assistant

secretary, but from the last year they had an Honorary Secretary, and he ventured to say that the work had been done by Maharajkumar Prodyot Coomar Tagore in a manner which must meet with the approval of all (applause). Though young in years, he had shown that he was gifted with great abilities which he had used with considerable tact and skili (Applause).

—The Englishman,
22nd September, 1900.

১৮৮৯ খৃস্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট কলিকাতার সম্ভ্রান্ত হিন্দু জমিদারগণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হিন্দু স্কুল উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করিলে, ২৪শে এপ্রিল তারিখে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের গৃহে এক সভায় সভাপতি হইয়া উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে চারুচন্দ্র বলেন—

Babu Charu Chandra Mullick said :—

Gentleman,—I think the Committee of the Association ought to consider the recommendation of the Director of Public Instruction for the abolition of the Hindu school an institution which has existed from the beginning of the introduction of English education into this country. I think we ought strongly to protest against such a recommendation. I doubt whether the Government have the power to abolish the institution. If the Government want a technical College let them have it by all means. But why to effect this object an institution should be abolished which is the only one of its kind ? I hope the committee will take early steps to make proper representation on the subject. Sir Alfred Croft's

proposal has already done mischief. It has reduced the number of students on the rolls and affected the finances of the school.

— Hindu Patriot,
April 29th, 1880.

উক্ত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সকলরূপ জনহিতকর কার্যের পরিচালনার ভার চারুচন্দ্রের উপর ছিল। তেজস্বী চারুচন্দ্র সরল সত্য কথা বলিতে কখনও ভীত হইতেন না। উক্ত এসোসিয়েশনের এক সভায় ৺রাধানাথ পাল মহাশয়ের সহিত চারুচন্দ্রের কোন বিষয়ে মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়, ইহাতে রাধানাথ বাবু চারুচন্দ্রকে একটি অপমানসূচক অপ্রিয় কথা বলেন। চারুচন্দ্র তৎক্ষণাৎ সভায় তাঁহার পদত্যাগ পত্র দিয়া চলিয়া আসেন। পরদিবস রবিবার প্রাতে চারুচন্দ্র তাঁহার বনহুগলীর বাগানে গিয়াছেন। বেলা ১০টার সময় উক্ত এসোসিয়েশনের তৎকালীন সভাপতি বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এবং সম্পাদক পাথুরিয়াঘাটার প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর মহাশয় তাঁহার পটলডাঙ্গাস্থ ভবনে আসিয়া চারুচন্দ্র বাগানে গিয়াছেন শুনিয়া উভয়ে তাঁহার বনহুগলীর বাগানে গিয়া চারুচন্দ্রকে উক্ত পদত্যাগ পত্র ফেরৎ লইতে বলেন এবং বিবাদ ভুলিয়া যাইতে অনুরোধ করেন। চারুচন্দ্র তাঁহাদের অনুরোধে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করেন। তীব্র কঠোর চারুচন্দ্র আবার কোমলতাময়ও ছিলেন। চারুচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্য একটি বিশেষ শোকসভার অধিবেশন হয় এবং নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়—

"The Committee of the British Indian Association have learnt with profound regret of the death of Babu Charu Chandra Mullick who had been connected with this Association as a member for a period of 37 years, and he had rendered very valuble services as an Ex-Vice-President and as Honorary Treasurer.

19th June, 1916.

চারুচন্দ্রের স্বর্গারোহণের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পাথুরিয়াঘাটার মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার ঠাকুর মহাশয় চারুচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে লিখিয়াছিলেন—

Tagore Castle
The 5th June, 1916.

My dear Ganen Babu,

I heard this morning from Babu Priya Nath Sen the heart breaking intelligence of the death of your worthy father. We all looked upon him as an elder brother and we all feel his death as a personal calamity. I cannot find language to give adequate expression to my grief……and brotherly feeling towards every one of us at the British Indian Association. The welfare of the Association was always uppermost in his mind. How often and how earnestly he had discussed with me various plans—they were all his—for increasing the influences and the popularity of the Association. And now he has passed away into dreamland leaving his plans unattempted.

কলিকাতা কর্পোরেশন—কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কর্পোরেশনের সহিত চারুচন্দ্র বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং কলিকাতাবাসীর সেবার জন্য তিনি বহু পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে মিউনিসিপালিটির কমিশনার মাননীয় এস. জে. রেনল্ড সাহেব পদত্যাগ করিয়া কলিকাতা ত্যাগ করিলে, চারুচন্দ্র ১৬নং ওয়ার্ডের বাদামতলা থানা হইতে কমিশনার পদপ্রার্থী হইয়া দাঁড়ান এবং ৩রা জুন ১৮৭৮ তারিখের প্রথম কর্পোরেশন সভার যোগদান করিলে কমিশনার মহারাজ নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের প্রস্তাবে এবং মাননীয় কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের সমর্থনে তিনি টাউন কমিটির সভ্য হন। ১৮৭৯ খৃস্টাব্দে কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ নির্বাচনে তিনি ৯নং ওয়ার্ড হইতে কমিসনার পদপ্রার্থী হন এবং অধিক ভোটে তিনি তাঁহার ভ্রাতা প্রবোধচন্দ্র মল্লিক ও ডাক্তার জগবন্ধু বোসের সহিত নির্বাচিত হন। ইহার পর তিন বৎসর অন্তর

কমিশনার নির্বাচনে দণ্ডায়মান হইয়া, পর পর তিনবারের নির্বাচনে তিনি জয়ী হইয়া কমিশনার মনোনীত হন। ১৮৭৮ হইতে ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ অবধি নয় বৎসর কলিকাতার করদাতৃগণের প্রতিনিধিরূপে চারুচন্দ্র কর্পোরেশনে সহরের নানাবিষয় উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। সেই সময় তাঁহার সহিত স্বর্গীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, নিমাইচন্দ্র বসু, কৃষ্ণদাস পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সারদাচরণ মিত্র, কালীনাথ মিত্র ইত্যাদি দেশপ্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্ত মহাপুরুষগণ কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হইয়া সহরবাসীর সেবা করিয়া গিয়াছেন। আজ কলিকাতা সহরের স্বাস্থ্য, শোভাসৌন্দর্য ইত্যাদির উন্নতি হইয়া যে কলিকাতা সহর Second city of the Empire হইয়াছে, তাহার ভিত্তি তাঁহারাই প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের পর তিনি কর্পোরেশনের কমিশনার হইয়া না দাঁড়াইলেও কলিকাতাবাসীর সকলরূপ সেবায় পরোক্ষভাবে তাঁহার জীবনের শেষ দিবস অবধি সহানুভূতি ছিল। সহরবাসীর জনহিতকর সকল বড় বড় সভা সমিতিতে তিনি যোগদান করিয়া কলিকাতাবাসীর স্বার্থ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

১৯১২ খৃস্টাব্দে কলিকাতা কর্পোরেশন যখন ট্যাক্সের হার বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করে সেই সময় নয় নম্বর পল্লীর সম্ভ্রান্ত অধিবাসী ডাক্তার নীলরতন সরকার, ডাক্তার হরিধন দত্ত, শ্রীনাথ পাল, শ্রীমতী কুমুদিনী বসু, অক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কলিকাতাবাসীগণ ২৩শে আগস্ট তারিখে চারুচন্দ্রকে সভাপতি করিয়া ব্যাপ্‌টিস্ট মিশন হলে একটি সাধারণ সভা করিয়া সকল করদাতৃগণ কর্পোরেশনের কর বৃদ্ধির বিশেষ প্রতিবাদ করেন এবং সেই দিন হইতেই নয় নম্বর ওয়ার্ডের একটি রেট-পেয়ারস্ এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করা হয়।

Proposed Rate-Payers Association.

Objection to Corporation Finance.

Meeting in Calcutta.

On Friday evening a public meeting of the rate-payers of Ward No. 9, was held at the Baptist Misson Halb. No 1/2 College Square under the Presidency of Babu Charu Chandra Basu Mullick.

Three resolutions were adopted, first protesting aganist

the resolution passed by the Commissioners in their meeting on the 3rd July, authorising the Chairman to inform the Government that the Corporation has preferred to raise a consolidated rate in the near future, secondly proposing to form a Rate-payers Association in Ward No. 9 to look after the interests of the Rate-payers of the said Ward, and lastly that the Rate-payers Association so formed in Ward No. 9 should co-operate with such other Associations in other wards and submit a memorial to the Government of Bengal to make a thorough investigation of the financial condition of the corporation with a view to enforce economy.

—The Englishman,
August 24th, 1912.

চারুচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর ৭ই জুন ১৯১৬ তারিখে কলিকাতা কর্পোরেশনের একটি সাধারণ সভায় রায় বাহাদুর ডাক্তার হরিধন দত্ত মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং রায় বাহাদুর রাধাচরণ পাল মহাশয়ের সমর্থনে সকল কমিশনারগণ দণ্ডায়মান হইয়া চারুচন্দ্রের মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করেন।

Calcutta Corporation.

On the Commissioners taking their seats Dr. Haridhan Dutt referred to the death on S ınday last of Babu Charu Chandı a Mullick who was a very useful and very well-known citizen of Calcutta, and was a member of the Corporation from 1878 to 1886. He moved that.

"The Chairman and Commissioners of the Corporation of Calcutta record their sense of sorrow at the death of Babu Charu Chandra Mullick, who was connected with the Corporation from 1878 to 1886 and was a well-known citizen

of Calcutta and that a letter of condolence be sent to his eldest son, Babu Ganendra Chandra Mullick."

The Hon'dle Rai Bahadur Radha Charan Pal seconded the resolution which was carried unanimously all present standing.

The Englishman.
Friday 9th June, 1916.

১৮৮২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কর্পোরেশনের সাধারণ কমিশনার নির্বাচনে নয় নম্বর ওয়ার্ড হইতে কমিসনার পদপ্রার্থী হইয়া দণ্ডায়মান হইয়া চারুচন্দ্রকে এক বড় মামলায় জড়িত হইতে হয়। সেই সময় কমিশনার পদপ্রার্থীদিগকে ভোট দিবার জন্য "ভোটিং পেপার" গুলি ডাকযোগে প্রত্যেক ভোটারের নিকট পাঠান হইত। ১৮৮২ খৃস্টাব্দের নির্বাচনে নয় নম্বর ওয়ার্ড হইতে অন্নদাচরণ খাস্তগিরি এবং চন্দ্রকান্ত গুপ্ত চারুচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বনওয়ারী লাল নামক এক ডাকপিওন কেদারনাথ দত্তের নামীয় একটি ভোটিং পেপার চারুচন্দ্রের ভ্রাতা শরৎচন্দ্রের নিকট দিয়া সই লইয়া যায়। চারুচন্দ্র যখনই শুনিলেন সরলচিত্তের শরৎচন্দ্র ভুলক্রমে কেদারনাথ দত্তের ভোটিং পেপারটি লইয়াছেন তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা কেদারনাথ দত্তের নিকট ফেরৎ পাঠাইয়া দেন কিন্তু তাঁহার দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পরের নিকট আত্মীয় এবং এই ভোট যুদ্ধে চারুচন্দ্রকে বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করিয়া, তাহারা একযোগে চক্রান্ত করিয়া চারুচন্দ্রকে ভারতবর্ষের পোস্ট আফিস আইনের ১৭ ধারা মতে এক ফৌজদারী মামলায় আসামী করেন। ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮৮২ তারিখে কলিকাতার পুলিশ কোর্টে মিস্টার বি. এল. গুপ্ত, (৺বিহারীলাল গুপ্ত) কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে চারুচন্দ্রের বিরুদ্ধে মামলা আরম্ভ হয়। উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট বি. এল. গুপ্ত মহাশয় উক্ত কমিশনার পদপ্রার্থী এবং চারুচন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী অন্নদাচরণ খাস্তগিরি মহাশয়ের শ্বশুর এবং চন্দ্রকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের পুত্র। চারুচন্দ্রের পক্ষের ব্যারিস্টার মিস্টার বেনসন সাহেব মামলা আরম্ভ হইতেই এক দরখাস্ত করেন যে যেহেতু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বাদী অন্নদাচরণ খাস্তগিরির শ্বশুর এবং চন্দ্রকান্ত গুপ্তের পুত্র, তাঁহার কোর্টে মামলার শুনানি না হইয়া অন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে শুনানি হউক কিন্তু তাহাতে মিস্টার বি. এল. গুপ্ত সম্মত না হওয়ায় পুনরায় ব্যারিস্টার বেনসন সাহেব

এই মামলা অন্য কোর্টে লইয়া যাইবার জন্য হাইকোর্টে দরখাস্ত করিবার জন্য সময় প্রার্থনা করিয়া ঐ তারিখে মামলা মুলতুবি রাখিতে বলেন কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার বি. এল. গুপ্ত এতদূর পক্ষপাতিত্বে অন্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি কোন কথাই না শুনিয়া বাদীর কথায় চারুচন্দ্রকে সেই দিবসই হাইকোর্ট সেসনকোর্টে প্রেরণের আদেশ দিলেন। চারুচন্দ্র তখন একজন প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট এবং কলিকাতার সম্ভ্রান্ত লোক কিন্তু উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব চারুচন্দ্রকে জামিনে খালাস দিতেও অস্বীকার করিয়া থানায় লইয়া যাইতে আদেশ দেন কিন্তু চারুচন্দ্রের পক্ষের ব্যারিস্টার বেনসন সাহেব সঙ্গে সঙ্গে হাইকোর্টে দরখাস্ত করিয়া চারুচন্দ্রকে জামিনে খালাস করিয়া আনেন।

৫ই ডিসেম্বর ১৮৮২ তারিখে হাইকোর্টের সেসন জজ নরিস সাহেবের নিকট চারুচন্দ্রের বিচার। চারুচন্দ্রের পক্ষে মিস্টার পিউ, মিস্টার বেনসন ইত্যাদি পাঁচজন বড় বড় ব্যারিস্টার নিযুক্ত হন। চারুচন্দ্র নির্ভীক এবং স্পষ্টভাবে স্বীকার করেন যে তিনি পিওনের নিকট হইতে ভোটিং পেপারের পোস্টকার্ডখানি গ্রহণ করেন এবং তাহা তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়া উক্ত ভোটারের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার সরলতা ও তেজস্বিতা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ব্যারিস্টার পিউ সাহেব বলেন তাহার মক্কেল ভুলক্রমে যাহা করিয়াছেন তাহার জন্য দুঃখিত। জজ নরিস সাহেব চারুচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

I assure you that it is with very considerable pain I see you, respectable citizens of Calcutta, standing in the position in which you stand at present time. I am quite willing to believe and I do believe implicity all that your learned counsel has so ably said in your behalf. I have no doubt that you, Charu Chandra, who were a candidate for what your learned counsel has called "Municipal Honours" were led away in your eager desire to obtain a position as the head of the poll to do an act which I am sure you contemplate now and believe to be a most unfair one to those who were in the race with yourself and you tempted the peon to a breach of duty which might have resulted in his dismissal

from the Postal service. If he is dismissed from the service, there would have been very considerable difficulty in his getting situation. I have had an opportunity before when the matter was before me with reference to the connection of expressing my views but I do not care to express them again. I think you anxious to serve this city and you should endeavour to do so in the way in which your counsel stated, that is in a straight forward way and that while representative government in this country is on its trial as it were, it behoves those who are anxious to see it developed to take care that their contests are conducted with the greatest possible uprightness and good feeling. Under the circumstances of the case, money, I know to you is a comparatively small object, and I sentences you to pay a fine of Rs. 50/- in default to suffer fourteen days simple imprisonment. I will add that I think it is much to be regretted that the charges under Penal Code were at any time brought against you and you were subjected to the prosecution to which you were subjected to at any time at the Police Court. I think the prosecutions were ill advised and that there was no real offence under the law."

উক্ত মোকদ্দমা লইয়া কলিকাতায় সেই সময়ে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হয়। সকল সংবাদপত্রই ম্যাজিস্ট্রেট মিস্টার বি. এল. গুপ্তকে বিশেষভাবে আক্রমণ করিয়া তাঁহার এইরূপ পক্ষপাতিত্বের বিশেষ নিন্দা করেন। উক্ত ম্যাজিস্ট্রেট গুপ্ত সাহেব তাঁহার পিতা এবং জামাতার জন্য এতই উৎসুক হইয়াছিলেন যে চারুচন্দ্রের বিরুদ্ধে কয়েকটি মিথ্যা ফৌজদারী ধারার চার্জ গঠন করেন। হাইকোর্টের জজ নরিস সাহেব চারুচন্দ্রের বিরুদ্ধে এইরূপভাবে কতকগুলি ফৌজদারী চার্জ গঠন হইয়াছিল দেখিয়া স্পষ্ট বলেন যে তিনি বিশেষ দুঃখিত যে মিথ্যা করিয়া কতকগুলি চার্জ গঠন করিয়া বাদী পক্ষ অন্যায় করিয়াছে। চারুচন্দ্রের বয়স তখন মাত্র ৩২ বৎসর এবং তিনি নিজেও জানিয়া

ভোটিং পেপার পিয়নের হস্ত হইতে লন নাই। তাঁহার ভ্রাতা শরৎচন্দ্র ভুলক্রমে ভোটিং পোস্টকার্ডখানি পিয়নের নিকট হইতে লইয়াছিলেন। চারুচন্দ্র ভ্রাতাকে রক্ষা করিবার জন্য নিজে সম্পূর্ণ দোষ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায়পরায়ণতায় এবং সরলতায় সকল দেশবাসীই তাঁহাকে প্রশংসা করিয়াছিলেন। এবং মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মাননীয় কৃষ্ণদাস পাল, রাজা কৃষ্ণদাস লাহা ইত্যাদি বহু সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ চারুচন্দ্রকে সহানুভূতি এবং প্রশংসা করিয়া পত্র দিয়াছিলেন এবং বাগবাজারের অমৃতবাজার পত্রিকা এবং কৃষ্ণদাস পাল মহাশয়ের হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা দুইখানি ইংরাজী সংবাদপত্রই ধারাবাহিকভাবে কয় দিবস সম্পাদকীয় স্তম্ভে ম্যাজিস্ট্রেট বি. এল. গুপ্তকে নিন্দা করিয়া তাঁহার আরো অনেক গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করেন। উক্ত মামলার পর ম্যাজিস্ট্রেট বি. এল. গুপ্তের সুনাম সমাজে এবং গভর্নমেণ্টের নিকট এতদূর নষ্ট হয় যে শীঘ্রই তাঁহাকে গভর্নমেণ্টের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। সুবিখ্যাত শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার তৎকালীন রিস ও রায়ৎ নামা সুবিখ্যাত পত্রিকায় চারুচন্দ্রের পক্ষে সম্পাদকীয় স্তম্ভে অনেকগুলি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

যাহা হউক এই মামলায় চারুচন্দ্রের বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় হয় এবং কয় দিবস মানসিক অশান্তি ও উদ্বেগও ভোগ করিতে হয় কিন্তু তিনি উক্ত মামলার পরও প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে ভোটে পরাজিত করিয়া কমিশনার নির্বাচিত হইয়া স্বীয় গৌরব বৃদ্ধি করেন।

কায়স্থ সভা—প্রবলপ্রতাপান্বিত কায়স্থ রাজন্যশাসিত বঙ্গদেশে নিজ জাতির বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে কায়স্থ জাতির কোনরূপ মিলন কেন্দ্র ছিল না এবং কায়স্থ নেতাগণ কোন সভাসমিতি গঠন করিয়া একত্রে সমাজ শাসনের ব্যবস্থা করিবার কোন পন্থাই গ্রহণ করেন নাই। অনেকের ধারণা ছিল যে কায়স্থ জাতি শূদ্র। ১৯০১ খৃস্টাব্দের গভর্নমেণ্ট কর্তৃক লোকসংখ্যা গণনায় জাতির শ্রেণী বিভাগের মধ্যে কায়স্থ জাতিকে শূদ্র বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহাতে সকল কায়স্থই বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া আন্দোলন করিতে থাকেন এবং কায়স্থগণকে যাহাতে ক্ষত্রিয় জাতি বলিয়া গণনা করিয়া ব্রাহ্মণের নীচেই স্থান দেওয়া হয় তাহার জন্য কায়স্থবংশীয় সম্ভ্রান্ত লোকগণ সভা করিয়া সেনসাস্ রিপোর্টের প্রতিবাদ করিয়া গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন-নিবেদন করিতে থাকেন। সেই সময় হইতে কায়স্থ নেতাগণ বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহাদিগের নিজের বঙ্গদেশীয় চারি শ্রেণীর (দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বঙ্গজ, উত্তর রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র) কায়স্থগণকে

লইয়া একটি সমাজ গঠন করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া আশু প্রয়োজন। সেই সময় হইতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার প্রতিষ্ঠা হয়। পাথুরিয়াঘাটার ঘোষবংশের রমানাথ ঘোষ এবং তাঁহার আত্মীয় চারুচন্দ্র এই সভা প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা ছিলেন। ২৫শে আগস্ট ১৯০১ খৃস্টাব্দে পাথুরিয়াঘাটার রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে একটি কায়স্থ জাতির সুবৃহৎ সভার অনুষ্ঠান করা হয় এবং হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত সভা হইতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয় এবং রমানাথ ঘোষ মহাশয় সম্পাদক এবং শোভাবাজারের মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব মহাশয় সভাপতি এবং চারুচন্দ্র ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণ কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য নির্বাচিত হইয়া একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১০ই পৌষ ১৩ ৯ তারিখে মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর সি. আই. ই. মহোদয়কে সভাপতি করিয়া ৪৭নং পাথুরিয়াঘাটাস্থ রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে একটি সাধারণ অধিবেশনে কায়স্থ সভার নিয়মাবলী এবং স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। সভাপতি মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ, রমানাথ ঘোষ এবং চারুচন্দ্র বসুমল্লিককে সভার পক্ষ হইতে এই কায়স্থ জাতির হিতকর সভাব সুচারুরূপে অনুষ্ঠানের জন্য তাঁহারা যে অসীম পরিশ্রম ও উদ্যোগ করিয়াছেন তাহার জন্য ধন্যবাদ দেন।

উক্ত সভা ১৮৬০ খৃস্টাব্দে ২১নং আইন মতে রেজিস্ট্রীকৃত হইলে রাজর্ষি বনমালী রায় বাহাদুর. রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, কুমার মন্মথনাথ মিত্র বাহাদুর, মহারাজা গিরিজানাথ রায় বাহাদুর এবং চারুচন্দ্র বসুমল্লিক মহাশয় উক্ত সভার ট্রাস্টী বা ন্যাসী নিযুক্ত হন। ৯ই পৌষ ১৩১৪ সনে চারুচন্দ্রেব ভবনে কুমার শরৎচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের সভাপতিত্বে কায়স্থ সভার বার্ষিক অধিবেশন হয়। চারুচন্দ্র উক্ত সভার মধ্য দিয়া কায়স্থ জাতির নানা বিষয় উন্নতির জন্য এবং সমাজ হইতে বিবাহে ব্যয়বাহুল্য, পণপ্রথা নিবারণ ইত্যাদি বহুরূপ অনিষ্টকর সংস্কার বিদূরিত করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার অস্তিত্ব যত দিবস থাকিবে তত দিবস উক্ত সভার একজন প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ও কর্মী চারুচন্দ্রের নাম কখনও বিলুপ্ত হইবে না। ১৩৪৭ সনে চারুচন্দ্রের পুত্র দেবেন্দ্রচন্দ্র সভার সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইয়া পিতার পদানুসরণ করিতেছেন।

বিধবা বিবাহ—১৯০৯ খৃস্টাব্দে কলিকাতার কয়েকটি সম্ভ্রান্ত পরিবার মধ্যে বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ হয়, ইহাতে হিন্দু সমাজে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত

হয়। চারুচন্দ্র বিধবা বিবাহের বিপক্ষে ছিলেন। ২৩শে আষাঢ় ১৩১৬ সনে বিডন স্ট্রীটস্থ কোহিনূর রঙ্গমঞ্চে বিধবা বিবাহের বিপক্ষে হিন্দু জনসাধারণের একটি সুবৃহৎ সভা হয় এবং উক্ত সভায় চারুচন্দ্র বিধবা বিবাহের বিপক্ষে বক্তৃতা দেন। উক্ত সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয় যে "যাহারা নিজ পরিবার মধ্যে বিধবা বিবাহ দিবেন বা তদ্বিষয়ে কোন প্রকার সাহায্য করিবেন তাঁহাদের সহিত প্রত্যেক কায়েস্থরই সামাজিক সংস্রব পরিত্যাগ করা উচিত।" উক্ত সভায় "বিধবা বিবাহ নিবারণী সভা" নাম দিয়া একটি সভা গঠন করা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে ৺কালীনাথ মিত্র সি. আই. ই. সভাপতি এবং চারুচন্দ্র বসুমল্লিক ও কুমার নরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় সম্পাদক নির্বাচিত হন। হাইকোর্টের উপস্থিত বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীদেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, কুমার শরচ্চন্দ্র সিংহ, গণেশচন্দ্র চন্দ্র, নিমাইচন্দ্র বসু, প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি কায়স্থ নেতাগণ উক্ত সভার কার্য নির্বাহক সমিতির সভ্য হন এবং ১নং ঝামাপুকুর রাজবাটীতে সভার কার্যালয় হয়।

২৬শে জুলাই ১৯০৯ খৃস্টাব্দের হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় চারুচন্দ্র যে পত্র প্রকাশ করেন তাহা হইতে তাঁহার প্রাচীন হিন্দুধর্মের প্রতি কিরূপ প্রগাঢ় আস্থা ছিল তাহা সম্যক প্রকাশ পায়।

Hindu Widow Marriage.

To the Editor
The Hindu Patriot.

Dear sir,

After reading your articles re: widow marriage in your paper of Tuesday last, I am sorry that you should attribute the agitation which is going on in our midst to any personal cause. We are little concerned with the girl widow marriage at Bhawnipore or that of a grown up widow marriage there. We are simply denouncing the widow marriage. When Pandit Iswar Chandra Vidyasagar tried to introduce widow marriage he failed to enlist the support of such men as Sir

Raja Radhakanto Deb Bahadoor, the then acknowledged leader and head of our society. They regarded it as a sin and expiated it by singing Hari Sankirttan in every quarter. Now their descendents take them for fools and are openly assisting the cause of widow marriage.

Those who are for widow marriage are making a great fuss by ventilating the question in a paper called "Bengalee" whose proprietor is a Baidya, some of whose castemen were prominently noticed amongst the so called reformed party. Has our society so much degraded itself that we shall leave aside our kinsmen and relatives and shall seek the assistance of men belonging to other castes than ours. Our Hindu religion is strong in itself and when Mahamedan persecution and other foreign rules failed to overthrow it, would it be possible for a handful of young Bengals to injure it ? We attach no importance to the ventilation of the question in any newspaper or feel pride in the presence of the man or that. It is quite immaterial. But we are considering the question of widow marriage by itself and as widow marriage is against the doctrine and principle of our Hindu Shastras we must condemn it always. A Hindu must be a Hindu always.

Yours sincerely
Charu Chandra Mullick.

—The Hindu Patriot, Monday, 26th July, 1909.

হিন্দু ধর্মে চারুচন্দ্রের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি অল্পবয়সে তাঁহার কুল-গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা নিয়মিতভাবে মন্ত্র জপ করিতেন। তাঁহার বাটীতে বার মাসে তের পর্ব হইত। নিজ গৃহে শ্রীশ্রীবাণেশ্বর শিব স্থাপিত করিয়া দৈনিক পূজার ব্যবস্থা করেন। প্রতি বৎসর তিনি বিশেষ ধুমধামের সহিত স্বগৃহে ৺শারদীয়া দুর্গাপূজা করিতেন এবং

পূজার কয়দিবস তাঁহার সকল আত্মীয়-স্বজন ও পল্লীবাসীগণ তাঁহার আলয়ে আসিয়া বিশেষ আমোদপ্রমোদ উপভোগ করিতেন। তাঁহার দুর্গা প্রতিমা… হস্ত লম্বা এবং অতীব মনোমুগ্ধকরভাবে সজ্জিত হইত। ধর্ম বিষয়ে তিনি অনেক পণ্ডিতের সহিত আলোচনা করিতেন এবং অনেক ধর্মগ্রন্থাদি প্রকাশের জন্য অর্থসাহায্য করিতেন। তিনি ঋগ্বেদ, যাবতীয় পুরাণ, সংহিতা ইত্যাদি হিন্দু শাস্ত্রের সকল প্রাচীন ধর্মপুস্তক ক্রয় করিয়া তাঁহার গৃহে একটি সুবৃহৎ গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরী করিয়াছিলেন।

চারুচন্দ্র একজন ঈশ্বরবিশ্বাসী শাক্ত ছিলেন এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তি হইলেও তাঁহার কোনরূপ গোঁড়ামী মোটেই ছিল না। তিনি অন্য জাতিকে নিন্দা বা তাঁহাদিগকে অশুচি বলিয়া গ্রহণ করিতেন না। ধর্ম সম্বন্ধে ও সামাজিক কার্যে তিনি সম্পূর্ণভাবে সুন্দর আচার-ব্যবহার যথাযথ পালন করিয়া গিয়াছেন কিন্তু বাহিরে তিনি সকল জাতীয় লোকের সহিত আন্তরিকভাবে মিশিতেন। ইংরাজ, মুসলমান ইত্যাদি অন্যজাতীয় বহু সম্ভ্রান্ত লোক তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং তাঁহাদের সহিত একত্রে আহার করিতে তিনি ঘৃণা বোধ করিতেন না। তিনি একজন উদারনৈতিক মতাবলম্বী ছিলেন।

চারুচন্দ্র একজন থিয়োসফিস্ট ছিলেন। তিনি থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির একজন বিশিষ্ট সভ্য নির্বাচিত হইয়া স্বর্গীয় অ্যানি বেসান্ত ও শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সহিত উক্ত সভার উন্নতির জন্য অনেক কার্য করিয়া গিয়াছেন।

দেশসেবা—বিভিন্নমুখী প্রতিভা, নির্মল চরিত্র, গভীর জ্ঞান, অকপট স্বদেশ-প্রেম এবং ধর্মনিষ্ঠায় চারুচন্দ্রের জীবন মধুময় হইয়াছিল। দেশের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও ভালবাসা অসীম ছিল। তিনি বিশেষ হৈ-চৈ করিতে ভালবাসিতেন না কিম্বা সর্বসাধারণের সভায় গিয়া বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়াইয়া নিজেকে সর্বদা জাহির করাও পছন্দ করিতেন না। তবে দেশহিতকর সকল :কার্যে তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল এবং দেশহিতকর কার্যে তিনি অনেকরূপে বিশেষ সাহায্য করিয়া গিয়াছেন।

ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের চারুচন্দ্র একজন সভ্য ও সেবক ছিলেন। তাঁহার জীবনকালে কংগ্রেসের অধিবেশন কলিকাতায় যতবার হইয়াছে চারুচন্দ্র প্রত্যেকবারই উক্ত অধিবেশনে যোগদান করিয়া তাহার সফলতার জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি মডারেট্ দলভুক্ত ছিলেন।

১৯০৫ খৃস্টাব্দে বঙ্গ-ভঙ্গ রদের জন্য বাঙ্গলাদেশে যে প্রবল আন্দোলন উপস্থিত

হয়, স্বদেশপ্রেমিক চারুচন্দ্র উক্ত আন্দোলন অনুমোদন করিয়া সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দলে যোগদান করিয়া নানারূপ সাহায্য করিয়া বঙ্গ-ভঙ্গ রদের জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। ১৬ই অক্টোবর ১৯০৬ তারিখে রাখীবন্ধন এবং উপবাসের দিবস বাগবাজারে ৺নন্দ বসুর সুবৃহৎ ভবনে যে বঙ্গ-ভঙ্গ রদের জন্য ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিরাট সভা হয়, চারুচন্দ্র তাহার একজন উদ্যোক্তা ছিলেন।

চারুচন্দ্র দেশের কার্যে সেই সময় নেতাগণের সহিত সহযোগে নানা সভাসমিতির অনুষ্ঠান করেন এবং নিজ আলয়েও কয়েকটি সাধারণ সভার অধিবেশন করান।

শ্রীশ্রীদুর্গা

শরণং

সবিনয় নিবেদন—

আগামী ২৩শে আশ্বিন একাদশীর দিন শ্রীযুক্ত রায় পশুপতিনাথ বসু মহাশয়ের বাগবাজারস্থ ভবনে অপরাহ্ন ৫টার সময় "বিজয়া সম্মিলন" হইবে। আমাদের সানুনয় নিবেদন, মহাশয় ঐ শুভদিনে সবান্ধবে উপস্থিত হইয়া এই জাতীয় মহোৎসবে যোগদান করিবেন। সম্মিলন স্থলে ব্যায়াম ও সঙ্গীতাদি হইবে।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

বিনীত—

শ্রীসূর্য্যকান্ত শর্ম্মা
(ময়মনসিংহ)

শ্রীজগদীন্দ্রনাথ শর্ম্মা
(নাটোর)

শ্রীগগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
(জোড়াসাঁকো)

শ্রীসতীশচন্দ্র সিংহ
(পাইকপাড়া)

শ্রীমন্মথনাথ মিত্র
(শ্যামপুকুর)

শ্রীনগেন্দ্র মল্লিক
(চোরবাগান)

শ্রীচারুচন্দ্র বসু মল্লিক
(পটলডাঙ্গা)

শ্রীধন্নূলাল আগরওয়ালা
(মদন চাটুয্যের লেন)

ব্রতী সমিতি

সবিনয় নিবেদন—

৮ই অগ্রহায়ণ ২৪শে নবেম্বর শুক্রবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময় পটলডাঙ্গা রাধানাথ মল্লিক লেন, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের ভবনে ব্রতী সমিতির বিশেষ অধিবেশন হইবে। স্বনাম প্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন এবং প্রসিদ্ধ বক্তাগণ বক্তৃতা করিবেন।

নিবেদক—
শ্রীমনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা
৭ই অগ্রহায়ণ ১৩১২ সাল।

উক্ত দুইটি সভাতেই চারুচন্দ্র উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা দেন এবং তাহাতে কিরূপ সহস্র সহস্র লোক উপস্থিত হইয়াছিল তাহা তৎসময়ের সংবাদপত্র পাঠ করিলেই উপলব্ধি হইবে।

সেই সময় বঙ্গ-ভঙ্গের আন্দোলন প্রবলবেগেই প্রবাহিত হইতে থাকে এবং ছাত্রগণ দলে দলে গভর্ণমেণ্টের ইস্কুল কলেজ পরিত্যাগ করিয়া দেশের কার্যে আত্মনিয়োগ করে। এই আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাতের সময় ১০ই কার্তিক ১৩১২ সনে শুক্রবার বৈকালে পটলডাঙ্গাস্থ চারুচন্দ্রের ভবনের প্রাঙ্গণে ছাত্রগণের এক বিরাট জনসভা হয়।

"গত শুক্রবার অপরাহ্নে পটলডাঙ্গায় শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মল্লিকের বাটীতে ছাত্রগণের এক বিরাট সভা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভাস্থলে ভিন্ন ভিন্ন কলেজের প্রায় সহস্রাধিক ছাত্র সমবেত হইয়াছিলেন। বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি অনেক গণ্য মান্য ব্যক্তি সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।"

—সঞ্জীবনী, ১৬ই কার্তিক ১৩১২।

উক্ত সভায় চারুচন্দ্র সুন্দর ভাষায় একটি বক্তৃতা দিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন এবং সভাপতি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সুন্দর বক্তৃতা দেন তাহা কেদারনাথ দাস মহাশয়ের লিখিত 'শিক্ষার আন্দোলন" নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। ইহার পর "ফিল্ড এণ্ড একাডেমীর" ক্লাবের মাঠে ২৩শে কার্তিক তারিখে একটি বিরাট সভায় চারুচন্দ্রের

ভ্রাতুষ্পুত্র সুবোধচন্দ্র সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া জাতীয় শিক্ষাপরিষদ প্রতিষ্ঠার জন্য এক লক্ষ টাকা দান করিয়া দেশবাসীর নিকট হইতে রাজা উপাধি পান।

৮ই অগ্রহায়ণ ১৩১২ শুক্রবারে চারুচন্দ্রের পটলডাঙ্গাস্থ ভবনে ব্রতী সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং সভাস্থলে ডাক্তার এস্. এস্. হোসেন, মৌলবী আবুল হোসেন, মৌলবী লিয়াকাত হোসেন, শ্রীপ্রভাতকুসুম রায় চৌধুরী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়, প্রমথনাথ মিত্র, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, সখারাম গণেশ দেউস্কর, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, মাদারিপুর ইস্কুলের হেড্ মাস্টার কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, ডাক্তার হরিধন দত্ত প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ব্রতী সমিতির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে "বন্যা আসিলে কৃষকেরা যেমন গর্ত্ত করিয়া জল ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করে, তেমনি আজ বাঙ্গলাদেশে নবজীবনের যে বন্যা আসিয়াছে তাহাকে ধরিয়া রাখিবার জন্য এই ব্রতি সমিতির সৃষ্টি হইয়াছে। যাহাতে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় এবং দেশের প্রতি ভক্তি জন্মে এমন কতকগুলি সঙ্কল্প প্রত্যেক ব্রতিকে গ্রহণ করিতে হয়। বাঙ্গলাদেশের অনেক স্থানে ব্রতি সমিতির বিভাগ প্রতিষ্ঠীত হইয়াছে।" খ্যাতনামা অনেক বক্তা সমিতির সাধু উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেন।

১৯১০ খৃস্টাব্দে "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রিকা ৬০ বৎসরে পদার্পণ করিলে; চারুচন্দ্র উদ্যোগী হইয়া টাউন হলে তাহার স্বর্ণ জুবিলীর অনুষ্ঠান করিয়া উক্ত পত্রিকার সম্পাদক তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে বিশেষ অভিনন্দন ও মানপত্র প্রদান করেন। ৯ই পৌষ ১৩১৭ সাল তারিখের বসুমতী ও অন্যান্য পত্রিকায় উক্ত মিরার জুবিলী ধনভাণ্ডারের অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র মল্লিকের ছবি প্রকাশ করিয়া তাঁহার বিশেষ প্রশংসা করে।

১৯১৪ খৃস্টাব্দে ইয়োরোপে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে নয় নম্বর ওয়ার্ডের জনসাধারণকে লইয়া চারুচন্দ্র, শ্রীনাথ পাল, ডাক্তার নীলরতন সরকার প্রভৃতি নেতাগণ একটি কমিটি গঠন করেন যাহাতে সর্বসাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া ভারতবর্ষের দেশীয় সৈন্যগণের ও তাহাদের নিরাশ্রয় পিতামাতা বা স্ত্রীকন্যাগণের অন্নকষ্ট নিবারিত হয়। তাঁহারা অনেক টাকা তুলিয়া যুদ্ধের সময় গভর্নমেন্টের হস্তে দান করেন।

শিক্ষায়—সাহিত্য ও শিক্ষার প্রতি চারুচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগ ছিল। দেশে

যাহাতে শিক্ষার বিস্তার হয় সে বিষয়ে তাহার বিশেষ আগ্রহ ও চেষ্টা ছিল। ১৮৯৪ ইহতে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ অবধি চারুচন্দ্র বহুবাজারস্থ স্বর্গীয় খেলাৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নামে প্রতিষ্ঠিত খেলাৎচন্দ্র ইনষ্টিটিউসনের সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে চারুচন্দ্র বিখ্যাত বালিকা বিদ্যালয় "মহাকালী পাঠশালার" সম্পাদক মনোনীত হন। তাঁহার পল্লীস্থ পটলডাঙ্গা হাই স্কুলের একজন পৃষ্ঠপোষক থাকিয়া চারুচন্দ্র মাসিক সাহায্য দান করিতেন।

চারুচন্দ্র রাজনীতি, সামাজিক, ধর্ম সম্বন্ধীয় ইতিহাস, ভ্রমণ ইত্যাদি সকল রকম ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিতে ভালবাসিতেন এবং বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অত্যন্ত অধ্যয়নস্পৃহা ছিল। অবসর সময় চারুচন্দ্র কখনও আলস্যে কাটাইতেন না। তিনি বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া তাঁহার গৃহে একটি সুবৃহৎ গ্রন্থাগার করিয়াছিলেন এবং উক্ত গ্রন্থাগারের জন্য বহু প্রাচীন পুঁথি পুরাণ ও সাহিত্য পুস্তক সংগ্রহ করেন।

কলিকাতায় প্রায় সকল বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৯০ খৃস্টাব্দে তিনি The Pataldanga Friends Library and Reading Roomএর সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে তিনি ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরীর কার্য-নির্বাহক সভার সভ্য নির্বাচিত হন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি কার্য-নির্বাহক সভার সভ্য ছিলেন। মহারাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর চারুচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু ও আত্মীয় ছিলেন। উক্ত মহারাজা বাহাদুর তাঁহার শোভাবাজার রাজবাটীতে একটি সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠা করিলে চারুচন্দ্র তাঁহার ধনাধ্যক্ষ নিবাচিত হইয়া সকল সাহিত্য সভার গবেষণায় যোগদান করিতেন।

চারুচন্দ্র একজন বড় লেখক ছিলেন না কিন্তু তিনি বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় নানা প্রবন্ধ, গল্প ও ভ্রমণকাহিনী নিজ নাম গোপন করিয়া সংবাদ ও মাসিকপত্রে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বড় বড় অনেক সাহিত্যিকের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। সুবিখ্যাত পৃথিবীর ইতিহাস লেখক দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় চারুচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং তিনি প্রায়ই চারুচন্দ্রের ভবনে আসিয়া নানা বিষয়ে আলোচনা করিতেন। চারুচন্দ্র অনেক দরিদ্র সাহিত্যিককে পুস্তক প্রকাশের জন্য সাহায্য করিতেন।

"গত আশ্বিন মাসে শোভাবাজারের খ্যাতনামা রাজা শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের ভবনে সাহিত্য সভার অধিবেশনে কলিকাতাস্থ রাজকীয় সংস্কৃত

কলেজের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন তিনি বাগ্‌বিতণ্ডার প্রবল স্রোতে ভাসমান হইয়া তাঁহার উচ্চাসনের পদমর্য্যাদা ভুলিয়া গিয়া ঐ সভায় একজন প্রধান সভ্য মহামতি পুরন্দর খাঁর বংশোদ্ভব শ্রীমান চারুচন্দ্র বসু মল্লিক মহাশয়কে (চারুবাবু সাহিত্য সভার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন) যে রূপ সম্ভাষণ করিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার ভ্রমপ্রমাদই বলিতে হইবে। তাঁহার এই ভ্রম সংশোধনের নিমিত্ত তিনি উক্ত মল্লিক মহাশয়কে দুইখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। একখানি পত্রে শিরোনামায় "অশেষ ক্ষমাধাম পণ্ডিত জাতি প্রতিপালক", অপর খানিতে "বিদ্বানগণ-সম্মান-রক্ষনৈকনিদান ধার্ম্মিক-কুল-তিলক" লিখিয়া ছিলেন। তর্কবাগীশ মহাশয় মাননীয় মল্লিক মহাশয়কে যেরূপ বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছিলেন তাহা কোন ক্ষত্রিয় রাজাকে ব্রাহ্মণের যেরূপ লেখা কর্ত্তব্য সেইরূপই হইয়াছে। "নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে"— তর্কবাগীশ মহাশয় চারুবাবুকে এইরূপও লিখিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থে প্রতিপাল্য ও প্রতিপালক সম্বন্ধ; সুতরাং পুত্র ও পিতা সম্বন্ধ, একথা তর্কবাগীশ মহাশয় স্বীকার করিয়াছেন। কায়স্থ জাতি শূদ্র হইলে তর্কবাগীশ মহাশয়ের ন্যায় পণ্ডিত ব্রাহ্মণ মল্লিক মহাশয়ের সহিত ঐরূপ সম্বন্ধ থাকা স্বীকার করিতেন না। কারণ 'পিতৃমাতৃব্যাদি ভ্রাতৃপুত্রাদি শব্দতঃ। শূদ্রাশ্চ ব্রাহ্মণশ্চৈব ন ভাষেতাং পরস্পরং॥' এই সকল দেখিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে তর্কবাগীশ মহাশয়ের পূর্ব্ব ভ্রম সংশোধিত হইয়াছে; তিনি আর কায়স্থকে শূদ্র শ্রেণীতে সন্নিবেশ করিবেন না, ইহাই বোধ হয়।

উপসংহার কালে বক্তব্য এই যে পূজনীয় তর্কবাগীশ মহাশয় কায়স্থ জাতিকে এতদূর ভালবাসেন যে তিনি বিগত ৪ঠা পৌষ রবিবার দিবস রাজা শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সহিত মল্লিক মহাশয়ের পটলডাঙ্গার বাটীতে পদধূলি প্রদান করিয়াছিলেন।"

—আর্য্য কায়স্থ প্রতিভা, ২য় বর্ষ, ১১ সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩১৬

চরিত্র—দয়াদাক্ষিণ্যে চারুচন্দ্র বিশেষ সহৃদয়তার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার যেরূপ পরদুঃখকাতরতা ছিল, সেইরূপ বদান্যতাও ছিল। বহু দরিদ্র ব্রাহ্মণ, অন্ধ ও খঞ্জ তাঁহার নিকট হইতে মাসিক ও বার্ষিক বৃত্তি পাইত। তিনি তাঁহার সুবৃহৎ অট্টালিকার এক অংশে দশটি করিয়া দরিদ্র বালককে রাখিয়া ভরণ-পোষণ দিয়া তাহাদের বিদ্যাশিক্ষার সমুদয় ব্যয় বহন করিতেন। তাঁহার আলয়ে

লালিত পালিত হইয়া অনেক ছাত্র ভবিষ্যৎ জীবনে উচ্চশিক্ষিত ও যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। বর্ধমানের গোতান গ্রাম নিবাসী গৌরচন্দ্র পাল নামক একটি বালক চারুচন্দ্রের আলয়ে থাকিয়া চতুর্থ শ্রেণী হইতে ইস্কুলের শিক্ষা আরম্ভ করিয়া কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. ও বি. এল. পাস করিয়া উকিল হন এবং পাটনায় নূতন হাইকোর্ট খুলিলে তিনি তথায় গিয়া ওকালতি করিয়া বহু অর্থ উপার্জন করেন এবং নিজ মেধা ও অধ্যবসায়গুণে পাটনা হাইকোর্টের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যবহারজীবী হন। সত্যকিঙ্কর সেন নামক আর একটি মেধাবী দরিদ্র বালক চারুচন্দ্রের আলয়ে থাকিয়া পঞ্চম শ্রেণী হইতে হিন্দু ইস্কুল হইতে বিদ্যার্জন করিতে আরম্ভ করিয়া বি. এ. অবধি ডিগ্রি পান এবং পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কয়েকবার মাসিক বৃত্তি পান।

চারুচন্দ্র শোভাবাজার বেনাভোলেণ্ট সোসাইটির একজন সহকারী সভাপতি ও কর্মী ছিলেন। ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে চারুচন্দ্র ডিস্ট্রিক্ট চ্যারিটেবেল সোসাইটি, ১৮৯৪ খৃস্টাব্দ হইতে Countess of Dufferin Fundএর এবং ১৮৯৭ খৃস্টাব্দ হইতে The Calcutta Society for the Prevention of Cruelty to Animals সভার সভ্য হইয়া আজীবন কার্য করেন। চারুচন্দ্র খুচরা পয়সা বাটীতে নিজের নিকট রাখিতেন এবং যে কেহ ভিখারী আসিত তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে স্বহস্তে দান করিতেন। প্রতিবৎসর ৺শারদীয়া পূজার সময় বহু অনাথা বিধবা, খঞ্জ ও অন্ধ তাঁহার নিকট হইতে বস্ত্র পাইত।

চারুচন্দ্রের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক ছিল। তাঁহার নেশার মধ্যে ছিল একমাত্র বর্মা চুরুট ধূমপান, ইহা ভিন্ন তিনি জীবনে কখনও কোনরূপ নেশা করেন নাই। তিনি সকলরূপ লোকের সহিত সর্বদা মিশিলেও এবং নানা উদ্যান পার্টি ও বিলাতী খানার পার্টিতে খাইলেও কেহ কখনও তাঁহাকে কোনরূপ মাদকদ্রব্য স্পর্শ করিতে দেখে নাই। সকলরূপ নেশাকেই তিনি ঘৃণা করিতেন।

মিথ্যা কথাকে চারুচন্দ্র অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তিনি জীবনে কখনও মিথ্যা কথা কহেন নাই বা তাঁহার নিকট কেহ মিথ্যা কথা বলিলে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হইতেন।

মানসিক বল ও আত্মসংযম তাঁহার অসম্ভবরূপ ছিল। তিনি যে কার্য হস্তে লইতেন তাহার সর্বাঙ্গীণ সুন্দরভাবে সুসম্পন্নের জন্য মনপ্রাণ ঢালিয়া দিতেন। আত্মাভিমান বা অহঙ্কার তাহার ছিল না এবং ধনী বা দরিদ্র

সকলের সহিত তিনি সমানভাবে মিশিতেন। তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদে বিশেষ পারিপাট্য ছিল কিন্তু বাহ্যাড়ম্বর ছিল না।

কলিকাতার তৎকালীন সকল সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত তিনি বিশেষ আত্মীয়ভাবে মিশিতেন। তাঁহার আন্তরিক বন্ধু ছিল তাঁহার সহপাঠী রাজা কৃষ্ণদাস লাহা, কুমার মন্মথনাথ মিত্র এবং হরিচরণ রায় চৌধুরী এবং তাঁহার ভগ্নীপতি পাথুরিয়াঘাটার রমানাথ ঘোষ, তাঁহার শ্যালক রমেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়। পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বংশের সহিত চারুচন্দ্রের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর চারুচন্দ্রকে বিশেষ ভালবাসিতেন এবং প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে চারুচন্দ্র যখন তাঁহার বনহুগলীর "চারুবাগ" নামক উদ্যানে বাস করিতেন সেই সময় তাঁহার বাগানের অদূরবর্ত্তী এমারল্ড বাওয়ার বা "মরকত কুঞ্জ" নামক উদ্যানে মহারাজাও ঐ সময়ে থাকিতেন এবং প্রতি বুধবার ও রবিবার বৈকালে মহারাজা চারুচন্দ্রের উদ্যানে আসিতেন এবং চারুচন্দ্রও প্রায় মহারাজার উদ্যানে যাইতেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পুত্র, মহারাজা স্যার প্রদ্যোৎকুমারও চারুচন্দ্রের একজন আন্তরিক বন্ধু ছিলেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন স্বর্গারোহণের পূর্বে পুত্র প্রদ্যোৎকুমারকে বলিয়া যান যে তাঁহার বিষয় সংক্রান্ত কোন জটিল প্রশ্নাদি উঠিলে চারুচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিতে। মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার চারুচন্দ্রকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় দেখিতেন এবং তিনি রাজনৈতিক ও বৈষয়িক নানা কার্য্যে চারুচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিতেন। মহারাজা প্রদ্যোৎকুমার যখন তাঁহার মধুপুরের প্রাসাদে থাকিতেন চারুচন্দ্রকে তিনি তথায় দুইবার নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। দুই পুরুষ হইতে উভয় সংসারে বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল এবং ঠাকুর বংশের সকলের সহিত চারুচন্দ্রের বিশেষ ভালবাসা ছিল।

অভ্যাস হইতেই চরিত্র গঠন হইয়া থাকে। চারুচন্দ্রের দৈনিক কার্য্য ঠিক নিয়মমত ছিল। তিনি প্রত্যহ প্রাতে ৫টা হইতে ৬টার মধ্যে কি গ্রীষ্ম কি শীত সকল কালেই উঠিয়া প্রাতঃস্নান করিয়া আহ্নিক করিতেন। প্রত্যহ সকালে তাঁহার বাটীতে তাঁহার পল্লীবাসী কয়েকটি বন্ধু আসিয়া তাঁহার সহিত চা খাইতেন। বেলা ৮টা হইতে ১১টা অবধি তিনি বিষয়কর্ম এবং অভ্যাগতদের সহিত দেখাশুনা করিতেন। বেলা ১২টার মধ্যে আহার করিয়া দুই ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া, বেলা তিনটার সময় প্রত্যহ দ্বিতীয়বার স্নান করিয়া, আহ্নিক করিয়া চা খাইতেন এবং বেলা ৪টার সময় ভ্রমণে বাহির

হইতেন। তাঁহার প্রত্যহ বৈকালের ভ্রমণ ছিল কোন সভা-সমিতিতে যোগদান করা কিম্বা কোন আত্মীয়-কুটুম্ব বা বন্ধুবান্ধবের বাটীতে দেখা সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া। তাঁহার কোন আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের অসুখ হইলে তিনি নিজে গিয়া নিয়মিতভাবে সংবাদ লইতেন এবং কোন আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের আলয়ে বিবাহাদি কোন উৎসব থাকিলে তিনি নিজে গিয়া নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন। প্রত্যহ রাত্র ৮টার মধ্যে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া রাত্র ৯টার মধ্যে আহারাদি করিয়া শয়ন করিতেন।

চারুচন্দ্রের একটি বিশেষ সখ ছিল নিজে হস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়া ও পাঁচজনকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়ান। তিনি নানারূপ খাদ্য অতি সুন্দরভাবে রন্ধন করিতে পারিতেন। নানারূপ বিভিন্ন দেশের মুদ্রা এবং পোস্টেজ স্ট্যাম্প বা ডাক টিকিট সংগ্রহ করা তাঁহার একটি বিশেষ সখ ছিল। নানা দেশের মুদ্রা এবং ডাকের টিকিট তিনি বহু যত্নে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এখনও তাহার সংগৃহীত পুরাতন মুদ্রা, পোস্টেজ স্ট্যাম্পের এলবাম তাঁহার পুত্রগণ লাইব্রেরীতে সযত্নে রাখিয়া দিয়াছেন। নানারূপ চিত্র সংগ্রহ করিতে তিনি ভালবাসিতেন। অনেক বিখ্যাত তৈলচিত্র তিনি ক্রয় করিয়া বা চিত্রকরকে দিয়া অঙ্কিত করাইয়া নিজ গৃহে সযত্নে রাখিয়াছিলেন।

চারুচন্দ্র বনহুগলী গ্রামে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর দ্বারিকানাথ ক্ষেত্রীর একটি মনোরম সুসজ্জিত উদ্যান এবং তদুপরি একটি সুবৃহৎ প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা ও অন্যান্য তিনটি বাটী ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে খরিদ করেন। এই উদ্যানটি চারুচন্দ্রের বিশেষ সখের সম্পত্তি ছিল। প্রায় প্রতি রবিবার প্রাতে তিনি তথায় গিয়া নানারূপ ফল-পুষ্পের বৃক্ষাদি নিজ তত্ত্বাবধানে বসাইতেন এবং পর্যবেক্ষণ করিতেন এবং সন্ধ্যার সময় ফিরিতেন। তাঁহার নানারূপ ফলফুল গাছের সখ বিশেষরূপ ছিল; বিশেষত আম্র তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। বার মাসই তিনি প্রায় আম খাইতেন। প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ দুই মাসে উক্ত উদ্যানে গিয়া সপরিবারে বাস করিতেন এবং উক্ত বাগানে মধ্যে মধ্যে আত্মীয়-বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়াইতেন।

দেশভ্রমণে চারুচন্দ্রের বিশেষ আসক্তি ছিল। তিনি ভারতবর্ষের প্রায় সকল বড় বড় সহর ও ঐতিহাসিক স্থানে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। প্রায় প্রতি বৎসর স্বীয় আলয়ে ৺দুর্গাপূজার কার্য শেষ করিয়া অন্ততঃ এক মাসের জন্যও দেশভ্রমণে বাহির হইতেন। ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে তিনি নৈনিতাল পাহাড়

ও রায়বেরিলী, ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে দিল্লী, আম্বালা, পেশোয়ার ও সিমলা পাহাড়ে, ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে বম্বে, পুনা, দ্বারকা ইত্যাদি স্থানে, ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে থানেশ্বর ও জয়পুর ইত্যাদি স্থানে এবং ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে পাথুরিয়াঘাটার রমানাথ ঘোষ ইত্যাদি কয়জন বন্ধুর সহিত ভাগলপুর, কাশী, অযোধ্যা, ফাইজাবাদ্ লক্ষ্ণৌ, হরিদ্বার, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, প্রয়াগ ইত্যাদি বহুস্থানে ভ্রমণ করিয়া আসেন।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পেশোয়ার হইতে যে পত্র লেখেন তাহাতেই তাঁহার দেশভ্রমণের আসক্তির পরিচয় পাওয়া যায়—

সিমলা পাহাড়

৯ই অক্টোবর, বুধবার।

আমি অমৃতসহর পরিত্যাগ করিয়া পেশোয়ার (কাবুলীদিগের দেশ) গিয়াছিলাম। এখানে রেলগাড়ী শেষ হইয়াছে—হিমালয় পাহাড় অতিক্রম করিয়া রেল গিয়াছে—পাহাড়ের পর সমতলভূমি সেইখানে পেশোয়ার। এখানে একটী বাঙ্গালী দেখিবার জো নাই—সকল পেস্তাবেচা কাবুলিদিগের নগর। চাষা চাষ করিতেছে, তাহারাও বড় ইজের জামা ও পাগড়ী ব্যবহার করে। এখানে বেদানা এক পয়সা, একটী আপেল দুই পয়সা, অতি উৎকৃষ্ট আঙ্গুরের বাক্স ছয় পয়সা। ইচ্ছা হইয়াছিল কতকগুলি কিনিয়া সঙ্গে লইয়া যাই। পথে লুধিয়ানা দেখিলাম—যেখান হ'তে কিয়েল যুদ্ধ করিয়া ইংরাজরা ফিরিয়াছে। পথে এটক কেল্লা—অতি সুন্দর—দুইদিকে বৃহৎ পাহাড়—মধ্য দিয়া নদী বহিতেছে এবং এই পাহাড়ের উপর কেল্লা। এখানে দার্জ্জিলিং পাহাড়ের ন্যায় রেল পাহাড়ের উপর ঘুরিয়া চলিয়াছে—এই সকল দেখিয়া সোমবার দিবসে কাল্কা আসিয়া পৌছিলাম। তথায় ক্ষেত্রের মামা জীবনকৃষ্ণ সেনের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় সিমলা পাহাড়ে উঠিবার বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলাম। তিনি বিশেষ যত্ন করিলেন। সোমবার রাত্রি ৯টার সময় পৌছিবামাত্র মেল গাড়ী প্রস্তুত ছিল তাহাতে রাত্র ১টার সময় চাপিয়া মঙ্গলবার সকাল ৯টার সময় পৌছিলাম। এখানে মরিস হোটেলে বাস করিতেছি।

অনেক ইংরাজ ও বিবি আছে। আমি নীচে পৃথক একটী ঘর লইয়াছি। ঘরের মধ্যেই খাইতেছি, সাহেবদিগের সহিত কোন এলাকা নাই। এখানে অত্যন্ত শীত। একখানা মোটা কম্বল কিনিয়া দুই পাট করিয়া গায়ে দিয়া তবে শীত নিবারণ হয়। কাল্কা হইতে সিমলা পাহাড়ে আসিবার গাড়ী যাহাকে

টাঙ্গা বলে ফেটিন গাড়ীর ন্যায় দুই ঘোড়া জোড়া ও অতিশয় নিচু। এখানে কলাইসুটি অনেক। অনেক আমি কিনিয়া বাড়ী লইয়া যাইব। ৪ জন ছেলের নিমিত্ত ৪টী গলাবন্ধ ও ৪ সেট পাথরের বোতাম কিনিয়াছি। পথে অপর ছেলেদের নিমিত্ত কিনিব। কল্য বৃহস্পতিবার সকালে সিমলা পরিত্যাগ করিয়া যাইব। সেই রাত্রে কাল্কা থাকিয়া শুক্রবার রাত্রিতে যাত্রা করিব। ১৩ই অক্টোবর রবিবার খুব সকাল ৫॥০টার সময় পৌছিব। ষ্টেশনে গাড়ী পাঠাইবে। কাগজে দেখিবে সকালে পুল খোলা আছে কিনা। যদি পুল ৬টা হইতে ৮টা অবধি সকালে খোলা থাকে তবে গাড়ী ওপারে রাখিবে। নচেৎ হাওড়া ষ্টেশনে রাখিতে বলিবে।

চারুচন্দ্র।

পটলডাঙ্গা বসুমল্লিক বংশের সকল সন্তানেরই বাবা বিশ্বনাথের স্থান ৺কাশীধামের উপর বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায়। ৺রাধানাথ বসুমল্লিক মহাশয়ের পুত্র পৌত্রগণ প্রায় সকলেই অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইয়া নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন কিন্তু তাহাদের সকলেরই কাশীধামের প্রতি যেরূপ অনুরাগ ও আকর্ষণ দেখা গিয়াছে এরূপ ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গলার বাহিরে আর কোন স্থানের প্রতি দেখা যায় নাই। এই বংশের অনেকেই কাশীধামে অনেক গৃহ খরিদ করিয়াছিলেন। রাধানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়গোপাল কাশীধামে ৺বিশ্বনাথের গলির মধ্যে একটি বাটী খরিদ করেন এবং তথায় গিয়া প্রায়ই বাস করিতেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রবোধচন্দ্র ঐ বাটীতে দেহরক্ষা করেন। মন্মথনাথ বিলাতে বহু বৎসর থাকিয়া মেম বিবাহ করিবার পরে ভারতবর্ষে আসিয়া কাশীধামের উক্ত বাটীতে সপরিবারে একবার দুই বৎসর বাস করিয়াছিলেন। ১৯০০ খৃস্টাব্দে চারুচন্দ্র ৺কাশীধামে চকের উপর ৺বিশ্বনাথদেবের মন্দির ও গঙ্গার সন্নিকটে বাসকা ফটকে জমি ক্রয় করিয়া নিজ পছন্দমত একটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া প্রতি বৎসর একবার বা দুইবার গিয়া তথায় বাস করিতেন। চারুচন্দ্র এই বাসকা ফটক মহল্লায় আরো দুইখানি বাটী, তাঁহার ভ্রাতা ক্ষেত্রচন্দ্র তিন চারিখানি বাটী এবং সতীশচন্দ্র প্রায় বার চৌদ্দখানি বাটী করিয়া তথায় একটি 'মল্লিক পাড়া"র সৃষ্টি করিয়াছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে নানাস্থানে ভাল ভাল স্বাস্থ্যকর বহু নগরাদি আছে কিন্তু এই বংশের কেহ সেই সময় কাশীধাম ভিন্ন অন্য কোথাও গৃহাদি নির্মাণ করান নাই এবং এই বংশধর-

গণকে কাশীধামে গিয়া যত দিবস অতিবাহিত করিতে দেখা যায় অন্য কোনস্থানে সেরূপ বাস করিতে এযাবৎ দেখা যায় না।

চারুচন্দ্র তাঁহার সকল বিষয়কর্মাদি স্বহস্তে তত্ত্বাবধান করিতেন এবং সকল বিষয় সম্পত্তির হিসাব নিকাশ নিজে দেখিতেন এবং তাঁহার সরকার গোমস্তা ইত্যাদি অনেক কর্মচারী থাকিলেও সকল বিষয় যতদূর পারিতেন নিজে দেখিতেন। একটি পয়সা কোন বিষয়ে খরচ হইলে বা করিলে তাঁহার সেই খরচের হিসাব লেখা থাকিত। জমিদারীর সকল পত্রাদি ও কাগজপত্র তিনি স্বয়ং দেখিতেন। সকল প্রকার খরচে তাঁহার মিতব্যয়িতা ছিল কিন্তু কার্পণ্য মোটেই ছিল না। মিথ্যা ব্যয়বাহুল্য তিনি কখনও করেন নাই।

চারুচন্দ্র সত্যবাদী, অমায়িক ও কর্মশীল পুরুষ ছিলেন। অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইয়াও গর্ব বা অহঙ্কার তাঁহার কখনও প্রকাশ পায় নাই? মুখমণ্ডল সৌম্য ও গম্ভীর—হৃদয় সরল ও মধুময়। জীবনে কখনও কাহারও সহিত রূঢ় ব্যবহার করেন নাই বা কাহারও মনে কষ্ট দেন নাই। ধনী ও দরিদ্র যিনিই চারুচন্দ্রের সংসর্গে আসিয়াছেন তিনিই চারুচন্দ্রের মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন। শত্রু বলিয়া তাঁহার জগতে কেহ ছিল না। ইংরাজ রাজপুরুষগণের মধ্যে তাঁহার বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া এবং সম্ভ্রান্ত সমাজেও চারুচন্দ্র একজন অসাধারণ লোক বলিয়া সম্মানিত হইয়া গিয়াছেন।

চারুচন্দ্র প্রথম জীবনে বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারে কালাতিপাত করেন। একান্নবর্তী পরিবারে সর্বদা যে সকল অসুবিধা সংঘটনের সম্ভাবনা, চারুচন্দ্রের প্রথম জীবনে পিতৃগৃহে সেরূপ অসুবিধার অভাব ছিল না কিন্তু তিনি কখনও বহুপরিবারের একত্রে বাস নিতান্ত অপ্রীতিকর ও অশান্তিজনক বিবেচনা করেন নাই। দশজনের সঙ্গে মিশিতে ও গল্প করিয়া বন্ধুত্ব করিতে ও রাখিতে চারুচন্দ্র বিশেষ ভালবাসিতেন। তিনি কত অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব অর্জন করিয়াছিলেন এবং কত সভাসমিতির সভ্য ছিলেন তাহার সংখ্যা করা কঠিন। সমাজে সকলেই তাঁহাকে একজন 'মজলিসি' লোক বলিত।

সঙ্গীতে চারুচন্দ্রের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি নিজে গাহিতে বা বাজাইতে জানিতেন না বটে কিন্তু একজন প্রকৃত সমজদার ছিলেন এবং তাঁহার সুরজ্ঞান বোধ ভালরূপই ছিল।

চারুচন্দ্র একজন বড় Freemason ছিলেন। ইংলিশ, স্কটিশ ও আইরিশ তিনটি লজ বা ফ্রীমেসনের তিনি একজন বিশেষ কর্মী ও সভ্য ছিলেন। অনেক

লজের তিনি 'মাষ্টার' হইয়া গিয়াছেন এবং উক্ত ফ্রিমেসন সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ পদ ও নানারূপ উপাধি পাইয়াছিলেন। প্রায় প্রতি সপ্তাহে দুই দিবস উক্ত ফ্রিমেসনের সভায় যোগদান করিতেন।

চারুচন্দ্র কোন কর্মেই কাহারও মুখাপেক্ষী হইতেন না। তাঁহার গৃহে বহু দাসদাসী থাকিলেও যাহা তিনি স্বয়ং করিতে পারিতেন তাহার জন্য ভৃত্যের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিতেন না। ধনীর সন্তান হইলেও তাঁহার গৃহ নির্মাণাদির রাজমিস্ত্রী এবং ছুতার মিস্ত্রীর কার্যে অভিজ্ঞতা ছিল। অনেক সময় নিজে সামান্য গৃহ মেরামত কার্য করিতে তিনি লজ্জিত হইতেন না। পরিশ্রম করাকে তিনি প্রকৃত পুরুষত্বের কার্য বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং কোনরূপ পরিশ্রমকে তিনি কষ্টকর বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁহার ন্যায় পরিশ্রমশীল লোক অল্পই দেখা গিয়াছে। সারা জীবন যথাসময়ে আহার বিহার এবং উপযুক্ত পরিশ্রম করিতেন বলিয়া ৬৬ বৎসর বয়ঃক্রমকাল অবধি তাঁহার শরীর বেশ বলিষ্ঠ ও নীরোগ ছিল।

তাঁহার গৃহদ্বার ধনী দরিদ্র সকল সম্প্রদায়ের লোকের জন্য সর্বদাই উন্মুক্ত থাকিত এবং পল্লীর মধ্যে পল্লীবাসীরা কোন সভা সমিতি বড় অনুষ্ঠান করিলেই তাহার অধিবেশন চারুচন্দ্রের সুবৃহৎ নাটমন্দিরের উঠানে অনুষ্ঠিত হইত। অনেক প্রতিবেশীর বিষয় রক্ষণাবেক্ষণের জন্য চারুচন্দ্রকে ট্রাস্টী বা একজিকিউটার নিযুক্ত হইয়া কার্য করিতে হইত। পরের হিতের জন্য চারুচন্দ্র স্বীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়া পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন কিন্তু কখনও কাহারও নিকট হইতে এক কপর্দক বা কোনরূপ পুরস্কার কোন প্রকারে গ্রহণ করেন নাই।

নিম্নলিখিত তাঁহার স্বহস্তে লিখিত পত্রের অংশ পাঠ করিলে তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব উপলব্ধি করা যায়—

রোজ ব্যাঙ্ক; দার্জিলিং

বৃহস্পতিবার ৬ই অক্টোবর, ১৮৮৭।

পৃথিবীতে বাস করিতে হইলে অনেকরূপে চলিতে হয়। পরোপকার অপেক্ষা ধর্ম্ম কি আর জগতে আছে? পরের উপকার করিতে হইলে নিজের ক্ষতি করিতে হয়।

চারুচন্দ্র

পটলডাঙ্গা

২৪শে জুন, ১৮৭৬।

......মনুষ্যের মন কখনও সমভাবে চিরকাল থাকে না; প্রত্যহ নূতন ভাবের উদয় হয়; আজ একরূপ কাল অন্য প্রকার। পরমেশ্বর মনুষ্যের মন এক অবস্থায় থাকিবার নিমিত্ত সৃজন করেন নাই; আজ বলিতেছি আমার সাত পুত্র হইলেও কখনও মন বিচলিত হইবেক না কিন্তু বলা যায় না; যখনই এই সন্তানের স্নেহের বশীভূত হইয়া মায়ায় মুগ্ধ হইব তখন কিরূপ হইবে। কেননা মনুষ্যের প্রতিজ্ঞা ক্ষণভঙ্গুর। তবে সকল মানবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া যাহাতে কখনও সে কর্ত্তব্য কর্ম্মের পথ হইতে ভ্রষ্ট না হয়।

চারুচন্দ্র।

বিবাহ—পটলডাঙ্গা বসুমল্লিকবংশ কায়স্থ কুলীনগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কুলীন বংশ। মহারাজ বল্লালসেনের সময় হইতে উক্ত বংশে কৌলীন্য প্রথা রক্ষা করিয়া, বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র এই বংশের পূর্বপুরুষ গোপীনাথের প্রবর্তিত 'পুরন্দরের কৌলীন্য প্রথা' অনুসারে পর্যায়ক্রমে জ্যেষ্ঠ পুত্র কুলীন কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া ২৯শে পর্যায় অবধি কৌলীন্য প্রথা বজায় রাখিয়া বংশগৌরব বৃদ্ধি করিয়া আসিতেছেন।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে চারুচন্দ্র যখন হিন্দু ইস্কুলের ছাত্র সেই সময় তাঁহার চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি কৌলীন্য প্রথা মতে বহুবাজার নিবাসী কুলীন কায়স্থ ক্ষেত্রচন্দ্র ঘোষের কন্যা শ্রীমতী শরৎমোহিনীকে বিবাহ করেন। বিবাহের তিন বৎসর পর, ৩রা ডিসেম্বর ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে শরৎমোহিনী তাঁহার একমাত্র কন্যা শিবদুর্গাকে প্রসব করিবার পর হইতে দুর্ভাগ্যক্রমে ৯ দিবস জ্বরে ভুগিয়া ১১ই ডিসেম্বর শনিবার ইহধাম ত্যাগ করেন।

প্রথমা স্ত্রীর স্বর্গারোহণের পর ৪ঠা মার্চ শুক্রবার ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে, শোভাবাজার রাজবংশের রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণসঙ্গিনীকে চারুচন্দ্র বিবাহ করেন। এই বিবাহে বরপক্ষের পটলডাঙ্গা ভবনে এবং কন্যা-পক্ষের শোভাবাজার রাজবাটীতে বিশেষরূপ আড়ম্বর ও ঘটা হইয়াছিল।

"Marriage in high life

The happy union took place on the night of the 4th instant at the mansions of the Rajahs Kalikrishna and Prosona

Narayan Deb Bahadurs of Sovabazar, the grand-daughter, who is the eldest daughter of Koomar Harendra Krishna Rai Bahadur our Deputy Magistrate and Deputy Collector of the Sealdah Court has been betrothed to the son of Babu Dwarakanath Mullick, a rich Zamindar of Pataldanga and the son of the latter to the daughter of good Kulin Babu."

—Englishman, June 1870.

চারুচন্দ্রের বিবাহিত জীবন খুব শান্তিতেই অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার স্ত্রী কৃষ্ণসঙ্গিনী একজন আদর্শ পতিভক্তিপরায়ণা বিদুষী ও শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। তাঁহাদের দাম্পত্য জীবনে কখনও কোনরূপ মনোমালিন্য হইতে কেহ দেখে নাই বা শুনে নাই। চারুচন্দ্রের ছয় পুত্র এবং ছয় কন্যা জন্মগ্রহণ করে। চারুচন্দ্রের বহু পুত্র কন্যা ও পৌত্র পৌত্রী দৌহিত্র দৌহিত্রী লইয়া সুবৃহৎ পরিবার-বর্গ মধ্যে তাঁহাদের উভয়ের সুন্দর প্রকৃতি ও সুবুদ্ধির জন্য সংসার প্রকৃত শান্তি ও সুখের আগার ছিল। চারুচন্দ্র সকল পুত্র কন্যাকে সমান চক্ষে দেখিয়া স্নেহ ভালবাসা ও যত্নে একজন আদর্শ পিতার ন্যায় লালন পালন করিয়া গিয়াছিলেন। প্রত্যেক কন্যার বিবাহ কলিকাতার সম্ভ্রান্ত বংশে উপযুক্ত পাত্র দেখিয়াই দিয়া গিয়াছেন। চারুচন্দ্র তাঁহার জীবনকালে সাত কন্যার বিবাহ ঠিক দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দিয়াছিলেন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহে বিশেষ ধুমধাম করিয়া কুলকর্ম করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক পুত্র কন্যার শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের জন্য যথাসম্ভব সুশৃঙ্খলে যথোচিত শাসন করিয়া সকলকে মানুষ করিয়াছিলেন।

স্বর্গারোহণ—চারুচন্দ্র তাঁহার পঁয়ষট্টি বৎসর বয়ঃক্রমকাল অবধি আহার নিদ্রা ও সকল কার্যই যথানিয়মিতভাবে সময়মত পালন করিয়া শরীর দৃঢ় ও স্বাস্থ্য সুন্দরভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। ২২শে মার্চ ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাঁহার প্রথম রোগের সূত্রপাত হয় এবং ঐ দিবস সকাল হইতে তাঁহার প্রস্রাব ক্রিয়া বন্ধ হয়। ডাক্তার হরিধন দত্ত এবং ডাক্তার মৃগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় তাঁহাকে চিকিৎসা করিয়া ৮।১০ দিবসের মধ্যে আরোগ্য করেন কিন্তু সেই সময় হইতে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইতে থাকে। ১০মে তারিখে তিনি দার্জিলিং পাহাড়ে তিন পুত্রের সঙ্গে বায়ু পরিবর্তনের জন্য যান কিন্তু তথায় অত্যধিক ঠাণ্ডা তাঁহার সহ্য না হওয়ার এক সপ্তাহ মাত্র থাকিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ২৫শে

সেপ্টেম্বর তারিখে কাশীধামে বায়ু পরিবর্তনের জন্য গিয়া দুই মাস থাকিয়া, ২০শে নভেম্বর তারিখে কলিকাতায় চলিয়া আসেন। ক্রমে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইতে থাকে এবং ডিসেম্বর মাস হইতে শয্যাগ্রহণ করেন। ডাক্তার নীলরতন সরকার, ব্রাউন সাহেব, ক্যালভার্ট সাহেব ইত্যাদি ডাক্তারগণের দ্বারা প্রথমে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা হয়। কয় মাস এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় উপকার না হওয়ায় ডাক্তার ইউনান সাহেব, ডাক্তার অক্ষয় ঘোষ, জোড়াসাঁকোর বিজয় সিংহ মহাশয় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন। তাহাতেও কোন উপকার না হওয়ায়, মহামহোপাধ্যায় শ্যামাদাস কবিরত্ন, নিরাপদ সেন প্রমুখের দ্বারা কবিরাজী চিকিৎসা করান হয়। কিন্তু কোন চিকিৎসাই ফলপ্রদ না হওয়ায়, ছয় মাস কাল জ্বর ও পেটের গোলমালে ভুগিয়া ২২শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার ১৩২৩ সনে ইংরাজী ৪ঠা জুন ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মহাপুরুষ চারুচন্দ্র পতিপ্রাণা স্ত্রী, ছয় পুত্র, ছয় কন্যা এবং অসংখ্য আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব রাখিয়া স্বর্গলোকে চলিয়া গেলেন। পটলডাঙ্গা বসুমল্লিক বংশের শ্রেষ্ঠ উজ্জ্বল রত্ন চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইল। রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় মহাপ্রয়াণ হয় এবং এক ঘণ্টার মধ্যে শত শত আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়া তাঁহাকে সম্মান দেখান এবং নিমতলার শ্মশানঘাটে প্রায় দুইশতের অধিক ভদ্রলোক গিয়া তাঁহার শেষ কর্ম করেন।

চারুচন্দ্র সেই সময় বঙ্গদেশের স্বনামধন্য মহাপুরুষগণের মধ্যে একজন ছিলেন এবং তাঁহার স্বর্গারোহণের পরই তাঁহার জন্য শোক প্রকাশ করিয়া বহু সভা-সমিতির বিশেষ অধিবেশন হয় এবং বঙ্গদেশের নানাস্থান হইতে বহু সম্ভ্রান্ত রাজা মহারাজা ও রাজপুরুষ, ধনী ও দরিদ্র তাঁহার শোকার্ত পরিজনবর্গকে সান্ত্বনা দিবার জন্য টেলিগ্রাম ও পত্র প্রেরণ করেন। তাঁহার স্বর্গগমনের পর-দিবসই শিয়ালদহ পুলিস কোর্ট, ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন, পটলডাঙ্গা হাই-ইস্কুল, ইত্যাদি ও অন্যান্য অনেক সাধারণ কার্যালয় এবং সভাসমিতি ও লাইব্রেরী গৃহ তাঁহার সম্মানের জন্য বন্ধ দেওয়া হয়। সেই সময় সকল ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রেই তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার জীবনী প্রকাশিত হয়।

চারুচন্দ্রের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া দার্জিলিংএর বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্ট হাউস হইতে দুইখানি পত্র আসে—

D. O. 1336

Private Secretary to
the Governor of Bengal.

Government House
Darjeeling.
12th June, 1916.

Dear Sir and Wor : Brother.

I have heard with deepest regret and sorrow of the death of your father Right Wor : Brother Charu Chandra Mullick. Past Senior Warder and Grand Superintendent of the Grand Lodge A. S. F. I. I beg that you will offer the sympathy of the Brother to the members of the bereaved family

Yours fraternally,
(Sd) W. R. Goulay.

দার্জিলিং পাহাড় হইতে বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর টেলিগ্রাম করেন—

Babu Ganendranath Mullick
18. Radhanath Mullick Lane,
Calcutta.

My deepest sympathy on your great Bereavement.

Burdwan

Death of Babu Charu Chandra Mullick.

The death took place last Sunday evening of Babu Charu Chandra Mullick at his family residency at Pataldanga He was the head of the Kayastha Mullick family of Calcutta occupied a most prominent position in his community. He. was a Zamindar and also owned considerable landed property in the city He took an active part in all public movements and was a leading member of the Committee of the British Indian Association of which he had been a Vice-President for

several times. He was an Honorary Magistrate of Calcutta and Sealdah and help a high place in Masonic circles. He has left behind him a widow and six sons and six daughters. his eldest son, Mr. Ganen Mullick being a high Mason who has been a Past Master in sevral Lodges in Bengal.

—The Englishman, Wednesday, 7th June, 1916.

Late Babu Charu Chandra Mullick

Sealdah Police Court was closed on Tuesday after the midday adjournment and the Clubs and Schools of Pataldanga were closed in respect for the memory of the late Babu Charu Chandra Mullick.

—The Statesman, 8th June, 1916.

Obituary

We are deeply grieved to announce the death on last Sunday evening of Babu Charu Chandra Mullick at his family residence at Pataldanga. He was the head of the Kayastha Mullick Family of Calcutta and occupied a most prominent position in his community. He was a Zemindar and also owned considerable landed property in Calcuttta. He took an active part in all public movements and was a leading member of the Committee of the British Indian Association of which he had been a Vice-President for several years. He was an Honorary Magistrate of Calcutta and Sealdah and held a high place in Masonic circles. He has left behind him a widow, six sons, and six daughters. his eldest son being Mr. Ganendra Mullick. We offer our condolences to the members of the bereaved family.

—The Amrita Bazar Patrika, 9th June, 1916.

কলিকাতার পটলডাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ বসু মল্লিক বংশের বাবু চারুচন্দ্র বসু মল্লিক ক্রমাগত ৬।৭ মাস জ্বর রোগে কষ্ট ভোগ করিয়া গত রবিবার রাত্রে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি কলিকাতা সমাজে একজন প্রতিষ্ঠাবান ও সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। বাবু চারুচন্দ্র বসু মল্লিক ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চ কায়স্থ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কায়স্থ সভার প্রতিষ্ঠাতা এবং একজন শ্রেষ্ঠ পরিচালক ছিলেন। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটিতে তিনি তিনবার কমিশনার নির্ব্বাচিত হইয়া নয় বৎসর উক্ত পদপ্রাপ্ত হয়েন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের তিনি বহু বৎসর ভাইস প্রেসিডেণ্ট ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন এবং কলিকাতা ও শিয়ালদহের পুলিশ কোর্টের অবৈতনিক প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

—দৈনিক বসুমতী, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩২৩।

গত ২২শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার কলিকাতা পটলডাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ বসু মল্লিক বংশীয় চারুচন্দ্র বসু মল্লিক মহাশয় ৬৬ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ছয় মাস জররোগে ভুগিতেছিলেন। বলাই বাহুল্য, চারুচন্দ্র উচ্চ কায়স্থ বংশীয়। এগার শত খ্রীষ্টাব্দে বল্লাল সেন যে পাঁচজন কায়স্থ আনাইয়াছিলেন, তাঁহাদের অন্যতম দশরথ বসু তাহার আদিপুরুষ ছিলেন। দশরথ বসুর অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ গোপীনাথ বসু বঙ্গের শাসন কর্ত্তা রাজা হোসেন শার উজির ছিলেন। তিনি খাঁ উপাধি লাভ করেন সপ্তদশ পুরুষ রঘুনাথ বসু খাঁ 'মল্লিক' উপাধি পান। চারুচন্দ্র নানা গুণে বহু বিশ্রুত। ইহার ধন ছিল; কিন্তু গর্ব্ব ছিল না। আজকাল কলিকাতায় অনেক সাধারণ কাজে তাঁহার সংশ্রব ছিল। সেই সূত্রে তাঁহার ধীরতা বুদ্ধিমত্তা বিদ্যাবত্তা এবং বিনয় নম্রতার পরিচয় পাইবার সুযোগ ঘটিত। ইনি বহু দরিদ্র ছাত্রকে আপনার বাড়ীতে রাখিয়া প্রতিপালন ও শিক্ষার সাহায্য করিতেন। অধিকন্তু অনেক বিধবা রমণী ও অন্ধ খঞ্জ আতুর ইহার নিকট সাহায্য পাইত। এক কথায় ইনি যেমন হৃদয়বান তেমনই বুদ্ধিমান ছিলেন। কাহাকেও এমন কি ভৃত্যবর্গকেও ইনি কখনও রূঢ় কথা বলিতেন না। এ হেন বহুগুণোপেত উচ্চবংশীয় পুরুষের বিয়োগে কে না ব্যথিত হইবে। কিন্তু উপায় কি? তাঁহার বংশধরগণ তাঁহারই গুণ স্মৃতিতে তাঁহারই পদানুসরণ করিয়া তাঁহার স্মৃতির সম্মান করুন ইহাই বাঞ্ছনীয়।"

—বঙ্গবাসী, ৩রা আষাঢ় শনিবার, ১৩২৩।

পরলোকগত ৺চারুচন্দ্র বসু মল্লিক

পটলডাঙ্গার বিখ্যাত বসু মল্লিক বংশের শ্রেষ্ঠ রত্ন ও গৌরবস্থল চারুচন্দ্র বসু মল্লিক আর এ জগতে নাই। কয়েক মাস শয্যাগত থাকিবার পর বিগত ২২শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার রাত্র ৯টার সময় তাঁহার নশ্বরদেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইয়াছে। তিনি গত ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বল্লালসেনের আনীত পঞ্চ কায়স্থের মধ্যে অন্যতম দাশরথী বসু তাঁহার আদি পুরুষ। তাঁহার অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ গোপীনাথ বসু বাঙ্গলার নবাব হোসেন সার উজীর ছিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক খাঁ উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাহার সপ্তদশ পুরুষ রঘুনাথ বসু খাঁ 'মল্লিক' উপাধি লাভ করেন; ঐ উপাধি আজিও এ বংশের সকলে ব্যবহার করেন। তিনি নয় বৎসর মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ছিলেন ইহার মধ্যে তিনবার পুনঃ নির্ব্বাচিত হন। তিনি লালবাজার ও শিয়ালদহ পুলিশ কোর্টের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামক সমিতির সহকারী সভাপতি ও কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। শোভাবাজার দাতব্য সভার ও ইণ্ডিয়ান মিরর নামক সংবাদ পত্রের হীরক জুবিলীর কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর সময় ময়দানে শোক প্রকাশের জন্য যে সকল অনুষ্ঠান হয় তিনি তাহার উদ্যোগী ছিলেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জের কলিকাতায় আগমন উপলক্ষে যে বাজী প্রদর্শন হইয়াছিল তিনি তাহার একজন সভ্য ছিলেন। তিনি ভারত সঙ্গীত সমাজের সভাপতি ছিলেন। শোভাবাজারের মহারাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের কন্যা কৃষ্ণসঙ্গিনীকে বিবাহ করেন। চারুচন্দ্র সত্যবাদী, অমায়িক ও কর্ম্মশীল পুরুষ ছিলেন। অতুল সম্পদের অধিকারী হইলেও তিনি নিরহঙ্কার ছিলেন। যিনিই তাঁহার সংসর্গে আসিয়াছিলেন তিনিই চারুচন্দ্রের সরল মধুর ব্যবহারে মুগ্ধ হইতেন। জীবনে কখনও কাহারও সহিত রূঢ় ব্যবহার করেন নাই বা কাহারও মনঃকষ্ট দেন নাই। তিনি অলসভাবে সময় কাটাইতে জানিতেন না। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিনও তাঁহাকে সংবাদপত্র পড়িয়া শুনান হইয়াছে। রোগের শয্যাতে জমিদারী চিঠি পত্র নিজে লিখাইতেন। সাহিত্যে তাঁহার অনুরাগ ছিল; তিনি সাহিত্য সভার কয়েক বৎসর কাল কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি জীবিত থাকিতে পাড়ার কাহাকেও বিপদ নিষ্পত্তির জন্য আদালতে আশ্রয় লইতে হয় নাই, দেশের ও দশের উপকার করা চারুচন্দ্রের জীবনের লক্ষ্য ছিল। তিনি দেশলাইয়ের কল স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি অনেকগুলি ছাত্রকে প্রতিপালন করিতেন এবং বিধবারা তাঁহার নিকট মাসিক

বৃত্তি পাইত। তিনি কায়স্থ সভার নেতা ছিলেন। হিন্দু ধর্মে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল ও তিনি দোল দুর্গোৎসবাদি অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহার সংসারে ছয় পুত্র ও দয়াময়ী পত্নী বর্তমান। তাঁহার সম্মানার্থে শিয়ালদার আদালত মঙ্গলবার ২টার সময় বন্ধ হয় এবং পটলডাঙ্গার ইস্কুল ও ক্লাব সব বন্ধ থাকে। তাঁহার শ্রাদ্ধের সভার দিনে বাঙ্গালার গভর্ণর বাহাদুরকে উপস্থিত হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করা হইতেছে। সোমবার দিন বর্দ্ধমানের মহারাজা ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সভায় শোক প্রকাশ করিবার জন্য সভ্যগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

—নায়ক, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, ১৩২৩।

From

"THE CYCLOPEDIA OF INDIA."

Vol. II, page 206

Mr. CHARU CHANDRA BOSE MULLICK is the head of the Pataldanga family of that name, and a well-known zemindar. The family are noted for their property and charity, and in the latter direction they have dontributed very large sums of money and have a fund for the education of boys. They also subscribe liberally to the Hindu widow Funds.

CHARU CHANDRA descended from Purandar Bose Mullick, better known as Purandar Khan, the founder of Kulins among the Kayesthas of Bengal. He is an Honarary Presidency Magistrate of both Calcutta and Sealdah and served as a Municipal Commissioner for nine years; during which period he was thrice elected. He is a member of several Associations and was for some time Vice President of the British Indian Association. He played a conspicuous part in the great maidan demonstration on the occasion of the death of the late Queen-Empress. As a Freemason he holds high rank. He is also a Prominant member of the

India Sangit Samaj Association. Although a Theosophist, he is a Hindu in the literal sense and observe all-Hindu rites.

(Published by the Cyclopaedia Publishing Coy. 1908)

"THE IMPERIAL CORONATION DURBAR."

Delhi. 1911.

"CHARU CHANDRA MULLICK of Calcutta was born in 1850 and educated at the Presidency College in the Metropolis. He is an Honarary Presidency Magistrate of Calcutta, and Honarary Magistrate of Sealdah. He belongs to a high Kayastha Family noted for its public spiritedness, and is Member of many Charitable and Public Associations He is a Zamindar and house owner, and proprietr of house property in Calcutta. He is descended from Dasarath Bose, whose 1?th descendant Gopinath Bose was Vazeer of King Hosein Sha and was given the title of Purandar Khan. Till this commemoration, betul and nuts are kept in marriage. Later on the 17th descendant Raghunath was given the title of "MULLICK" which name is still borne by the family, Charu Chaudra Mullick has been exempted from Arm Act and is allowed 4 armed retainers. He is a Theosophist and high Mason.

The Imperial Publishing Co. (Khosla Bros.)
Lahore (Punjab) (page 242) Vol. I.

রাজকুমারী কৃষ্ণসঙ্গিনী—রাজকুমারী কৃষ্ণসঙ্গিনী মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের প্রপৌত্র মহারাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হরেন্দ্র কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ কন্যা। তিনি ১০ই মাঘ ১২৬৬ সনে জন্মগ্রহণ করেন।

রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ একজন বিশেষ শিক্ষিত ও গুণী লোক ছিলেন এবং ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য করিতেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু হইলেও তাঁহার পাঁচ কন্যা

ও তিন পুত্রকে সুন্দরভাবে শিক্ষিত করেন। কৃষ্ণসঙ্গিনী শৈশবে গৃহপণ্ডিতের নিকট শিক্ষা করিয়া পরে বেথুন কলেজিয়েট ইস্কুলে কয় বৎসর অধ্যয়ন করেন। তাঁহার সহপাঠিনী ৺কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা কুচবিহারের মহারাণী সুচারু দেবী এবং ময়ূরভঞ্জের মহারাণী সুনীতি দেবীর সহিত কৃষ্ণসঙ্গিনীর বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। বাল্যকাল হইতেই কৃষ্ণসঙ্গিনী সুন্দরভাবে লিখিতে ও পড়িতে পারিতেন।

২০শে ফাল্গুন শুক্রবার ১২৭৬ সনে কৃষ্ণসঙ্গিনীর চারুচন্দ্রের সহিত শুভ পরিণয় হয়। কৃষ্ণসঙ্গিনী শ্বশুরালয়ে আসিয়া একান্নবর্তী বৃহৎ সংসারে থাকিয়া নিজগুণে সকলের বিশেষ প্রিয়পাত্রী হন।

কৃষ্ণসঙ্গিনী দয়াশীলা ও এক আদর্শ রমণী ছিলেন। পরদুঃখকাতরতায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃভবনে ও স্বামী-ভবনে অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে নানারূপ ভোগে মানুষ হইয়াও তাঁহার হৃদয়ে কখনও গর্ব বা অহঙ্কার প্রবেশ করে নাই। কোন দরিদ্র ভিখারী তাঁহার নিকট হইতে বিনা ভিক্ষায় কখনও ফিরে নাই ; দিনে হউক বা রাত্রে হউক গৃহে কোন অতিথি আসিলে তাঁহাকে জলযোগ না করাইয়া তিনি কখনও ফিরাইতেন না। অনেক বিধবা স্ত্রীলোক তাঁহার নিকট হইতে মাসিক বৃত্তি পাইত। যে কেহ আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাকে বিমুখ করিয়া ফিরিতে দেন নাই। অন্ন-ব্যঞ্জন লইয়া আহারে বসিয়াও যদি শুনিতেন যে কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তিনি সেই ক্ষুধার্তকে আহার না দিয়া নিজে ভোজন করিতেন না।

তাঁহার হৃদয়ে কি অসীম দয়া ছিল তাহা প্রকাশ করা যায় না। কাহাকেও তিনি মশা বা ছারপোকা বা অন্য কোন ক্ষুদ্র জীবনকে হত্যা করিতে দিতেন না। সকল জীবজন্তুর উপর তাঁহার অসীম করুণা ছিল। প্রত্যহ দুইবেলা ছাতে গিয়া নিজ হস্তে কাকপক্ষীকে চাল ইত্যাদি আহার দিতেন এবং বাটীর মধ্যে কোন পক্ষীকে পিঞ্জরাবদ্ধ করিয়া, বা ছাগল হরিণ বা অন্য জন্তুকে বন্ধন করিয়া রাখিতে দেন নাই।

কৃষ্ণসঙ্গিনী একজন সুন্দর লেখিকা ও কবি ছিলেন। তিনি বহু কাব্য নিজে সুন্দরভাবে রচনা করিয়াছেন। প্রভাবতী ও মনোবিকাশ নামক দুইখানি কাব্য পুস্তক তিনি নিজে রচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দেশের প্রতি তাঁহার আন্তরিক ভালবাসা ও স্বদেশী আন্দোলনে তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল। ছিয়াত্তর বৎসর বয়ঃক্রম কালেও তিনি দেশের

সামাজিক ও রাজনৈতিক সকলরূপ ঘটনা জ্ঞাত হইবার জন্য উৎসুক থাকিতেন এবং প্রত্যহ দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ করিতেন এবং দেশের হিতকর নানা বিষয় আলোচনা করিতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার অধ্যয়নে অত্যন্ত স্পৃহা ছিল। পুরাণ, ভাগবত, মহাভারত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠে তাঁহার অত্যন্ত আসক্তি ছিল এবং অবসর সময় তিনি নানারূপ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া অতিবাহিত করিতেন। নিষ্ঠাবান হিন্দুর সংসারে থাকিয়া নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবার যাহা কিছু ব্রত নিয়মাদি পালন করা আবশ্যক, কৃষ্ণসঙ্গিনী যথাযথরূপে তাহা পালন করিতেন এবং তাঁহার স্বামীগৃহের বারমাসের তের পর্ব যথানিয়মে পরিচালনা করিয়া আসিয়াছেন। অল্প বয়স হইতেই তিনি স্বামীর সহিত শ্বশুর বংশের কুলগুরু কালনার ৺গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট হইতে মন্ত্র লইয়া সকাল সন্ধ্যা প্রত্যহ আহ্নিক না করিয়া জল খাইতেন না। এখনও এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের অনেক হিন্দু গৃহেই আদর্শ হিন্দু মহিলার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কিন্তু তাঁহার ন্যায় সরলহৃদয়া দয়াবতী ও ধর্মপরায়ণা রমণী খুব বিরল বলিলেই চলে। তিনি কেবল পতি পুত্র কন্যা প্রভৃতি আত্মীয় পরিজনের সেবাতেই আত্মোৎসর্গ করেন নাই; পরের দুঃখ দূর করিতে, পরের ঘরের সুখ-দুঃখের সংবাদ লইতে এবং সকলের অভাব মোচন করিতে সর্বদাই উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করিতেন। গৃহের দাসদাসী বা অপরাপর পরিজনবর্গের সুখ সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে তাঁহার দয়াপ্রবণ হৃদয়ের মোটেই ঔদাস্য ছিল না। তিনি তাঁহার পল্লীর ধনী দরিদ্র ও সকল গৃহস্থ গরীব মহিলার সহিত আলাপ করিতে এবং সকলকে সমান ভাবে সম্মান দেখাইতে ভালবাসিতেন।

১৩২৩ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার দেবতুল্য স্বামী ইহলোক ত্যাগ করিবার পর হইতে তিনি প্রত্যহ কি শীত গ্রীষ্ম বারমাস প্রাতঃ ৪ ঘটিকার সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া সূর্যোদয়ের পূর্বেই স্নান করিয়া শীতকালে ত্রিতলার বারাণ্ডায় এবং গ্রীষ্মকালে উন্মুক্ত ছাতে বসিয়া জপ ও সূর্যোদয় দর্শন করিতেন। বেলা ৭টা হইতে ১২টা অবধি পূজাগৃহে বসিয়া পূজা করিতেন। বেলা একটার সময় আহার করিয়া মাত্র দুই ঘণ্টা কাল বিশ্রাম করিয়া পুনরায় বেলা ৩টার মধ্যে গাত্রপ্রক্ষালন করিয়া বৈকাল ৪টা হইতে মাল্যার্চনা পূজাদি সন্ধ্যা ৭টা অবধি করিতেন। রাত্র ৭॥০টার মধ্যে অল্প ফল মিষ্ট আহার করিয়া রাত্র ৮টার মধ্যে প্রত্যহ শয়ন করিতেন।

"পতিরেকো গুরু স্ত্রিয়াং"—এই ধারণা তাঁহার হৃদয়ে এতদূর বদ্ধমূল ছিল

যে পতিকে ভিন্ন অন্য পুরুষকে স্পর্শ করা নারীর কর্তব্য নয় বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণেরও পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেন না। তিনি বলিতেন যে, একমাত্র পুরুষ স্বামীরূপ-দেবতাকে স্পর্শ করিয়া পূজা করিয়াছি, অন্য কোন পুরুষকে স্পর্শ করিয়া পূজা করা উচিত নহে। যথার্থ শিক্ষিত মহিলার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক অর্থাৎ হৃদয়ের মহত্ব, নিঃস্বার্থ প্রেম, ন্যায়নিষ্ঠা, জীবে করুণা, বিপদে অবিচলিতচিত্ততা, সম্পদে ঔদাস্য ইত্যাদি তিনি সে সকল গুণেরই অধিকারিণী ছিলেন। সে বিষয় তাঁহার রচিত 'মনোবিকাশ' পুস্তকখানি পাঠ করিলেই বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়। চারুচন্দ্র সহধর্মিণীর অভিলাষ অনুসারে ৺কাশীধামে বাসূকাফটকের চকের রাস্তার উপর তিন তলা একটি বড় অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া স্ত্রীর নামে "কৃষ্ণধাম" নাম দেন। উক্ত ভবনের সদর দরজার দুই দিকে প্রস্তরনির্মিত বিষ্ণুমূর্তি বিরাজমান এবং দরজার উপর সর্বসিদ্ধি-দাতা গণেশ মূর্তি স্থাপিত। রাস্তার লোক ঐ সকল মূর্তি প্রণাম করিয়া ইষ্ট সাধনায় গমন করিয়া থাকেন। ঐ অট্টালিকায় প্রবেশ ও বাহির হইবার সময় হিন্দুমাত্রেরই অন্তরে পবিত্র ধর্মভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে।

এরূপ পরদুঃখকাতরা ও পর-সেবাপরায়ণা রমণী গৃহলক্ষ্মীরূপে যে গৃহে বিরাজ করিতেছেন, সে গৃহের প্রতি দেবতা প্রসন্ন হইবেন ইহা বিচিত্র কি?

স্বর্গারোহণ—আশীবষ বয়স অবধি কৃষ্ণসঙ্গিনীর স্বাস্থ্য ভালই ছিল। শরীরে বেশ শক্তি সামর্থ্য ছিল। ১৩৪৬ সনের প্রথম হইতে তাঁহার শরীর দুর্বল হয় এবং ২৫শে আষাঢ় হইতে তিনি অতিরিক্ত বাহ্য ও দুর্বলতার জন্য শয্যা লন এবং মাত্র ছয় দিবস শয্যায় রোগ যন্ত্রণা পাইয়া শনিবার ৩০শে আষাঢ় ১৩৪৫ তারিখে রাত্র ১১।৩০ সময় তিনি পুত্র কন্যা সকলকে শোক সাগরে ভাসাইয়া স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর শেষ সীমায় এক আশ্চর্য দৃশ্য দেখা যায়। তিনি সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া স্বর্গারোহণের জন্য ব্যস্ত হইয়া সকল আত্মীয়স্বজনকে ডাকিয়া আশীর্বাদ করেন এবং হরিনাম করিতে করিতে চলিয়া যান। সে দৃশ্য যে দেখিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে। কায়স্থ পত্রিকার ১৩৪৬ সনের শ্রাবণ সংখ্যায় যে সত্য ঘটনার বিবরণটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলেই সকলে মোহিত হইবে।

তাঁহার মৃত্যুর পর কলিকাতায় সকল সংবাদপত্রেই শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার জীবনী প্রকাশিত হয়। ১৭ই শ্রাবণ ১৩৪৬ তারিখের কলিকাতা

কর্পোরেশনের অধিবেশনে স্যার নীলরতন সরকারের স্ত্রী লেডী নির্মলা সরকার এবং কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব কাউন্সিলার চারুচন্দ্র বসুমল্লিকের পত্নী শ্রীযুক্তা কৃষ্ণসঙ্গিনী বসুমল্লিকের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ সভার অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা, অনেক ক্লাব ও সমিতি প্রভৃতিতে তাঁহার স্বর্গারোহণের জন্য শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তাঁহার শেষ কার্য আদ্যশ্রাদ্ধ ও বৃষোৎসর্গ তাঁহার পাঁচ পুত্র বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন করেন। পরদিবস বহু পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বিদায়প্রাপ্ত হয় এবং নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয়গণ ও সহস্রাধিক দরিদ্র ব্যক্তিকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করান হয়।

কায়স্থ পত্রিকা—শ্রাবণ ১৩৪৬

রাজকুমারী কৃষ্ণসঙ্গিনী বসু মল্লিকের সজ্ঞানে স্বর্গারোহণ

গত ৩০শে আষাঢ় শনিবার রাত্রে কলিকাতা পটলডাঙ্গার বসু মল্লিক বংশোদ্ভব সুবিখ্যাত ৺চারুচন্দ্র বসু মল্লিক মহাশয়ের সহধর্মিণী কৃষ্ণসঙ্গিনী বসু মল্লিক মহাশয়া ৮৪ বৎসর বয়সে স্বর্গলাভ করিয়াছেন। শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান লোপ হয় নাই। শ্রীমতী কৃষ্ণসঙ্গিনী শোভাবাজারের মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের জ্যেষ্ঠ প্রপৌত্র রাজা হরেন্দ্র কৃষ্ণ দেব বাহাদুর সি, আই, ই, মহোদয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা ছিলেন। শৈশবে তিনি বেথুন স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। তিনি একজন সুলেখিকা ও কবিরূপে যশস্বিনী হইয়াছিলেন। তিনি বঙ্গভাষায় "মনোবিকাশ" "প্রভাবতী" প্রভৃতি কয়েকখানি কবিতা পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন।

কৃষ্ণসঙ্গিনী একজন আদর্শ রমণী ছিলেন। রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করিয়া পিতৃভবনে ও স্বামীগৃহে অতুল ঐশ্বর্য্যের ও ভোগবিলাসের মধ্যে লালিতপালিত হইলেও তিনি নিরহঙ্কারী ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তাঁহার হৃদয় পরদুঃখকাতরতায় পূর্ণ ছিল। কোন অতিথি বা ভিখারীকে তাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া যাইতে হয় নাই। বহু দরিদ্র বিধবা তাঁহার নিকট হইতে মাসিক বৃত্তি পাইত।

তিনি ধর্মপ্রাণা আদর্শ হিন্দুরমণী ছিলেন। তিনি প্রত্যহ নিয়মমত রামায়ণ মহাভারত ভাগবতাদি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতেন। নিষ্ঠাবতী হিন্দুবিধবার যে সকল ব্রতনিয়মাদি পালন করা উচিত, তাহা তিনি যথাযথরূপে পালন করিতেন। ১৩২৩ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার দেবতুল্য স্বামী স্বর্গারোহণ করেন। তদবধি তিনি প্রত্যহ রাত্র ৩টার পূর্বে গাত্রোত্থান করিয়া স্নানান্তে বেলা ১ টা পর্যন্ত পূজাগৃহে বসিয়া জপতপাদি করিতেন। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্ব পর্যন্ত তিনি এই নিয়ম পালন করেন।

২৫শে আষাঢ় সোমবার মধ্যাহ্নকাল হইতে তিনি শয্যাশায়িনী হন। পরবর্তী শনিবার বৈকাল হইতে তাঁহার দেহে অশেষ যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। ইহা লাঘব করিবার জন্য ডাক্তার ঔষধ খাওয়াইয়া তাঁহাকে অচেতন করেন। রাত্রি ৯টার সময় হঠাৎ তিনি "হরিনাম কর"—বলিয়া উঠেন। সেই সময় হইতে তাঁহার অন্তিম (রাত্রি ১১টা ২০ মিনিট) পর্য্যন্ত তাঁহার দেহে যন্ত্রণা ছিল বলে মনে হয় নাই। তখন তিনি কেবল দেব-দেবীর নাম করিতে থাকেন, এবং উপস্থিত দুই দল কীর্ত্তনীয়াকে হরিনাম করিতে বলেন।

দুই জন ডাক্তার সেই সময়ে তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে যান। কিন্তু তিনি তখন কীর্তন শুনিয়া এরূপ তন্ময় হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের উপস্থিতি পর্য্যন্ত অনুভব করিতে পারেন না। এই সময় তাঁহার স্বামীর ব্যবহৃত খড়ম আনাইয়া তদুপরি নিজ মস্তক স্থাপন করেন, এবং তৎপরে উহা গঙ্গায় দিতে বলেন। এই সময় তাঁহার মস্তক দক্ষিণ দিকে ছিল ; অকস্মাৎ বামপার্শ্বে ঘুরিয়া, তিনি তাঁহার মস্তক পশ্চিম দিকে রাখেন। এই সময়ে তাঁহাকে গরদের কাপড় পরিধান করাইয়া নামাবলী গায়ে দিয়া দিতে বলেন। তৎপরে তাঁহার গলার তুলসীমালা খুলিয়া দিয়া জগন্নাথদেবের রথের দড়ি গলার উপরে রাখেন। তাঁহার স্বামীর শেষ সময়ে যে পদচিহ্ন লওয়া হইয়াছিল, তাহা একটি বড় ফ্রেমে বাঁধাইয়া অতি যত্নে সংরক্ষিত ছিল। তাঁহার সেই দুর্বল ক্ষীণহস্তে স্বর্গত সেই পদ-ছাপ ধরিয়া তিনবার মস্তকে ও বক্ষঃদেশে স্পর্শ করেন। তৎপরে গঙ্গাজলপূর্ণ একটি কলসী আনাইয়া উহা হইতে স্বহস্তে মস্তকে ও গাত্রে মধ্যে মধ্যে পবিত্র গঙ্গাজল ছিটাইতে থাকেন। এই সময় গঙ্গামৃত্তিকা জলে গুলিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার কপালে "হরেকৃষ্ণ" এবং বুকের উপর "শ্রীদুর্গা" লিখিতে বলেন। তাঁহার মৃত্যু শয্যার পার্শ্বে, তাঁহার পুত্র-কন্যা, পৌত্র-পৌত্র, দৌহিত্র-দৌহিত্রী, প্রপৌত্র অন্যূন ষাট সত্তর জন সমবেত হইয়াছিল। তিনি সকলকেই কেবল দেব-দেবীর নাম

করিতে বলিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার এক কন্যার চক্ষুতে অশ্রু দেখিতে পাইয়া তিনি বলিলেন,—"কেঁদ না, কেঁদ না, হরিনাম কর।" একবার পাঁচ মিনিট গীতাপাঠ ও পরে পাঁচ মিনিট মহাভারত পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতে বলিলেন। অবশেষে মৃত্যুর বিশ মিনিট পূর্বে "হরেকৃষ্ণ হরেরাম" গান করিতে এবং গৃহ-মধ্যে যাঁহারা ছিলেন তাঁহাদিগকে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হরিনাম কীর্তন করিতে বলিলেন। নিজেও "হরেকৃষ্ণ, নারায়ণ, অন্তে নারায়ণ ব্রহ্ম" প্রভৃতি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া অর্ধঘণ্টা কাল দেব-দেবীর নাম উচ্চারণ করিবার পর, হঠাৎ তিনি তিনবার "নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ" বলিয়া উঠিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইল, আর তিনি যেন নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। এই সময় তাঁহার মুখশ্রী এক অলৌকিক স্বর্গীয় দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মৃত্যুর পর এরূপ মুখশ্রী প্রায় দেখা যায় না।

তিনি শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র, গোপেন্দ্রচন্দ্র, যতীন্দ্রচন্দ্র, দেবেন্দ্রচন্দ্র এবং নরেন্দ্রচন্দ্র এই পাঁচ পুত্র এবং অন্যূন ষাট জন পৌত্র-পৌত্রী, দৌহিত্র-দৌহিত্রী ও প্রপৌত্র রাখিয়া গিয়াছেন।

আমরা শ্রীভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে, তিনি এই পুণ্যবতী মহিলার আত্মার কল্যাণ করুন এবং তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে শান্তিদান করুন।

ডাঃ শ্রীকুঞ্জবিহারী দেব।

রাজকুমারী কৃষ্ণসঙ্গিনী সকল আত্মীয়স্বজনকে সর্বদা পত্র লিখিয়া সংবাদ লইতে ভালবাসিতেন। ১৩৩৮ সালে তাঁহার প্রথম পুত্র দেবেন্দ্রচন্দ্র জমিদারী সংক্রান্ত বিশেষ কার্যে তাঁহাদের বগুড়া ও দিনাজপুর জেলাস্থ বাগজানা কাছারিতে একলা যাইলে তিনি যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার মধ্যে একখানি পাঠ করিলেই তাঁহার মহৎ হৃদয়ের বিষয় জানা যায়।

শ্রীশ্রীদুর্গা

ভরসা।

কল্যাণীয় প্রিয় পুত্র দেবেন্দ্র দীর্ঘজীবেষু—

প্রাণাধিক পুত্র—

দেবেন,

বহুদিন রাখিয়াছে তোমায় নিজন প্রদেশে। বন্ধু বান্ধব-হীন আত্মীয় স্বজন স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া রহিয়াছ। ঈশ্বরের কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। নানারকমে মনের কষ্ট পাচ্ছি। সব ভুলে কয়টি পুত্রের মুখ চাহিয়া মঙ্গল কামনায় ইষ্টদেবতার চরণে প্রাণ ভরে নির্ভয় চাহি ; জগদীশ্বর মহা সঙ্কট হইতে উদ্ধার করুন আমাদের। অঋণী অপ্রবাসী পৃথিবীতে সুখী। ক্ষণভঙ্গুর শরীর, চৈতন্য জীবের হয় না ; ভগবান তোমাদের নির্ভাবনা করুন। প্রার্থনা করি সুপ্রসন্ন ভাগ্য হউক ; কষ্ট, দুঃখহারী দূর করুন। বড় ঘরে জন্মিয়াছ, সৎস্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছ ; কনিষ্ঠ বিদ্বান বুদ্ধিমান উপার্জনে যেন সক্ষম হও।

প্রজাদের মঙ্গল হউক, পৃথিবীর মঙ্গল হউক, অন্তর্যামী জানেন মনের বাসনা। সতীশ কাকা এবং নেপেন ভাল আছে। কাকিমা তেমনি আছে। ছেলেরা, বাটীর সকলে ভাল আছে।

গুড়ের ঝুড়ি ৪টা, শাকআলু ও আদা এক ঝুড়ি এসেছে। ঝুড়ি খোলা। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। নগেন কেমন আছে। বামুন ঠাকুর ভাল আছে। তোমার খাওয়া কখন হয় ? রাত্রিতে শয়ন কখন কর লিখিবে। শরীর সুস্থ রাখবে। গরম জল খাইবে। একটু সকাল বিকাল বেড়াবে। সচ্চিদানন্দ আনন্দ দান করুন। শক্তটা, তোমাদের কল্যাণ করিব ইচ্ছা আছে। মা হওয়া কত ভাবনা কিন্তু মায়া নিম্নগামী। সকলে ভাল আছে। খুকি, ছেলেরা, উমা ভাল আছে।

তোমার—মাতা।

৫।১০।১২।

পূবে লেখা হইয়াছে কৃষ্ণসঙ্গিনী একজন বিশিষ্ট কবি ছিলেন এবং কয়খানি কবিতা পুস্তক প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার 'মনোবিকাশ' নামক কবিতা পুস্তক হইতে একটি কবিতা এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

সরস্বতী বন্দনা

সিতাব্জ বাসিনী জয় সরস্বতী।
বাগীশ্বরী বীণাপাণি ভগবতী॥
কুসুমিত কুন্দ-স্রক সুশোভনা।
কহ্লার কুমুদ কুন্দ কৃতাসনা॥
চিক্কণ চন্দন ললাট উজ্জলা।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা সনাল বিমলা॥
তুষার বরণা পূর্ণেন্দু বদনা।
গজেন্দ্র মুক্তা হার বিভূষণা॥
মণিময় পঞ্চম নূপুর কিঙ্কিণী।
অলিমদ খর্ব্বে ঝঙ্কার কারিণী॥
মৃণাল দ্বিভুজ, লগ্ন সরসিজ।
দ্বিরেফমণ্ডিত চারু পদ্মবীজ॥
পীতবাসধৃত, বিম্বাধরভৃত।
বাক্য সুধাময়, কেশ ঘনাবৃত॥
ত্রিভুবনারাধ্য ত্রিজগত বন্দে।
জয় জয় দেবী কবিকুলানন্দে॥
বিজ্ঞানবিধাত্রী সঙ্গীতাধিষ্ঠাত্রী।
তন্ত্রমন্ত্র বেদ পুরাণ গায়ত্রী॥
অসীম মহিমা করুণা আধারে।
হর মা দুর্গতি অবিদ্যা-বিকারে॥
কবিতা-নিকুঞ্জে মন ভৃঙ্গ গুঞ্জে।
অবলা অজ্ঞানে সাধু মধু ভুঞ্জে॥
দেহি পদে ভক্তি ধ্যান অনুরক্তি।
দুর্ব্বল লেখনী আদি কবি শক্তি॥
মুরারি-মোহিনী সাক্ষাৎ দামিনী
নমস্তে বাগীশ ভক্তি প্রদায়িনী॥
গললগ্ন বাসে ত্বদীয় সকাশে।
যাচয়ে সঙ্গিনী পদরেণু আশে॥

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বসুমল্লিক

স্বর্গীয় চারুচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র ২৮শে পর্যায়ে জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ২রা আষাঢ় বৃহস্পতিবার ১২৮৩ ইং ১৫ই জুন ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে শোভাবাজার রাজবাটীতে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশবে গৃহশিক্ষকের নিকট এবং হিন্দু ইস্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন।

বাল্যকাল হইতে জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র নানারূপ দেশহিতকর ও সামাজিক কার্যে যোগদান করেন এবং সকলের সহিত মিশিতে ভালবাসেন। তিনি অনেকগুলি সভাসমিতির সভ্য হইয়া নানারূপ কার্যে লিপ্ত থাকিয়া অসংখ্য বন্ধু লাভ এবং সমাজে সর্বজনপ্রিয় হইয়াছেন। অনেক সাধারণ সভাসমিতির তিনি সম্পাদক ও কার্যনির্বাহক সভার সভ্য ও সভাপতি। তিনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন, কায়স্থ সভা ভারত সঙ্গীত সমাজ ও অনেকগুলি বড় বড় সভাসমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট এবং পল্লীর সকলরূপ হিতকর কার্যে আন্তরিক সহানুভূতি ও সাহায্য করেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে হাইকোর্টের স্পেশল জুরা নির্ব্বাচন করিয়াছেন এবং ভাইসরয় এবং বঙ্গের গবর্ণরের বাটীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নামের তালিকার মধ্যে তাঁহার নাম আছে এবং সকাল লেভি উদ্যানপার্টি ইত্যাদিতে তিনি যোগদান করেন। স্বদেশী আন্দোলনেও তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি আছে এবং কংগ্রেসেরও তিনি একজন বিশিষ্ট সভ্য তবে তিনি মডারেটদের দলভুক্ত। তিনি অনেক লজের সভ্য এবং একজন বড় ফ্রিমেসন।

জ্ঞানেন্দ্র তাঁহার স্বনামধন্য পিতার পদানুসরণ করিয়া নিষ্ঠাবান হিন্দুর ন্যায় সকল পূজাদি ও সামাজিক ক্রিয়াকর্ম সুচারুরূপে যথাযথ পালন করিয়া আসিতেছেন। পৈত্রিক কুলগুরুর নিকট হইতে মন্ত্র লইয়া প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা জপ আহ্নিক করেন এবং দেবদেবীতে তাঁহার অশেষ ভক্তি। তিনি স্বর্গীয় পিতার মৃত্যুর পর হইতে আজ পঁচিশ বৎসর সপরিবারে সকল ভ্রাতা ও ভ্রাতাগণের পরিবারবর্গকে লইয়া একান্নবর্তী পরিবারের সকলের সহিত বিশেষ সদ্ভাব রাখিয়া জ্যেষ্ঠের কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিতেছেন। প্রতিবৎসর শারদীয়া দুর্গাপূজা অতি সমারোহে করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহার আলয়ে বহু দীন দুঃখী আতুর মাসিক বৃত্তি পাইয়া থাকে। তাঁহার হৃদয় যেমন উচ্চ তেমনি মহৎ।

২৬শে ফেব্রুয়ারী সোমবার ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বিডন ষ্ট্রীট নিবাসী কুলীন কায়স্থ প্রতাপচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী শিবানীকে বিবাহ করেন। তাঁহার বিবাহে অতুল ঐশ্বর্য্যাধিপতি সম্ভ্রান্ত নগরবাসী তাঁহার পিতা-

ঠাকুর রাজকীয় সমারোহের আয়োজন করেন। কেল্লার গোরার বাজনা আটদল ইংরাজী ব্যাণ্ড, খাসগেলাস আলো ইত্যাদির প্রোসেসন করিয়া বর চতুর্দোলায় গমন করে এবং বিবাহের দুই দিবস পূর্বে আম্বুর্ক্ক্যান্নের দি স ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৮৯৪ তারিখে তাঁহার ১৮নং রাধানাথ মল্লিক লেনস্থ ভবনে একটি ইভিনিং পার্টি ও নাচের আয়োজন হয়। এই উৎসবে হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি নরিস্ সাহেব, বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি কলিকাতার রাজা মহারাজা জমিদার ব্যারিষ্টার ইত্যাদি সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ যোগদান করেন।

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের স্ত্রী শ্রীমতী শিবানী আদর্শ মহিলা ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র রবীন্দ্রনাথ ও পাঁচ কন্যা হয়। তাঁহার কনিষ্ঠ কন্যার জন্মগ্রহণ করিবার পর হইতে দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইতে থাকে এবং কয় মাস রোগশয্যায় থাকিয়া ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে শিবানী স্বর্গলোকে চলিয়া যান।

প্রথমা পত্নীর স্বর্গারোহণের পর জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দ্বিতীয়বার ২৪শে মে ১৯২০ তারিখে কোন্নগর নিবাসী ৺হরিহর মিত্র মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী উমারাণীকে বিবাহ করেন।

রবীন্দ্রচন্দ্র

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রচন্দ্র (২৯শে মার্চ বৃহস্পতিবার ১৯০০) ২৬শে চৈত্র ১৩০৬ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ইস্কুলে অধ্যয়ন করিয়া ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন। উক্ত কলেজ হইতে ইণ্টারমিডিয়েট ও বি, এ, পরীক্ষায় ভালভাবে উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা ইউনিভারসিটি 'ল' কলেজে আইন পড়িতে থাকেন এবং হাইকোর্টের উকিল হইবার অভিপ্রায়ে হাইকোর্টের সুবিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র বসুমল্লিকের আর্টিকেল ক্লার্ক হন।

রবীন্দ্রচন্দ্র ২৭শে শ্রাবণ ১৩৩১ মঙ্গলবারে দর্জিপাড়া মিত্র বংশের কুলীন কায়স্থ শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী দেবরাণীকে কুলকর্ম করিয়া বিবাহ করেন। ১৯শে ভাদ্র ১৩৩৪ তারিখে রবীন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র রথীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন।

রবীন্দ্রচন্দ্র বাল্যকাল হইতে মেধাবী শ্রমশীল পরদুঃখকাতর এবং সর্বগুণ-সম্পন্ন ছিলেন। সকলের সহিত অমায়িকভাবে মিশিতেন এবং আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁহার আসক্তি ছিল এবং তিনি সুন্দর গাহিতে ও বাজাইতে পারিতেন। তাঁহার সুমিষ্ট গান শুনিতে সকলেই ভালবাসিত। তিনি অল্পবয়স হইতেই অনেক সভাসমিতিতে যোগদান করিতেন এবং পল্লীর সকল ক্লাব সমিতিতে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। অল্পবয়সেই তিনি সকলের প্রিয়পাত্র হন এবং অসংখ্য বন্ধু লাভ করেন। রবীন্দ্রের অমায়িক ব্যবহার ও সুমিষ্ট কথায় সকলেই মুগ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও নির্মলচরিত্রের যুবক এখনকার সমাজে অল্পই দেখা যায়।

কিন্তু হায়! ভগবানের কি বিচিত্র লীলা! বসুমল্লিক বংশের একটি উজ্জ্বল রত্ন সংসারে অল্পদিবসই আলো বিতরণ করিতে পারিয়াছিল। শেষ আইন পরীক্ষা দিবার জন্য রবীন্দ্রচন্দ্র যখন পাঠে মগ্ন তখন উপর হইতে তাঁহার ডাক আসিল। রবীন্দ্রচন্দ্র মাত্র ২৯ বৎসর বয়সে, কয় মাস মাত্র জ্বর রোগে ভুগিয়া ১০ই আশ্বিন ১৩২৬ তারিখের বৃহস্পতিবার দিবস রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় বৃদ্ধা পিতামহী, পিতামাতা, অল্পবয়স্কা পত্নীকে এবং একমাত্র শিশুপুত্রকে রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। এই অল্পবয়সের মধ্যেই কর্মক্ষেত্রে তাঁহার কার্য-কুশলতায় যশঃসৌরভে চারিদিক পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণ রবীন্দ্রচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য "রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি" স্থাপন করিয়াছেন। রবীন্দ্রের হৃদয়ের আদর্শে দরিদ্র লোক এবং বিধবাদিগের সাহায্য করিবার জন্য একটি ধনভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত সমিতি হইতে গরীব বিধবা ও দরিদ্র লোকদিগকে মাসিক সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের উপস্থিত একমাত্র পুত্র রাজেন্দ্র ৫ই ডিসেম্বর ১৯২৪ তারিখে জন্মগ্রহণ করে। উপস্থিত হিন্দু ইস্কুলের প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছে।

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরোজিনী ৯ই নবেম্বর ১৮৯৮ তারিখে জন্মগ্রহণ করে। ১১ই বৈশাখ ১৩১৭ ইং ২৪শে এপ্রিল ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার চুঁচুড়া নিবাসী দেবেন্দ্রনাথ সোম মহাশয়ের মধ্যম পুত্র শ্রীভূপেন্দ্রনাথের সহিত শুভবিবাহ হয়। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ১৩০৮ সনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় "চুঁচুড়া সোমবংশ ও সূর্যামূর্ত্তি" সম্বন্ধে প্রবন্ধে

লিখিয়াছেন—"চুঁচুড়ার সোমবংশ ৬৯৯ বর্ষ এখন ৭২২ বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালার আসিয়া বাস করেন। তখন গৌড়ে হিন্দু শাসন। তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধর বলভদ্র সোম গৌড়েশ্বরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। গৌড়েশ্বরের প্রধান কর্ম্মচারী পুরন্দর খাঁ (গোপীনাথ বসু) অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি সাবানা সূর্য্যমূর্ত্তির পূজা করিতেন। পুরন্দরের এক রূপবতী কন্যা ছিল। বলভদ্র ঐ কন্যা প্রার্থনা করেন। পুরন্দর বলভদ্রকে কন্যা সম্প্রদান করেন। বিবাহান্তে বলভদ্র সূর্য্যোপাসক হইয়া গেলেন। বলভদ্রের প্রপৌত্র শ্যামরায় মন্ত্রান্তর গ্রহণ করেন।"

ভূপেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দুইটি বিষয়ে এম, এ, পরীক্ষা দিয়া ডবল এম, এ, ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন। তিনি এখন হুগলীর একটি বড় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কার্য করেন। ভূপেন্দ্রনাথ অল্পভাষী ও অত্যন্ত সৎচরিত্রের লোক। তাঁহার তিন পুত্র জিতেন্দ্র, বিজেন্দ্র ও বীরেন্দ্র এবং এক কন্যা শ্রীমতী শোভা।

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী পঙ্কজিনী ৩১শে মার্চ ১৮৯৯ তারিখে জন্মগ্রহণ করে। ১০ই ডিসেম্বর ১৯১৩ তারিখে শ্রীমতী পঙ্কজিনীর হাটখোলা দত্ত বংশের রাধানাথ দত্তের সহিত বিবাহ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিবাহের দুই বৎসরের মধ্যে ৮ই ডিসেম্বর ১৯১৫ তারিখে পঙ্কজিনী ইহধাম ত্যাগ করেন।

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী কল্যাণী ২৩শে এপ্রিল ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৪ঠা মে ১৯১৭ তারিখে বেনেপুকুর নিবাসী জিতেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত শ্রীমতী কল্যাণীর শুভবিবাহ হয়। জিতেন্দ্রনাথ মিষ্টভাষী, বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান লোক ছিলেন। ৩০শে শ্রাবণ ১৩৪৬ বুধবার দিবস মাত্র সাত দিবস নিউমোনিয়া রোগে ভুগিয়া জিতেন্দ্রনাথ স্ত্রী-পুত্র কন্যাগণকে শোকসাগরে ভাসাইয়া স্বর্গলোকে চলিয়া যান।

শ্রীমতী কল্যাণীর পুত্র শ্রীমান অশোক এবং চার কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা, শ্রীমতী কণিকা, শ্রীমতী নমিতা এবং শ্রীমতী শোভিতা।

জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরার ২০শে বৈশাখ ১৩৪৩ তারিখে সারপেন্‌টাইন লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের প্রথম পুত্র শ্রীমান রবীন্দ্রনাথের সহিত শুভবিবাহ হয়।

দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী কণিকার ১৮ই ফাল্গুন ১৩৪৬ তারিখে বিডন স্ট্রীট

নিবাসী ডাক্তার হীরেন্দ্রনাথ বসুর সহিত শুভবিবাহ হয়। হীরেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, বি, পাশ করিয়া জাপানে গিয়া দন্ত-চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া আসিয়াছেন।

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী নন্দরাণী ১০ই জুলাই ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭ই জানুয়ারী ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে নন্দরাণীর চন্দ্রনগর নিবাসী ডাক্তার শীতলপ্রসাদ ঘোষের একমাত্র পুত্র ডাক্তার জ্যোতিঃপ্রসাদের সহিত বিবাহ হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে নন্দরাণী একটিমাত্র পুত্র রাখিয়া ১৬ মার্চ ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করেন।

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের পঞ্চম কন্যা শ্রীমতী অলকা ২২শে চৈত্র ১৩২৫ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬ই শ্রাবণ ১৩৪৫ তারিখে মাণিকতলা নিবাসী শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান নিত্যানন্দের সহিত শ্রীমতী অলকার শুভবিবাহ হইয়াছে।

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের ষষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী রেবারাণী এবং কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী রমারাণী।

শ্রীগোপেন্দ্রচন্দ্র

চারুচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র গোপেন্দ্রচন্দ্র ২৪শে জুন ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বৃহস্পতিবার জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত অধ্যয়নে রত হন এবং শৈশবে হিন্দু স্কুলে প্রবেশ করিয়া ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন এবং বি, এ, পরীক্ষা অবধি অধ্যয়ন করেন।

তিনি অবিবাহিত থাকিয়া নানারূপ পুস্তক অধ্যয়ন করিয়া কালাতিপাত করেন।

শৈলেন্দ্রচন্দ্র বসুমল্লিক

চারুচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র শৈলেন্দ্রচন্দ্র ১লা আষাঢ় বুধবার, ১৪ই জুন '৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি হিন্দু স্কুলে বিদ্যা শিক্ষা করেন। শৈশব হইতে তাঁহার খেলাধূলায় বিশেষ আসক্তি ছিল এবং যুবা বয়সে একজন বড় Sportsman হইয়া নানারূপ ব্যায়াম ক্রীড়ায় উচ্চ আসন পান। নানারূপ ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় তিনি

অনেক কাপ, পদক এবং অন্যান্য পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। ফুটবল খেলায় তিনি একজন প্রসিদ্ধ ব্যাক্ ছিলেন। আই, এফ, এ, শিল্ড প্রতিযোগিতায় তিনি কয় বৎসর শোভাবাজার ফুটবল ক্লাবের হইয়া খেলেন।

তিনি হাইকোর্টের একজন স্পেশাল জুরার, ভাইসরয় এবং বাঙ্গলার গভর্ণমেণ্ট হাউসের সম্ভ্রান্ত লোকদিগের তালিকায় তাঁহার নাম ছিল। তিনি কুলগুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা আহ্নিক করিতেন এবং সকলের সহিত তাঁহার আন্তরিকভাবে মেলামেশা ছিল।

শৈলেন্দ্রচন্দ্র ১লা মে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইটালী নিবাসী রায় কালীকুমার দেব বাহাদুরের পৌত্রী শ্রীমতী ক্ষিরোমণিকে বিবাহ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার প্রথমা পত্নী ১৬ই নবেম্বর ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করেন।

শৈলেন্দ্র দ্বিতীয় বার ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে জয়নগর নিবাসী জমিদার ৺যোগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের মধ্যম কন্যা শ্রীমতী প্রভাবতীকে বিবাহ করেন। প্রভাবতী দুই কন্যা নলিনীসুন্দরী এবং গীতারাণীকে রাখিয়া ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করেন।

শৈলেন্দ্রচন্দ্র ১২ই মার্চ ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে বাঠরা নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন মজুমদার মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ীকে বিবাহ করেন। ২১শে ডিসেম্বর ১৯৩৮ বুধবার ৫ই পৌষ ১৩৪৫ সনে শৈলেন্দ্রচন্দ্র একমাস রোগশয্যায় থাকিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন।

শৈলেন্দ্রচন্দ্রের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী নলিনীসুন্দরী ১২ই নবেম্বর ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬ই জুলাই ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে হাইকোর্টের উকিল ৺সমতুল দত্ত মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র সুধীরচন্দ্র দত্তের সহিত বিবাহ হয়। সুধীরচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিজ্ঞানে এম্, এস্-সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার সায়েন্স কলেজের স্যার প্রফুল্ল রায়ের প্রিয় ছাত্র হিসাবে বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা করিতে থাকেন। পরে ধানবাদ গভর্ণমেণ্ট মাইনিং কলেজের অধ্যাপক হইয়া ধানবাদে গিয়া থাকিতে হয়। চারি বৎসর ধানবাদে অধ্যাপকের কার্য করিবার কালে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ একদিবস তাহার জ্বর ও পেট খারাপ হয় এবং মাত্র পাঁচ দিবস রোগ ভোগ করিয়া ১৭ই আষাঢ় ১৩৩১ সোমবার রাত্রে টাইফায়েড রোগে ধানবাদে ইহধাম ত্যাগ করেন। সুধীরচন্দ্র যেমন বিদ্বান তেমনি মহৎ অন্তঃকরণের লোক ছিলেন।

সুধীরচন্দ্র বিধবা পত্নী নলিনীসুন্দরী এবং তিন পুত্র সুহাস, সুবাস ও খোকা

এবং এক কন্যা ইরাণীকে রাখিয়া যান। শৈলেন্দ্রচন্দ্রের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী গীতারাণী ২৩শে বৈশাখ ১৩২৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন। ২৪শে অগ্রহায়ণ ১৩৪২ তারিখে গীতারাণীর আহিরীটোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ রবীন্দ্রনাথের সহিত শুভবিবাহ হয়।

শৈলেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র শচীন্দ্রনাথ ৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ রবিবার দিবস জন্মগ্রহণ করেন।

শৈলেন্দ্রনাথের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী লতিকা, চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী ললিতা, পঞ্চম কন্যা শ্রীমতী শোভিতা এবং কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ঝরণা।

শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র বসুমল্লিক

চারুচন্দ্রের চতুর্থ পুত্র যতীন্দ্রচন্দ্র ৩০শে আগষ্ট বৃহস্পতিবার ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি হিন্দু স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গৃহে শিক্ষকের নিকট হইতে জমিদারী এবং একাউণ্ট বা হিসাবপত্রের বিষয় ভালরূপ শিক্ষা করেন। তিনি কয়েকটি বড় ইংরাজ আফিসে চিফ্ একাউণ্ট্যাণ্টের কার্য করেন।

তিনি অমায়িক ও নিষ্ঠাবান হিন্দু; কুলগুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা আহ্নিক করেন। তিনি সকলের সহিত অমায়িকভাবে মেশেন।

১৬ই আগষ্ট শুক্রবার ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে যতীন্দ্রচন্দ্র পার্শিবাগান নিবাসী হেমচন্দ্র সোম মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শেফালিকাকে বিবাহ করেন।

যতীন্দ্রচন্দ্রের দুই পুত্র—মণীন্দ্র ও সরোজেন্দ্র, এক কন্যা শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী।

মণীন্দ্রচন্দ্র ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে মিত্র ইন্‌ষ্টিটিউসন হইতে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া সেণ্টপলস কলেজে প্রবেশ করেন এবং তথা হইতে আই, এ, পাশ করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে বি, এ, অধ্যয়ন করেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজ হইতে বি. এল্, ডিগ্রি পাইয়াছেন এবং হাইকোর্টের এটর্ণী হইবার জন্য বি, এন, বসু এণ্ড কোম্পানীর এটর্ণী আফিসে আর্টিকেল ক্লার্ক হইয়াছেন। ৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীপুর নিবাসী ৺ললিতপ্রসাদ ঘোষ আই, এম, এস, মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী কনকপ্রতিমার সহিত শুভবিবাহ হয়। শ্রীমতী কনক-

প্রতিমা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাশ করেন ও আশুতোষ কলেজে অধ্যয়ন করিয়া আই, এস-সি, পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

যতীন্দ্রচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র সরোজেন্দ্র ৪ঠা এপ্রিল ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সরোজেন্দ্র শৈশবে মিত্র ইনষ্টিটিউশনে অধ্যয়ন করিয়া ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে আই, এ, এবং বি, কম, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যাঙ্কের কার্য শিক্ষা করিতেছেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পাঠ করিতেছেন।

যতীন্দ্রচন্দ্রের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী ১৯১৮ সালের আগষ্ট মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ২৭শে জানুয়ারী ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ৺সরস্বতী পূজার দিবস জ্যোৎস্নাময়ীর জোড়াবাগান নিবাসী স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার ঘোষ মহাশয়ের একমাত্র পুত্র দেবীপ্রসন্নের সহিত শুভবিবাহ হয়। বাল্যকাল হইতেই দেবীপ্রসন্ন মেধাবী এবং যশস্বী বালক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি ইংরাজীতে এম, এ, ডিগ্রি পাইয়াছেন।

নানারূপ ব্যায়াম ক্রীড়া ও চিত্রশিল্পে দেবীপ্রসন্ন সুপরিচিত। দেবীপ্রসন্ন আলিপুর কোর্টের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক কলিকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার মনোনীত হইয়াছেন। শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ীর পাঁচটি কন্যা বাণী, অঞ্জলী, আরতী, জয়ন্তী ও দীপা।

শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র বসুমল্লিক

চারুচন্দ্রের পঞ্চম পুত্র দেবেন্দ্রচন্দ্র ৫ই মে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মঙ্গলবার ইং ২৩শে বৈশাখ ১২৯৮ সালে কলিকাতা বসু বংশের পৈত্রিক ভবনে জন্মগ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রচন্দ্র বাল্যকাল হইতে পিতার অভিলাষ অনুসারে বিদ্যালয়ে না গিয়া গৃহ-শিক্ষকের নিকট সকল বিষয় শিক্ষালাভ করেন। পরে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু স্কুলে প্রবেশ করিয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন এবং উক্ত প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ইণ্টার-মিডিয়েট ও ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বি, এ, ডিগ্রি লন। এই সময়ে তাঁহার পিতার স্বর্গারোহণ হয়।

"A Successful Student—We are glad to announce that Sreejut Debendra Chandra Mullick, the promising son of the

late Babu Charu Chandra Mullick, head of the Kayastha community of Calcutta who died two weeks ago, has successfully passed the B.A. Examination of the Calcutta University. This happy news, we hope will go to some extent to assuage the shock of the great bereavement, the family has sustained."

The Amrita Bazar Patrika.
26th June, 1916.

পটলডাঙ্গার বসুমল্লিক বংশে দেবেন্দ্রচন্দ্র প্রথম বি, এ, ডিগ্রি পান এবং শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই বংশের অনেক সন্তান বি, এ, ডিগ্রি লাভ করিয়াছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে দেবেন্দ্রচন্দ্রের চোরবাগান দত্ত বংশের শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী উমাশশীর সহিত ২০মে ১৯১৪ বুধবার ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ তারিখে শুভবিবাহ হয়। উক্ত পুত্রের বিবাহে চারুচন্দ্র বিশেষ সমারোহে সুসম্পন্ন করেন।

"The elite of the Hindu community in general and the Kayastha community in particular, mustered strong in the evening of the 20th May last at the residence of the well-known and universally popular Kayastha leader, Babu Charu Chandra Mullick of Pataldanga on the occasion of the wedding of his promising son, master Debendra Chandra a B. A. student with a daughter of Babu Nibaran Chandra Dutt, another universal favourite. The band of the Royal Fusiliers, as well as several other bands, English as well as Indian, made College Square re-sound with melody and the procession. which was over a mile long and consisted of several hundreds of the motor cars, and carriages, was one of the most imposing seen in recent times. The bridegroom drove in a carriage drawn by ten horses.

It was just like Charu Babu's way of doing things."

The Hindu Patriot.
1st June, 1914.

দেবেন্দ্রচন্দ্র বি, এ, ডিগ্রি লইয়া কলিকাতা আইন কলেজে বি, এল, অধ্যয়ন করেন এবং হাইকোর্টের এটর্ণী হইবার অভিপ্রায়ে ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে হাইকোর্টের এটর্ণী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের অফিসে আর্টিকেল্ড ক্লার্ক হইয়া পাঁচ বৎসর এটর্ণীর কার্য শিক্ষা করিতে থাকেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে এটর্ণীসিপ পরীক্ষার ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করিয়া ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ফাইনেল পরীক্ষা দেন।

বাল্যকাল হইতে দেবেন্দ্র নানারূপ জনহিতকর সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যে যোগদান করিয়া নানা সংকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি হিন্দু ইস্কুল ডিবেটিং ক্লাব ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়নের কার্যকরী সমিতির সভ্য, ইউনিভার্সিটি ইন্‌সষ্টিট্যুশনের ও ওয়াই, এম, সি, এ-র সভ্য ছিলেন। বালক-বালিকাগণের আবৃত্তি বিষয়ে উৎসাহ দিবার জন্য তিনি পটলডাঙ্গা ইউনিয়নের সম্পাদক হইয়া ১৯১৭ হইতে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ অবধি কয় বৎসর প্রায় তিনশত বালক-বালিকাদিগকে লইয়া আবৃত্তি প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রতুল স্পোর্টিং ক্লাবের সভ্য এবং পরে সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি টালায় সুবারবন এসোসিয়েশন ও ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীয়ার স্পোর্টিং ক্লাবের কার্যনির্বাহক সভার সভ্য হন। পাথুরেঘাটার সিদ্ধেশ্বর ঘোষের ভবনে কয়েকজন বন্ধুতে মিলিয়া ইউনাইটেড্ ক্লাব প্রতিষ্ঠা করিয়া কয়টি অতীব মনোমুগ্ধকর অভিনয় করেন। জগজ্জ্যোতি লাইব্রেরী এবং অবৈতনিক পাঠাগারের তিনি সম্পাদক নির্বাচিত হইয়া কয় বৎসরে পাঠাগারের বিশেষ উন্নতি করেন।

বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার তিনি ১৩৩৪ সন হইতে সভ্য হইয়া সভার উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তিনি কায়স্থ সভার প্রথমে কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য, পরে সম্পাদক নির্বাচিত হন এবং সভার অনেক অধিবেশনে তিনি গবেষণাপূর্ণ যে সকল বক্তৃতা দেন তাহা কায়স্থ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। কায়স্থ সভার উন্নতির জন্য তিনি একটি কায়স্থ সভা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং কায়স্থ সভায় সাহিত্য বিভাগের মধ্য দিয়া নানারূপ শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন। সমাজের কলঙ্কর পণপ্রথা নিবারণের জন্য তিনি বিশেষভাবে আন্দোলন করিতেছেন।

দেবেন্দ্র তাঁহার পল্লীর এবং কলিকাতা নগরবাসীর স্বাস্থ্য ও সকল বিষয় উন্নতির জন্য ১৯২৪ সন হইতে নানা সভাসমিতিতে যোগদান করিয়া আন্তরিক-

ভাবে পরিশ্রম করিতেছেন। ৯নং ওয়ার্ডের করদাতৃসঙ্ঘের তিনি সহযোগী সম্পাদক এবং স্বাস্থ্য সমিতির তিনি কার্যনির্বাহক সভার সভ্য। ১৯৩৩ সন হইতে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে সভাপতি করিয়া, রায়বাহাদুর ডাক্তার হরিধন দত্ত, কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়, কুমার সুরেন্দ্র লাহা, কৃষ্ণকুমার মিত্র নসিপুরের রাজা ভূপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ, স্যার হরিশঙ্কর পাল ইত্যাদি সম্ভ্রান্ত নগরবাসীরা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন হলে কলিকাতা নগরবাসীর সর্ববিষয় উন্নতি সাধনের জন্য "কলিকাতা সিটিজেন এসোসিয়েসন'" নাম দিয়া একটি বড সভার প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৯১৩ সালের ৮ আইন মতে রেজিষ্ট্রী করাইয়াছেন এবং দেবেন্দ্রচন্দ্র উক্ত এসোসিয়েসনের একজন প্রতিষ্ঠাতা ও সরকারী সম্পাদক। দেবেন্দ্রবাবু ও উপরোক্ত ব্যক্তিদের উদ্যোগে "কলিকাতাবাসী" নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। দেবেন্দ্রবাবু নানাভাবে সহরের ও জনসাধারণের হিতের জন্য কার্য করিতেছেন।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন, ডেফ্ এণ্ড ডাম্ব স্কুল ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি বিশিষ্ট সভ্য। পল্লীর শান্তিরক্ষার জন্য তিনি পুলিশ কমিসনার কর্তৃক মুচিপাড়া থানার অন্তর্ভুক্ত সিভিক্ গার্ড সমূহের গ্রুপ কমাণ্ডার নির্বাচিত হইয়াছেন।

ভাইসরয় এবং বাঙ্গালার গবর্ণরের খাতায় যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের নাম আছে দেবেন্দ্রচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে একজন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের গবর্ণর জেনারেল লর্ড চেমসফোর্ডের লেভিতে এবং উদ্যান পার্টিতে তিনি প্রথম যোগদান করেন এবং ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কলিকাতায় গবর্ণর জেনারেলের যতগুলি উদ্যান পার্টি ও লেভি হইয়াছে দেবেন্দ্রচন্দ্র এযাবৎ প্রত্যেকটিতে যোগদান করিয়াছেন।

হিন্দু সভা এবং অন্যান্য অনেক জনহিতকর সভাসমিতির তিনি সভ্য এবং প্রকৃত দেশসেবার কার্যে তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও সাহায্য আছে। তিনি ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেসের সভ্য হন, কিন্তু তাঁহার মত মডারেট বা জাতীয় দলের সহিত মিল হয়, বলিয়া তিনি মডারেট দলভুক্ত।

কলিকাতার সম্ভ্রান্ত সকল লোকের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় আছে এবং তিনি দীন দরিদ্র বা গৃহস্থ লোকের সহিত সমানভাবে মিশিয়া থাকেন। সকল সম্প্রদায় লোকের মধ্যে একতা বর্ধন ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে সর্ব সম্প্রদায়ের লোকগণকে লইয়া দেশ ও জনহিতকর কার্য করা তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া বড় বড় সভাসমিতিতে যেরূপ উৎসাহের সহিত যোগদান করেন, সামান্য সামান্য

সভাসমিতিতে গিয়া তিনি সকল সম্প্রদায়ের লোকের সহিত সমানভাবে ভাবের আদান-প্রদান করেন।

পটলডাঙ্গা বসুমল্লিক বংশের শাখা-প্রশাখা এত বিস্তীর্ণ হইয়াছে যে এক বংশের সন্তানসন্ততি হইলেও অনেক জ্ঞাতি ভ্রাতা অন্য জ্ঞাতি ভ্রাতার সহিত পরিচয় নাই এবং বিধাতার ইচ্ছায় অনেক বংশধর স্থানান্তরে গিয়া পড়িয়াছেন; পরস্পর পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ বহু বৎসরের মধ্যে একবারও হয় কিনা সন্দেহ। পটলডাঙ্গা বসুমল্লিক বংশের প্রাণপুরুষ ৺রাধানাথ বসুমল্লিক মহাশয়ের বংশধর এবং বংশের সকল কন্যা জামাতা এবং দৌহিত্র দৌহিত্রী ইত্যাদি সকলের মধ্যে সর্বপ্রকার ঐক্য বর্ধন ও প্রীতি সংরক্ষণ করিবার জন্য একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। শ্রীনীরদচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ ইত্যাদি মিলিয়া ১৪ই চৈত্র শুক্রবার ১৩৩৬ সনে ৺সতীশচন্দ্র বসুমল্লিক মহাশয়ের ভবনে তাঁহাকে বংশের বয়ঃশ্রেষ্ঠ হিসাবে সভাপতি করা হয় এবং দেবেন্দ্র উক্ত সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হন।

সাহিত্যেও দেবেন্দ্রচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগ আছে। অবসর সময়ে তিনি নানারূপ গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া অতিবাহিত করেন। তাঁহার লিখিত বহু প্রবন্ধাদি নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ভগবান মনুষ্যকে জগতে কেবল ভোগ-সুখ ও আমোদপ্রমোদ বা বিশ্রাম করিয়া মহামূল্য সময় অতিবাহিত করিবার জন্য পাঠান নাই। স্বাস্থ্যবান পুরুষ মানুষ হইয়া যে মিথ্যা সময় অপহরণ করে, সে কখনও স্বর্গপ্রাপ্ত হইতে পারে না। প্রত্যেক মনুষ্যকে কর্ম করিবার জন্য ভগবান পাঠাইয়াছেন এবং সকল জীবজন্তুর মধ্যে মনুষ্য আজ জগতে নরজন্ম-রূপ দেবজন্ম পাইয়া নানা সুখ ঐশ্বর্য উপভোগ করিতেছে তাহার একমাত্র কারণ মনুষ্য কার্য করিয়া নিজের সুখ ঐশ্বর্য ধনসম্পত্তি অর্জন করিতে পারিয়াছে। সর্বদা পরিশ্রম করা এবং প্রত্যেক মানবকে সমান চক্ষে দেখিয়া সকলকার সহিত সমানভাবে আত্মীয়তা করাই ধর্মকর্ম। দ্বেষ হিংসা বা মান অপমান মনে স্থান দিতে নাই। কেবল নিজের কর্তব্যকর্ম পালন করিয়া যাওয়াই প্রকৃত মহৎজনের কার্য।

পটলডাঙ্গা বসুমল্লিক বংশের আদি বাটী ১৮নং রাধানাথ মল্লিক লেনস্থ ভবন যৌথ সম্পত্তি বিভাগ হইলে চারুচন্দ্রই প্রাপ্ত হন। চারুচন্দ্র ১৩২৩ সনে স্বর্গারোহণ করিলে, তাঁহার ছয় পুত্র বিধবা মাতাঠাকুরাণীকে লইয়া স্ত্রী পুত্র কন্যা পৌত্র পৌত্রীগণের সহিত সকলে একত্রে আজ পচিশ বৎসর একান্নে বেশ সদ্ভাবের

সহিত বাস করিয়া আসিতেছেন। স্বর্গীয় পিতামহ ও পিতৃদেবের সকলরূপ ক্রিয়াকলাপ যথোচিত পালন করিয়া আসিতেছেন। উক্ত বাটীতে প্রায় ১৮৪০ সন হইতে প্রতি বৎসর ৺শারদীয় দুর্গাপূজা যেরূপ মহাসমারোহের সহিত হইয়া আসিতেছে চারুচন্দ্রের পুত্রগণ এখনও তাহা সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াছে।

দুর্গাপূজা

১৩ই কার্তিক ১৩৪৩ তারিখের বসুমতী, বন্দে মাতরম প্রভৃতি সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত বিষয়টি প্রকাশিত হয়—"পূর্ব্বের ন্যায় এবারও ১৮নং রাধানাথ মল্লিক লেনস্থ 'পটলডাঙ্গা ভবনে' শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রায় এক হাজার দর্শক ও বিজ্ঞ পণ্ডিত পূজা মণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রফেসার পশুপতি বাবু ও সতীশ দাসের হিপনোটিজম, ঐন্দ্রজালিক খেলা প্রভৃতি সমবেত জনমণ্ডলীকে মুগ্ধ করিয়াছিল। পটুয়াটোলা সেণ্ট্রাল ক্লাবের 'আদর্শ ব্রাহ্মণ' যাত্রাভিনয় দেখিয়া সকলে প্রশংসা করিয়াছিলেন। দেবীর প্রসাদ জাতি ধর্ম নির্ব্বিশেষে সকলকে বিতরণ করা হইয়াছিল। পতাকা ও আলোকমালায় সজ্জিত পটলডাঙ্গা ভবনে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র, শৈলেন্দ্র, যতীন্দ্র, দেবেন্দ্র ও নরেন্দ্রচন্দ্র বসুমল্লিক অতিথিদের আপ্যায়নে ব্যস্ত ছিলেন।"

তাহাদের পিতৃদেব যে সকল দরিদ্র বিধবা, অন্ধ, খঞ্জ প্রভৃতিকে মাসিক ভিক্ষা দিতেন, এখনও কয় ভ্রাতায় সেইরূপ মাসিক ভিক্ষা দিয়া আসিতেছেন। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র প্রভৃতির পাঁচ ভ্রাতায় বাগজানা ষ্টেট নামক বগুড়া ও দিনাজপুর জেলাস্থ সুবৃহৎ জমিদারীর পরিচালনা সুন্দরভাবেই করিয়া আসিতেছেন। উক্ত জমিদারীর মধ্যস্থ বাগজানা মৌজাস্থ হিন্দু মুসলমান প্রজাদিগের পুত্র কন্যাগণের শিক্ষার জন্য পুরাতন বিদ্যালয় ভবনটি ভাঙ্গিয়া প্রায় এক হাজার টাকা খরচ করিয়া নূতন বড় গৃহ করিয়া দিয়াছেন এবং বিদ্যালয়টির পরিচালনার সকলরূপ খরচ তাঁহারা বহন করিয়া আসিতেছেন। প্রজাগণের সুবিধার জন্য প্রায় তিন হাজার টাকা খরচ করিয়া ছয় মাইল দীর্ঘ দুইটি নূতন রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন এবং জলকষ্ট নিবারণের জন্য কয়েকটি ইন্দারা করিয়া দিয়াছেন। দেবেন্দ্র প্রভৃতি উক্ত জমিদারীতে প্রতি বৎসর গিয়া প্রায় দুই মাস করিয়া থাকিয়া সকল প্রজার অভাব অভিযোগ নিজেরাই দেখেন এবং প্রয়োজন অনুসারে নানারূপ সাহায্য ইত্যাদি করিয়া থাকেন।

১৩১২ সনে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে অল্পবয়সে দেবেন্দ্রচন্দ্রের স্বরচিত এই কবিতাটি সাধারণে প্রকাশিত হয়—

১

বন্দে মাতঃ! বলি ডাকে তোমার তনয়,
জননী সন্তানগণে দাও পদাশ্রয়,
ভগবতী ভয়োচ্ছেদে, রক্ষা কর এ বিপদে,
ভারতের নরনারী কাতর হৃদয়।

২

বৎসর অতীত প্রায় তাহারা দেখে না মায়,
নানা কষ্টে পড়ি সদা করে হায় হায়;
শরৎ আইল এবে মার দেখা পাবে ভবে,
দুঃখ যত দূরে যাবে, সর্ব্বসুখে সুখী হবে,
ভারত-সন্তানগণ আছে ভরসায়।

৩

পুত্রের মলিন-মুখ দেখিলে কি মনে সুখ
জননীর থাকে কভু? কে কোথা দেখেছে,
নানাবিধ অত্যাচার, সহিতে না পারি আর,
'বন্দে মাতরম্' বলি ছেলেরা ডাকিছে।

৪

বিদেশী বণিক, লয়ে যায় সব ধন,
দুর্গতিনাশিনী দুর্গে করহ উপায়,
উর্ব্বরা ভারত ভূমে, নানা শস্য হয় ক্রমে,
কৃষিজীবী খেটে বহু, খাইতে না পায়।

৫

শুনেছি মা পূর্ব্বকালে, ছিল সবে কুতূহলে,
এরূপ মহার্ঘ্য কেহ দেখেনা কখন,
দরিদ্র না ছিল কেহ, পুণ্যকার্য্য অহরহ
করি সবে, মহাসুখে কাটাত জীবন।

৬

দেশের ক্রমে দৈন্য দশা, বিলাসের বাড়ছে আশা
সুখে অন্ন পায়না কেহ,
ক্রমে সব শীর্ণ দেহ,
চাকুরী ত মিলা ভার, যার মিলে তার তিরস্কার
সহিতে হয় কত মত
সদাই হয়ে মানে হত।

৭

আপন আপন ব্যবসা ছেড়ে, কি হলো হায় লিখে পড়ে
সকল ব্যবসা নিল কেড়ে, বিদেশীরা এক এক চড়ে।

৮

জাতিধর্ম্ম নাহি স্মরি, অখাদ্য সব খেয়ে মরি,
বিদেশীর কুহক বুঝে, কে আছে এই ভারত মাঝে।

৯

এবার ভেবেছি মোরা, তোমার নাম লয়ে তারা!
ভাই ভগ্নী সবে মিলে করিব যতন।
ত্যজিতে বিদেশী দ্রব্য, ক্রেতব্য দ্রব্যের লভ্য
দেশীয়েরা পাবে, আর শ্রমলভ্য-ধন।

DEBENDRA CHANDRA BASU MALLICK B.A,

1. Hony. Secretary,
   Bangadeshiya Kayastha Sabha. (Regd.)
   Calcutta.
2. Life Member and Working Committee Member,
   All India Kayastha Conference, (Regd.)
   Allahabad.

3. Executive Committee Member,

    Calcutta Deaf and Dumb School, (Regd.)

    Upper Circular Road, Calcutta.

4. Executive Committee Member,

    Indian Association, (Regd.)

    67, Bowbazar Street, Calcutta.

5. Member,

    Bangiya Sahitya Parishad, (Regd.)

    243/1, Upper Circular Road, Calcutta.

6. Ex-Hony. Secretary, and present Executive Committee Member,

    Pratul Sporting Club,

    10, Radha Nath Mullick Lane, Calcutta.

7. Hony. Secretary,

    The Jagajjyoti Library and Free Reading Room,

    4/2, Madhu Gupta Lane, Calcutta.

8. Hony. Treasurer,

    "Sreebidhyapit" Girls School,

    Mahabodhi Society Hall. 4, College Square, Calcutta.

9. Hony. Secretary,

    Mahendra Balika Bidyalaya,

    Kanai Dhar Lane, Calcutta.

10. Hony. Secretary,

    Pataldanga Union Recitation Competition,

    18, Radha Nath Mullick Lane, Calcutta.

11. Hony. Secretary,

    Rakhansil (Orthodox) Hindu Mahasabha.

    18, Radha Nath Mullick Lane, Calcutta.

12. Hony. Assistant Secretary,
Calcutta Citizens Association, (Regd.)
81, Harrison Road, Calcutta.

13. Executive Committee Member,
Ward Health Association,
Ward IX, (Regd.)
24/2, Patuatola Street, Calcutta.

14. -Hony. Assistant Secretary,
Ward IX Rate-Payers' Association, (Regd.)
35, Seetaram Ghosh Street, Calcutta.

15. Committee Member,
The Indian Committee of the
District Charitable Society.
79, Upper Chitpore Road, Calcutta.

16. Hony. Secretary,
Ward IX Hindu Sabha.

17. Vice-President,
Patuatola Central Club,
58/B, Patuatola Street, Calcutta.

18. Member,
Greer Sporting Club.
24, Jagannath Dutta Lane, Calcutta.

19. Member,
Tripura Hitasadhini Sabha,
137, Bowbazar Street, Calcutta.

20. Hony. Secretary,
Radha Nath Basu Mallick Smriti Samiti.
18, Radha Nath Mullick Lane, Calcutta.

21. Executive Committee Member,
The Bengal Hindu Sabha, (Regd)
36, Harrison Road, Calcutta.

22. Member,

    The Calcutta Hindu Sabha,

    50, Bagbazar Street, Calcutta.

23. Committee Member,

    The Nationalist Party,

    62, Bowbazar Street, Calcutta.

24. Executive Committee Member,

    Sovabazar Badminton Association,

    36, Raja Naba Krishna Street, Calcutta.

25. Hony. Secretary,

    Working Committee of the Reception Committee,

    All India Kayastha Conference,

    34, Shyampooker Street, Calcutta.

26. Executive Committee Member,

    Rabindra Smriti Samity,

    Radha Nath Mullick Lane, Calcutta.

27. Executive Committee Member,

    Girish Sangha,

    50, Baghbazar Street, Calcutta.

28. Executive Committee Member,

    The Thanthania Sarbojonin Kali Poojah,

    21, College Row, Calcutta.

29. Vice-President,

    College Square Children Garden's Club,

    College Square, Calcutta.

30. Reception Committee Member,

    National Liberal Federation of India,

    19th Session in Calcutta 1937,

    62, Bowbazar Street, Calcutta.

31. Executive Committte Member,
Calcutta Temperance Federation,
92, Central Avenue, Calcutta.

32 Member,
Women Protection League,
4, College Square, Calcutta.

33. Council Member,
Bengal Benevolent Society Ltd., (Regd.)
Stephen House, Dalhousie Square, Calcutta.

দেবেন্দ্রচন্দ্রের তিন পুত্র শ্রীমান খগেন্দ্র, শ্রীমান তপেন্দ্র এবং শ্রীমান অলোকেন্দ্র এবং এক কন্যা শ্রীমতী সরস্বতী।

খগেন্দ্র

দেবেন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র খগেন্দ্রচন্দ্র ২৪শে ভাদ্র শনিবার ১৩২৩ সনে. ইংরাজী ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে বিডন ষ্ট্রীটস্থ মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে মিত্র ইনষ্টিটিউসনে শিক্ষা লাভ করিয়া ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে আই, এস-সি, অধ্যয়ন করেন। সেই সময় ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি, ট্রেনিংকোরএ যোগদান করেন। শৈশবে খগেন্দ্র অতীব সুন্দর আবৃত্তি করিতে পারিতেন। আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বহু স্থানে প্রথম হইয়া ২৬খানি স্বর্ণ ও রৌপ্যের পদক ও বহু পুস্তক উপহার পাইয়াছিলেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীতে আই, এস-সি, অধ্যয়ন করিতেছিলেন সেই সময় কোন রাজনৈতিক অপরাধে ২৭শে জুলাই তারিখে ইলিসিয়ম্ রোডস্থ ইন্টেলিজেন্ট বিভাগের পুলিশ দল আসিয়া রাত্র ১০টার সময় তাহাকে বাটী হইতে ধরিয়া লইয়া যান।

১লা অক্টোবর ১৯৩৪ তারিখে মিষ্টার জে, কে, বিশ্বাস প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে খগেন এবং তাঁহার ইস্কুল বন্ধু বিজয়ভূষণ সেনকে ফৌজদারী আইনে অভিযুক্ত করা হয় এবং রাজনৈতিক অপরাধে উভয়কে দুই বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। খগেন্দ্রের পক্ষে আলিপুরের পাবলিক্ প্রসিকিউটার রায়বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেট

সাহেব গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিবার জন্য বলেন এবং রায়েও গবর্ণমেণ্টকে দণ্ড লাঘব করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন এবং খগেন্দ্রকে প্রথম শ্রেণীর কয়েদি করিয়া রাখিবার আদেশ দেন। খগেন্দ্র এক বৎসর আট মাস আলিপুর জেলে প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক কয়েদি হিসাবে থাকিয়া ২২শে জুলাই ১৯৩৬ তারিখে জেল হইতে মুক্ত হন। জেলে থাকিবার কালে খগেন্দ্র ল্যাটিন জ্যারম্যান ভাষা ও নানারূপ সাহিত্য পুস্তক পাঠ করিয়া যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করেন।

১৯৩৬ সনেই ১লা আগষ্ট হইতে খগেন্দ্র এমার্শ ষ্ট্রীটস্থ সেণ্টপল কলেজে দ্বিতীয় শ্রেণীতে আই, এস-সি, ক্লাসে ভর্তি হন এবং পর বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে আই, এস-সি, পরীক্ষা দিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের প্রায় দশ হাজার পরীক্ষার্থীর মধ্যে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। ১৯৩৭ সনের জুলাই মাসে মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য প্রবেশ করিয়া উপস্থিত উক্ত কলিকাতা মেডিকেল কলেজের চতুর্থ বৎসরের শ্রেণীতে বিশেষ সুনামের সহিত চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সায়েনটিফিক্ এম, বি. পরীক্ষায় সকল পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ২২ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেছে এবং বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক ও পুস্তকাদি পারিতোষিক পাইয়াছে। ১৯৪০ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম, বি, পরীক্ষার মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া মাসিক বৃত্তি পাইয়াছেন।

তপেন্দ্রচন্দ্র

দেবেন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র তপেন্দ্রচন্দ্র ২২শে আশ্বিন ১৩২৫, ইং ১১ই অক্টোবর ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে মিত্র ইন্‌ষ্টিটিউসনে অধ্যয়ন করিয়া ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষা দিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হইয়া আই, এস-সি, পাস করিয়া ১৯৪০ সনে বি, এস-সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে এম, এস-সি, অধ্যয়ন করিতেছেন।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ট্রেনিং কোরে যোগদান করিয়া ভালভাবেই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন। ১৯৩৯

সনে উক্ত ফৌজে 'ল্যান্স করপোরেল' উপাধি পাইয়াছেন এবং বন্দুক ছোড়া প্রতিযোগিতায় অনেকবার প্রথম হইয়া অনেক পুরস্কার পাইয়াছেন।

অলোকেন্দ্র

দেবেন্দ্রচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র অলোকেন্দ্রচন্দ্র ১১ই ফাল্গুন ১৩২৭ সনে বুধবার, ইং ২৪শে ফেব্রুয়ারী ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে মিত্র ইন্‌ষ্টি উসন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া পরে হেয়ার ইস্কুলে অধ্যয়ন করেন। ১৯৩৮ সনে হেয়ার ইস্কুল হইতে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এমার্শ ষ্ট্রীটস্থ সেণ্টপল কলেজে আই, এ, অধ্যয়ন করিয়া ১৯৪০ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি, এ, অধ্যয়ন করিতেছেন।

শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র বসুমল্লিক

চারুচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র নরেন্দ্রচন্দ্র ১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নরেন্দ্র বাল্যে গৃহ শিক্ষকের নিকট বিদ্যা লাভ করিয়া, হিন্দু ইস্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং পরে কেশব একাডেমীতে এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাটিকুলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, প্রেসিডেন্সি কলেজে আই, এ, অধ্যয়ন করেন। উক্ত কলেজ হইতে আই, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গবাসী কলেজে বি, এ, অধ্যয়ন করেন এবং বি, এ, পরীক্ষা দেন।

নরেন্দ্র ২রা আগষ্ট ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে দশঘরা নিবাসী বিপিনকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র নীরদবরণ রায়ের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী কমলাবালাকে শুভবিবাহ করেন।

নরেন্দ্র বি, এ, পরীক্ষা দিয়া তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের ষ্টিভেডর কার্যের আফিসে যোগদান করিয়া দুই বৎসর কার্য করেন। নরেন্দ্রের ধর্ম বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তি। তিনি উত্তর দক্ষিণে ভারতবর্ষের প্রায় সকল তীর্থ দর্শন করিয়া আসিতেছেন। তিনি হরিদ্বার, বৃন্দাবন, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, নাসিক ইত্যাদি প্রায় সকল প্রসিদ্ধ দেবস্থানে গিয়াছিলেন। পর সেবা ও পরোপকারে তাঁহার বিশেষ আসক্তি আছে। সঙ্গীতবিদ্যা ও নৃত্যগীতাদিতে তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ। সঙ্গীত ও ভারতের প্রাচীন নৃত্যকলা লইয়া তিনি গবেষণা করিতে ভালবাসেন। ১৯৩০ সনে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে তাঁহাকে প্রথম বাঙালী বিচারক করা হইয়াছিল।

নরেন্দ্রের দুই পুত্র মাধবেন্দ্র ও অশোক এবং এক কন্যা শ্রীমতী বেলারাণী।

মাধবেন্দ্র ১৭ই ডিসেম্বর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪০-এ মিত্র ইনিসৃষ্টিটিউসন বিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

নরেন্দ্রের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী বেলারাণী ৪ঠা ভাদ্র ১৩২৭ শুক্রবার দিবস জন্মগ্রহণ করেন। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭ বৃহস্পতিবার দিবস তাঁহার হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল বালীগঞ্জ নিবাসী শ্রীযুক্ত পঞ্চানন ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সুকুমারের সহিত শুভবিবাহ হয়। শ্রীসুকুমার হাইকোর্টের উকিল এবং মিষ্টভাষী চরিত্রবান লোক।

শ্রীমতী শিবদুর্গা—

চারুচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শিবদুর্গা ৩রা ডিসেম্বর শুক্রবার ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১লা ফেব্রুয়ারী ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হাটখোলা দত্ত বংশের কৃপানাথ দত্তের সহিত তাঁহার শুভবিবাহ হয়।

কৃপানাথ ৺প্রাণনাথ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তাঁহার শরীর রুগ্ন ছিল, কিন্তু পরে বেশ স্বাস্থ্যবান হন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে কৃপানাথ সাব রেজিষ্টারের পদ গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই রেজিষ্ট্রার হন এবং রেজিষ্ট্রার হিসাবে তিনি মালদহ, বীরভূম ইত্যাদি অনেক জেলায় কার্য করিয়া ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কলিকাতায় রেজিষ্ট্রি অফিসের প্রধান রেজিষ্ট্রারের পদে নিযুক্ত হইয়া শেষ জীবনে উক্ত কার্য করিয়া যান। তিনি যে যে স্থানে গিয়া কার্য করিয়াছেন তথাকার স্থানীয় সকল ভদ্রলোকের সহিত তিনি সুন্দর-ভাবে কথাবার্তা কহিতেন এবং অমায়িকভাবে মিশিতেন। সকল জেলায় এবং কলিকাতায় তাঁহার নিকট উকিল ব্যারিষ্টার এটর্নী জমিদার ইত্যাদি যে কেহ কার্যোপলক্ষে যাইতেন কৃপানাথ সকলের সহিত এরূপ ভদ্র ও অমায়িকভাবে মিশিতেন যে সকলেই তাঁহার মিষ্ট কথায় ও অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে শত মুখে প্রশংসা করিতেন এবং সম্মান দেখাইয়া বন্ধুত্ব করিতেন।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে কৃপানাথ ইনস্পেক্টর অফ্ রেজিষ্ট্রেশন (Inspector of Registration) নিযুক্ত হন। ভারতবাসীদিগের মধ্যে তিনিই প্রথম এই উচ্চ পদ লাভ করেন। কিন্তু নানাস্থানে সর্বদা ভ্রমণ করা তাঁহার শরীরের উপযোগী না হওয়ায় তিনি তাহা পরিত্যাগ করেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Register of Joint Stock Companies নিযুক্ত হন। এই উচ্চ রাজকার্য

অদ্যাবধি তিনি ভিন্ন কোন ভারতবাসী প্রাপ্ত হন নাই। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কৃপানাথ দত্ত মহাশয় গবর্ণমেন্টের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

কৃপানাথ দত্তের পিতা মহাশয় হাটখোলা হইতে টালায় গিয়া একটী গৃহ খরিদ করিয়া তথায় বাসস্থান স্থাপন করেন। তৎকালে টালা কাশীপুর চিৎপুর মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত ছিল যাহা এখন কলিকাতা কর্পোরেশনের মধ্যভুক্ত হইয়াছে। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কাশীপুর চিৎপুর মিউনিসিপ্যালিটির সৃষ্টি হইলে কৃপানাথ তাহার একজন কমিশনার নির্বাচিত হন এবং তাঁহার জীবনের শেষ ৩৬ বৎসর যাবৎ উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির উন্নতিকল্পে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া উক্ত স্থানের কিরূপ অপরিসীম উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কৃপানাথ উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন এবং ঐ বৎসর হইতে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, পুনরায় ১৯০৮ হইতে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ এবং পুনরায় ১৯২০ হইতে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ অবধি বিশেষ সুখ্যাতির সহিত উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতির পদে থাকিয়া অবৈতনিক কার্য হইলেও স্বদেশের উন্নতির জন্য অসীম পরিশ্রম করিয়া সকলরূপে উক্ত মিউনিসিপ্যালিটির এত উন্নতি করেন যে সকল লোকে তাঁহার কার্য কুশলতায় মুগ্ধ হন এবং গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে রায়বাহাদুর উপাধি দানে সম্মানিত করেন।

কৃপানাথ গবর্ণমেন্টের কার্য করিলেও দেশের নানারূপ জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠানে তিনি একজন কর্মী ছিলেন এবং কলিকাতার বড় বড় অনেকগুলি সভাসমিতির সভ্য ছিলেন। কায়স্থ সভার তিনি সহকারী সভাপতি হন এবং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে পাইকপাড়ার রাজবাটীতে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার বার্ষিক অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কাশীপুর-চিৎপুর মিউনিসিপ্যালিটি কলিকাতা কর্পোরেশনের সহিত মিলিত হইলে কৃপানাথ একজন কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। তিনি কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্ট, কলিকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন ইত্যাদি নানা বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সভ্য ছিলেন।

কৃপানাথ তেজস্বী ও নির্ভীক লোক ছিলেন। তিনি কখনও কাহারও নিকট হইতে কোনরূপ অন্যায়ভাবে উপঢৌকন বা পুরস্কার লইতেন না। তিনি বাঙলা ও ইংরাজী ভাষায় সুন্দরভাবে লিখিতে ও বক্তৃতা দিতে পারিতেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন এবং দীনদরিদ্র লোকের প্রতি তাঁহার বিশেষ দয়াদাক্ষিণ্য

ছিল। তাঁহার ন্যায় বিনয়ী নিরহঙ্কার ও অকলঙ্ক চরিত্রের লোক অতি অল্পই দেখা যায়। কৃপানাথের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য কাশীপুরের একটি বড় রাস্তার নাম "কৃপানাথ দত্তের রোড" করা হইয়াছে।

কৃপানাথের স্বাস্থ্য শেষ জীবনে ভালই ছিল। ২৫শে জানুয়ারী ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে রাত্রে হঠাৎ তাঁহার মহাপ্রাণ স্বর্গধামে চলিয়া যায়। তিনি কাহারও সেবার ঋণ হইলেন না বা এক ঘণ্টাও রোগ ভোগ করিলেন না।

কৃপানাথের সাধ্বী পতিব্রতা পত্নী শিবদুর্গা স্বামীর স্বর্গারোহণের পর বৎসরই মাত্র কয় দিবস জ্বর রোগে ভুগিয়া ১২ই অক্টোবর ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গলোকে স্বামীর সহিত মিলিত হন।

কৃপানাথের তিন পুত্র—দীননাথ, ত্রৈলোক্যনাথ ও কুমুদনাথ এবং পাচ কন্যা।

দীননাথ

কৃপানাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দীননাথ ১১ই এপ্রিল ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দীননাথ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নানারূপ ব্যবসাবাণিজ্যে লিপ্ত হন। কলিকাতায় প্রথম ম্যাডান বায়স্কোপ কোম্পানির পর দীননাথ মেছুয়াবাজারে রিপন থিয়েটার হলে সিনেমা খোলেন। নানারূপ দেশ সেবায় দীননাথের আন্তরিক অনুরাগ ছিল। তিনি একটি ব্যায়ামাগার স্থাপন করেন। ৪ঠা আষাঢ় ১৩১৫ তারিখে কলিকাতার সুবিখ্যাত এটর্নী কালীনাথ মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণাকে দীননাথ বিবাহ করেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে জীবনের শেষ তিন বৎসর পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হইয়া দীননাথ ১৮ ভাদ্র শনিবার ১৩৪০ সনে ইহধাম ত্যাগ করেন।

দীননাথের তিনটি মাত্র কন্যা শ্রীমতী শোভা, শ্রীমতী আভা ও শ্রীমতী প্রতিভা।

প্রথম কন্যা শোভার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষের সহিত শুভবিবাহ হয়। তাঁহার এক পুত্র প্রশান্ত এবং এক কন্যা ঝরণা।

দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী আভারাণীর, ৩রা শ্রাবণ বৃহস্পতিবার ১৩৪০ সনে শ্যামবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত রমণীমোহন বসুর চতুর্থ পুত্র শ্রীজ্ঞানব্রতের সহিত শুভবিবাহ হয়। তাঁহার এক পুত্র ভীষ্মদেব।

ত্রৈলোক্যনাথ

কৃপানাথের দ্বিতীয় পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে নবেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। মেধাবী ও অধ্যায়ন অনুরাগী ত্রৈলোক্যনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম, এস-সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কলিকাতা ইউনিভারসিটি হইতে বি, এল, ডিগ্রি লইয়া আইন বা ওকালতী করিতেছেন। উপস্থিত তিনি বিহারের ছাপরা কোর্টে তাঁহার শ্বশুর সুবিখ্যাত গবর্ণমেণ্টের উকিল শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের জুনিয়র হিসাবে বেশ সুনামের সহিত ওকালতি কার্য করিতেছেন। দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতির জন্য তাঁহার বিশেষ উৎসাহ। তিনি কয়েকটি বড় বড় ব্যবসায় লিপ্ত আছেন। তাঁহার উৎসাহে সম্প্রতি বিহারের সিতলপুর নামক স্থানে কয় লক্ষ টাকার যৌথ মূলধনে সিতলপুর সুগার ওয়ার্কস লিমিটেড নামে বড় একটি চিনির কল খোলা হইয়াছে। উক্ত কলের ত্রৈলোক্যনাথ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং তাঁহার তত্ত্বাবধানে প্রতি বৎসর প্রায় দুই লক্ষ মন চিনি প্রস্তুত হইয়া দেশের ব্যবসার উন্নতি হইতেছে।

সামাজিক এবং দেশহিতর নানারূপ কার্যে ত্রৈলোক্যনাথের বিশেষ সহানুভূতি আছে। ছাপরা মিউনিসিপ্যালিটির তিনি সভ্য এবং সহকারী সভাপতি, ছাপরা কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের তিনি কর্মী ও নানারূপ প্রতিষ্ঠানের তিনি উৎসাহদাতা। ১৫ই মাঘ ১৩০৮ তারিখে ত্রৈলোক্যনাথ কুমারটুলীর সুবিখ্যাত মিত্র বংশের ছাপরার উকিল ও বিচারপতি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী নীলিমাকে বিবাহ করেন। শ্রীমতী নীলিমা সর্বগুণসম্পন্না শিক্ষিতা মহিলা এবং তিনি একজন শ্রেষ্ঠ চিত্র অঙ্কনকারিণী।

ত্রৈলোক্যনাথের তিন পুত্র রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ এবং চন্দ্রনাথ আর তিন কন্যা শ্রীমতী বেলারাণী, শ্রীমতী চম্পা এবং শ্রীমতী ডালিয়া।

গত ২৪শে শ্রাবণ ১৩৩৮ সনে বেলারাণীর সিমলা নিবাসী উকিল শ্রীযুক্ত সনৎকুমার ঘোষের সহিত শুভবিবাহ হইয়াছে। তাঁহার এক পুত্র সুবোধ এবং দুই কন্যা।

কুমুদনাথ

কৃপানাথের কনিষ্ঠ পুত্র কুমুদনাথ। কুমুদনাথ বঙ্গবাসী কলেজে আই, এ, অবধি অধ্যয়ন করিয়া ব্যবসা করিতেছেন। তিনি Calcutta Aerial Club-এর সভ্য হইয়া এয়ারোপ্লেন চালাইতে শিক্ষা করিয়াছেন। ২৬শে

বৈশাখ ১৩৪৭ তারিখে কুমুদনাথ মাণিকতলা নিবাসী শরৎচন্দ্র পাল মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী রানুকে বিবাহ করেন।

কৃপানাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা ভুবনমোহিনী ৩রা ডিসেম্বর ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ২৬শে জানুয়ারী ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীপুর নিবাসী দেবেন্দ্রনাথ মিত্রের সহিত ভুবনমোহিনীর শুভবিবাহ হয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং দুই কন্যা শ্রীমতী উষারাণী ও শ্রীমতী তুষাররাণী। দেবেন্দ্রনাথ জেনারেল পোষ্ট আফিসের উচ্চ কর্মচারী ছিলেন। ১৮ই ডিসেম্বর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ শোকার্ত মাতাকে অধিকতর গুরুশোকে নিপীড়িত করিয়া ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে পিতার নিকট চলিয়া যান। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী উষারাণীর হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ বসুর সহিত শুভবিবাহ হয় এবং দ্বিতীয় কন্যা তুষাররাণীর ১৩ই মাঘ রবিবার ১৩৩১ তারিখে শ্রীযুক্ত তারাকুমার মজুমদারের সহিত শুভ-বিবাহ হয়।

কৃপানাথের দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী জগৎমোহিনীর ২৬শে মে ১৮৯৭ তারিখে শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুর সহিত শুভবিবাহ হয়। যতীন্দ্রনাথ বঙ্গদেশের ডাইরেক্টর অফ ইণ্ডাষ্ট্রীস্ গভর্ণমেণ্ট আফিসে উচ্চ রাজকার্য করেন। তাঁহার তিন পুত্র শ্রীজ্যোৎস্নাকুমার বসু এম্, এ, পুরাণরত্ন, বিদ্যাবিনোদ, দ্বিতীয় পুত্র ৺প্রভাতকুমার এবং কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীসুনীলকুমার এবং দুই কন্যা বীণাপাণি ও রেণুকা। শ্রীমতী বীণাপাণির রাঁচী নিবাসী বীরেশ্বর দেবের সহিত শুভবিবাহ হয়। শ্রীমতী রেণুকার ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৫ তারিখে রাঁচী নিবাসী ৺সুনীলবিহারী আয়কাত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান বনবিহারীর সহিত শুভবিবাহ হয়।

কৃপানাথের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী উমাশশীর ৮ই জুন বৃহস্পতিবার ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহিত শুভবিবাহ হয়। ফণীন্দ্রনাথ বি, এস্-সি, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য শিক্ষা করিয়া নিজের লৌহ কারখানার ব্যবসা পরিচালনা করেন। তিনি অতি অমায়িক ও দয়ালু লোক, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার একজন প্রকৃত কর্মী এবং ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে উপবীত গ্রহণ করিয়া স্বয়ং ৺দুর্গাপূজাদি ধর্মকর্ম করিয়া থাকেন।

কৃপানাথের চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী প্রতিমা ; ২৫শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে কাশীপুর নিবাসী হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বসুর

সহিত শুভবিবাহ হয়। প্রতিমার এক পুত্র রমেন্দ্র এবং তিন কন্যা শ্রীমতী পারুল, শ্রীমতী রেবা ও শ্রীমতী রিণা।

সুরেন্দ্রনাথ আগষ্ট ১৮৮৮ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছেন। তিনি মিষ্টভাষী অমায়িক ভদ্রলোক। বহু সভাসমিতিতে যোগদান করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র রমেন্দ্র অক্টোবর ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং এম্, এ, বি, এল্, ডিগ্রি পাইয়াছেন।

কৃপানাথের কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী অমিতাভার ২৫শে শ্রাবণ ১৩২১ সিমলা নিবাসী শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মিত্রের সহিত শুভ বিবাহ হয়। শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ রেজিষ্ট্রারের কার্য করেন। অমিতাভা ২২শে জুলাই ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনটি কন্যা রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন।

শ্রীমতী প্রভাবতী

চারুচন্দ্রের দ্বিতীয় কন্যা প্রভাবতী ৭ই অক্টোবর রবিবার ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ২রা ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রভাবতীর নড়াইলের জমিদার ৺গোবিন্দচরণ রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের সহিত বিবাহ হয়।

জিতেন্দ্রনাথ কলিকাতা ইউনিভারসিটি হইতে বি, এল, পাস করিয়া উকিল হইবার জন্য স্বর্গীয় স্যার রাসবিহারী ঘোষের আর্টিকেল ক্লার্ক বা শিক্ষানবিশ হন, কিন্তু পিতার ইচ্ছায় তাহাকে আইন অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া সুবৃহৎ জমিদারী পরিদর্শনের ভার লইতে হয়। তিনি স্বগৃহে নানারূপ সাহিত্য এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিয়া ইংরাজী ও বাঙলা ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছেন। অনেক দেশহিতকর কার্যে তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি আছে এবং সম্ভ্রান্ত সমাজে সকলের সহিত তিনি অমায়িকভাবে মেশেন। বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভার তিনি একজন বিশেষ কর্মী এবং কয়েক বৎসর তিনি কায়স্থ পত্রিকার সম্পাদক থাকিয়া অনেক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন। তিনি হিন্দুসভার একজন কর্মী এবং হিন্দুসভার পক্ষ হইতে তিনি যশোহর জেলার প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া কয় বৎসর বেঙ্গল লেজিস্-লেটিভ সভার সভ্য নির্বাচিত হন। অনেক সভাসমিতিতে তিনি যোগদান করেন। তিনি ইয়োরোপের নানা দেশ তিনবার ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন।

প্রভাবতীর দুই পুত্র নলিনীনাথ ও অনাথনাথ এবং দুই কন্যা শ্রীমতী

নির্মলনলিনী ও শ্রীমতী সরোজবাসিনী। কনিষ্ঠ পুত্র অনাথনাথের জন্ম-গ্রহণের পরদিবস দুর্ভাগ্যক্রমে ২২শে জানুয়ারী ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রভাবতী সূতিকাগৃহে ইহধাম ত্যাগ করেন।

নলিনীনাথ

জিতেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র নলিনীনাথ ১০ই অক্টোবর ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে হিন্দু ইস্কুলে অধ্যয়ন করিয়া ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষা দেন। বাল্যকাল হইতে নলিনীনাথ বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তিনি নানারূপ সভাসমিতিতে একান্তভাবে পল্লীবাসীর সহিত কার্য করিতেন এবং অল্পবয়স হইতেই তাঁহাকে সকল দেশবাসী ভালবাসিত। খেলাধূলায় তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। ফুটবল, ক্রিকেট্, টেনিস ইত্যাদি সুন্দরভাবে খেলিতে পারিতেন এবং সুবিখ্যাত এরিয়ন ফুট্বল ক্লাবের নলিনীনাথ কয় বৎসর সম্পাদক ছিলেন। অল্প বয়স হইতে তিনি নানারূপ দেশের ও দেশের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। কালিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে যে জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, নলিনীনাথ উক্ত কংগ্রেসের সর্ব বিষয়ে সাহায্য করেন এবং উক্ত কংগ্রেসের ভলাণ্টিয়ার দলের ক্যাপ্টেন্ হইয়া কয়দিবস অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের স্বরাজ দলের একজন বিশেষ কর্মীরূপে যোগদান করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে স্বরাজ দলের পক্ষ হইতে যশোহর অমুসলমান কেন্দ্র হইতে বাঙ্গালার নূতন ব্যবস্থা সভার সদস্যপদ প্রার্থী হন এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সুবিখ্যাত রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর, কিন্তু এই অল্প বয়সে নলিনীনাথ সকলের এত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন যে তিনিই সর্বাধিক ভোটে নির্বাচিত হন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর জেলায় বঙ্গদেশীয় প্রাদেশিক কনফারেন্সের অধিবেশন হইলে তিনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মনোনীত হইয়া উক্ত সভায় একটি মনোজ্ঞ অভিভাষণ পাঠ করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে নলিনীনাথ পুনরায় যশোহর কেন্দ্র হইতে বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপরিষদের সদস্য পদপ্রার্থী হন এবং তিনি সর্বদেশবাসীর এত প্রিয় ছিলেন যে উক্ত নির্বাচনে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী সুপ্রসিদ্ধ রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুরকে . . ভোটাধিক্যে পরাজিত করিয়া সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি কয় বৎসর Bengal Legislative Councilএ স্বরাজ দলের সঙ্গে থাকিয়া দেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন।

কিন্তু হায়! এরূপ একজন সর্বজনপ্রিয় দেশসেবক যুবা জগতে বেশীদিবস থাকিয়া দেশসেবা করিতে পারিলেন না। ২৮শে নবেম্বর ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে নলিনীনাথ কালাজ্বর রোগে ভুগিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন।

১২ই মার্চ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে নলিনীনাথ চুঁচুড়া নিবাসী ৺নবকুমার বসু মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী কনকবালাকে বিবাহ করেন এবং এবং অল্প বয়স্কা সাধ্বী নিঃসন্তান পত্নীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া চলিয়া যান। নড়াইলের সুবিখ্যাত জমিদার রতন রায়ের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং অতুল ঐশ্বর্যে লালিতপালিত হইয়াও নলিনীনাথ নিরহঙ্কার, নির্ভীক, উদার এবং দূরদর্শী লোক ছিলেন। অল্প বয়স হইতেই তাঁহার কার্যকলাপের যশঃসৌরভে চারিদিক অমোদিত হইয়া উঠিয়াছিল।

অনাথনাথ

জিতেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র অনাথনাথ ২১শে জানুয়ারী ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অনাথনাথ বিদ্বান ও বুদ্ধিমান বালক ছিলেন এবং নানারূপ সভাসমিতিতে তাঁহার বেশ মেলামেশা ছিল এবং তাঁহার চরিত্র নির্মল ও মধুর ছিল। ইয়োরোপের মহাযুদ্ধের সময় অনাথনাথ কলিকাতা লাইট হাউস Calcutta Light House ভলেণ্টিয়ার দলে যোগদান করেন ৩রা জুলাই ১৯২২ তারিখে। অনাথনাথ হুগলীর মিত্র বংশের চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের একমাত্র কন্যা উমাশশীকে শুভ বিবাহ করেন। দুর্ভাগ্যক্রমে অনাথনাথ অল্প বয়সে ১০ই আশ্বিন ১৩৪৩ তারিখে হঠাৎ হৃদয় ক্রিয়া বন্ধ হইয়া ইহধাম ত্যাগ করেন।

অনাথনাথের দুই পুত্র আশুতোষ ও বিষ্ণু এবং একমাত্র কন্যা শ্রীমতী রেবারাণী।

প্রভাবতীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী নির্মলনলিনী ২৪শে মে বুধবার ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ২৩শে জানুয়ারী ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীপুর নিবাসী বিচারপতি ৺চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রায় যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ বাহাদুরের দ্বিতীয় পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ক্ষিতীশচন্দ্র হাইকোর্টের উকিল এবং সুন্দর অমায়িক লোক ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ক্ষিতীশচন্দ্র অতি অল্প বয়সে নিঃসন্তান বালিকা পত্নীকে রাখিয়া ১লা অক্টোবর ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গলোকে চলিয়া যান।'

প্রভাবতীর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরোজনলিনী ২রা অক্টোবরে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে

জন্মগ্রহণ করেন। ২০শে এপ্রিল ১৯১২ তারিখে যশোহর বিত্তানন্দ কাঠী নিবাসী ডাক্তার গোপালচন্দ্র ঘোষের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। গোপালচন্দ্র কলিকাতায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়া বিলাতে চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিতে যান এবং ইংলণ্ডের নানা হাসপাতালে এগার বৎসর কার্য করিয়া চিকিৎসা বিদ্যায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়া ভারতবর্ষে আসিয়া বিবাহ করেন।

গোপালচন্দ্র কয় বৎসর নেপাল রাজ্যে নেপাল মহারাজার ডাক্তার ছিলেন, পরে ধানবাদে কতকগুলি বড় বড় কোম্পানির ডাক্তার হন। তিনি দরিদ্র রোগীর নিকট হইতে ফি লইতেন না এবং সকল শ্রেণীর লোকের সহিত অমায়িকভাবে মিশিতেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার ১৯৩২ তারিখে হঠাৎ হৃদয়ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গোপালচন্দ্র সাধ্বী স্ত্রী এবং তিন কন্যা রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। তিনি এত জনপ্রিয় ছিলেন যে তাঁহার স্বর্গারোহণের পর বিহারের সাহেব ও বাঙ্গালী ভদ্রমহোদয়গণ প্রায় এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার স্মৃতি চিরকাল জাগরূপ রাখিবার জন্য গত ২৪।১০।৩৮ তারিখে The Dhanbad and Districf Leprosy Relief Association বিহার তিতুমারী নামক স্বাস্থ্যকর স্থানে Dr. Gopal Chandra Ghose Memorial Leprosy Hospital বিহারের লাটের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করেন।

গোপালচন্দ্রের তিন কন্যা শ্রীমতী প্রতিমা, মতী নীলিমা এবং এবং শ্রীমতী রমলা। জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রতিমা লোরেটো গার্লস ইস্কুল হইতে সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সব বিষয় শিক্ষিতা হন। ২৪শে শ্রাবণ ১৩৪০ বুধবার ফরিদপুর জেলাস্থ ভাটিয়াপাড়া নিবাসী ৺বীরচাঁদ বক্সীর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রভূষণের সহিত শুভ বিবাহ হয়। নগেন্দ্রভূষণ বিলাত হইতে সিভিলসার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতবর্ষে ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য করিতেছেন এবং উপস্থিত ডেল্‌টনগঞ্জের ডেপুটি কমিশনার।

শ্রীমতী বিভাবতী

চারুচন্দ্রের তৃতীয় কন্যা শ্রীমতী বিভাবতী ৭ই ফেব্রুয়ারী রবিবার ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৩রা মার্চ রবিবার ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কাঁসারিপাড়া নিবাসী অটলকুমার সেন মহাশয়ের সহিত বিবাহ হয়। চন্দনগরের পর্ণকুটীর-বাসী দীন দরিদ্র কিঙ্কর সেন স্বীয় অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি বলে একদিন দিল্লীশ্বরের উপরে—'বেগম তক্ত আত্তর জায়রণ'—লেখনী চালাইয়া যে সাহসের

ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে বাদশাহ্ তাঁহাকে হুগলীর ফৌজদার পদে নিযুক্ত করিয়া সম্মানিত করেন। বাদশাহ বাহাদুর শাহ্ কিঙ্কর সেনের বাক্-চাতুর্যে ও রূপ মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে "ভাইয়া" বলিয়া সম্বোধন করেন এবং কিঙ্কর সেন সেই সময়ে "ভাইয়া কিঙ্কর সেন" নামে অভিহিত হন। সেই সময়ে কিঙ্কর সেন দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ সমাজে ঐশ্বর্য ও সম্ভ্রম প্রতিপত্তিতে অশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া সমীকরণ বা একজাই করিয়া ২০শ পর্যায়ের কুলীন কায়স্থগণের গোষ্ঠীপতি হন। এই মেধাবী স্বনামধন্য স্বর্গীয় মহাপুরুষের বংশধর পবিত্র সেন সিমুলিয়া কাঁসারিপাড়ার সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ঐশ্বর্যশালী নিরহঙ্কারী উদার শান্ত স্বনামধন্য অটলকুমার সেন এই বংশের একটি উজ্জ্বল রত্ন। ইহার শিষ্টাচার, সরল স্বভাব, বংশ উন্নত আদর্শ চরিত্র, সমাজের সকল লোককেই মুগ্ধ করিয়াছিল। ধনী নির্ধনী সকলেই তাঁহার চক্ষে সমান ছিল। শত্রু বলিতে ইহার কেহই ছিল না। সেই সৌম্য মানব মূর্তি চিরদিনই দেবমূর্তির ন্যায় সকলের চক্ষে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র হইয়াছিল। বংশমর্যাদা রক্ষার লক্ষ্য, পরদুঃখমোচন কর্ম, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনকে ভালবাসা তাঁহার ধর্ম ছিল। স্থূলকায় দেহ সত্ত্বেও প্রভাত হইতে গভীর রাত্র পর্যন্ত প্রতিদিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না।

অটলকুমার বানহাউসের মুচ্ছদী এবং টেলিফোন কোম্পানী ইত্যাদি অনেকগুলি বড় বড় কোম্পানীর ডাইরেক্টর ছিলেন। কলিকাতায় অনারারী প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট, শিয়ালদা কোর্টের অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট, মহামান্য হাইকোর্টের স্পেশাল জুরার এবং ভারত সঙ্গীত সমাজের সম্পাদক, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। কলিকাতার বড় বড় প্রায় সকল সভাসমিতির তিনি সভ্য ছিলেন। ১৫ই অগ্রহায়ণ ১২৭৭ সনে অটলকুমার জন্মগ্রহণ করেন।

বিভাবতী সাধ্বী সহধর্মিনী ছিলেন। দীন দরিদ্রের প্রতি তাঁহার অশেষ করুণা। তিনি বদ্রিনারায়ণ পশুপতিনাথ ইত্যাদি ভারতবর্ষের প্রায় সকল দুরূহ তীর্থাদিতে ভ্রমণ করিয়াছেন। ১৩২৮ সনে তিনি সংবৎসর মধ্যে সর্বত্যাগাত্মক সর্বজয়া ব্রত করিয়া কঠোর সাধনা করেন।

বিভাবতীর একমাত্র পুত্র অচলকুমার ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬ই জানুয়ারী ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সিমুলিয়া নিবাসী চারুচন্দ্র বসুর দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী দেবরাণীর সহিত শুভ বিবাহ হয়।

সর্বরূপ জনহিতকর কার্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়া ১৮ই কার্তিক ১৩৩৪ সনে অচলকুমার স্বর্গলোকে প্রস্থান করেন।

শ্রীমতী লীলাবতী

চারুচন্দ্রের চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী লীলাবতী ১০ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

১লা মে শুক্রবার ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সিমলা নিবাসী মহেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় হয়।

ব্রজেন্দ্রনাথ ২রা জানুয়ারী ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার দেহ অতীব সুন্দর এবং উচ্চতা অপরূপ; তাঁহার ন্যায় দীর্ঘাকৃতি তেজস্বী পুরুষ বাঙলাদেশে বিরল ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ নানারূপ ব্যবসা বাণিজ্যে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নানারূপ ব্যবসায় অক্লান্ত পরিশ্রম করিলেও চঞ্চলা লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি বিশেষ সুপ্রসন্ন হন নাই। ব্রজেন্দ্রনাথ কলিকাতার উচ্চ সমাজের সকলের সহিত বিশেষ সৌহার্দ স্থাপন করেন। অনেক সভাসমিতিতে যোগদান করিতেন এবং মোহনবাগান ক্লাবের অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। দুই বৎসর ক্যানসার রোগে ভুগিয়া ১৬ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১৩৩৬ তারিখে স্বর্গারোহণ করেন।

লীলাবতীর দুই পুত্র নৃপেন্দ্র এবং সমরেন্দ্র এবং তিন কন্যা শ্রীমতী অমিয়বালা, শ্রীমতী কমলাবালা এবং শ্রীমতী রমলা।

নৃপেন্দ্রনাথ ১১ই এপ্রিল বৃহস্পতিবার ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এ, ও বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কোর্টে ওকালতি কার্য করিতেছেন এবং অর্থনীতি বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া তিনি কয়টি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন।

সমরেন্দ্রনারায়ণ ৮ই অক্টোবর ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। সমরেন্দ্র ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাস অবধি অধ্যয়ন করিয়া ইংরাজ কোম্পানীর আফিসে কার্য করেন।

লীলাবতীর প্রথমা কন্যা শ্রীমতী অমিয়বালা ২৭শে ডিসেম্বর ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৪ঠা জুলাই ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে গোয়াবাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র ঘোষের সহিত তাঁহার শুভ বিবাহ হইয়াছে।

অমিয়বালার দুই পুত্র অমল ও শ্যামল এবং দুই কন্যা শ্রীমতী ছবিরাণী এবং

শ্রীমতী মঞ্জু। ২৮শে বৈশাখ ১৩৪৩ তারিখে ছবিরাণীর বেলগাছিয়া নিবাসী ৺বিভাসচন্দ্র দত্তের প্রথম পুত্র শ্রীমান সুধীরচন্দ্র দত্তের সহিত শুভ বিবাহ হয়। শ্রীমতী ছবিরাণীর দুই পুত্র কল্যাণ ও খোকা।

লীলাবতীর দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী কমলাবালা ৪ঠা জানুয়ারী ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭ই জুন ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে হোগলকুড়িয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র বসুর সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় হয়। তাঁহার চার পুত্র প্রফুল্ল প্রশান্ত, প্রবীর ও সমীর একটি কন্যা শ্রীমতী রেবা।

শ্রীমতী সত্যবতী

চারুচন্দ্রের পঞ্চম কন্যা শ্রীমতী সত্যবতী ২৪শে অক্টোবর ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯৮খ্রীষ্টাব্দে হাটখোলা দত্ত বংশের ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র সাগর চাঁদ দত্তের সহিত তাঁহার শুভ বিবাহ হয়।

সাধ্বী পত্নী সত্যবতী দুই পুত্র এবং দুই কন্যা রাখিয়া ৬ই জুলাই ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র তিন দিবস রোগে ভুগিয়া স্বর্গালোকে চলিয়া যান।

সাগরচন্দ্র দশ দিবস মাত্র টাইফয়েড রোগে ভুগিয়া ৯ই ভাদ্র রবিবার ১৩৪১ তারিখে ইহধাম ত্যাগ করেন।

সত্যবতীর প্রথম পুত্র সুশীলচন্দ্র ২৮শে এপ্রিল ১৯ ২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় পুত্র শিবশঙ্কর ২৯ অক্টোবর ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

সত্যবতীর প্রথমা কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি ৩০শে আগষ্ট ১৯০০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৮ই আগষ্ট ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে চোরবাগান নিবাসী সন্ন্যাসীচরণ ঘোষের পুত্র লালমোহনের সহিত বিবাহ হয়। লালমোহন বিশেষ স্বাস্থ্যবান ও বিজ্ঞ লোক ছিলেন। ৬ই নভেম্বর ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে কয় দিবস রোগে ভুগিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। লক্ষ্মীমণির দুই পুত্র ললিতমোহন এবং গোরাচাঁদ এবং দুই কন্যা শ্রীমতী সুলেখা এবং শ্রীমতী মিনতিরাণী।

সত্যবতীর কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী শোভারাণী ৫ই আগষ্ট ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৮ই জুলাই ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে কটকের গবর্ণমেণ্ট উকিল দেশ-প্রসিদ্ধ রায় জানকীনাথ বসু বাহাদুর মহাশয়ের পুত্র ডাক্তার সুনীলচন্দ্র বসুর সহিত শুভ বিবাহ হয়। সুনীলচন্দ্র সুবিখ্যাত দেশসেবক সুভাষচন্দ্রের তৃতীয় ভ্রাতা। সুনীলচন্দ্র দুইবার ইংলণ্ডে গিয়া চিকিৎসাবিদ্যায় বড় উপাধি লইয়া আসেন।

শোভারাণীর এক কন্যা শ্রীমতী লীলাবতী।

২রা মাঘ মঙ্গলবার ১৩৪৬ তারিখে লীলাবতীর কুলীন গ্রাম নিবাসী চারুচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের পুত্র বিজয়কুমারের সহিত শুভ পরিণয় হয়।

শ্রীমতী ঊষাবতী

চারুচন্দ্রের ষষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী ঊষাবতী ২৭শে ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

৫ই মে ১৯০১ তারিখে হাটখোলা দত্ত বংশের যোগেন্দ্রনাথ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধীরচন্দ্রের সহিত শ্রীমতী ঊষাবতীর বিবাহ হয়।

৩০শে আশ্বিন ১৩৪৪ তারিখে সুধীরচন্দ্র এক সপ্তাহ মাত্র রোগে কষ্ট পাইয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অমরেন্দ্রনাথ, শচীন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্র এবং দুই কন্যা শ্রীমতী শোভারাণী ও শ্রীমতী প্রতিমা।

জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ ১৭ই অক্টোবর শনিবার ১৯০৮ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। পরেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী বিমলার সহিত তাঁহার শুভ বিবাহ হয়। তাঁহার দুই কন্যা।

দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান সমরেন্দ্র ১০ই মাঘ মঙ্গলবার ১৩১৭ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন ঘোষ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী কমলার সহিত তাঁহার শুভ বিবাহ হয়।

ঊষাবতীর জ্যেষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী শোভারাণী ৪ঠা জানুয়ারী ১৯০৫ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৯ তারিখে শ্যামবাজার নিবাসী নগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের পুত্র বিমলচাঁদের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিমলচাঁদ অল্পবয়সে ১৩৪১ সনে তিনটি কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা, শ্রীমতী রাধা এবং শ্রীমতী দুর্গাকে রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন।

কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রতিমা ৯ই নবেম্বর ১৯১৩ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ২৮শে মে সোমবার ১৯২৮ তারিখে ব্যাটরা নিবাসী শ্রীযুক্ত অনিলচাঁদ ঘোষের সহিত তাহার শুভ বিবাহ হয়। তাঁহার দুই পুত্র—অজিত ও সুজিৎ।

শ্রীমতী দুর্গাবতী

চারুচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী দুর্গাবতীর ১৫ই নবেম্বর মঙ্গলবার ১৮৯৪ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ১১ই ডিসেম্বর সোমবার ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে দর্জিপাড়ার

সুবিখ্যাত মিত্র বংশের অমরকৃষ্ণ মিত্র মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র দীনেন্দ্রকৃষ্ণের সহিত দুর্গাবতীর শুভ বিবাহ হয়। দীনেন্দ্রকৃষ্ণ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সদালাপি, বুদ্ধিমান ও নির্মল চরিত্রের লোক ছিলেন।

২৪শে এপ্রিল ১৯১৮ তারিখে দীনেন্দ্রকৃষ্ণ সাধ্বী স্ত্রী এবং দুইটি নাবালক পুত্র রাখিয়া অল্প বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন।

দীনেন্দ্রকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র কনকেন্দ্র ১৫ই এপ্রিল ১৯১০ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬ই শ্রাবণ বুধবার ১৩৩৮ তারিখে শ্যামবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত তপেন্দ্রকুমার ঘোষচৌধুরীর পরমাসুন্দরী কন্যা শ্রীমতী ইলারাণীর সহিত কনকেন্দ্রের শুভ বিবাহ হয়। তাঁহার তিন পুত্র।

দীনেন্দ্রকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র নীরজেন্দ্র ১১ই এপ্রিল ১৯১৪ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার ১৩৫৪ তারিখে গোয়াবাগানি নিবাসী ৺ডাক্তার হরনাথ বসুর ষষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্রের কন্যা শ্রীমতী প্রীতিময়ীর সহিত নীরজেন্দ্রের বিবাহ হয়। নীরজেন্দ্র বেশ মিষ্টভাষী উচ্চহৃদয়বান সুপুরুষ ছিলেন। বিবাহের দেড় বৎসরের মধ্যে ১৩৪৬ সালে হঠাৎ তিনি টাইফয়েড রোগাক্রান্ত হন এবং ছাব্বিশ দিবস জ্বরে ভুগিয়া ২০শে ভাদ্র বুধবার দিবস নিঃসন্তান সাধ্বী স্ত্রীকে রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন।

দুর্গাবতীর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। ১৩৪৫ সন হইতে তাঁহার হৃদয়ের রোগ হয়। ১৩৪৬ সনে আষাঢ় মাসে তিনি পিত্রালয়ে অসুস্থ মাতাকে দেখিতে আসিয়া ২৮শে আষাঢ় ১৩৪৬ তারিখে রাত্র ২টার সময় হঠাৎ তাঁহার হৃদয়ক্রিয়া বন্ধ হইয়া স্বামীর সহিত স্বর্গধামে মিলিত হইবার জন্য চলিয়া যান।

—

পঞ্চদশ অধ্যায়

শরৎচন্দ্র বসুমল্লিক

দ্বারিকানাথের মধ্যম পুত্র (২৭শে পর্যায়ে) শরৎচন্দ্র, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার ১২৬২ সনে জন্মগ্রহণ করেন। শরৎচন্দ্র প্রথমে হিন্দু স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে চতুর্থ শ্রেণী বি, এ অবধি অধ্যয়ন করেন। শিক্ষা ও সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল। নানারূপ ধর্ম ও সাহিত্য গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতে এবং ধর্ম শাস্ত্রাদি লইয়া আলোচনা করিতে তিনি ভালবাসিতেন। তিনি গীতার বহুরূপ অনুবাদ ও অনুশীলন করিয়া নিজে একটি ব্যাখ্যা লিখিয়া গিয়াছেন এবং "জন্মান্তরবাদ" ও "গীতার পরতত্ত্ব" নামক দুইখানি বিশেষ গবেষণাপূর্ণ পুস্তক প্রকাশ করেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তাঁহার চরিত্র যেরূপ মহৎ ও দেবতুল্য ছিল হৃদয়ও তাঁহার সেইরূপ দয়ামায়ায় পরিপূর্ণ ছিল। দ্বেষ, হিংসা, রাগ বলিয়া কোন রিপু তাঁহার হৃদয়ে কখনও প্রবেশ করে নাই। তিনি অল্পভাষী এবং সাদাসিধা সরল অন্তঃকরণের মানুষ ছিলেন। সকল আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে আন্তরিকভাবে ভালবাসিতেন ও সকলের সহিত অমায়িকভাবে মিশিতেন। অনেক দরিদ্র বিধবা ও অন্ধ তাঁহার নিকট হইতে মাসিক বৃত্তি পাইত।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র সপরিবারে চুণার পাহাড়ে গিয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য প্রায় চার মাস বাস করেন। উক্ত স্থানের সন্নিকটে একটি পাহাড়ের উপর প্রাচীন দুর্গাদেবীর এক মূর্তি ও মন্দির আছে। উক্ত পর্বতের উপরে যাইতে রাস্তার মধ্যে এক বড় ঝরণা পড়ে। শরৎচন্দ্র স্থানীয় লোক ও যাত্রীদিগের ঝরণা অতিক্রমের বিপদ এবং কষ্ট দূর করিবার জন্য ঐ সময়ে প্রায় দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া উক্ত পাহাড়ের উপর একটি সেতু নির্মাণ করিয়া দেন। উক্ত সেতু এবং তৎপার্শ্বে তাঁহার নাম এখনও তথাকার লোকদিগের নিকট চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

শরৎচন্দ্র অনেক বড় বড় সভাসমিতিতে যোগদান করিতেন এবং একজন ফ্রিমেসন্ ছিলেন। তাঁহার কোনরূপ বাহ্যাড়ম্বর ছিল না এবং অতি সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় তাঁহার চালচলন ছিল।

প্রথম জীবনে তিনি ১৮নং রাধানাথ মল্লিক লেনস্থ পৈত্রিক ভবনে একান্নবর্তী পরিবারে সকলের সহিত বিশেষ সদ্ভাব রাখিয়া বাস করেন। আজীবন তিনি জ্ঞাতি ভ্রাতা ও আত্মীয়স্বজনকে যথাযোগ্য ভক্তি শ্রদ্ধা স্নেহ ও ভালবাসা দিয়া আপনার করিয়া রাখিয়াছিলেন। কখনও কাহারও সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হয় নাই। তাঁহার এবং তাঁহার ভ্রাতাগণের পুত্রকন্যাদি বৃদ্ধি হইলে এক বাটীতে সকলের থাকা কষ্টকর হওয়ায়, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিন ভ্রাতায় পৈত্রিক সম্পত্তি, আপোষে নির্বিবাদে বণ্টন করিয়া লন। কোন উকিল এটর্ণী বা শালিসী নিযুক্ত হন নাই। বিষয় সম্পত্তি বিভাগ হইবার পর শরৎচন্দ্র সপরিবারে ১৩ ও ১৪নং রাধনাথ মল্লিক লেনস্থ ভবনে কয় বৎসর বাস করেন। পরে পৈত্রিক ভবনের নিকটে ৪০।১নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেনস্থ জমিতে নূতন বাটী নির্মাণ করাইয়া ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুন তারিখ হইতে উক্ত বাটীতে সপরিবারে বাস করিয়া শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

১৯শে মাঘ বুধবার ১২৭৯ সনে ২৪ পরগণা আরবেলে গ্রামস্থ কালীনাথ নাগচৌধুরীর কন্যা শ্রীমতী কিরণমোহিণীকে বিবাহ করেন।

শরৎচন্দ্রের চারি পুত্র চণ্ডীচরণ, শ্রীশচন্দ্র, শচীন্দ্র ও মাখনলাল এবং পাঁচ কন্যা শ্রীমতী প্রমীলাবালা, শ্রীমতী সুশীলাবালা, শ্রীমতী নির্মলাবালা, শ্রীমতী অন্নপূর্ণা এবং শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি।

১৩২১ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে শরৎচন্দ্র সপরিবারে ভুবনেশ্বরে বেড়াইতে যান। তথায় তাঁহার একটি ঘা কিরূপে বিষাক্ত হইয়া যায়। তিনি শীঘ্র কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং তিন দিবস মাত্র জ্বরে ভুগিয়া ৫ই শ্রাবণ ১৩২১ তারিখে সকাল ৮টার সময় স্বর্গলোকে চলিয়া যান।

শরৎচন্দ্রের স্ত্রী শ্রীমতী কিরণমোহিনী ক্যান্সর রোগে কয় মাস ভুগিয়া ১লা আশ্বিন রবিবার ১৩৪০ তারিখে স্বামীর সকাসে প্রস্থান করেন।

চণ্ডীচরণ

শরৎচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ডীচরণ ১১ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু ইস্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন। ব্যায়াম ক্রীড়ায় তাঁহার অত্যন্ত আসক্তি ছিল এবং তিনি একজন প্রসিদ্ধ ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। শোভাবাজার ক্লাবের পক্ষে তিনি কয় বৎসর শীল্ড প্রতিযোগিতায়

খেলিয়াছিলেন। তাঁহার দেহকান্তি যেরূপ রাজপুত্রের ন্যায় ছিল এবং শারীরিক শক্তিও সেইরূপ অপরিসীম ছিল।

২৬শে মাঘ ১৩০৭ তারিখে কুলকর্ম করিয়া চণ্ডীচরণ মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী তপোবালাকে বিবাহ করেন। ৫ই আষাঢ় ১৩৪৫ তারিখে শ্রীমতী তপোবালার মৃত্যু মৃত্যু হয়।

৯ই আগষ্ট ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে, তিনি দ্বিতীয়বার বারুইপুর নিবাসী নৃপেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরীর কন্যা শ্রীমতী হিরণমোহিনীকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করেন।

৫ই সেপ্টেম্বর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে চণ্ডীচরণ বিধবা পত্নী, একমাত্র পুত্র সুধীরকুমার এবং তিন কন্যা শ্রীমতী মনোরমা, শ্রীমতী সুরমা এবং শ্রীমতী সুষমাকে রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন।

সুধীরকুমার

চণ্ডীচরণের একমাত্র পুত্র ২৯শে পর্যায়ের শ্রীসুধীরকুমার, ১৭ই জুন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সুধীরকুমার মিত্র ইনষ্টিটিউশনের প্রথম শ্রেণী অবধি অধ্যয়ন করেন। ১৬ই ফাল্গুন ১৩৪৬ তারিখে সুধীরকুমারের বিডন্ ষ্ট্রীট নিবাসী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার সরকার মহাশয়ের চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী প্রিয়ম্বদার সহিত শুভ বিবাহ হয়।

চণ্ডীচরণের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী মনোরমা ২১শে নবেম্বর ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কটকের সুপ্রসিদ্ধ উকিল বিশ্বনাথ সিংহের পুত্র শ্রীমণীন্দ্রনাথ সিংহের সহিত শ্রীমতী মনোরমার শুভ বিবাহ হয়। তাঁহার এক পুত্র সুহাস। চণ্ডীচরণের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সরমাসুন্দরী ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ১০ই মাঘ ১৩৬৭ তারিখে সরমার ইটালীগোবরা নিবাসী শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ দের সহিত শুভ বিবাহ হয়।

কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুষমার বেলেঘাটা নিবাসী ৺ক্ষীরোদকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সতীশচন্দ্র ঘোষের সহিত ১১ই মে ১৯৩৭ তারিখে শুভ বিবাহ হয়।

শ্রীশচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীশচন্দ্র ২০শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু ইস্কুলে অধ্যয়ন করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায়

উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে আই, এ, অবধি অধ্যয়ন করেন। শ্রীশচন্দ্র চরিত্রবান নিরহঙ্কারী সামাজিক লোক। অনেক সভাসমিতিতে তিনি যোগদান করেন এবং দেশের কার্যে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ আছে।

৩০শে আষাঢ় ১৯১৩ তারিখে হাটখোলার অক্ষয়কুমার ঘোষ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী উমাশশীকে তিনি বিবাহ করেন ।

শ্রীশচন্দ্রের একমাত্র পুত্র রণজিৎকুমার এবং পাঁচ কন্যা শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ী, শ্রীমতী শোভা, শ্রীমতী আভা, শ্রীমতী মীরা এবং শ্রীমতী ছবি।

রণজিৎ ১৯৩৯ সনের প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জ্যোৎস্নাময়ীর কাঁটাপুকুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকুমার নাগচৌধুরীর সহিত ২৪শে ফাল্গুন ১৩৩০ তারিখে শুভ বিবাহ হয়।

দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী শোভার ২৭শে জুন ১৯৩২ তারিখে বাজে শিবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীসুশীলকুমারের সহিত শুভ বিবাহ হয়। ২৫শে চৈত্র শুক্রবার ১৩৪৪ সন্ধ্যা ৬টা ১০ মিনিটের সময় শ্রীমতী শোভা পাঁচ দিবস জ্বরে ভুগিয়া স্বর্গারোহণ করেন।

তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী আভারাণীর ১২ই জুলাই ১৯৩২ তারিখে বাজে শিবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অহিভূষণ দত্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীগৌরীশঙ্করের সহিত শুভ বিবাহ হয়।

চতুর্থা কন্যা শ্রীমতী মীরারাণীর ৩রা শ্রাবণ ১৩৪১ তারিখে বাগবাজার নিবাসী শ্রীযুক্তবাবু কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র ব্রহ্মগোপালের সহিত শুভ বিবাহ হয়। আষাঢ় ১৩৪৪ সনে তাঁহার এক সন্তান হয়।

শচীন্দ্র

শরৎচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র শচীন্দ্র ১লা অক্টোবর ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শচীন্দ্র সিটি ইস্কুল হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বঙ্গবাসী কলেজ হইতে আই, এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি, এস-সি, পরীক্ষা দেন। দুইবার বি, এস-সি, পরীক্ষা দিয়া ভগ্ন মনোরথ হইয়া ২৪শে জুলাই ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্ব-ইচ্ছায় ইহধাম ত্যাগ করেন।

মাখনলাল

শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র মাখনলাল ২৯শে মাঘ মঙ্গলবার ১৩০২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিটি কলেজিয়েট্ ইস্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে আই, এ, ও বি, এ, অধ্যয়ন করেন। বি, এ, ডিগ্রি লইয়া তিনি হাইকোর্টের এটর্ণী হইবার অভিপ্রায়ে প্রিয়নাথ সেন মহাশয়ের নিকট আর্টিকেল ক্লার্ক হন।

মাখন কাঁটাপুকুর সেন বংশের এটর্ণী শ্রীযুক্ত মণিলাল সেন মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী গুণমণিকে বিবাহ করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র মুকুন্দকুমার এবং এক কন্যা শ্রীমতী মল্লিকা। ২৭শে শ্রাবণ ১৩৪৪ বৃহস্পতিবার মল্লিকারাণীর পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র বুদ্ধদেবের সহিত শুভ বিবাহ হয়।

৯ই অগ্রহায়ণ ১৩৪৪ বুধবার মাত্র দশ দিবস নিউমোনিয়া রোগে ভুগিয়া মাখনলাল ইহধাম ত্যাগ করেন।

শরৎচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী প্রমীলাবালা। তাঁহার ২৭শে আশ্বিন রবিবার ১৮৮৬ সনে বহুবাজারের সুবিখ্যাত এটর্ণী গণেশচন্দ্র চন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র অতুলচন্দ্রের সহিত শুভ বিবাহ হয়। অতুলচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম, এ, পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। তিনি বিশেষ বিদ্বান এবং সাহিত্যানুরাগী লোক ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ৯ই ডিসেম্বর ১৮৯১ তারিখে অতুলচন্দ্র দ্বাদশবর্ষীয়া বিধবা নিঃসন্তান পত্নীকে রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন। প্রমীলাবালা নানা ধর্ম-কর্ম লইয়া এবং বদ্রিনারায়ণ, দ্বারকা, পশুপতিনাথ ইত্যাদি তীর্থ দর্শন ও ভ্রমণে কালাতিপাত করিয়া বৈধব্য ক্লেশ ভুলিয়া আছেন।

শরৎচন্দ্রেয় দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সুশীলাবালা। ২৮শে জুন রবিবার ১৮৯১ তারিখে আহিরীটোলা নিবাসী ৺যদুনাথ মিত্র মহাশয়ের একমাত্র সন্তান ভূতনাথের সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। ভূতনাথ একজন সঙ্গীত অনুরাগী, বিদ্বান এবং সৎ চরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি আহিরীটোলা 'সঙ্গীত বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন এবং অনেক বড় বড় সভাসমিতিতে যোগদান করিতেন। তিনি পুরী, দেরাদুন, সিমলা পাহাড় ইত্যাদি স্বাস্থ্যকর স্থানেই শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। ১৬ই জুন ১৯২০ তারিখে তিনি সিমলা পাহাড় হইতে কলিকাতায় ফিরিবার পথে ট্রেনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করেন। নিঃসন্তান

সুশীলাবালা দেব প্রতিষ্ঠা করিয়া নানা ধর্ম-কর্মে শেষ জীবন অতিবাহিত করিতেছেন।

শরৎচন্দ্রের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী নির্মলাবালার ৮ই জুলাই ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে হাটখোলা দত্ত বংশের ৺বিজয়কৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শরৎচন্দ্রের সহিত শুভ বিবাহ হয়। শরৎচন্দ্র ১২৮৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিনয়ী, চরিত্রবান ও ধার্মিক লোক ছিলেন। ১৩১৮ সনে কার্তিক মাসে তাঁহার একমাত্র পুত্র সুকুমার জন্মগ্রহণ করেন। ১৭মে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র একমাত্র পুত্র এবং পতিপ্রাণা সহধর্মিণীকে রাখিয়া পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে মানবলীলা সংবরণ করেন।

শরৎচন্দ্রের চতুর্থা কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা। ৭ই মার্চ ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে শোভাবাজার নিবাসী যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ৪ঠা নবেম্বর ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে অন্নপূর্ণা কয় দিবস জ্বরে ভুগিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন।

অন্নপূর্ণার দুইটিমাত্র পুত্র প্রভাতকুমার এবং তুলসীদাস।

শরৎচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি। ১০ই জুন ১৯১১ বহুবাজার নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ এটর্ণী গণেশচন্দ্র চন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র শরৎচন্দ্রের সহিত শ্রীমতী লক্ষ্মীমণির শুভ বিবাহ হয়। গণেশচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্রের সহিত শ্রীমতী লক্ষ্মীমণির জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর বিবাহ হইয়াছিল।

১৭ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মীমণি অকালে অল্প বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন।

—

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

ক্ষেত্রচন্দ্র বসুমল্লিক

দ্বারিকানাথের কনিষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রচন্দ্র ১৫ই আশ্বিন ১২৭২ সনে শনিবার প্রাতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি হিন্দু ইস্কুলে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া গৃহে পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ভাষা ভালরূপে শিক্ষা করেন। বাল্যকাল হইতে ব্যায়াম ক্রীড়ার এবং শরীর চর্চায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। বড় বড় পালোয়ানকে গৃহে রাখিয়া তিনি কুস্তি বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং অনেক ভারতীয় পালোয়ান তাহার নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পাইত। তাঁহার মহাদেবের ন্যায় দেহাকৃতি, সুন্দর সৌম্য মূর্তি, গোলাকার বলিষ্ঠ দেহ এবং বালকের ন্যায় সরল মনোহর মুখচ্ছবি সকলের মনোমুগ্ধকর ছিল।

ক্ষেত্রচন্দ্র আজীবন একজন পরম নিষ্ঠাবান হিন্দু থাকিয়া হিন্দুদিগের ধর্মকর্মে এবং ধর্মালোচনায় তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ দেখাইয়া গিয়াছিলেন। অনেক বড় বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে তিনি গৃহে রাখিয়া ধর্ম বিষয় আলোচনা করিতে এবং হিন্দু পণ্ডিত সাধু ও সন্ন্যাসীকে সেবা করিতে তিনি ভালবাসিতেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার মন সন্ন্যাস ধর্মে আসক্ত হয়।

ক্ষেত্রচন্দ্রের ছয় বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার পিতা স্বর্গারোহণ করেন এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চারুচন্দ্র ক্ষেত্রচন্দ্রকে পালন করিতে থাকেন। অল্প বয়স হইতে ক্ষেত্রচন্দ্রের সংসার বৈরাগ্যের ভাব দেখিয়া চারুচন্দ্র কনিষ্ঠ সহোদরকে সংসারী করিবার জন্য তাঁহার বিবাহ দিবার অভিলাষ করেন। প্রথমে ক্ষেত্রচন্দ্র দারপরিগ্রহণ করিয়া সংসারী হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু সকলের বিশেষ অনুরোধে তিনি অবশেষে সম্মত হন এবং ১৬ই জুন ১৮৮১ তারিখে ষোল বৎসর বয়ঃক্রমকালে জোড়াবাগান ঘোষ মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী ক্ষীরোদামণির সহিত তাহার শুভ বিবাহ হয়। সেই সময় চারুচন্দ্র একান্নবর্তী পরিবারের কর্তা ছিলেন। তিনি মহাসমারোহ করিয়া কনিষ্ঠ সহোদরের বিবাহ দেন। এই বিবাহ উপলক্ষে ১৪ই জুন মঙ্গলবার ১৮৮১ তারিখে গাত্রহরিদ্রার দিবস রাত্রে তাঁহার ১৮নং রাধানাথ মল্লিক লেনস্থ ভবনে একটি বড় ইভনিং পার্টি ও নাচ হয়। ইহাতে কলিকাতা হাইকোর্টের

অনেক বিচারপতি, ব্যারিষ্টার, উচ্চ রাজকর্মচারী ও অন্যান্য বহু সম্রান্ত ব্যক্তি যোগদান করেন। ঐ নাচের উৎসবে ইংরাজ ধর্মপুরোহিত কলিকাতার পাদ্রী সাহেব মিষ্টার হেরিসন্ উপস্থিত হওয়ায় এলাহাবাদের সুবিখ্যাত পত্রিকা পাইওনিয়ার সংবাদপত্র ২০শে জুন তারিখের কাগজে একটী উপভোগ্য প্রবন্ধ প্রকাশ করেন এবং কলিকাতার ইংলিসম্যান পত্রিকা তাহা পুনঃপ্রকাশ করেন—

"The Calcutta correspondent of the Pioneer has the following anent the Natch party at the house of Sreegopal Mallick and Charu Chander Mallick of College Square :—

"On Tuesday a nautch took place in honour of the marriage of a son of a well to-do Baboo, a ceremony somewhat unusual at this time of year, I believe. This was attended, among other Calcutta worthies by Mr. Harrison—I refer to Mr. "Missionary" Harrison, as distinguished from the secretary of the Saturday Club and by another popular veteran of Calcutta Society, conspicuous for his hale appearance and general manner, no less than for possessing all the youthful energy and sprightliness of a green old age. The 'nautch', to which were invited some two hundred people including a few European ladies was rendered more attractive by the presence in the gallery of the 90th. band, which played continuously. There was an uncommon feature about this entertainment caused by an arrengament which placed the chief guest of the evening in the bridegroom's seat, until the arrival of the that hero of the day, the conspicuous throne set apart for latter being thus occupied during the whole of the performance On the arrival of the bridegroom whose face too plainly portrayed his thoughts on the tremendous step he was taking, the Chief guest was deposed from his throne

and given a lower seat by his side when the differance between the expression on the two countenances was calculated as much to depress as to amuse the spectator.

The good humoured appearance and placid smile of the wedding guest seemed certainly to ask "who would not be blythe" ; which the bridegroom, far from resembling the "five and happo baily" when in a similar position, appeared rather to be undergoing the pleasurable sensations one might expect to be excited by 'sitting' on a scythe."

Pioneer—20 June, 1981.

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ তারিখে ক্ষেত্রচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ সন্তান বীরেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ বৎসরই ৩০শে অক্টোবর তারিখে তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী ক্ষীরোদামণি স্বর্গলোকে চলিয়া যান। সাধ্বী পত্নীর স্বর্গ গমনে ক্ষেত্রচন্দ্রের প্রাণে সংসার বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং তিনি সংসার ত্যাগ করিতে উদ্যোগী হন। সেই সময় সাধু ভোলানন্দ গিরি ক্ষেত্রচন্দ্রের ভবনে বাস করিতেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ক্ষেত্রচন্দ্র একখানি আমমোক্তার-নামায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর চারুচন্দ্রের উপর বিষয়-কর্ম রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া কলিকাতা ত্যাগ করেন। তাঁহার সহিত ভোলানন্দ গিরি এবং বিশ্বস্ত দরবান কানাই সিংহকে তাঁহার অনিচ্ছা সত্বেও সঙ্গে দেওয়া হয়। সেই সময় তাঁহার একটি কাল স্পেনিয়ল কুকুর সঙ্গে থাকিত। তিনি যাত্রা করিবার সময় উক্ত প্রভুভক্ত কুকুরটি কিছুতেই তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিল না। ক্ষেত্রচন্দ্র, ভোলানাথ গিরি এবং কানাই সিংহ দরবান তিনজনে কাশীধামে গিযা উঠিলেন এবং তিনি সন্ন্যাস দীক্ষা লইবার জন্য ব্যস্ত হন। সেই সময় মহাত্মা ভাস্করানন্দ সরস্বতী কাশীধামের দুর্গাবাটীর নিকট তাঁহার আশ্রমে বাস করিতেন এবং ক্ষেত্রচন্দ্র সন্ন্যাস দীক্ষা লইবার জন্য তাঁহার নিকট গিয়া সকাল সন্ধ্যা মন্ত্র দিবার জন্য উপরোধ করিতে লাগিলেন। ভাস্করানন্দ স্বামী ক্ষেত্রচন্দ্রকে তৃতীয় দিবস বলিলেন, "মিথ্যা হো হো করিয়া বেড়াইও না। সংসারে ফিরিয়া যাও।" কিন্তু ক্ষেত্রচন্দ্র কিছুতেই সংসারে ফিরিতে সম্মত না হওয়ায়, স্বামিজী তাঁহাকে বলিলেন, "আচ্ছা উপস্থিত তুমি এত বৎসর ভারতবর্ষের তীর্থসকল ও চার ধাম ভ্রমণ করিয়া এস।" ক্ষেত্রচন্দ্র অনুপবীত ছিল বলিয়া অনেক তীর্থ মন্দিরে

প্রবেশ করিতে দিবে না, এই কারণে স্বামিজী তাঁহাকে উপবীত করিয়া যজ্ঞদণ্ড ধারণ করিতে দিলেন। ক্ষেত্রচন্দ্র দণ্ডী হইয়া তীর্থ ভ্রমণে বাহির হইয়া প্রথমে হরিদ্বার হৃষিকেশ হইয়া বদ্রিনাথ, গেলেন। তাঁহার সহিত স্বামী ভোলানন্দ গিরি এবং কানাই সিংহ দরবান সর্বদা সঙ্গী হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার ভক্ত যে কলে কুকুরটি ছিল, সেটি বদ্রিনাথের পথে বরফের মধ্যে পদচ্যুত হইয়া চিরবিদায় লয়। ক্ষেত্রচন্দ্র ভারতবর্ষের সকল তীর্থ ভ্রমণ করিয়া একবৎসর বাদে কাশীধামে স্বামী ভাস্করানন্দ প্রভুর নিকট ফিরিয়া আসিয়া মন্ত্র লইবার জন্য স্বামিজীকে উপরোধ করিতে লাগিলেন।

স্বামী ভাস্করানন্দ তাঁহার অসীম ক্ষমতা-বলে ক্ষেত্রচন্দ্রকে আশ্রমের গৃহমধ্যে তাঁহার আশ্চর্য ক্ষমতা প্রদর্শন করান। ক্ষেত্রচন্দ্র দেখিলেন ঐ গৃহে মা কালীর মূর্তি আবির্ভাব হইল এবং অল্প সময়ের মধ্যে তাহা অন্তর্হিত হইল এবং গৃহদ্বারে একটী যুবতী স্ত্রলোক একটী শিশুপুত্র ক্রোড়ে লইয়া দণ্ডায়মান। অল্প সময়ের মধ্যে তাহাও সরিয়া গেল। ক্ষেত্রচন্দ্র এই ঘটনা দর্শনে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যান। স্বামী ভাস্করানন্দ তাঁহাকে উপদেশ দেন যে "তোমায় সংসারে ফিরিয়া গৃহস্থ ধর্ম পালন করিতে হইবে। মিথ্যা হৈ হৈ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইও না। সংসারে ফিরিয়া যাও; বিবাহ করিয়া সংসার ধর্ম পালন কর। তোমার বৃদ্ধ মাতা ও আত্মীয়গণ তোমার জন্য মনোকষ্ট পাইতেছে। তুমি গৃহস্থধর্ম পালন করিয়া দীনদরিদ্র সাধুসন্ন্যাসীর সেবা করিয়া জীবন অতিবাহিত কর। তোমার সন্ন্যাসী হইবার যোগ নাই।" সেই সময় স্বামী ভাস্করানন্দ ক্ষেত্রচন্দ্রকে মন্ত্র দীক্ষা দেন এবং তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য করেন। ঐ সময়ে কলিকাতায় তাঁহার বাটীতে ক্ষেত্রচন্দ্রের কাশীধামে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা চারুচন্দ্র কাশীধামে গিয়া স্বামী ভাস্করানন্দ মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া ক্ষেত্রচন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া আসেন।

ক্ষেত্রচন্দ্র কলিকাতায় ফিরিলেই তাঁহার মাতা এবং ভ্রাতা ১০ই মে ১৮৮৯ তারিখে শোভাবাজার রাজবংশের কুমার সুশীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণশৈলবালার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। উক্ত বিবাহের পর ক্ষেত্রচন্দ্র নবপরিণীতা পত্নীকে দেখিয়া আশ্চর্যই হইয়া যান। কাশীধামে ভাস্করানন্দ স্বামীর গৃহে একপুত্র ক্রোড়ে ঠিক এই বালিকা মূর্তি তিনি দেখিয়াছিলেন। তিনি পত্নীকে প্রশ্ন করেন যে কয় মাস পূর্বে তিনি কাশীধামে স্বামীজীর আশ্রমে গিয়াছিলেন কি না। স্ত্রী শৈলবালা বলেন যে কয় বৎসরের

মধ্যে তিনি কখনও কাশীধামে গমন করেন নাই। এই আশ্চর্য ঘটনায় ক্ষেত্রচন্দ্র স্বামী ভাস্করানন্দের ক্ষমতায় মুগ্ধ হন। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে (৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩ ২) তারিখে শ্রীমতী শৈলবালার একমাত্র পুত্র যজ্ঞেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন এবং ঐ বৎসর ২২শে ডিসেম্বর ১৮৯৫ তারিখে সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন।

ক্ষেত্রচন্দ্রের স্বাস্থ্য চিরজীবন বেশ সুন্দর ছিল এবং কোন রোগে তাঁহাকে কখনও আক্রান্ত হইতে দেখা যায় নাই। কেবলমাত্র একবার তাঁহার জীবন সংশয় হয়, কিন্তু দেবতার অপার করুণায় তিনি আশ্চর্যভাবে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হন।

দ্বিতীয়া পত্নীর স্বর্গারোহণের পর ২৬শে এপ্রিল ১৮৯৬ তারিখে ক্ষেত্রচন্দ্র প্রিয়নাথ দত্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী প্রভাবতীকে বিবাহ করেন। উক্ত শুভ বিবাহকর্ম গঙ্গাতীরবর্তী আগরপাড়ার উদ্যানে সম্পন্ন হয়। সেই সময় বিসূচিকার বীজ কোনরূপে তাঁহার শরীরে প্রবেশ করে এবং ফুলশয্যার দিবস হইতে তিনি কলেরা রোগে ভীষণভাবে আক্রান্ত হন এবং ১লা মে তারিখের প্রাতঃ হইতে তাঁহার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গীন হয়। কলিকাতার বড় বড় চিকিৎসকগণ তাঁহার আশা পরিত্যাগ করেন এবং তাঁহার শেষ অবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে ঘরের বাহিরে স্থাপন করিয়া দুর্গানাম শোনান হইতে থাকে। পূর্ব দিবস কাশীধামে তাঁহার গুরু স্বামী ভাস্করানন্দকে আসিবার জন্য তার করা হয়, কিন্তু পরদিবস প্রাতে স্বামীর তার আসে—"কোন ভয় নাই—ক্ষেত্রচন্দ্রের আরোগ্য নিশ্চয় হইবে।" সেই সময় অনেক বড় বড় সাধু সন্ন্যাসীর সহিত ক্ষেত্রচন্দ্রের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। ক্ষেত্রচন্দ্রের বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে শিবপুর নিবাসী স্বামী ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় এক আসনে তিন দিবস বসিয়া অনাহারে তপস্যা করিতে থাকিলেন এবং ক্ষেত্রচন্দ্রের অন্তিমকালে কোন এক সাধুপুরুষ হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া কালীঘাট হইতে শ্রীশ্রী৺কালীমাতার চরণামৃত জল আনিয়া ক্ষেত্রচন্দ্রের মুখে দেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নাড়ী ফিরিয়া আসে এবং ধীরে ধীরে তিনি আরোগ্য হইতে থাকেন। বড় বড় চিকিৎসকগণ এবং অন্যান্য সকলে এই আশ্চর্য ঘটনা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া যান। রোগীর হৃদয় ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। শবশয্যায় রোগী শায়িত ছিল। সাধু মহাপুরুষ-গণের আশীর্বাদে এবং মা কালীর কৃপায় মহাপ্রাণ নবজীবন প্রাপ্ত হন।

কালীঘাটের শ্রীশ্রী৺কালীমাতা পটলডাঙ্গার বসুমল্লিক বংশের এক বিশেষ আরাধ্যা দেবী। এই বংশের সকল ধর্মকর্ম পূজাদিতে বা বিবাহ অন্নপ্রাশন ইত্যাদি সকলরূপ শুভকর্মের অনুষ্ঠানে প্রথমে কালীঘাটের ৺কালীমাতার নিকট পূজা দিয়া প্রসাদ আনান হইয়া থাকে। বহু প্রাচীনকাল হইতে এই বংশের একটি প্রথা আছে যে প্রতি বৎসর শুভ ১লা বৈশাখ তারিখে বৎসরের প্রথম দিবস এই বংশের বৃদ্ধ যুবা বালক সকলে নূতন পঞ্জিকা শ্রবণ করিয়া কালীঘাটে গিয়া শ্রীশ্রী৺কালীমাতাকে দর্শন ও পূজা করিয়া আসেন।

পরম সাধু বিশ্ববিখ্যাত মহাত্মা ভাস্করানন্দ সরস্বতী মহারাজা ক্ষেত্রচন্দ্রকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন এবং কলিকাতায় আসিয়া ক্ষেত্রচন্দ্রের পটলডাঙ্গা ভবনে বাস করিতেন। স্বামী ভাস্করানন্দের অসীম ক্ষমতা ছিল। ক্ষেত্রচন্দ্রের উক্ত সঙ্কট রোগের সময় স্বামীজী কাশীধামে থাকিয়া যোগবলে ক্ষেত্রচন্দ্রের জীবন প্রত্যাবর্তন করিবার ব্যবস্থা করেন।

স্বামী ভাস্করানন্দের অসীম ক্ষমতার বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া সকলে আশ্চর্য হন এবং ক্ষেত্রচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী সৌদামিনী এবং তাঁহার স্বামী পাথুরিয়া-ঘাটার সুবিখ্যাত জমিদার রমানাথ ঘোষ মহাশয় সস্ত্রীক কাশীধামে স্বামীজীর নিকট গমন করেন। রমানাথ ঘোষ মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র গণেশচন্দ্রের কুষ্ঠিতে তাঁহার ষোড়শবর্ষে মৃত্যু যোগ সুস্পষ্ট লেখা ছিল।

রমানাথ ঘোষ মহাশয় স্বামী ভাস্করানন্দকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি তিন পুত্রের বিবাহ দিতে পারেন কিনা। স্বামীজী বলেন যে "বিবাহ দাও।" যে সময় রমানাথ ঘোষ মহাশয় স্বামীজীর সহিত পুত্রের আয়ু সম্বন্ধে কথা কহিতেছেন সেই স্থানে আরো দুইজন বড় বড় জ্যোতিষী উপস্থিত ছিলেন। উক্ত জ্যোতিষীরা কুষ্ঠি পর্যালোচনা করিয়া বলেন "স্বামীজী, এ আপনি কি বলিতেছেন, কুষ্ঠিতে ষোল বৎসর বয়ঃক্রমকালে সুস্পষ্ট মৃত্যুযোগ রহিয়াছে।" স্বামীজী বলিলেন "কুছ ডর নেহি। পুত্রের কোন ভয় নাই।"

রমানাথ ঘোষ মহাশয় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ২৩শে এপ্রিল ১৮৯৮ তারিখে উক্ত পুত্রের বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর বৎসর এক দিবস প্রাতে গড়ের মাঠে অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতে করিতে অশ্ব খেপিয়া গিয়া ছুটিতে থাকে এবং গণেশচন্দ্র অশ্ব হইতে পতিত হইয়া ভীষণভাবে আহত হন এবং ঠিক সেই সময় হইতে স্বামী ভাস্করানন্দ কাশীধামে বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হন এবং তিন দিবস মাত্র ভুগিয়া ৯ই জুলাই ১৮৯৯ তারিখে রাত দুই প্রহরের সময়

কাশীধামে স্বামী ভাস্করানন্দ এবং কলিকাতায় গণেশচন্দ্র এক মুহূর্তে একসঙ্গে ইহধাম ত্যাগ করেন। স্বামীজী বলিয়াছিলেন আমি যত দিবস জীবিত থাকিব তোমার পুত্রের প্রাণের আশঙ্কা নাই। সত্যই তাহা হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত "ভাস্করানন্দ মহারাজের জীবনী"তে উক্ত ঘটনা সকল এবং ক্ষেত্রচন্দ্রের সহিত স্বামীজীর যে সকল পত্রাদি আদান-প্রদান হইয়াছিল তাহা প্রকাশিত ও বর্ণিত হইয়াছে।

স্বামী ভাস্করানন্দ মহারাজার সম্পত্তির ক্ষেত্রচন্দ্র একজন ট্রাষ্টি ছিলেন এবং ক্ষেত্রচন্দ্রের উদ্যোগে কয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে কাশীধামে শ্রীশ্রীভাস্করানন্দ স্বামীজীর মঠ প্রস্তুত হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ ক্ষেত্রচন্দ্রের বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং ভোলানন্দ স্বামী প্রথম জীবনে ক্ষেত্রচন্দ্রের কলিকাতার ভবনে বহুকাল যাপন করিয়াছিলেন এবং তাহার সহিত বহু তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন।

ভক্তবীর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত ক্ষেত্রচন্দ্রের আজীবন বিশেষ সৌহার্দ ছিল।

ধর্মসঙ্গীত এবং কীর্তন গানে ক্ষেত্রচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি তাঁহার বাটীতে কীর্তন গাহিবার জন্য বড় বড় কীর্তনীয়া এবং খোল করতালি বাদককে মাহিনা দিয়া রাখিতেন এবং তাঁহার আলয়ে প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় কীর্তন হইত। তাঁহার বাটীতে বার মাসে তের পর্ব হইত এবং ৺শারদীয়া দুর্গাপূজা এবং শিবরাত্রিতে শিবপূজা প্রতি বৎসর খুব ধুমধামের সহিত করিতেন এবং বহু আতুর দরিদ্র লোক আহারাদি পাইত।

ক্ষেত্রচন্দ্রের চরিত্র অতীব নির্মল ও নিষ্কলঙ্ক ছিল। তামাক সিগারেট বা কোন প্রকার মাদক দ্রব্য জীবনে কখনও স্পর্শ করেন নাই। অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াও তাঁহার মোটেই গর্ব বা দাম্ভিকতা ছিল না। তিনি সর্বদা সর্বত্রই সাদাসিধা গৃহস্থের ন্যায় পরিচ্ছেদ পরিতেন এবং গরীব বড়লোক সকল লোকের সহিত মিষ্ট ভাষায় আলাপ করিতেন। তাঁহার আলয়ে অনেক সাধু সন্ন্যাসী বা আতুর দরিদ্র কখনও অতৃপ্ত হইয়া ফিরিতেন না।

৺কাশীধামে বাসফটকায় বড়রাস্তার উপরে তিনি ত্রিতলা একটি অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া তাহাতে স্বর্ণবর্ণের পিতল নির্মিত মনোমুগ্ধকর মাতৃমূর্তি ৺অন্নপূর্ণা' দুর্গার কলেবর প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। উক্ত প্রতিমা প্রতিষ্ঠার সময় স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী উক্ত শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণাদেবীর বেদীতে প্রথমে বসিয়া

প্রতিষ্ঠাকার্য সুসম্পন্ন করান। ক্ষেত্রচন্দ্র তাঁহার উক্ত অট্টালিকার নাম "শিবালয়" দিয়া দেবোত্তর সম্পত্তি করিয়া দৈনিক পূজাদির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার কাশীধামে তিনখানি মনোরম অট্টালিকা কাশীধামের চকের বড় রাস্তার উপরে শ্রেণীবদ্ধভাবে তাঁহার কীর্তি ও যশগৌরব প্রকাশ করিতেছে। ৺কাশীধামের প্রতি ক্ষেত্রচন্দ্রের অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। প্রতি বৎসর ৺শারদীয়া পূজার পর তিনি সপরিবারে কাশীধামে গিয়া দুই তিন মাস বাস করিতেন। সেই সময় অনেক দীন দরিদ্রকে তিনি শীতবস্ত্র, কম্বল ও কাপড় প্রভৃতি দান করিয়া পশ্চিমের দারুণ শীতে সুখী করিতেন এবং কাশীধামের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বড় বড় সাধু-সন্ন্যাসীকে আহার ও দক্ষিণাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিতেন। কাশীধামের বাসকা-ফটক মহলে মল্লিকদিগের অনেকগুলি বাটী একত্রে থাকায় সেই স্থান মল্লিক মহল্লা নামে কথিত হয়।

ক্ষেত্রচন্দ্রের হৃদয় ক্ষমার আধার ছিল। হাজার দোষ করিয়াও একবার ক্ষেত্রচন্দ্রের নিকট গিয়া দাঁড়াইলে তিনি সব দোষগুণ ভুলিয়া গিয়া তাঁহাকে আবার আপনার করিয়া লইতেন। ৺কাশীধামে একটী "কুষ্ঠাশ্রম" প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষেত্রচন্দ্র বহু টাকা দান করেন। স্বামী দীনানন্দ সেই সময় কাশীধামে একটী কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ যত্নবান হন। ক্ষেত্রচন্দ্র এই সাধুসঙ্কল্পে আত্মনিয়োগ করেন এবং স্বামী দীনানন্দ লিখিত "কুষ্ঠ কথা" নামক হৃদয়-বিদারক একটি পুস্তক ছাপাইয়া প্রকাশ করেন এবং ১৯১২ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে রাজঘাটের রাজার আলয়ের পূর্বদিকে একটী কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ৩০।৩২টী নরনারী কুষ্ঠগ্রস্ত হইয়া উক্ত আশ্রমে আসিয়া আশ্রয় লয়। উক্ত আশ্রম কয় মাস পরিচালিত হইবার পর কোন দুষ্ট লোক স্বামী দীনানন্দকে প্রতারিত করিয়া উক্ত আশ্রমের বহু অর্থাদি লইয়া পলায়ন করে এবং এই প্রতারণায় পড়িয়া স্বামী দীনানন্দকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হয়। দয়ার্দ্র হৃদয় ক্ষেত্রচন্দ্রের মন এত উন্নত এবং ক্ষমার আধার ছিল যে উক্ত স্বামী দীনানন্দকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার পর নিজ আলয়ে আশ্রয় দিয়া আজীবন পালন করেন।

ক্ষেত্রচন্দ্র উদার এবং সরল হৃদয়ের লোক ছিলেন। তাঁহার মিষ্ট কথা যে শুনিত সেই তাঁহাকে ভুলিতে পারিত না। গোবরডাঙ্গার জ্ঞানদাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী, রাজা ৺জগৎকিশোর আচার্যচৌধুরী, সাতক্ষীরার গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ও সতীনাথ রায়চৌধুরী প্রভৃতি ক্ষেত্রচন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত ক্ষেত্রচন্দ্রের বিশেষ সৌহার্দ

ছিল। দেশহিতকর অনেক কার্যে ক্ষেত্রচন্দ্রের বিশেষ সহানুভূতি ছিল। ১৯০৫ সনের বঙ্গভঙ্গ-রদের আন্দোলনের সময় ক্ষেত্রচন্দ্র অনেক সাহায্য করেন। ২৮শে ভাদ্র বুধবার ১৩২১ সনে ক্ষেত্রচন্দ্রের পটলডাঙ্গাস্থ ভবনের সুবৃহৎ উঠানে একটী বিরাট স্বদেশী সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় মান্যবর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, প্রফেসর হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, মনোরঞ্জন গুহ, রমাকান্ত রায় এবং অন্যান্য অনেক দেশপ্রেমিক উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

ক্ষেত্রচন্দ্র প্রথম জীবনে পৈত্রিক ভবনে একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে সপরিবারে বাস করিতেন। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে পৈত্রিক সম্পত্তিসকল ভাগ হইবার পর ২২ নং রাধানাথ মল্লিক লেনস্থ জমির উপর তিনি একটি বড় রাজপ্রাসাদতুল্য ত্রিতলা অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দ হইতে সপরিবারে তথায় গিয়া আজীবন শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করেন। উক্ত ভবনের মধ্যে ক্ষেত্রচন্দ্র নাটমন্দির নির্মাণ করিয়া ঠাকুর দালানে শিবদুর্গা এবং অন্যান্য সুন্দর দেব-দেবীর মূর্তি বড় চিত্রকরকে দিয়া বহু মুদ্রা খরচ করিয়া চিত্রিত করিয়া গিযাছেন। তিনি তাঁহার বৃদ্ধ মাতাকে সর্বদা সঙ্গে রাখিয়া সেবা করেন এবং ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে তাহার বৃদ্ধা মাতাঠাকুরাণী স্বর্গলোকে চলিয়া গেলে তিনি এবং তাঁহার দুই ভ্রাতা চারুচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্রের সহিত মাতার শেষ কার্য বহু মুদ্রা খরচ করিয়া 'দানসাগর' শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন করেন। সকল আত্মীয়স্বজন ও পল্লীবাসীর সহিত ক্ষেত্রচন্দ্রের বিশেষ সদ্ভাব ও ভালবাসা ছিল।

স্বর্গারোহণ

ক্ষেত্রচন্দ্র প্রত্যহ সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া প্রাতঃভ্রমণ করিতেন। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি বাৎসরিক ৺শারদীয়া দুর্গাপূজা যথা-নিয়মে ধূমধামের সহিত নিজগৃহে সুসম্পন্ন করান। বিজয়ার পর একাদশীর দিবস ১৬ই অক্টোবর ১৯১৮ তারিখে প্রাতে তিনি যথারীতি সুস্থ শরীরে ভ্রমণ করিয়া বেলা ৭টার সময় গৃহে ফিরিবার পথে বুকে অল্প বেদনা অনুভব করেন এবং বাটী ফিরিয়াই শুইয়া পড়েন। ইহার পর দুই চারিটি কথা কহিয়াই তাঁহার মহাপ্রাণ চুয়াত্তর বৎসর বয়ঃক্রমকালে স্বর্গলোকে চলিয়া যায়। এক ঘণ্টাও তিনি রোগে যন্ত্রণা পান নাই, কাহারও সেবা লন নাই, কোনরূপ ঔষধপত্রও ব্যবহার করেন

নাই—ইহা যেন ধার্মিক ও সাধুপুরুষের ইচ্ছামৃত্যু। মা দুর্গা যেন পুত্রের হস্ত ধরিয়া অমরলোকে সঙ্গে লইয়া গেলন—কি সুন্দর প্রাণ বিয়োগ!

ক্ষেত্রচন্দ্র সাধ্বী স্ত্রী, আট পুত্র বীরেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, রাজেশ্বর, ভুবনেশ্বর, গোরাচাঁদ, নিতাই এবং নিমাই এবং দুই কন্যা শ্রীমতী পার্বতী এবং শ্রীমতী অন্নপূর্ণাকে রাখিয়া যান।

তাঁহার স্ত্রী প্রভাবতী বেশী দিবস বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করিলেন না। ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯১৯ তারিখে স্বামীর স্বর্গারোহণের এক বৎসরের মধ্যেই তিনি অল্প দিবস জ্বর রোগে ভুগিয়া স্বর্গলোকে স্বামীসকাশে গিয়া মিলিত হন।

বীরেশ্বর

ক্ষেত্রচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরেশ্বর ১লা মার্চ বৃহস্পতিবার ১৮৮৮ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু ইস্কুলে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেন। ২৫শে জানুয়ারী ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে মুখ্য কুলীন বীরেশ্বর ২৮শে পর্যায়ের কুলীন কন্যা সালিখা নিবাসী কুলীন কায়স্থ অতুলকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সরযূবালাকে বিবাহ করেন।

বীরেশ্বর নারায়ণগঞ্জ জার্ডিন স্কিন্ কোম্পানির জুট মিলে কয় বৎসর কোষাধ্যক্ষের কার্য করেন। তিনি সৎচরিত্র ও মহৎ হৃদয়ের লোক ছিলেন।

বীরেশ্বরের এক পুত্র এবং একটি কন্যা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে ৮ই অক্টোবর ১৯১৮ তারিখে তাঁহার স্ত্রী শ্রীমতী সরযূবালা অল্প বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন। সাধ্বী স্ত্রী বিয়োগের পর হইতে বীরেশ্বর পুনরায় দারপরিগ্রহ না করিয়া সাত্ত্বিকভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন। নিরামিষ আহার এবং পূজা-আহ্নিক করিয়া কাশীধামে বাস করিতেন। ১৩৩৬ সনে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন এবং কয় মাস রোগে ভুগিয়া ১৯শে শ্রাবণ ১৩৩৯ বৃহস্পতিবার প্রাতে ইহধাম ত্যাগ করেন।

বীরেশ্বরের একমাত্র পুত্র অমিতাভ।

একমাত্র কন্যা উমারাণী ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ২৮শে অগ্রহায়ণ ১৩৩৫ তারিখে রংপুর নিবাসী টেপার জমিদার রায় যতীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরীর একমাত্র পুত্র শ্রীজিতেন্দ্রমোহনের সহিত তাঁহার শুভ বিবাহ হয়।

শ্রীমতী উমারাণীর দুই কন্যা—গীতারাণী ও মায়া এবং একমাত্র পুত্র যোগেন্দ্র।

যজ্ঞেশ্বর

ক্ষেত্রচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র যজ্ঞেশ্বর ৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০২ সনে জন্মগ্রহণ করেন। স্বামী ভাস্করানন্দ মহারাজের আলয়ে কাশীধামে এই পুত্র জন্মাইবার পূর্বেই তাঁহাকে আশ্চর্যভাবে দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া পুত্রের নাম যজ্ঞেশ্বর রাখেন। যজ্ঞেশ্বর শৈশবে রিপন ইস্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন। তাঁহার মাতামহ শোভা-বাজার রাজবংশের কুমার সুশীলকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের কোন সন্তানাদি না থাকায় তিনি তাঁহার একমাত্র দৌহিত্র যজ্ঞেশ্বরকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিবার অভিলাষ করেন, কিন্তু ক্ষেত্রচন্দ্র তাঁহার বহুপুত্র থাকিলেও এই পুত্রকে দত্তক পুত্র হিসাবে দান করিতে অসম্মত হন। যজ্ঞেশ্বর দত্তক পুত্র না হইয়াও মাতামহের উইল অনুসারে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব নামমাত্র গ্রহণ করিয়া মাতামহের অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া শোভাবাজারের রাজবাটীতে মাতামহের গৃহে বাস করিতেছেন।

২০শে জুন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ঝামাপুকুর নিবাসী প্রসিদ্ধ উকিল ৺রামচন্দ্র মিত্রের পুত্র নরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী সুধারাণীকে বিবাহ করেন। যজ্ঞেশ্বরের দুই পুত্র—হীরণকৃষ্ণ এবং কমলকৃষ্ণ এবং দুই কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণ অরুণা ও শ্রীমতী কৃষ্ণ আরতি। জ্যেষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণ অরুণার সহিত ২২শে শ্রাবণ ১৩৫৪ রবিবার দিবস ভবানীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষিতীশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সুধীরকুমারের শুভ বিবাহ হয়।

সিদ্ধেশ্বর

ক্ষেত্রচন্দ্রের তৃতীয় পুত্র সিদ্ধেশ্বর। তিনি শৈশবে হিন্দু ইস্কুলে অধ্যয়ন করেন। ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে আই, এ, এবং বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া 'ল' কলেজে আইন পাঠ করিতে থাকেন।

বাল্যকাল হইতে সিদ্ধেশ্বর বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও সর্বগুণসম্পন্ন লোক ছিলেন এবং সকলের সহিত মিশিতেন এবং পল্লীর সভাসমিতিতে যোগদান করিতেন। সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। নিজ পল্লীতে বালকগণকে লইয়া "ইউরেনিয়া ক্লাব", "জগজ্জ্যোতি পাঠাগার", "ভক্ত সম্মিলনী" ইত্যাদি কয়েকটী সাধারণ জনহিতকর সভাসমিতি স্থাপন করেন এবং নিজে সম্পাদক ও কর্মী হইয়া কার্য করেন। কিন্তু এরূপ চরিত্রবান যুবা বেশী দিবস জগতে

থাকিলেন না। তিনি ২৪শে জুন ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে কলেজ স্কোয়ারস্থ দে বংশের কন্যা শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করেন। এরূপ একটি শিক্ষিত যুবক নিঃসন্তান স্ত্রীকে রাখিয়া ৮ই মে ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে কয় মাস জ্বরে ভুগিয়া স্বর্গলোকে চলিয়া গেলেন।

রাজ্যেশ্বর

ক্ষেত্রচন্দ্রের চতুর্থ পুত্র রাজ্যেশ্বর ২০শে জানুয়ারী ১৮৯৯ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু ইস্কুল হইতে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া দেশীয় ন্যাশানেল টেকনিকেল ইনিষ্টিটিউসনে শিল্পশিক্ষা করেন। তিনি চরিত্রবান মিষ্টভাষী ও দেব-দ্বিজভক্তিপরায়ণ লোক। নিরামিষ আহার করেন এবং পূজাদি ধর্মেকর্মে তাঁহার বিশেষ আসক্তি। তিনি দ্বারকা, বদ্রিনারায়ণ ইত্যাদি অনেক তীর্থ অল্প বয়সেই ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন। দেশহিতকর অনেক সভাসমিতিতে তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি আছে।

৩০শে এপ্রিল ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে মজিলপুর নিবাসী বিরাজকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী নলিনীবালাকে শুভ বিবাহ করেন। রাজ্যেশ্বরের চার পুত্র জগদীশ, অজিৎ, নবকুমার এবং সুকুমার এবং দুই কন্যা শ্রীমতী উমারাণী ও শ্রীমতী রমারাণী।

ভুবনেশ্বর

ক্ষেত্রচন্দ্রের পঞ্চম পুত্র ভুবনেশ্বর ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু ইস্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন। তিনি চরিত্রবান ও বুদ্ধিমান লোক। কীর্তন সঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ আসক্তি ছিল। শ্রীযুক্ত নবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী মহাশয়ের নিকট হইতে তিনি কীর্তন গান এবং খোল বাজাইতে শিক্ষা করিয়াছেন। রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব আছে। ১লা মে ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে হাটখোলা দত্ত বংশের গোকুলচাঁদ দত্ত মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সুষমাকে তিনি শুভ বিবাহ করেন।

তাঁহার দুই কন্যা শ্রীমতী আরতি এবং শ্রীমতী হাসিরাণী।

গোরাচাঁদ

ক্ষেত্রচন্দ্রের ষষ্ঠ পুত্র গোরাচাঁদ ২রা মাঘ ১৩১৮ সনে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে হিন্দু ইস্কুলে অধ্যয়ন করিয়া তিনি মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং কার্যশিক্ষা

করেন। ২৭শে অগ্রহায়ণ ১৩৪০ তারিখে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল সিংহ মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী শেফালীকে শুভ বিবাহ করেন।

তাঁহার এক পুত্র প্রণবকুমার ও তিন কন্যা রেবা, সবিতা ও তৃপ্তি।

নিতাইচাঁদ

ক্ষেত্রচন্দ্রের সপ্তমপুত্র নিতাইচাঁদ ১৯শে ফাল্গুন ১৩২০ সনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু ইস্কুল হইতে বিদ্যা শিক্ষালাভ করেন। বাল্যকাল হইতে নিতাইচাঁদ নিরামিষভোজী এবং ভক্তিপরায়ণ বালক ছিলেন। বিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অতি অল্প বয়সে তিনি কাশী নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয়ের সহিত হরিদ্বার বৃন্দাবন ইত্যাদি তীর্থ সকল ভ্রমণ করিয়া ১৩৪১ সালে আলমোড়া শহর হইতে বাহির হইয়া পদব্রজে হিমালয় পর্ব্বতের উপর দিয়া ভ্রমণ করিয়া আসেন। মাত্র আঠার বৎসর বয়ঃক্রম হইতে সাধু সন্ন্যাসীদিগের ন্যায় কঠোর সংযম ব্রত গ্রহণ করিয়া এইরূপ দুর্গম তীর্থ সকলে ভ্রমণ করিতে অন্য কোন হিন্দু সন্তানের বিষয় শুনা যায় নাই। অসীম তাঁহার কর্ম সহিষ্ণুতা এবং কঠোর তাঁহার সহ্যগুণ।

১৩ই আষাঢ় ১৩৪৬ তারিখে শাঁখারীটোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ সরকার মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী ক্যামেলিয়ার সহিত নিতাইচাঁদের শুভ বিবাহ হয়।

নিমাইচাঁদ

ক্ষেত্রচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান নিমাইচাঁদ ২৬শে অগ্রহায়ণ রবিবার ১৩২২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু ইস্কুল হইতে বিদ্যালাভ করেন। ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৭ তারিখে নিমাইচাঁদ মনোহরপুকুর রোড নিবাসী শ্রীযুক্ত করুণারঞ্জন দত্ত মহাশয়ের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী ছায়ারাণীকে শুভ বিবাহ করেন। তাঁহার একটি মাত্র কন্যা।

শ্রীমতী বিমলাসুন্দরী

ক্ষেত্রচন্দ্রের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী বিমলাসুন্দরীর ১৩ই আষাঢ় ১৩১৭ তারিখে বহুবাজার নিবাসী অক্ষয়কুমার মিত্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান সুধাংশুশেখরের সহিত শুভ বিবাহ হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে বিবাহের পর বৎসর ৯ই মে ১৯১১ তারিখে বিমলাসুন্দরী ইহধাম ত্যাগ করেন।

শ্রীমতী পার্বতী

ক্ষেত্রচন্দ্রের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী পার্বতী। তাঁহার ১৯শে মে ১৩১৮ তারিখে হাইকোর্টের এটর্ণী শ্রীযুক্ত তারকনাথ মিত্রের সহিত শুভ বিবাহ হয়। শ্রীতারকনাথ সুবিখ্যাত কবি দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের বংশধর ছোট আদালতের জজ। ৺বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তারকনাথ এটর্ণীশিপ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং উপস্থিত কলিকাতা কর্পোরেশনের প্রধান ল' অফিসার বা সলিসিটার। তারকনাথ মিষ্টভাষী, বিদ্বান ও অমায়িক ভদ্রলোক। তাঁহার চরিত্র অতীব মহৎ ও দেবতুল্য প্রকৃতির।

শ্রীমতী পার্বতীর পাঁচ পুত্র—তাপসচন্দ্র, মানসচন্দ্র, বাসবচন্দ্র, রাজসচন্দ্র এবং পানু এবং তিন কন্যা—শ্রীমতী শোভারাণী, শ্রীমতী তৃপ্তিরাণী এবং শ্রীমতী দীপ্তিরাণী।

দুর্ভাগ্যক্রমে ৮ই আষাঢ় শুক্রবার ১৩৪৬ তারিখে পার্বতীর স্বামী পুত্রকন্যাকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহধাম ত্যাগ করেন।

শ্রীমতী অন্নপূর্ণা

ক্ষেত্রচন্দ্রের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯০৯ তারিখে কাশীধামে জন্মগ্রহণ করেন। ৩০শে এপ্রিল ১৯২০ তারিখে মজিলপুর দত্ত বংশের জমিদার শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র দত্তের সহিত তাঁহার শুভ বিবাহ হয়।

শ্রীমতী অন্নপূর্ণার গোবিন্দদাস এবং শিবদাস দুই পুত্র।

—

ষোড়শ অধ্যায়

দীননাথ বসুমল্লিক

রাধানাথ বসু মল্লিক মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র ২৩শে পর্যায়ে দীননাথ। তিনি প্রথমে হিন্দু ইস্কুলে পরে হিন্দু কলেজে ইংরাজী ও বাঙলা ভাষা ভালরূপ শিক্ষা করেন। তিনি বাঙলা ও ইংরাজী ভাষায় সুন্দরভাবে কথা কহিতে ও লিখিতে পারিতেন। বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি পৈত্রিক সম্পত্তি তত্ত্বাবধান করিতে থাকেন এবং কয়েকটি ব্যবসায়েও মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম জীবনে কয়বৎসর পিনরস কোম্পানি নামক এক ইংরাজী অফিসে বেনিয়নের কার্য করেন এবং আরও কয়েকটি অফিসের বেনিয়ন বা মুচ্ছুদ্দির কার্য করিয়াছিলেন।

দীননাথ বিশেষ সৌখিন লোক ছিলেন। তাঁহার ঘোড়াগাড়ীর বিশেষ সখ ছিল। ভাল ভাল ওয়েলার ঘোড়া ও মূল্যবান অনেক গাড়ী তিনি খরিদ করেন এবং নিজে উত্তমরূপে অশ্বারোহণ করিতে পারিতেন। সম্ভ্রান্ত সমাজের সকল লোকের সহিত তাঁহার খুব মেলামেশা ছিল এবং সমাজে তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল।

দীননাথ প্রথম জীবনে ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পু গণের সহিত পটলডাঙ্গাস্থ পৈত্রিক ভবনে একান্নবর্তী পরিবারে বাস করেন। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে যৌথ সম্পত্তি বিভাগ হইয়া গেলে তিনি পার্শীবাগানে তৎকালীন ৯২নং নর্থদারণ সারকুলার রোডস্থ জমির উপর একটি বড় উদ্যান সংযুক্ত প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় গিয়া বাস করেন। দীননাথ তাঁহার উক্ত বাটী বহুমূল্যের আসবাবপত্র দ্বারা খুব পরিপাটীরূপে সজ্জিত করেন। ইটালি হইতে বহু টাকা ব্যয় করিয়া অনেকগুলি মার্বেল পাথরের প্রসিদ্ধ শিল্পীদিগের নির্মিত মূর্তি আনাইয়া গৃহ সজ্জিত করেন এবং ইংলণ্ডের গ্লাসগো হইতে নিজ রুচিমত লৌহনির্মিত বারান্দা ও দরদালানের কারুকার্য বিশিষ্ট ফ্রেম সকল প্রস্তুত করাইয়া আনাইয়া ঠাকুরবাড়ীর চতুর্দিকে এবং বাগানের দক্ষিণ দিকে বসাইয়া এক অভিনব প্রণালীতে পূজার দালান ও বারান্দা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন; যাহা কলিকাতায় কোন সম্ভ্রান্ত লোকের

বাটীতে সে সময় দেখা যাইত না। গৃহের উত্তর দিকের জমিতে বহু মূল্যবান ফল-ফুলের গাছ দিয়া একটি বড় সুন্দর উদ্যান প্রস্তুত করেন। সেই সময়ে দীননাথের পার্শীবাগানস্থ বাটী কলিকাতার মধ্যে একখানি প্রসিদ্ধ বাটী ছিল এবং বহু সম্ভ্রান্ত লোক উক্ত ভবন দেখিয়া যাইতেন। উপস্থিত উক্ত বাগান বাটীতে টি, পালিত মহাশয়ের অর্থে বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

দীননাথের বাটীর সন্নিকটে মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বাস করিতেন এবং দীননাথের সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। রাধানাথ বসুমল্লিক মহাশয়ের স্বর্গারোহণের তেইশ বৎসর পরে তাঁহার চারি পুত্রগণের মধ্য, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে, পৈত্রিক সকল সম্পত্তি অংশীদারগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিবার জন্য মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা কৃষ্ণদাস লাহা এবং রায় বাহাদুর কৃষ্ণদাস পাল এই চারিজন সালিসী নিযুক্ত হন এবং তাঁহার যৌথ সম্পত্তি আপোষে বণ্টন করিয়াছেন এবং চারিজন অংশীদার প্রত্যেকে বহু লক্ষ টাকা মূল্যের জমিদারী, কলিকাতার বাটী এবং কোম্পানির কাগজ প্রভৃতি প্রাপ্ত হন।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত গ্রন্থে এই ঘটনার উল্লেখ আছে—

"একবার বিদ্যাসাগরের সাংঘাতিক কারবাঙ্কল হয়। যখন সেই সুকঠিন পীড়ার সূত্রপাত হয়, যখন তিনি কলিকাতায় সেটী কাটাইবার জন্য আসেন। এই সময় পার্শীবাগান নিবাসী মল্লিক মহাশয়ের বৈষয়িক একটী শালিসীর ভার তাঁহার উপর পড়ে। তিনি বসিয়া দীননাথ মল্লিক মহাশয়ের সহিত শালিসী বিষয়ক কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন আর ডাক্তার চন্দ্রমোহন ঘোষ একাকী সেই কারবঙ্কল পটলচেরা করিয়া তাহার পুঁজ রক্ত বাহির করিয়া বাঁধিয়া দিয়া বসিয়া আছেন। দীননাথ মল্লিক মহাশয় বলিলেন, 'তবে ডাক্তার বাবুর কাজটা হয়ে যাক না? আর বিলম্ব কেন?' তখন উপস্থিত ব্যক্তিগণ জানিতে পারিলেন যেটা হয়ে ছিল সেটা কারবঙ্কল আর তাহা এই কথাবার্ত্তার মধ্যেই অস্ত্র করাও হইয়াছে। শালিসীর মীমাংসা করিতে করিতে, একটী কারাবাঙ্কলের অস্ত্র চিকিৎসা হইয়া গেল; নিকটস্থ কেহ জানিতেও পারিলেন না; সামান্য নড়াচড়া কি উঃ আঃ কিছুই না। এই দৃঢ়তা ও কোমলতা মিশ্রণই তাঁহার জীবনব্যাপী উচ্চতার উপাদান; উপকরণ ও গঠনের কার্য করিয়াছে। ইহাতেই সে জীবনের সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ।"

দীননাথ পারলৌকিক তত্ত্ব বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। ইউরোপে ও আমেরিকার অন্যতম প্রসিদ্ধ পারলৌকিক তত্ত্ব বিষয়ে মিডিয়ম এগলিণ্ট সাহেব ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া যে কয়েকটি প্রকাশ্য স্থানে তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করেন, তন্মধ্যে দীননাথ মল্লিক মহাশয়ের পার্শী-বাগানস্থ বাটীতে গিয়া অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহোদয়গণের সম্মুখে তিনি সে সকল অদ্ভুত ব্যাপার দেখাইয়াছিলেন তাহার বিশদ বিবরণ তৎকালীন 'ইণ্ডিয়ান মিরার' ও সাইকিক্ নোটিস নামক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ ভক্তিভূষণ মহাশয়ের "পরলোকের কথা" গ্রন্থে ঐ বিষয়ের সবিশেষ উল্লেখ দেখা যায়।

দীননাথ স্বল্পভাষী এবং গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার চরিত্র নির্মল ও নিষ্কলঙ্ক ছিল। সকল কার্যেই তিনি নিয়মিতভাবে ইংরাজী আদব-কায়দায় সময় নির্দেশ মত পালন করিতেন।

শেষ জীবনে তাঁহার খুব আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছিল। তিনি কাশীপুর নিবাসী ৺মহিমচন্দ্র চক্রবর্তী তান্ত্রিক সাধক মহাশয়ের বিশেষ শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এমন কি যোগাভ্যাস করিতেও আরম্ভ করেন। যখন তিনি এইরূপ সাধনায় রত থাকিতেন তখন তাঁহার দুই পুত্র নগেন্দ্র ও যোগেন্দ্র দুইদিকে বসিয়া অনবরত চন্দ্রমুখী শঙ্খধ্বনি করিতে থাকিত। তিনি নিত্য সন্ধ্যাকালে পৌত্রপৌত্রী পরিবেষ্টিত হইয়া দেবাদি স্তব ও গান করিয়া বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিতেন।

দীননাথ হাটখোলা দত্ত বংশের বৈদ্যনাথ দত্ত মহাশয়ের ভগ্নীকে বিবাহ করেন।

১৬ই মে ১৮৯০ তারিখে শুক্রবার তারিখে ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ রাত্র ১০ ঘটিকার সময় হঠাৎ তাঁহার হৃদয় যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তিনি তাঁহার পার্শীবাগানস্থ ভবনে ইহধাম ত্যাগ করেন।

দীননাথের স্বর্গারোহণের পরই The Reis and Rayat 'রিস ও রয়েৎ' নামক তৎকালীন ইংরাজী পত্রিকায় দীননাথ ও তাঁহার দুই পুত্রের নামে মিথ্যা কলঙ্কসূচক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। দীননাথের দুই পুত্রে নগেন্দ্র এবং যোগেন্দ্র উক্ত পত্রিকার সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে একটা ফৌজদারী মামলা দায়ের করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ফৌজদারী সেসন কোর্টে বিচারপতি উইলসন সাহেব ১৮ই জুলাই ১৮৯০ তারিখে উক্ত ডিফামেশন বা

অপবাদের খেসারদের মামলার বিচার করেন। দীননাথের পুত্রদ্বয়ের পক্ষে হাইকোর্টের দুইজন সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার উড্রফ্ ও গর্থ সাহেব এবং প্রতিবাদীর পক্ষে ব্যারিষ্টার ব্যানার্জী, হেণ্ডারসন এবং আব্বার রহমান মোকদ্দমার তদ্বির করেন। বিবাদী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় উক্ত প্রবন্ধ লেখা ও প্রকাশের জন্য বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করেন। বাদীগণ মার্জনা গ্রহণ করেন কিন্তু বিচারপতি মহাশয় অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া বিবাদীর পাঁচশত টাকা জরিমানা করেন।

দীননাথের দুই পুত্র নগেন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রনাথ এবং এক কন্যা শ্রীমতী কাদম্বরী।

নগেন্দ্রনাথ বসুমল্লিক

দীননাথ বসুমল্লিক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ২০শে পর্যায়ে নগেন্দ্রনাথ।

তিনি হিন্দু ইস্কুল হইতে ও গৃহশিক্ষকের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। বাংলা ও ইংরাজী ভালরূপ অধ্যয়ন করেন এবং ইংরাজী ভাষায় সুন্দরভাবে লিখিতে ও কথা কহিতে পারিতেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি সকলের সহিত মিশিতে ভালবাসিতেন। 'ভারত সঙ্গীত সমাজের' তিনি একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন এবং অন্যান্য অনেক বড় বড় সভাসমিতিতে তিনি যোগদান করিতেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ও দেহকান্তি বেশ সুন্দর ছিল এবং শরীরও বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ ছিল। অশ্বারোহণ করিতে তিনি খুব ভালবাসিতেন এবং প্রত্যহ প্রাতে অশ্বারোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেন।

২০শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭১ তারিখে নগেন্দ্রনাথ শ্যামবাজার নিবাসী কুলীন কায়স্থ হরপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী বসন্তবালাকে কুলকর্ম করিয়া বিবাহ করেন।

নগেন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে পার্শীবাগানের পৈতৃক ভবনে বাস করিতেন। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে নগেন্দ্র এবং যোগেন্দ্র দুই ভ্রাতায় আপোষে পৈতৃক সকল সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লন। উক্ত পার্শীবাগানের অট্টালিকা জোড়াসাঁকো নিবাসী কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয়কে ১,৭৫,০০০ টাকা মুদ্রায় বিক্রয় করেন। ১৩ই জুলাই ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দ হইতে নগেন্দ্র সপরিবারে ৩৫নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারস্থ ভবনে গিয়া বাস করিতে থাকেন। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে মৌলালি দরগার পার্শ্বে ১৫৫নং সারকুলার রোডের উপর মার্টিন কোম্পানীকে দিয়া প্রায় দুই লক্ষ মুদ্রা

ব্যয়ে একটী সুবৃহৎ উদ্যানসংযুক্ত অট্টালিকা নির্মাণ করান এবং উক্ত ভবনের নাম "মিনার" দিয়া তথায় বাস করেন। উক্ত মিনার ভবন হইতে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মনোজেন্দ্রের বিবাহে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বিশেষ সমারোহের সহিত দেন।

১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে উক্ত মিনার ভবন পরিত্যাগ করিয়া ৯১নং এলিয়াট রোডস্থ ভবনে আসিয়া বাস করেন। সেই সময় হইতে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইতে থাকে।

নগেন্দ্রনাথ শৈশব হইতে অত্যন্ত সাহেবী মেজাজের লোক ছিলেন। বাহির হইতে সকলে মনে করিত যে তিনি অত্যন্ত ইংরাজী ভাবাপন্ন, কিন্তু তিনি যে আন্তরিক হিন্দু দেবদেবী ভক্ত এবং হিন্দুর আচার ব্যবহারে আস্থাবান সে বিষয় বাহির হইতে কেহ জানিত না। রোগশয্যায় শায়িত হইয়া, তিনি সর্বদা ধর্মকথা, দেবদেবীর নাম এবং গীতাপাঠ শুনিতে ভালবাসিতেন। প্রায় তিন মাস তিনি রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন। সেই সময় প্রত্যহ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আসিয়া তাঁহার নিকট ভাগবতাদি ধর্মপুস্তক পাঠ করিত। ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১৯২১ তারিখ হইতে তাঁহার অবস্থা বড়ই সঙ্কটাপন্ন হয় এবং তিনি অনবরত তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইয়া যাইবার জন্য বলিতে থাকেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার শেষ অবস্থা আসিয়াছে এবং প্রকৃত নিষ্ঠাবান হিন্দুর পুণ্যতোয়া গঙ্গাতটে প্রাণত্যাগ করা অপেক্ষা পুণ্য কার্য নাই। তিনি ভাগীরথীতটে যাইবার জন্য এত অনুনয় বিনয় করিয়া অভিলাষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে তাঁহার স্ত্রী পুত্র আত্মীয়স্বজন অনেক বুঝাইয়াও সেই নিষ্ঠাবান ভক্তকে গৃহমধ্যে আটক রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার একান্ত ইচ্ছায়, তাঁহার আত্মীয়স্বজনেরা অনিচ্ছা স্বত্বেও, তাঁহাকে বহন করিয়া আহেরিটোলার নিকট গঙ্গার তটে লইয়া গেলেন। তাঁহাকে যখন কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট দিয়া কালীতলার ৺কালীমাতার মন্দিরের সম্মুখ দিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে সেই সময় তিনি তাঁহাকে মা কালীকে দর্শন করিতে লাগিলেন। ৺কালীমাতার সম্মুখে রাখা হইলে তিনি ক্ষীণ হস্তদ্বয় তুলিয়া দেবীকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার খাটের পার্শ্বে তাঁহার ভ্রাতা ক্ষেত্রচন্দ্র যাইতেছিলেন, তিনি তাঁহাকে যুক্ত হস্ত দেখাইয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন—"ক্ষেত্র-প্রণাম"-ইঙ্গিতে বুঝা গেল যে তিনি সকলকে মা কালীকে প্রণাম করিতে বলিতেছেন।

গঙ্গার ধারে পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর সলীলে পাদদেশ রাখিয়া, তিন দিবস

তিনি কেবল ৺হরিনাম শুনিতে লাগিলেন। তিন দিবস হিন্দু দেবদেবীর নাম অফুরন্ত ভাবে শ্রবণ করিয়া ১৩ই ফাল্গুন সোমবার ১৩২৩ ইং ২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সোমবার বেলা ১২টার সময়, মহাপ্রাণ স্বর্গলোকে চলিয়া গেলেন।

সারা জীবন ইংরাজী পোষাক পরিচ্ছদ ও ইংরাজী আচার ব্যবহারে স্বভাব সিদ্ধ হইয়া এবং অতুলঐশ্বর্য্যে সারাজীবন নানারূপ ভোগ বিলাসে দিন যাপন করিয়া নগেন্দ্রনাথ শেষ জীবনে হিন্দু সাধু সন্ন্যাসীর ন্যায় সর্বত্যাগী হইয়া যে কীর্তি দেখাইয়া গেলেন তাহার তুলনা হয় না।

সত্যেন্দ্রনাথ

নগেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র ২৮শে পর্য্যায়ে সত্যেন্দ্রনাথ।

৯ই মে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বুধবার দিবস কুলীন কায়স্থ বিনোদবিহারী ঘোষ মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী আভারাণীকে বিবাহ করেন।

সত্যেন্দ্রনাথের তিন পুত্র নীরোজেন্দ্র, সমরেন্দ্র এবং মানবেন্দ্র এবং দুই কন্যা শ্রীমতী রত্নামালা এবং শ্রীমতী বনমালা।

৮ই আষাঢ় ১৩৩৮ সনে মঙ্গলবার দিবস সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার মধ্যম ভগ্নীর ৬৫নং বিডন ষ্ট্রী ভবনে দুই মাসকাল রোগ ভোগ করিয়া বৃদ্ধ মাতা, সাধ্বী স্ত্রী এবং নাবালক পুত্র কন্যাগণকে অকুল সমুদ্রে ভাসাইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন।

সত্যেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী রত্নামালার ঝামাপুকুর নিবাসী, ডাক্তার সন্তোষকুমার দেবের সহিত শুভ বিবাহ হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী বনমালার ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫ সোমবার দিবস শ্রীভূপেন্দ্রনাথ ঘোষ রায় চৌধুরীর পুত্র শ্রীমান ডাক্তার আর্য্য কুমার রায় চৌধুরীর সহিত শুভ বিবাহ হয়।

মনোজেন্দ্র

নগেন্দ্রনাথের মধ্যম পুত্র মনোজেন্দ্র বাল্যে সেণ্টজেভিয়ার ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে শিক্ষা লাভ করিয়া পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইংলণ্ডে গিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং তথা হইতে বি. এ. ডিগ্রি লইয়া পরে ব্যারিষ্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী কার্যে যোগদান করেন। কয় বৎসর তিনি মালয় দ্বীপে ফেডারেট মালয় ষ্টেটে কুয়ালামপুর নামক নগরের কোর্টে ব্যবহারজীবির

এবং অন্য ব্যবসা করিয়াছিলেন। উপস্থিত তিনি হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারের কার্য করিতেছেন।

৩০শে জুলাই ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে হাটখোলা দত্ত বংশের শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের পৌত্রী শ্রীমতী শোভাপ্রভাকে বিবাহ করেন।

মনোজেন্দ্রনাথের দুটি কন্যা শ্রীমতী কমলমালা এবং খুকী।

নগেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র অরবিন্দ।

শ্রীমতী ইন্দুমতী

নগেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ইন্দুবালা। জোড়াসাঁকো নিবাসী ঘোষ বংশের অমরেন্দ্রনাথ ঘোষের সহিত বিবাহ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অমরেন্দ্রনাথ অল্পবয়সে নিঃসন্তান স্ত্রীকে রাখিয়া বিবাহের দুই বৎসরের মধ্যে ইহধাম ত্যাগ করেন।

শ্রীমতী চন্দ্রপ্রভা

নগেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী চন্দ্রপ্রভা। ২রা জুলাই ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বিডন ষ্ট্রীট নিবাসী ত্রিপদনাথ দেবের সহিত বিবাহ হয়। ত্রিপদনাথ বাঙলার শেষ গোষ্ঠীপতি এবং কায়স্থদিগের সমীকরণকারক বিডন ষ্ট্রীট নিবাসী অনাথনাথ দেব মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

ত্রিপদনাথের পাঁচ পুত্র নীরোজেন্দ্র, সরোজেন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্র, শিখরেন্দ্র এবং অলোকেন্দ্র এবং দুই কন্যা শ্রীমতী শেফালিকা এবং অরুণা।

ত্রিপদনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান নীরোজেন্দ্রের ৩০শে শ্রাবণ ১৩২১ তারিখে রায়বাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী নির্মল-হাসিনীর সহিত শুভ বিবাহ হয়।

শ্রীমতী সুধাংশুপ্রভা

নগেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুধাংশুপ্রভা। ৪ঠা জুন ১৮৯৩ তারিখে সুধাংশুপ্রভার মজিলপুর নিবাসী অম্বিকাচরণ দে মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথের সহিত বিবাহ হয়। নরেন্দ্রনাথ বহু বৎসর ইংলণ্ডে থাকিয়া বিদ্যার্জন করেন।

শ্রীমতী সুধাংশুপ্রভার একমাত্র পুত্র শ্রীমান কুমার হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার এবং একটি কন্যা শ্রীমতী গীতা।

শ্রীমান কুমারের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ তারিখে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দত্তের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী গোপার সহিত শুভ বিবাহ হয়।

যোগেন্দ্রনাথ বসুমল্লিক

দীননাথ বসুমল্লিকের কনিষ্ঠ পুত্র যোগেন্দ্রনাথ।

যোগেন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে পার্শীবাগানস্থ পৈতৃক ভবনে অতিবাহিত করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথের সহিত আপোষে পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইয়া তিনি দর্জিপাড়ায় ১৬নং হরি ঘোষ ষ্ট্রীটস্থ ভবনে শেষ-জীবন অতিবাহিত করেন।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং মহৎ চরিত্রের লোক ছিলেন। হিন্দুধর্মে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল এবং হিন্দু ধর্ম-গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতে ভালবাসিতেন। তিনি গৃহপণ্ডিত রাখিয়া ভালভাবে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং কাদম্বরী, ভট্টিকাব্য, কুমারসম্ভব প্রভৃতি সংস্কৃত কাব্য সকল তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল।

৮ই মার্চ সোমবার ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে যোগেন্দ্রনাথ শোভাবাজার রাজবংশের স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের কন্যা রাজকুমারী কৃষ্ণসরোজিনীকে বিবাহ করেন।

২০শে অক্টোবর ১৯০২ তারিখে প্রয়াগে ১১নং এ্যাগমন্টন্ রোডস্থ ভবনে যোগেন্দ্রনাথ কয়েক দিবস মাত্র রোগে ভুগিয়া পুণ্য তীর্থে স্বর্গারোহণ করেন।

যোগেন্দ্রনাথের স্ত্রী রাজকুমারী কৃষ্ণসরোজিনী ৮ই এপ্রিল ১৯২৭ তারিখে ইহধাম ত্যাগ করেন।

যোগেন্দ্রনাথের এক পুত্র গুণেন্দ্রনাথ এবং দুইটি কন্যা শ্রীমতী বিনয়নী এবং শ্রীমতী সুহাসিনী।

গুণেন্দ্রনাথ

গুণেন্দ্রনাথ ২৮শে পর্যায়ের মুখ্যকুলীন ৭ই আগষ্ট ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালে হিন্দু ইস্কুলে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে আই, এ, অধ্যয়ন করেন।

৮ই জুলাই ১৮৯৬ তারিখে গুণেন্দ্রনাথ কুল মর্যাদা রক্ষা করিয়া বৈদ্যবাটীর

কুলীন মিত্র বংশের ৺শম্ভুচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ৺মহিমচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী ভানুমতীকে শুভ বিবাহ করেন। গুণেন্দ্রনাথ মিষ্টভাষী, বিদ্বান এবং নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের লোক। তিনি উপস্থিত শ্রীরামপুরে ভাগীরথীর নিকটে বাস করিতেছেন।

গুণেন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র বারীন্দ্রনাথ এবং এক কন্যা শ্রীমতী কমলমালা।

বারীন্দ্রনাথ ২৯ পর্যায়ের মুখ্যকুলীন ; ২০শে শ্রাবণ সোমাবার ১৩১৩ সনে জন্মগ্রহণ করেন। বারীন্দ্রনাথ হিন্দু ইস্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে বি, এ, অধ্যয়ন করেন।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১৩৩৮ সনে শ্রীরামপুর ভবন হইতে বারীন্দ্রনাথ কুলকর্ম করিয়া চন্দননগর নিবাসী কুলীন কায়স্থ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী নন্দরাণীকে বিবাহ করেন।

বারীন্দ্রনাথের একমাত্র পুত্র দীপেন্দ্রনাথ ১৬ই মাঘ ১৩৪১ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

গুণেন্দ্রনাথের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী কমলারাণীর ২২শে আষাঢ় ১৩২৭ তারিখে কাশীপুর রায় বংশের হেমন্তকুমার রায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশৈলেন্দ্র কুমারের সহিত শুভ বিবাহ হয়। তাঁহার দুই পুত্র রবীন্দ্র এবং খোকা এবং এক কন্যা শ্রীমতী সুনীলিমা।

শ্রীমতী বিনয়নী

যোগেন্দ্রনাথের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী বিনয়নী ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯৩ তারিখে পটলডাঙ্গা নিবাসী রায় সুরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুরের একমাত্র পুত্র সত্যেন্দ্রনাথের সহিত বিবাহ হয়। সত্যেন্দ্রনাথ চরিত্রবান উচ্চ হৃদয়ের লোক ছিলেন। ৮ই অক্টোবর ১৯২৫ তারিখে সত্যেন্দ্রনাথ নিঃসন্তান সাধ্বী স্ত্রীকে রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন।

শ্রীমতী সুহাসিনী

যোগেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সুহাসিনী। মজিলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সৌরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সহিত তাঁহার শুভ পরিণয় হয়। সৌরেন্দ্রনাথ কলিকাতা হাইকোর্টের একজন এটর্ণী। তিনি অমায়িক, বিদ্বান ও নিষ্কলুষ লোক ছিলেন।

তাঁহার একমাত্র কন্যা শ্রীমতী সুলতিকা। শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র মিত্রের সহিত তাঁহার শুভ বিবাহ হইয়াছে। এবং একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত সরোজেন্দ্র-নারায়ণ এম, এ, ও আইন পাশ করিয়াছেন।

শ্রীমতী কাদম্বরী

দীননাথ বসুমল্লিক মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী কাদম্বরীর সহিত ৩০শে এপ্রিল মঙ্গলবার ১৮৭২ তারিখে কলিকাতা জোড়াসাঁকো নিবাসী রায় হরচন্দ্র ঘোষ বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রের শুভ বিবাহ হয়। জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র উদার দার্শনিক ও করুণার্দ্র চিত্তের লোক। তিনি বাল্যকাল হইতে ধর্মপিপাসু হইয়া নানা ধর্ম বিষয়ে গবেষণা করেন এবং যৌবনে খ্রীষ্টীয় ধর্মে অনুরাগী হইয়া প্রকাশ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। ভগবান জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্রকে যেরূপ ঐশ্বর্য দিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে সেইরূপ দানের ঔদার্য দিয়াছেন।

তাঁহার তিন কন্যা শ্রীমতী নলিনী, শ্রীমতী মৃণালিনী এবং শ্রীমতী ঊষা এবং একমাত্র পুত্র ষ্টেফানস্ নির্মলেন্দু।

নির্মলেন্দু ২৬শে ডিসেম্বর ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং বাল্যকাল হইতে বিশেষ মেধাবী ও অধ্যবসায়ী বালক ছিলেন। ২১শে নভেম্বর ১৯ ৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মলেন্দুর আত্মা অল্প বয়সে অমরধামে প্রয়াণ করিল। এরূপ বুদ্ধিমান এবং সৎচরিত্রের একমাত্র পুত্রের অকাল মৃত্যুতে জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বড়ই কাতর হন এবং তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য বহু টাকা নানারূপ সৎকার্যে ব্যয় করেন।

জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে এক লক্ষ মুদ্রা প্রদান করিয়া "Stephanos Nirmalendu Ghosh Comparative Theological Lectures" নামক একটি অধ্যাপক বৃত্তি প্রস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি সেন্ট-পলস্ কলেজের ছাত্রবৃন্দের পাঠ সৌকর্যার্থে "Nirmalendu Hall of Learning নামক এক মনোরম পাঠাগার সৌধ পঁয়ত্রিশ হাজার মুদ্রা ব্যয়ে নির্মাণ করাইয়া কলেজ কর্তৃপক্ষকে প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয়ের লিখিত 'ষ্টিফানস্ নির্মলেন্দু ঘোষ' নামক পুস্তকে আমরা দেখিতে পাই—

"নির্মলেন্দুর জীবনে যেমন এক দিকে পিতার চরিত্র প্রভাব বিস্তার

করিয়াছিল, তেমনি অন্যদিকে তাঁহার জননীর জীবনও কম প্রভাব বিস্তার করে নাই।

নির্মলেন্দুর জননী সম্ভ্রান্ত বংশ-সম্ভূতা। পটলডাঙ্গার বসুমল্লিকগণ ধনে, মানে, কুলে, শীলে কলিকাতার এক বিশেষ প্রখ্যাত বংশ। নির্মলেন্দুর মাতা এই বংশের কন্যা। বংশযোগ্য সকল গুণই তাহাতে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল। কি শারীরিক কি মানসিক উভয়বিধ সৌন্দর্যেই তিনি বিশেষ বিমণ্ডিতা ছিলেন। তাঁহার হৃদয় তাঁহার স্বামীর ন্যায় উচ্চ পবিত্র ও করুণাপূর্ণ ছিল। তিনি যথার্থই গৃহলক্ষ্মী ছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি অধিক দিন জীবিত থাকেন নাই, কিন্তু যতদিন ইহ সংসারে ছিলেন, ততদিন স্বর্গের সুষমায় স্বগৃহ আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় জননী লাভ করা সন্তান-সন্ততিবর্গের পক্ষে কম সৌভাগ্য ও গৌরবের কথা নহে।"

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রীগোপাল বসুমল্লিক

রাধানাথ বসুমল্লিক মহশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র ২৬শে পর্যায়ে শ্রীগোপাল। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে হিন্দু ইস্কুলে এবং পরে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন। প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থাদি এবং সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি তাঁহার আলয়ে শিক্ষিত পণ্ডিত ও অধ্যাপক রাখিয়া সংস্কৃত পুরাণ, ব্যাকরণ, শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্র বিষয় আলোচনা করিতে এবং প্রাচীন ধর্ম দর্শন এবং সাহিত্য বিষয়ক পুস্তকাদি পাঠ করিতে ভালবাসিতেন। সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি বৈদিক ধর্মবিষয়ে একজন সুপণ্ডিত হন। হিন্দু বেদান্ত দর্শন বিষয়ে শ্রীগোপাল যেরূপ গবেষণা করিয়াছিলেন এবং পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন, সেরূপ পাণ্ডিত্য অতি অল্প হিন্দুই লাভ করিতে পারিয়াছিল। তাঁহার মহামূল্যবান জীবনের অধিকাংশ সময়ই হিন্দু বেদান্ত দর্শন ও অন্যান্য প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থাদির গবেষণায় অতিবাহিত হইয়াছিল। হিন্দুদিগের প্রাচীন অমূল্য বেদ বেদান্ত দর্শন গীতা ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থাদি সর্ব-সাধারণের নিকট প্রকাশ ও দেশবাসীকে উক্ত বিষয়ে সকল শিক্ষা দিবার জন্য তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। উক্ত ধর্মগ্রন্থাদি প্রকাশের জন্য তিনি অনেক টাকা সাহায্য করিতেন। বহু দরিদ্র হিন্দু ছাত্র যাঁহারা সংস্কৃত শিক্ষা করিত তাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে মাসিক বৃত্তি পাইতেন। নানারূপ ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি ক্রয় করিয়া তিনি তাঁহার আলয়ে একটী বড় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

শ্রীগোপাল বসুমল্লিক বৃত্তি

হিন্দুদিগের সংস্কৃত ধর্ম ও সাহিত্য বিশেষভাবে বেদান্ত দর্শন প্রচার এবং বিদ্যাশিক্ষার জন্য শ্রীগোপাল বসুমল্লিক মহাশয় তাঁহার উইলের দ্বারা তাঁহার সম্পত্তি হইতে প্রায় দেড় লক্ষ টাকার মূল্যবান সম্পত্তি পৃথক করিয়া ট্রাষ্টীর হস্তে দিয়া ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে উক্ত সম্পত্তির বার্ষিক আয়ের মধ্য হইতে

প্রতি বৎসর পাঁচ সহস্র টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট শ্রীগোপাল বসুমল্লিক বৃত্তি "Sreegopal Bose Mallck Fellowship" নামক বৃত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তিন বৎসরের জন্য একজন করিয়া অধ্যাপক নিযুক্ত করিবেন। উক্ত অধ্যাপক বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে এবং সংস্কৃত প্রাচীন শাস্ত্রাদির বিষয় লইয়া ধারাবাহিকভাবে বিশ্ববিদ্যালযে বক্তৃতা দিবে এবং বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে গবেষণা করিবে।

উক্ত অধ্যাপক প্রতি মাসে ১২৫৲ করিয়া এবং তিন বৎসর অন্তর আরও ১৪০০৲ পাইবে। যে সকল ছাত্র উক্ত বেদান্ত দর্শন বিষয় অধ্যয়ন ও গবেষণা করিবে তাহাদের মধ্যে ১২জন ছাত্র মাসিক ১০৲ করিয়া বৃত্তি পাইবে এবং প্রতি বৎসরের শেষে উক্ত বিষয়ে একটি পরীক্ষা হইবে। উক্ত পরীক্ষায় যে ছাত্র প্রথম স্থান অধিকার করিবে তিনি এক শত টাকা মূল্যের একটী স্বর্ণ পদক এবং পাঁচ শত টাকা পাইবে। উক্ত অধ্যাপকের বক্তৃতা পুস্তকাকারে ৫০০ করিয়া মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করা হইবে। উক্ত পুস্তকের মধ্যে ১০০ পুস্তক দাতার বংশধরগণ এবং ৪০০ পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয় পাইবে। নিম্নলিখিত পণ্ডিতগণ শ্রীগোপাল বসুমল্লিক বৃত্তির অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন—

১৮৯৭-১৯০১—মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার।

১৯০৭—পাণ্ডে রামাবতার শর্মা সাহিত্যাচার্য এম, এ,।

১৯২৫—মিষ্টার এস্, কে, বেলভাকর-এম, এ, পি, এচ, ডি,।

১৯২৬—মিষ্টার এল-কে, দত্ত, এম, এ, পি, এইচ ডি, (লণ্ডন)।

১৯২৭—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এম, এ,।

১৯২৮—অধ্যাপক আর্, ডি, রেনাডি এম, এ,।

১৯২৯—শ্রীযুক্ত সরোজকুমার দাস এম, এ, পি-এইচ, ডি, (লণ্ডন)।

১৯৩০—পণ্ডিত কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী এম, এ,।

জগতের বড় বড় পণ্ডিতগণের মতে হিন্দুদিগের প্রাচীন বেদ বেদান্ত দর্শন ইত্যাদি গ্রন্থাদি অন্য জাতির গ্রন্থাদি অপেক্ষা বহু প্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ। সেই সকল প্রাচীন অমূল্য পুস্তকাদি জগৎ সমাজে প্রচার করিলে হিন্দুদিগের মুখোজ্জ্বল হইবে এবং প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারের সাহায্য করিবে। এখনও অনেক প্রাচীন হিন্দু মুনিঋষিগণের লিখিত অমূল্য গ্রন্থাদি অন্ধকারে রহিয়াছে। স্বর্গীয় মহাত্মা রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় হিন্দুদিগের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করিয়া জগতের সাহিত্য সমাজে নবযুগের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীগোপাল বসুমল্লিক মহাশয় হিন্দুদিগের প্রাচীন বেদান্ত দর্শনাদি বিশদভাবে গবেষণা করিয়া জ্ঞাত হইয়াছিলেন, যে ইহা একটি অমূল্য দ্রব্য যাহার প্রকাশ ও গবেষণা হইলে জগতের দর্শনশাস্ত্রের অশেষ উপকার হইবে। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্যের মধ্য হইতে কিয়দংশ দিয়া তিনি কেবল তাঁহায় মহত্ত্বের পরিচয় দেন নাই, হিন্দু বিজ্ঞান ও জগতের দর্শনশাস্ত্রের অশেষ উন্নতির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন হিন্দু দর্শন বিস্তারের জন্য এরূপ ঔদার্য অন্য কাহাকেও করিতে দেখা যায় নাই।

শ্রীগোপাল ফেলোশিপ, লেকচারের চেয়ার স্থাপিত করিয়া তিনি তাঁহার নিজের এবং পটলডাঙ্গা বসুমল্লিক বংশের উচ্চ সম্রম আরো বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন এবং চিরকালের জন্য তাঁহার উচ্চ হৃদয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া হিন্দুদিগকে কৃতজ্ঞতা—পাশে বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়া নানারূপ শিক্ষা বিস্তারের জন্য বহু মহাপুরুষ বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উক্ত দাতাদিগের নামের তালিকা এবং টাকার অঙ্ক দেখিলেই উপলব্ধি হইবে যে অধিকাংশ দাতাই কায়স্থ এবং প্রায় অধিকাংশ টাকাই কোন না কোন কায়স্থ দাতার দান।

দয়ার্দ্রহৃদয় শ্রীগোপাল প্রকৃত একজন দাতা ছিলেন। বহু দরিদ্র বিধবা এবং গরীব ছাত্র তাঁহার নিকট হইতে মাসিক বৃত্তি পাইত। তিনি সদাই মুক্তহস্ত ছিলেন। অনেক কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্রকে সাহায্য দান করিয়া তিনি অনেক দরিদ্র কন্যার বিবাহ দিয়া গিয়াছেন। দেশের কোথাও কোনরূপ মহামারী, বন্যা বা দুর্ভিক্ষ হইলে তিনি যথোচিত সাহায্য দান করিতে কখনই কুন্ঠিত হইতেন না।

কলিকাতা সহরে যখন প্লেগ রোগের প্রথম প্রাদুর্ভাব হইয়া দরিদ্র সহরবাসীকে আক্রমণ করে শ্রীগোপালের দয়ার্দ্র হৃদয় তখন দরিদ্রদিগকে সাহায্য করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠে। সেই সময় প্লেগাক্রান্ত রোগীদিগের চিকিৎসার জন্য তাঁহার বহু টাকা মাসিক ভাড়ার হ্যারিসন রোডস্থ কয়খানি বড় বড় বাটী বিনাভাড়ায়হাসপাতালকরিবার জন্য ছাড়িয়া দেন এবং বহু মুদ্রা সাহায্য করেন।

তিনি নিজের নাম জাহির করিবার জন্য কিংবা খেতাবের লালসায় দান করিতেন না। তিনি গুপ্তভাবে সাহায্য করিতেই ভালবাসিতেন।

কুষ্ঠাক্রান্ত রোগীদিগের বাংলাদেশে কোনরূপ আশ্রম নাই। স্বর্গীয় স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একটি কুষ্ঠাশ্রম স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিলে, শ্রীগোপাল উক্ত সদনুষ্ঠানে বহু টাকা দান করেন, কিন্তু চাঁদার খাতায় টাকার অঙ্ক বসাইয়া নিজ নাম গোপন রাখেন।

শ্রীগোপালের পিতা স্বনামধন্য মহাপুরুষ রাধানাথ বসুমল্লিক মহাশয়ের তিরোধানের সময় শ্রীগোপালের বয়স মাত্র চারি বৎসর ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর জয়গোপাল এবং দ্বারিকনাথ তাঁহাকে উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। সাবালক হইয়া তিনি তাঁহার পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রম অবধি ভ্রাতৃগণের সহিত একান্নভুক্ত সংসারে সকলের সহিত বিশেষ সদ্ভাব রাখিয়া বাস করেন। পৈত্রিক সকল সম্পত্তি সেই সময় যৌথ ছিল এবং ১৮ নং রাধানাথ মল্লিক লেনস্থ পৈত্রিক ভবনে শ্রীগোপাল তাঁহার জ্যেষ্ঠ দুই সহোদর দ্বারিকনাথ ও দীননাথ এবং তিন ভ্রাতুষ্পুত্র প্রবোধচন্দ্র, মন্মথনাথ এবং হেমচন্দ্র সকলের পরিবারবর্গ এবং অন্যান্য অনেক আশ্রিত দরিদ্র আত্মীয়গণকে লইয়া বাস করিতেন। বুদ্ধিমান এবং কার্যকুশল শ্রীগোপালকে সংসারের সকলেই বিশেষ ভালবাসিত এবং তাঁহার উপর সংসারের আয়ব্যয় ও সকল খরচপত্রাদির সম্পূর্ণ ভার ছিল। অল্পবয়স হইতেই শ্রীগোপাল বিশেষ মেধাবী এবং বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন। সেই সময় তাঁহাদের অতুল ঐশ্বর্য এবং বার্ষিক আয় কয়েক লক্ষ মুদ্রা।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পৈত্রিক সকল সম্পত্তি শালিসীর দ্বারা বিভাগ হইয়া গেলে, শ্রীগোপাল পুরাতন পৈত্রিক ভবনে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র চারুচন্দ্রের সহিত ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ অবধি সপরিবারে বিশেষ সদ্ভাবের সহিত বাস করেন। পৈত্রিক বাটীর সংলগ্ন দক্ষিণ দিকের জমি ক্রয় করিয়া তিনি পূজার দালান নাটমন্দির ইত্যাদি সংযুক্ত একটি ত্রিতলা সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে নূতন ভবনে গিয়া শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

শ্রীগোপাল নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তিনি কুলগুরুর নিকট হইতে মন্ত্র লইয়া প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা জপ করিতেন। তাঁহার আলয়ে প্রতি বৎসর বিশেষ আড়ম্বরের সহিত ৺শারদীয়া পূজা এবং জগদ্ধাত্রী পূজা হইত। বার মাসে তের পর্ব তাঁহার বাটীতে যথারীতি সুসম্পন্ন হইত।

তাঁহার পিতার প্রতিষ্ঠিত গৃহদেবতা "শ্রীশ্রীধর জিউ"কে তিনি তাঁহার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণের সহিত গ্রহণ করিয়া তাঁহার নূতন ভবনে প্রতিষ্ঠা করিয়া

দৈনিক পূজার এবং উৎসবাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন এবং উক্ত দেবতার সেবার ব্যয় নির্বাহের জন্য যৌথ দেবোত্তর সম্পত্তি ভিন্ন স্বীয় অনেক টাকা বার্ষিক আয়ের একটি জমিদারী দেবোত্তর করিয়া উক্ত গৃহদেবতার সেবার ব্যয়ের জন্য পৃথকভাবে দান করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীগোপালের চরিত্র দেবতুল্য ছিল। তিনি জীবনে কখনও কোনরূপ নেশা করেন নাই বা মাদকাদি নেশার দ্রব্য স্পর্শ করেন নাই।

তিনি অতি সাদাসিধা লোক ছিলেন। পোষাকপরিচ্ছদে কোনরূপ আড়ম্বর ছিল না। তিনি ধনী দরিদ্র সকলের সহিত বিশেষ অমায়িকভাবে মিশিতেন। রাগ দ্বেষ হিংসা বলিয়া কোন রিপু কখনও তাঁহার চরিত্রে স্থান পায় নাই। তিনি যেমন জিতেন্দ্রিয় ছিলেন, তেমনি উচ্চহৃদয়ের লোক ছিলেন। সম্ভ্রান্ত সমাজের সকল ভদ্রলোকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল।

তাঁহার দেহ বেশ বলিষ্ঠ এবং হৃষ্টপুষ্ট ছিল। তিনি শরীর রক্ষার জন্য পালোয়ান রাখিয়া কুস্তি করিতেন এবং হিন্দু কুস্তি বিদ্যায় তিনি পারদর্শী ছিলেন। তিনি অন্যকে কুস্তি এবং শারীরিক ব্যায়াম করিয়া দেহ বলিষ্ঠ ও কর্মঠ করিবার জন্য উপদেশ দিতেন। তাঁহার উদ্যোগে পৈত্রিক ভবনের পশ্চিম দিকের ১৫নং রাধানাথ মল্লিক লেনস্থ ভবনের মধ্যস্থ একটি খোলা জমিতে তিনি একটি ব্যায়ামের সমিতি করিয়াছেন এবং তাঁহার বংশের বালকগণকে উক্ত স্থানে দৈনিক ব্যায়ামাদি ক্রীড়া করিবার জন্য উৎসাহ দিতেন। বেতন দিয়া তিনি কয়েকজন বলিষ্ঠ পালোয়ানকে রাখিয়া দিয়াছিলেন।

বিবাহ

শ্রীগোপাল ধর্মাহাটা দত্ত বংশের কন্যা শ্রীমতী ত্রৈলোক্যমণিকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র সতীশচন্দ্র এবং একটি কন্যা শ্রীমতী গিরিবালা জন্মগ্রহণ করেন।

৬ই সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রাত্রে ৮ ঘটিকার সময় উক্ত প্রথম স্ত্রী পিত্রালয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন।

প্রথমা স্ত্রী স্বর্গারোহণের পর ৪ঠা ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ১৮৭৩ তারিখে তিনি দ্বিতীয় বার মজিলপুর নিবাসী জমিদার ৺তারকনাথ দত্ত মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী স্বরৎমোহিনীকে বিবাহ করেন। উক্ত দ্বিতীয় পত্নীর দুই কন্যা শ্রীমতী নৃপেন্দ্রবালা এবং শ্রীমতী ননীবালা।

স্বর্গারোহণ

শ্রীগোপাল নিয়মিতভাবে আহারবিহার ও সকল বিষয়ে সংযমী থাকায় তাঁহার স্বাস্থ্য ৫৫ বৎসর বয়ঃক্রম অবধি বেশ বলিষ্ঠ ও নীরোগ ছিল। ১৩০৬ সনের শেষ ভাগ হইতে তাঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয় এবং ১০ই চৈত্র শুক্রবার ১৩০৬ সনে ইংরাজী ২৩শে মার্চ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রাত্র ৮ ঘটিকার সময় এই মহাপুরুষের প্রাণ স্বর্গধামে চলিয়া যায়। তিনি ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়া গেলেও, তাঁহার অমূল্য সুনাম এবং অবিনশ্বর কীর্তি বাঙলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

এই উদার হৃদয় স্বনামধন্য মহাপুরুষের নাম চিরস্মরনীয় করিয়া রাখিবার জন্য তাঁহার বাটীর সম্মুখের রাস্তার নাম কলিকাতা কর্পোরেশন "ক্যাথিড্রেল মিশন লেন" নামের পরিবর্তে ২২শে জুলাই ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে শ্রীগোপাল বসুমল্লিকের লেন নামকরণ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীগোপাল বসুমল্লিকের শেষ কার্য তাঁহার একমাত্র পুত্র সতীশচন্দ্র প্রায় লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া দানসাগর শ্রাদ্ধ করেন এবং বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে অকাতরে তৈজসপত্র ও মুদ্রা বিদায় এবং দরিদ্রগণকে বস্ত্র ও মুদ্রা দিয়া সন্তুষ্ট করেন।

শ্রীগোপালের স্ত্রী শ্রীমতী সুরৎমোহিনী স্নেহময়ী দয়ার্দ্র হৃদয়ের ধর্মপরায়ণা সাধ্বী মহিলা ছিলেন। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ১লা পৌষ তারিখে তিনি ৺কাশীধামে পুত্রের আলয়ে সজ্ঞানে অমরধামে প্রস্থান করেন। সতীশচন্দ্র তাঁহার শ্রাদ্ধ কার্য যথারীতি হিন্দু মতে সুসম্পন্ন করেন।

'আর্য্য কায়স্থ প্রতিভা' নামক মাসিক পত্রিকার ১৩২২ সনের পৌষ সংখ্যায় কায়স্থ জাতির বর্তমান প্রভাব প্রতিষ্ঠা নামক প্রবন্ধে (৩ ৩ পৃষ্ঠা) লিখিত আছে—

"বঙ্গীয় সমাজ ও সাহিত্যের পরমহিতৈষী শ্রীগোপাল বসুমল্লিক পৌরষ-দীপ্ত কর্মী কায়স্থ। তাঁহার সাধুতা, সৎগুণের বুদ্ধি বিস্তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া যে কীর্তিস্তম্ভ প্রোথিত করিয়াছেন তাহা কস্মিনকালেও বিলুপ্ত হইবে না।

সর্ব্বগুণান্বিত সর্ব্বজনবরেণ্য কায়স্থ জাতিকে যাহারা শূদ্র বলেন তাহারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং নিতান্ত কৃপার পাত্র সন্দেহ নাই।"

শ্রীগোপালের স্বর্গারোহণের সংবাদ দৈনিক সংবাদপত্র "প্রতিবাসী" তাঁহার প্রতিকৃতির সহিত প্রকাশ করেন (বৈশাখ ১৩০৭ সন)—

"কলিকাতার কায়স্থ কুলের অন্যতম রত্ন উদারহৃদয় শ্রীগোপাল বসুমল্লিক

প্রায় ষষ্ঠিতম বর্ষে পরলোকগমন করেন। নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সরলভাবে বেদান্তের সত্য প্রচারের জন্য তিনি কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে বার্ষিক ৫ সহস্র টাকার বৃত্তি প্রদান দ্বারা যে ফেলোসিপ স্থাপনের সুব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কীর্ত্তি ও দৃষ্টান্তের জন্য বঙ্গদেশ তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞ থাকিবে। ভোগায়তন দেহের সেবা পরিচর্য্যায় অর্থ প্রয়োগই এযুগের ধর্ম এবং বিশেষত্ব ও এতদ্দেশবাসীগণের বর্ত্তমান প্রকৃতি। এ অবস্থায় তিনি এই দানশীলতা দ্বারা হৃদয়ের কি গরীয়সী শক্তি এবং সত্যের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই কার্য্য দ্বারাই তাঁহার সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রতিপন্ন হইতেছে। এতদ্ব্যতীত তিনি দেবসেবার জন্য অনেক দেবোত্তর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি অনেক হিন্দু বিধবাকে অর্থ সাহায্য প্রদান করিতেন। তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও নিরহঙ্কার ছিলেন এবং সকল লোককেই সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতেন।"

সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের প্রণীত সরল বাঙ্গলার অভিধানে (১১৬৬ পৃ) আছে :

"শ্রীগোপাল বসুমল্লিক—ইনি কলিকাতা পটলডাঙ্গার বসুমল্লিক বংশ সম্ভূত। দেহত্যাগকালে ইনি যে উইল করিয়া যান, তাহার সর্ত্ত মতে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ন্যস্ত মূলধন হইতে বেদান্ত শিক্ষার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তিন বৎসরের জন্য একজন করিয়া অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন। তিনি বেদান্ত বিষয়ে ধারাবাহিক উপদেশ দিবেন এবং উক্ত দর্শন সম্বন্ধে মৌলিক তথ্য বাহির করিয়া সংস্কৃত ভাষা বিশেষতঃ বেদান্ত শিক্ষার সহায়তা করিবেন। তিনি ১২৫ টাকা হিসাবে মাসিক বেতন পাইবেন এবং তিন বৎসর অন্তে ১৪০০ টাকা পাইবেন। এই টাকায় তাঁহার প্রদত্ত উপদেশগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া ৪০০শ খানা পুস্তক বিদ্যালয়কে এবং ১০০শ খানা পুস্তক বন্ধুগণকে বিতরণ করিবার জন্য বসুমল্লিক মহাশয়ের বংশের প্রতিনিধিকে দিতে হইবে। অবশিষ্ট টাকা অধ্যাপক নিজে লইতে পারিবেন। বেদান্ত শিক্ষার জন্য এরূপ দান আর কোন বাঙ্গালী এ পর্য্যন্ত করেন নাই। এই দানের জন্য বসুমল্লিক মহাশয়ের নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।"

সুবিখ্যাত মাসিক পত্রিকা "ভারতবর্ষের" ১৯শ বর্ষ, ২য়-৪র্থ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৩৮, ৬১৬ পৃষ্ঠায় তাঁহার বহু বর্ণে একটী সুন্দর প্রতিকৃতি ও জীবনী প্রকাশিত হয়।

শ্রীগোপাল বসুমল্লিক—লেখক শ্রীনীরেন্দ্রনাথ ঘোষ—"ঢাক-ঢোল বাজাইয়া যাহারা দান করিয়া থাকেন, নামের প্রয়াসী হইয়া যাঁহারা দান করেন, তাঁহাদের দান, দান বটে, সাধারণের তাহাতে মঙ্গলও হয় বটে কিন্তু উহাতে যে স্বার্থের গন্ধ থাকে সেই কারণে উহার মাহাত্মোর কতকটা অপচয় ঘটে। কিন্তু যাঁহারা নাম হইবে বলিয়া দান করেন না, যাঁহারা বিনা আড়ম্বরে দান করেন, তাঁহাদের দানই প্রকৃত সাত্ত্বিক দান; এইরূপ দানেই ধনের যথার্থ সদ্ব্যয় হয়। ইহার সহিত যদি দাতার বিদ্যানুরাগ প্রকাশ পায় তাহা হইলে মণিকাঞ্চন সংযোগ স্বীকার করিতেই হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্তের অধ্যাপনার সুব্যবস্থা আছে। এই অধ্যাপনার জন্য উপযুক্ত বৃত্তির ব্যবস্থাও আছে। এই বৃত্তির নাম শ্রীগোপাল বসুমল্লিক বৃত্তি। যে শ্রীগোপাল বসুমল্লিক মহাশয় এই বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বেদান্ত শিক্ষার্থী ছাত্রমণ্ডলী এবং বাঙ্গলাদেশের অধিবাসীগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার বিস্তৃত পরিচয় জন-সাধারণ সবিশেষ অবগত নহেন। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, দাতা নামের প্রয়াসী ছিলেন না। বেদান্তের প্রতি অবিচলিত অনুরাগবশতঃ বেদান্ত চর্চার সাহায্যার্থে বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া তিনি আত্মতৃপ্তি সাধন করিয়াছেন মাত্র। আজ আমার বহু চেষ্টায় দাতার জীবনের অতি সংক্ষিপ্ত যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ সংগ্রহপূর্বক ভারতবর্ষে প্রকাশ করিতে পারিয়া পরম প্রীতি অনুভব করিতেছি।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে পটলডাঙ্গার বিখ্যাত মল্লিক বংশে শ্রীগোপাল বসুমল্লিক মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। বসুমল্লিক বংশের আদি নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত কাঁটাগড় গ্রামে ছিল। জ্ঞানালোচনা ও জনহিতকর কার্যের জন্য এই বসুমল্লিক বংশ চিরদিনই প্রসিদ্ধ। শ্রীগোপাল বসুমল্লিক এই বংশের উপযুক্ত বংশধর।

শ্রীগোপালবাবুর পিতা রাধানাথ বসুমল্লিক মহাশয়ের নামে পটলডাঙ্গার একটি রাস্তার নাম আছে। রাধানাথ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। শ্রীগোপাল অল্প বয়সে পিতৃহীন হইলেও পিতৃ পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তির সহিত তাঁহার সদ্‌গুণাবলীরও অধিকারী হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের তত্ত্বাবধানে লালিতপালিত হন। তাঁহার ভ্রাতৃভক্তি যেমন অসাধারণ ছিল; তিনিও তদ্রূপ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের পরম স্নেহভাজন ছিলেন।

শৈশবকাল হইতে জ্ঞানার্জনে শ্রীগোপালের অকৃত্রিম অনুরাগ জন্মে। সাধারণ শিক্ষা শেষ করিয়া তিনি দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা আরম্ভ করেন এবং অচিরে 'কন্টিনেন্টাল' অর্থাৎ ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠেন। দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা, এবং এই শাস্ত্রে নব-নব জ্ঞানার্জ্জনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। প্রত্যহ তিন চারিজন পণ্ডিতের সহিত তাঁহার বেদান্তদর্শন শাস্ত্রের আলোচনা চলিত। বেদান্তের প্রতি তাঁহার এমন প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছিল যে মৃত্যুকালে উইল করিয়া বেদান্ত বৃত্তি স্থাপনের জন্য বাৎসরিক পাঁচ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পণ করিয়া যান। তাঁহার উইলের সর্ত্তানুযায়ী ন্যস্ত সম্পত্তি হইতে বেদান্ত অধ্যাপনার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা হয় যে, একজন বেদান্ত অধ্যাপক তিন বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইবেন। তিনি বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা দিবেন এবং মৌলিক গবেষণা করিবেন। অধ্যাপকের মাসিক বৃত্তির পরিমাণ হইবে ১২৫৲ টাকা। তিনি বৎসর অন্তর তিনি আরও থোক ১৪০০৲ টাকা পাইবেন। তাঁহার অধ্যাপনা ও গবেষণার ফল সংস্কৃত ভাষা, বিশেষতঃ বেদান্তচর্চার সহায়তাকল্পে ঐ থোক টাকা হইতে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবে। মুদ্রিত পুস্তকের ৪০০ খণ্ড কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং ১০০ খণ্ড দাতার বংশধরগণ তাঁহাদের বন্ধুগণের মধ্যে বিতরণার্থ প্রাপ্ত হইবেন। অবশিষ্ট পুস্তক ও টাকা অধ্যাপক স্বয়ং প্রাপ্ত হইবেন। এই টাকা হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "শ্রীগোপাল ফেলোশিপ লেকচারারের" চেয়ার স্থাপিত হইয়াছে।

শ্রীগোপালের বিদ্যানুরাগ কিরূপ প্রবল ছিল নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভে তাঁহার কিরূপ আগ্রহ ছিল তাহা তাঁহার পারিবারিক গ্রন্থাগারে সংগৃহীত পুস্তকের তালিকা পাঠ করিলেই জানিতে পারা যায়। এই সমুদয় পুস্তক তিনি যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। বেদ পুরাণ উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে গ্রন্থাগারটি সুসজ্জিত। এতদ্ব্যতীত প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্য বিষয়ক বহু দুরূহ ও দুর্লভ গ্রন্থও অধ্যয়ন করিয়া এই দুই শাস্ত্রে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াছিলেন।

যিনি স্বয়ং সুশিক্ষিত—শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহ তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ—বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত শ্রীগোপাল বৃত্তি। দরিদ্র সন্তানরা

অর্থাভাবে শিক্ষালাভ করিতে পারে না দেখিয়া তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার সহায়তা করিতে তিনি সদা মুক্তহস্ত ছিলেন।

দুস্থ হিন্দু বিধবাগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি তাঁহার জননী ৺বিন্দুবাসিনীর নামে একটি তহবিল স্থাপন করিয়াছিলেন। এই তহবিল হইতে অসহায়া বিধবাদিগের অভাব ও প্রয়োজন অনুযায়ী দুই চারি টাকা করিয়া মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতীত, ইহার অনুরূপ আরও বহু সাধারণ হিতকর কার্যে তিনি অকাতরে অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন।

প্লেগ নামক মহামারী যখন সর্বপ্রথম কলিকাতা আক্রমণ করে, তৎকালে শ্রীগোপাল বসুমল্লিক মহাশয়ের পর দুঃখকাতরচিত্ত দুস্থ প্লেগ রোগীদিগের দুঃখে বিগলিত হইয়া উঠে। সেইজন্য তিনি হ্যারিসন রোডস্থ তিনখানি সুবৃহৎ অট্টালিকা প্লেগ রোগীদিগের হাঁসপাতাল স্থাপনের জন্য ছাড়িয়া দেন।

হিন্দুসুলভ ধর্মপ্রবণতা ও ভগবদ্ভক্তি তাহাতে অতিরিক্ত মাত্রায় বর্তমান ছিল। সেইজন্য তিনি তাঁহার সম্পত্তির অর্ধাংশ শ্রীধরজীর সেবার্থ উইল করিয়া দিয়া যান।

স্বর্গীয় স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন করেন তখন শ্রীগোপাল বসুমল্লিক মহাশয় সদনুষ্ঠানের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন জানিয়া এই অনুষ্ঠানের পক্ষ হইতে এক ভদ্রলোক বসুমল্লিক মহাশয়ের নিকট আসিয়া চাঁদার জন্য আবেদন করেন। শ্রীগোপালবাবু এই অনুষ্ঠানে এককালীন বহু অর্থ প্রদান করেন। চাঁদার খাতায় টাকার অঙ্ক লিখিয়া দিয়া স্বাক্ষর করিবার সময় তিনি চাঁদা-সংগ্রাহক ভদ্রলোককে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করেন যে এই দানের কথা যেন প্রকাশ করা না হয়। নাম জাহির করা সম্বন্ধে এরূপ ঔদাসীন্য এদেশে কেন, কোন দেশেই বিশেষ সুলভ নহে।

শ্রীগোপাল বসুমল্লিক মহাশয় ঢাক-ঢোল-কাঁসর বাজাইয়া নাম জাহির করিয়া সদনুষ্ঠানের পক্ষপাতী ছিলেন না—তিনি ছিলেন নীরব কর্মী। তাই তিনি নীরবে নিঃস্বার্থভাবে বহু সদনুষ্ঠান করিলেও এবং বহু সাধারণ প্রতিষ্ঠানে অর্থ ও সামর্থ্য দিয়া সাহায্য করিলেও আজও তাঁহার বহু অবদানের কথা বাঙ্গালী জনসাধারণের অজ্ঞাত। বঙ্গীয় সমাজে এমন আদর্শ চরিত্র সুদুর্লভ।

সন ১৩০৭ সালের ১০ই চৈত্র ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে মার্চ দেব দ্বিজে ভক্তিপরায়ণ, নরনারায়ণের একনিষ্ঠ সেবক, এই মহাত্মা অমরধামে মহাপ্রয়াণ করেন। তিনি গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সদনুষ্ঠানগুলির কার্য নিয়মিতভাবে

চলিতেছে। তাঁহার নশ্বর জীবন ধ্বংস হইলেও তাঁহার কীর্তিগুলি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

শ্রীগোপালবাবুর একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বসুমল্লিক মহাশয় পিতৃ-অনুষ্ঠিত সকল কীর্তি পূর্ণ মাত্রায় বজায় রাখিয়াছেন। তবে তিনি এখন বার্ধক্যে উপনীত হওয়ায় তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বসুমল্লিক ও শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বসুমল্লিক এখন বিষয়-কর্মের তত্ত্বাবধান করিতেছেন।

সতীশচন্দ্র বসুমল্লিক

শ্রীগোপাল বসুমল্লিক মহাশয়ের একমাত্র পুত্র ২১ পর্যায়ের মুখ্য কুলীন সতীশচন্দ্র ১লা ভাদ্র ১২৭৪ সনে ইং ১৬ই আগষ্ট ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে হিন্দু স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া পরে গৃহশিক্ষকের নিকট বিদ্যার্জন করেন।

সতীশচন্দ্র তাঁহার মহাপুরুষ পিতা এবং পিতামহের সর্বগুণই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে সতীশচন্দ্র মেধাবী ও বিনয়ী ছিলেন এবং সকল বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের সহিত অমায়িকভাবে মেলামেশা করিতেন। সতীশচন্দ্র বাল্যকাল হইতে বেশ বলিষ্ঠ ও কর্মপটু ছিলেন। যৌবনাবস্থায় অশ্বারোহণে তাঁহার বিশেষ সখ ছিল এবং বেশ সুন্দরভাবে অশ্বারোহণ করিতে পারিতেন। তিনি সেই সময়ে অনেকগুলি সুন্দর অশ্ব বহুমূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন। অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইয়াও তিনি স্বহস্তে কোন কর্ম করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তাঁহার গৃহে অনেক চাকর থাকিলেও তিনি সকল কার্য নিজ তত্ত্বাবধানে করাইতেন। এঁড়েদহে ভাগীরথীর তটে তাঁহার পৈতৃক একটি সুন্দর উদ্যান আছে। তিনি তথায় গিয়া মালিদিগের সহিত একত্রে স্বহস্তে বৃক্ষাদি রোপণ করিতে এবং ঐ উদ্যানে রক্ষিত সারস, হাঁস, পক্ষী ইত্যাদি পালিত জীবজন্তু দিগকে নিজ হস্তে আহারাদি দিতে ভালবাসিতেন।

সতীশচন্দ্র তাঁহার স্বনামধন্য পিতার ন্যায় যশস্বী, প্রতিষ্ঠাবান, সত্যনিষ্ঠ ও স্বদেশপ্রেমিক। স্বজাতি ও সকলের কল্যাণ সাধন করিতে তিনি সদাই যত্নবান। তিনি সভাসমিতিতে গিয়া হৈচৈ করিতে বা নিজ নাম জাহির করিতে মোটেই ভালবাসিতেন না। নীরবে কার্য করাই তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অভ্যাস ছিল।

তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় দানশীল। গরীব ও বিধবার ক্লেশ লাঘব করিবার জন্য সাহায্য করিতে তিনি মুক্ত হস্ত ছিলেন। তাঁহার প্রায় সকল দানই গোপনে হইয়া থাকিত।

সতীশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র জ্যোতিষচন্দ্র অল্প বয়সে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে তিনি পুত্রের কল্যাণ ও তাহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য বহু অর্থ দিয়া "জ্যোতিষচন্দ্র বসু মল্লিক দাতব্য ভাণ্ডার" নামে ফাণ্ড করিয়া গিয়াছেন। উক্ত ফাণ্ডের টাকা হইতে মাসিক তিন শত টাকা বহু দরিদ্র বিদ্যার্থী ছাত্রকে মাসিক সাহায্য করা হয়।

সতীশচন্দ্র পাবনা জেলার মীরপুর নামক স্থানে তাঁহার জমিদারীর মধ্যে দরিদ্র প্রজাদিগের জলকষ্ট নিবারণের জন্য বহু সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া অনেকগুলি গ্রামে অনেক ইঁদারা ও পুষ্করিণী খনন করাইয়া দিয়াছেন এবং দরিদ্র প্রজাদিগের উপকারের জন্য ও তাঁহার স্বর্গীয় মাতাঠাকুরাণীর নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য তাঁহার মীরপুর কাছারীর সন্নিকটে শ্রীমতী ত্রৈলোক্যমণির নামে ১১৪০০৲ টাকা ব্যয়ে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং উহার মাসিক ১৫০৲ ব্যয় নিজে বহন করেন।

২৪ পরগণাস্থ এঁড়েদহ গ্রামে তাঁহার "নিরোজ কানন" নামক উদ্যানের পার্শ্বে ভাগীরথীর তটে স্থানীয় পল্লীবাসিগণের উপকারের জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একটি স্নানের ঘাট সাধারণের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন।

দেশ সেবা ও জাতীয় উন্নতির আন্দোলনে সতীশচন্দ্রের বিশেষ সহানুভূতি দেখা যায়। ১৯০৫ সনে যখন প্রথম স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয় সেই সময়ে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা সুবোধচন্দ্র বসুমল্লিক প্রথমে একসঙ্গে এক লক্ষ টাকা দান করিয়া দেশের বালকগণকে জাতীয়তাভাবে শিক্ষা দিবার জন্য যে "জাতীয় শিক্ষা পরিষদ" প্রতিষ্ঠা করেন, সতীশচন্দ্র উক্ত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উন্নতি-কল্পে দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা দান করেন। উক্ত অর্থ হইতে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রসায়ন পরীক্ষার কারখানার যন্ত্রপাতি খরিদ করা হয়। উপস্থিত যাদবপুরের জাতীয় সুবৃহৎ শিক্ষা পরিষদে সেই সকল যন্ত্রাদি রক্ষিত হইয়াছে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'চরিত্র পূজা' নামক পুস্তকের শেষ অধ্যায়ের একস্থানে লিখিয়াছেন :—'বরঞ্চ আমাদের মধ্যবিত্তগণ সাধারণ কাজে যেরূপ ব্যয় করিয়া থাকেন সম্পদের তুলনা করিয়া দেখিলে ধনীরা তাহা করে না। তাঁহাদের দ্বারবানগণ স্বদেশের অভাবকে দেউড়ী পার হইয়া প্রাসাদে ঢুকিতে

দেয় না। ভ্রমক্রমে ঢুকিতে দিলেও ফিরিবার সময় তাহার মুখে অধিক উল্লাসের লক্ষণ দেখা যায় না। ইহার কারণ আমাদের ধনীদের ঘরে বিলাতের বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, অথচ বিলাতের ঐশ্বর্য নাই। নিজেদের ভোগের জন্য তাহাদের অর্থ উদ্বৃত্ত থাকে বটে, কিন্তু সেই ভোগের আদর্শ বিলাতের। বিলাতের ভোগীরা ভারবিহীক স্বাধীন ঐশ্বর্যশালী ; নিজেদের ভাণ্ডারের সম্পূর্ণ কর্তা। সমাজবিধানে আমরা তাহা নই। অথচ ভোগের আদর্শ সেই বিলাতী ভোগীর অনুরূপ হওয়াতে খাটে, পালঙ্কে, বসনে, ভূষণে, গৃহ-সজ্জায়, গাড়ীতে, জুড়িতে আমাদের ধনীদের আর বদান্যতার অবসর দেয় না—তাহাদের বদান্যতা বিলাতী জুতাওয়ালা, টুপিওয়ালা ঝাড় লণ্ঠনওয়ালা, চৌকিটেবিলওয়ালার সুবৃহৎ পকেটের মধ্যে নিজেকে উজাড় করিয়া দেয়, শীর্ণ কঙ্কালসার দেশ রিক্ত হস্তে ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া থাকে। দেশী গৃহস্থের বিপুল কর্তব্য এবং বিলাতী ভোগীর বিপুল ভোগ এই দুই ভার একলা কয়জন বহন করিতে পারে ?”

এই বসুমল্লিক বংশের অনেক মহাপুরুষের জীবনী হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে তাঁহারা অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইয়া কেবল নিজেদের ভোগবিলাসে বসনে-ভূষণে গৃহসজ্জায় গাড়ী মোটরে অর্থ ব্যয় করিতেন না। দেশের গরীব, দুঃখী, আতুর অনাথার কষ্ট নিবারণের জন্য, দেশের শিক্ষাবিস্তারের জন্য, নানারূপ কর্মে এবং অন্যান্য জনহিতকর কার্যে অর্থ ব্যয় করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইতেন না। এই বংশে রাধানাথ, দ্বারকানাথ, শ্রীগোপাল, চারুচন্দ্র, ক্ষেত্রচন্দ্র, হেমচন্দ্র প্রভৃতি ক্ষণজন্মা মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হইয়া পরোপকারের জন্য যে সকল কাজ করিয়া গিয়াছেন এবং অকাতরে যেরূপ অর্থ ব্যয় করিয়াছেন যেরূপ পরোপকারের জন্য এত অর্থ ব্যয় তাঁহাদের ন্যায় কয়জন ধনীর বংশধরের জীবনীতে দেখা যায় ? তাঁহারা দরিদ্র আত্মীয়স্বজন এবং দেশের গরীব দুঃখী আতুর অনাথার ক্লেশ মোচনের জন্য এবং নানারূপ জনহিতকর কার্যে যেরূপ অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন তাহা এই বাঙ্‌লাদেশে তাঁহাদের সমতুল্য ধনীর বংশের ইতিহাসে অল্পই দেখা যায়। রাধানাথ বসুমল্লিক মহাশয়ের পূর্বপুরুষগণ এবং তাঁহার সন্তান ও পৌত্রগণ অতুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হইয়াও কেবল নিজেদের ভোগ-বিলাসে কেহ রত ছিলেন না। দান ধ্যান পূজা পর্ব করিয়া শত দিক দিয়া শতরূপে মহৎ বংশের মহাপুরুষগণ দেশের ও দশের নানারূপ উপকার সাধন করিয়া বংশের গৌরব উজ্জ্বল এবং উদ্দীপ্ত করিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহারা কেহ ঢাক ঢোল বাজাইয়া আত্মগরিমা প্রকাশ করেন নাই ; সংবাদপত্রে নাম

প্রকাশের জন্য বা নাম জাহিরের জন্য দান করেন নাই কিম্বা খেতাব লাভের জন্য লালায়িত হন নাই সকলেই নীরবে কার্য করিতেন এবং বিনা আড়ম্বড়ে প্রকৃত সাত্বিক দান করিতেন। কেহ নামের প্রত্যাশী ছিলেন না। এই বংশের রাজা সুবোধচন্দ্র যেরূপ সর্ব স্বার্থত্যাগ করিয়া দেশের ও দশের সেবায় তাঁহার যথা-সর্বস্ব দান করিয়া গিয়াছেন। এখন সকল দেশবাসী তাঁহাকে দাতাকর্ণ বলিয়া অভিহিত করেন। সতীশচন্দ্রের দানের সীমা নাই। তিনি কত বিষয়ে কত টাকা দান করিয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

সতীশচন্দ্র তাঁহার পিতার সকল অনুষ্ঠিত কীর্তি পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃত পিতৃমাতৃভক্ত পুত্র। তাঁহার গৃহে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে গৃহদেবতার পূজা-অর্চনা এবং বারমাসে তের পর্ব হইত। ৺শারদীয়া দুর্গাপূজা এবং শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা প্রতি বৎসর বিশেষ সমারোহে হইয়া থাকে এবং পূজার কয় দিবস কোন দীনদরিদ্র অভ্যাগত বিনা আহারে তাঁহার গৃহ হইতে ফেরে না।

সতীশচন্দ্র নিষ্ঠাবান হিন্দু। তিনি কুলগুরুর নিকট হইতে মন্ত্র লইয়া প্রত্যহ সকাল সন্ধ্যা জপ ও আহ্নিক করিতেন। দেব-দ্বিজে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি। তিনি স্বল্পভাষী ও সরল হৃদয়ের লোক। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য ছিল, কিন্তু কোনরূপ গর্ব ছিল না। ধনী তাঁহার কোনরূপ বাবুয়ানা কিম্বা পোষাক-পরিচ্ছদে কোনরূপ বাহুল্যতা ছিল না। ধনী দরিদ্র সকলকেই তিনি সমান চক্ষে দেখিতেন। কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত তাহার সৌহার্দ্র ছিল। ঝামাপুকুরের কুমার নরেন্দ্র মিত্র, শ্রীরামপুরের শ্রীযুক্ত রাধিকা গোস্বামী, মেছুয়াবাজার নিবাসী সতীশ মিত্র, শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়গণ তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গদেশীয় কায়স্থ সভা ইত্যাদি অনেক বড় বড় সভাসমিতির তিনি বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন।

বিবাহ

২রা ডিসেম্বর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে চেৎলানিবাসী কুলীন কায়স্থ ৺ললিতমোহন ঘোষ মহাশয়ের ভগ্নী শ্রীমতী নিরোজিনীকে সতীশচন্দ্র কুলকর্ম করিয়া বিবাহ করেন। ৭ই জুলাই ১৮৯৩ তারিখে শ্রীমতী নিরোজিনী একমাত্র পুত্র জ্যোতিষ-চন্দ্রকে রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। সাধ্বী সহধর্মিনী শ্রীমতী নিরোজিনী স্বর্গারোহণ করিলে দয়ার্দ্র হৃদয় সতীশচন্দ্র তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য ও তাঁহার স্মৃতি রক্ষার জন্য ৺কাশীধামে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে দশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়

করিয়া একটি বাটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। উক্ত ভবনে স্ত্রীলোক রোগীদের পরিচর্যার জন্য কয়টি বেড শয্যার সম্পূর্ণ ব্যয় তিনি মাসিক বৃত্তি দান করিয়া বহন করেন। কাশীধামের লক্সায় উক্ত রামকৃষ্ণ সেবা আশ্রম নামক মহৎ প্রতিষ্ঠান যত দিবস থাকিবে সতীশচন্দ্রের প্রদত্ত "নিরোজনী ওয়ার্ড" তাঁহার উচ্চ হৃদয়ের মহত্ত্ব ঘোষণা করিবে। ৺কাশীধামের উক্ত রামকৃষ্ণ সেবা আশ্রমটি প্রকৃত একটি জগতের মধ্যে পুণ্যক্ষেত্র। কত সহস্র দরিদ্র রোগীর ঐ আশ্রমের ভদ্র সেবক ও সেবিকাগণের পরিচর্যায় রোগমুক্ত হইতেছে। উক্ত আশ্রমটি কেবলমাত্র বাঙালী দাতাগণের লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দানে এবং বাঙালী সেবকগণের সেবায় পরিচালিত হইতেছে। কাশীধামে সকল অভ্যাগত বাঙালী স্ত্রী পুরুষের উক্ত আশ্রমটি দেখিয়া আসা উচিত।

প্রথমা পত্নীর স্বর্গারোহণের পর ৭ই আগষ্ট ১৮৯৪ তারিখে ত্রিবেণী ভাস্তারা নিবাসী স্বর্গীয় যজ্ঞেশ্বরচন্দ্র সিংহ মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী সরোজিনীকে শুভ বিবাহ করেন। শ্রীমতী সরোজিনী ধর্মপরায়ণা ও দয়ার্দ্র হৃদয়া নারী। দিবসের অধিকাংশ সময় তিনি পূজা অর্চনা ও জপ করিয়া অতিবাহিত করেন। তিনি দ্বারকা, হরিদ্বার, সেতুবন্ধ রামেশ্বর প্রভৃতি ভারতবর্ষের অনেক তীর্থক্ষেত্র ভ্রমণ করেন।

ভারতবর্ষের মধ্যে বহু স্বাস্থ্যকর ও সৌন্দর্যময় সহর আছে, কিন্তু শ্রেষ্ঠ পুণ্যভূমি কাশীধামের প্রতি এই বংশের সকলেরই যেরূপ আকর্ষণ সেরূপ আর কোন স্থানেই দেখা যায় না। সতীশচন্দ্রেরও কাশীধামের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। তিনি গঙ্গা ও বিশ্বনাথ মন্দিরের সন্নিকটে বাসকা ফটক মহলে চকের বড় রাস্তার উপরে কলিকাতা হইতে মিস্ত্রি লইয়া গিয়া একটি সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদতুল্য বড় অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধ বয়সে অধিকাংশ সময় উক্ত কাশীধামের ভবনে বাস করিয়াছেন। প্রতি রবিবারে কাশীধামের গরীব দুঃখী কাঙালীকে তিনি ভিক্ষা দিতেন এবং কাশীধামের অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও দরিদ্র বিদ্যার্থী ছাত্র তাঁহার নিকট হইতে মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইত।

সতীশচন্দ্রের দানের তালিকার শেষ ছিল না। রাজ সম্মান প্রাপ্তি বা সুনামের আশায় ইনি কখনও দান করিতেন না এবং দানের বিষয়ে সম্প্রদায় বা আত্মপর ভেদ করিতেন না। ইঁহার পিতার ইচ্ছামত বেদান্ত শাস্ত্র প্রচার তদ্বিষয়ক গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসিক পাঁচ শত টাকা ইনি

চিরদিন নিয়মিতভাবে দান করিয়া আসিয়াছিলেন। কুষ্টিয়ায় কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা হইলে ইনি এককালীন তিন শত টাকা দান করেন। ঐস্থানে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রাবাস নির্মাণ বাবদ সতীশচন্দ্র মোট হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন এবং স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়টি সম্প্রসারণ আবশ্যক হইলে এক শত টাকা দান করেন। নদীয়া জেলায় তাঁহার জমিদারীভুক্ত মিরপুর মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয়ে মাসিক সতের টাকা এবং বহুলবাড়িয়া, মাদ্রাসা ও খাদিমপুর উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাসিক পনের টাকা হিসাবে মোট ত্রিশ টাকা নিয়মিতভাবে প্রদান করিয়া আসিয়াছেন। এই সকল দান তাঁহার বিদ্যোৎসাহিতার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

আপনার জমিদারী ও পার্শ্ববর্তী স্থানের অধিবাসিগণের জলকষ্ট নিবারণের জন্য সর্বসুদ্ধ এগারখানি গ্রামে প্রয়োজন মত একটি বা দুইটি করিয়া বৃহৎ কূপ বা ইন্দারা এবং দুইটি বৃহৎ জলাশয় খনন করাইয়া দেন; ইহাতে মোট খরচ হইয়াছিল তের হাজার পঁচিশ টাকা।

বারাকপুর ট্র্যাঙ্ক রোডের সংলগ্ন এঁড়িয়াদহস্থ শ্রীগোপাল মল্লিক রোডস্থ বড় রাস্তা সংস্কার ও সমুন্নতির জন্য সতীশচন্দ্র দশ হাজার টাকা দান করেন। কুষ্টিয়া সীড ষ্টোর ও যতীন্দ্রমোহন হল নির্মাণের জন্য তিনি নয় শত টাকা দান করেন।

১৩৩৬ সন হইতে তাঁহার শরীর দুর্বল হইলে তিনি কাশীধাম বাস ত্যাগ করিয়া চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসেন এবং সেই সময় হইতে তাঁহার ব্লাডপ্রেসার বা রক্তের উচ্চচাপ বৃদ্ধি পায়। পরকাল বিশ্বাসী হিন্দুর স্বভাবসুলভ গঙ্গাতীরে দেহরক্ষা তাঁহার একান্ত কামনার বিষয় ছিল। তাই যথাসময়ে পরপারের আহ্বান অনুভব করিয়াই সতীশচন্দ্র তাঁহার এঁড়িয়াদহ উদ্যান বাটীতে গিয়া বাস করিতে থাকেন। ১৩৪৬ সনের শ্রাবণ মাসের প্রথম হইতে তাঁহার রক্তের চাপ বৃদ্ধি রোগে অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়েন। শরীর অসুস্থ হইলেও তিনি নিজ কর্তব্য ভুলেন নাই। ২রা শ্রাবণ তারিখে তাঁহার মেজ বৌদি (চারুচন্দ্রের স্ত্রীর) পরলোকগমনের সংবাদ পাইয়াই তিনি এঁড়িয়াদহ হইতে ছুটিয়া পটলডাঙ্গাস্থ তাঁহার শ্রদ্ধেয় মেজদাদার পুত্রকন্যাগণকে সান্ত্বনা দান করিয়া যান।

দুই সপ্তাহ মাত্র শয্যাগ্রহণ করিয়া ২৮শে শ্রাবণ ১৩৪৬ তারিখে এঁড়িয়াদহ বাগানবাটীতে সকাল আট ঘটিকার সময় তাঁহার সহধর্মিণী, পুত্রদ্বয় ও পৌত্র-

পৌত্রীগণ এবং অনুরক্ত জনসাধারণকে শোকাকুল করিয়া ইহার আত্মার পরম পদে লীন হয়। উপযুক্তভাবে ভাগীরথী তীরে নিজ উদ্যানে তাঁহার শেষ কার্য সম্পন্ন করা হয়।

তাঁহার তিরোধানের সংবাদ সকল সংবাদপত্রে এবং বেতারবার্তায় জীবনী সহ সাধারণে বিজ্ঞাপিত হয়।

সতীশচন্দ্রের দুই পুত্র যোগেশচন্দ্র এবং ভোলানাথ।

সর্বজনাশ্রয় দানশীল সতীশচন্দ্রের পরলোকগমনে শ্যামবাজার সুহৃদ সম্মিলনের উদ্যোগে ইং ১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ তারিখে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় ৪এ কলেজ স্কোয়ারস্থ মহাবোধি সোসাইটি হলে কলিকাতা নাগরিকগণের একটি মহতী স্মৃতি সভার অধিবেশন হয়। অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মাননীয় শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু, কিরণচন্দ্র দত্ত, নিবারণচন্দ্র দত্ত, পণ্ডিত জীবনভূষণ কাব্যালঙ্কার, নিরাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট নাগরিকগণ দানবীর সতীশচন্দ্রের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া তাঁহার মহৎ জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

জ্যোতিষচন্দ্র

সতীশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র জ্যোতিষচন্দ্র। জ্যোতিষচন্দ্র ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতে জ্যোতিষচন্দ্র মেধাবী ও বুদ্ধিমান বালক ছিলেন। তিনি সেণ্টজেভিয়র বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। শিক্ষালাভ করিবার সময় মাত্র দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ২রা জানুয়ারী ১৯০১ খৃষ্টাব্দে জ্যোতিষচন্দ্রের নির্মল আত্মা অমরধামে প্রয়াণ করে। প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিয়োগে পুত্রবাৎসল্যময় পিতার হৃদয় শোকে অত্যধিক অভিভূত হয় এবং স্নেহময় সতীশচন্দ্র প্রতি বৎসর ২রা জানুয়ারী তারিখে নিরম্বু উপবাস করিয়া পুত্রের আত্মার কল্যাণের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন।

যোগেশচন্দ্র

সতীশচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র যোগেশচন্দ্র ২রা ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার ১৮৯৭ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। যোগেশচন্দ্র হিন্দু ইস্কুলে বিদ্যার্জন করিয়া ১৯১৭

খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে আই. এ. অধ্যয়ন করেন।

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন তারিখে যোগেশচন্দ্র যশোহর জেলা নিবাসী মুখ্য কুলীন কায়স্থ সত্যচরণ ঘোষ মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সুশীলাবালাকে শুভবিবাহ করেন। সতীশচন্দ্র বিশেষ সমারোহের সহিত পুত্রের বিবাহ দেন।

যোগেশচন্দ্র পিতা পিতামহের আশীর্বাদে তাঁহাদের মহৎ হৃদয় ও সকল গুণাবলী প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি অধ্যবসায়ী ও বুদ্ধিমান লোক। তাঁহার চরিত্র যেমন মহৎ সেইরূপ তাঁহার জিতেন্দ্রিয় ও বিনয়ী স্বভাব। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু। অল্প বয়সেই কুলগুরুর নিকট হইতে তিনি মন্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রত্যহ জপ আহ্নিক করেন। তাঁহার বৃদ্ধ পিতৃদেব বার্ধক্যে উপস্থিত হইলে যোগেশচন্দ্র তাঁহার একমাত্র উপযুক্ত ভ্রাতা ভোলানাথকে লইয়া সকল বিষয়কর্মাদি সুচারুরূপে দেখাশুনা করিতেছেন। তিনি পিতা পিতামহের প্রতিষ্ঠিত সকল কীর্তিকলাপ ও অনুষ্ঠানাদি যথানিয়মে পালন করিয়া বংশের সম্মান এবং গৌরব সম্যকভাবে রক্ষা করিয়া যাইতেছেন। অনেক দেশ ও জনহিতকর কার্যে তাঁহার সহানুভূতি দেখা যায়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন, কায়স্থ সভা, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ ইত্যাদি অনেক সভাসমিতির তিনি সভ্য এবং সকলের সহিত মেলামেশা করিতে আন্তরিক ভালবাসেন। ফটোগ্রাফ বিদ্যায় তাঁহার পারদর্শিতা আছে এবং উদ্যানের কার্যে ও মাছ ধরায় তাঁহার শখ আছে।

যোগেশচন্দ্রের তিন পুত্র এবং তিন কন্যা। প্রথম পুত্র রাসবিহারী ১৮ই নভেম্বর ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরবৎসরই বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালের কবলে পতিত হন। যোগেশচন্দ্র পুত্রের স্মৃতি রক্ষার জন্য এঁড়েদহ গ্রামে শ্রীগোপাল মল্লিক রোডস্থ রাস্তার উপর গ্রামবাসীর জলকষ্ট নিবারণের জন্য উক্ত স্বর্গীয় প্রিয়পুত্রের নামে একটি নলকূপ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সদনুষ্ঠান হইতে যোগেশচন্দ্রের উচ্চ হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়।

যোগেশচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র শান্তচন্দ্র। শান্ত হিন্দু ইস্কুল হইতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে আই. এ. অধ্যয়ন করিতেছেন।

যোগেশচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র জয়ন্ত। ৯ই ফাল্গুন ১৩৩৮ সনে জন্মগ্রহণ করেন।

যোগেশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠাকন্যা শ্রীমতী রেণুকাবালা। তিনি শ্যামবাজারস্থ ডাক

বিদ্যালয়ে বিদ্যালাভ করেন। ২৮শে জুলাই ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে যশোহর জেলায় নড়াইলের সুবিখ্যাত জমিদার কাশীপুর নিবাসী স্বর্গীয় শ্যামাচরণ রায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র শ্রীপ্রশান্তকুমারের সহিত শুভবিবাহ হয়। রেণুবালার দুই পুত্র এবং এক কন্যা।

ভোলানাথ

সতীশচন্দ্রের কনিষ্ঠপুত্র ভোলানাথ ২৬শে নভেম্বর বৃহস্পতিবার ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যে হিন্দু ইস্কুল হইতে বিদ্যার্জন করিয়া ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে আই. এ. এবং বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভোলানাথ কলিকাতা ইউনিভারসিটি 'ল' কলেজে আইন অধ্যয়ন করিতেছেন এবং হাইকোর্টের এটর্ণী হইবার জন্য হাইকোর্টের এটর্ণী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের অফিসে আর্টিকেল ক্লার্ক হইয়া এটর্ণীসিপ শিক্ষা করেন।

ভোলানাথ বিনয়ী চরিত্রবান ও জিতেন্দ্রিয় বালক। সকলের সহিত তিনি অমায়িকভাবে মেশেন এবং পল্লীবাসীর সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্য আছে।

৪ঠা মে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ভোলানাথ সিমলানিবাসী শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের একমাত্র কন্যা শ্রীমতী শান্তিলতাকে শুভবিবাহ করেন।

তাঁহার একমাত্র পুত্র দিলীপকুমার।

শ্রীগোপাল বসুমল্লিক মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যা শ্রীমতী গিরিবালা। বারুইপুর-নিবাসী জমিদার যতীন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিবাহের কয় বৎসরের মধ্যেই ২৭শে ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বেলা ১১টার সময় তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

শ্রীগোপাল বসুমল্লিক মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী নৃপেন্দ্রবালা। ২৪শে এপ্রিল মঙ্গলবার ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামবাজার নিবাসী শ্রীযুক্ত অমূল্যপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের সহিত তাঁহার শুভপরিণয় হইয়াছে। অমূল্যপ্রসাদ বিনয়ী চরিত্রবান এবং বিদ্বান পুরুষ। তাঁহার মিষ্ট কথা এবং অমায়িক ব্যবহারের জন্য সকলেই তাঁহাকে ভালবাসেন।

অমূল্যপ্রসাদের দুই পুত্র নগেন্দ্রপ্রসাদ এবং নরেন্দ্রপ্রসাদ এবং এক কন্যা শ্রীমতী কমলকুমারী।

নগেন্দ্রপ্রসাদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নানারূপ ব্যবসা করিতেছেন।

নরেন্দ্রপ্রসাদ বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া জাপানে গিয়া ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে সেলুলয়েডের কার্য শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

নৃপেন্দ্রবালার একমাত্র কন্যা শ্রীমতী কমলকুমারীর ফড়েপুকুর নিবাসী শ্রীঅভয়কুমার দত্তের সহিত শুভবিবাহ হইয়াছে। তাঁহার এক কন্যা শ্রীমতী মাধবীলতা।

শ্রীগোপাল বসুমল্লিক মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ননীবালা। ১০ই জুন ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে হাইকোর্টের এটর্ণী প্রকাশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সহিত শুভ-বিবাহ হয়। প্রকাশচন্দ্র বিশেষ বিদ্বান, অল্পভাষী এবং নির্মল চরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি মহৎ বংশের কুলীন সন্তান ছিলেন। লণ্ডনের ভারতবর্ষের হাইকমিশনার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র। দুর্ভাগ্যক্রমে ১৬ই ১৯১৯ তারিখে প্রকাশচন্দ্র নিঃসন্তান ২৬ বৎসর বয়স্কা সাধ্বী স্ত্রীকে রাখিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন। পতিশোকে কাতর সাধ্বী স্ত্রী ননীবালা সর্বদা পূজা-অর্চনা করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছেন। বদ্রিনারায়ণ, দ্বারকা, পশুপতিনাথ ইত্যাদি ভারতবর্ষের সকল তীর্থেই তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন। পুণ্যভূমি কাশীধামে গৃহ খরিদ করিয়া তথায় সাত্ত্বিকভাবে জীবনযাপন করিতেছেন। তিনি স্বর্গীয় স্বামীর নামে কাশীধামে একটি শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া শিব পূজা করিয়া কালাতিপাত করেন।

—